রিচার্ড রাইট

ব্ল্যাক বয়

অনুবাদ : কবীর চৌধুরী

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ লেখক রিচার্ড রাইট (১৯০৮-৬০) শ্বেতাঙ্গ- কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষক রূপে আধুনিক মার্কিন সাহিত্যের অঙ্গনে সর্বজনস্বীকৃত উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। লেখকের নেটিভ সান (১৯৪০) ও ব্ল্যাক বয় (১৯৪৫) গ্রন্থ দু'টি তাঁর জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি বয়ে আনে। নেটিভ সান প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা গোটা আমেরিকায় বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্য ভুবনে এরকম কিছু ইতোপূর্বে আর রচিত হয়নি। এ উপন্যাসে হত্যা ও ধর্ষণসহ নানা রক্তাক্ত নাটকীয় ঘটনাবলী আছে কিন্তু তার উর্ধে আরো আছে বিভিন্ন উদ্দীপনাময় সাহিত্যিক গুণাবলী। লেখক তাঁর উপন্যাসের নায়ক বিগার টমাসকে বিন্দুমাত্র আদর্শায়িত করে চিত্রিত করেন নি। বিগার টমাস এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। লেখক তার ভেতর ও বাহির দুটোই তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছেন এবং তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবতা বিরোধী, অনৈতিক, নিষ্ঠুর ও ক্রিমিনাল বর্ণবাদী পরিস্থিতিতে নির্মোহ ভাবে উপস্থিত করেছেন। নেটিভ সান-এর বাস্তবতা, জীবনঘনিষ্ঠতা, পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রগাঢ় মানবতাবোধ এবং কাহিনীর কাঠামো নির্মাণ ও বিন্যাসের নৈপুণ্য একজন বড় মাপের সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের পরিচয় তুলে ধরে। এর মধ্যে ক্রোধ আছে, তীব্র প্রতিবাদী সুর আছে কিন্তু তার পাশাপাশি আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের অবস্থা ও জীবন, তাদের আশা ও আকাঙ্খাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার অত্যাবশ্যকতার দিকটিও জোরালো ভাবে উঠে এসেছে। রিচার্ড রাইটের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দি আউটসাইডার (১৯৫৩), ব্ল্যাক পাওয়ার (১৯৫৪), দি কালার কার্টেন (১৯৫৬) এবং দি লঙ্গ ড্রীম (১৯৫৮)।

নেটিভ সান ও ব্ল্যাক বয় সহ রিচার্ড রাইটের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ফরাসি, ইতালিয়, জার্মান, ডাচ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এখন বাংলাতেও তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হলো।

মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ লেখক রিচার্ড রাইট (১৯০৮-৬০) শ্বেতাঙ্গ- কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষক রূপে আধুনিক মার্কিন সাহিত্যের অঙ্গনে সর্বজনস্বীকৃত উচ্চ

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রচ্ছদ
উত্তম সেন
বর্ণবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস্
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
দাম
তিনশ' পঞ্চাশ টাকা
ISBN 984-422-210-5

প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী, মানবতাবাদী, শক্তিশালী মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ লেখক রিচার্ড রাইট জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মিসিসিপিতে, একটি তুলা চাষের খামারে। দুঃসহ দারিদ্র্য, সারাক্ষণ ক্ষুধায় কাতর, নিষ্ঠুর বর্ণবাদের শিকার, শ্বেতাঙ্গদের ভয়ে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত, নোংরা পরিবেশ প্রভৃতির ভেতর থেকে নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তি, পড়াশোনা, কতিপয় গুণী মানুষের সাহচর্য এবং আপন প্রতিভার গুণে রিচার্ড রাইট নিজেকে এক মহৎ উচ্চ স্তরে উন্নীত করেন। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে তিনি আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক রূপে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছেন।

রিচার্ড রাইটের **নেটিভ সান** (১৯৪০) ও **ব্ল্যাক বয়** (১৯৪৫) গ্রন্থ দুটি লেখককে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। প্রথমটি বাস্তবতা ও নাটকীয়তা সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য উপন্যাস, দ্বিতীয়টি আত্মজীবনী। নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে লেখক মার্কিন সমাজ-জীবনে বিদ্যমান বর্ণবাদ ও বৈষম্যের এক নির্মোহ, সত্যনিষ্ঠ, অসাধারণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

রাইট তার আত্মজীবনী লেখায় মনোনিবেশ করেন ১৯৪৩ সালে, নাম দেন আমেরিকান হাঙ্গার। পরে ওই নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেন ব্ল্যাক বয়। ১৯৪৫ সালে **ব্ল্যাক বয় : এ রেকর্ড অব চাইল্ডহুড অ্যান্ড ইয়ুথ** প্রকাশিত হলে তা বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দন লাভ করলেও কয়েকটি মহল থেকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। মিসিসিপির এক শ্বেতাঙ্গ সেনেটর মার্কিন সিনেটে গ্রন্থটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনেন, কিন্তু তাতে **ব্ল্যাক বয়** এর ব্যাপক সমাদরে ভাটা পড়েনি। এ গ্রন্থে রাইট বিশ্লেষণ দক্ষতা, অকপট সত্য কথন এবং আবেগের সঙ্গে যুক্তির যে সমন্বয় সাধন করেছেন তার গুণে **ব্ল্যাক বয়** একটি ক্লাসিক হয়ে উঠেছে।

এ গ্রন্থ রাইট নামক একটি বিশেষ কৃষ্ণাঙ্গ বালকের নিয়তির কাহিনী হয়েও শৈল্পিক গুণের জন্য দারিদ্র্য ও বঞ্চনার ভুবনে বাস করা বহু প্রজন্মের কৃষ্ণাঙ্গ বালকের জীবন কাহিনী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, **ব্ল্যাক বয়** তার চাইতে আরো বিশে কিছু হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে একটা ভয়াবহ ছবি প্রাণ পেয়েছে যা আমাদের সর্বাঙ্গ অসাড় করে দেয়। এখানে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে আমরা সেই সব মানুষের ছবি দেখি যারা কখনো প্রকৃত শৈশব বা যৌবনের স্বাদ পায় নি, অব্যাহত নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনার মধ্যে যাদের জীবন কেটেছে, যারা পরিণত হয়েছে সমকালীন অমানবিক নাগরিক সভ্যতার হতভাগ্য শিকারে। সার্বিক অর্থেই **ব্ল্যাক বয়** একটি ক্লাসিক সাহিত্যকর্ম।

নেটিভ সান ও **ব্ল্যাক বয়**-সহ রিচার্ড রাইটের একাধিক গ্রন্থ ফরাসি, ইতালিয়, জার্মান, ডাচ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এখন বাংলাতেও কিছু অনূদিত হলো। বর্তমান প্রকাশক আমার অনূদিত **নেটিভ সান** প্রকাশ করেন গত ফেব্রুয়ারিতে। এই ফেব্রুয়ারিতে **ব্ল্যাক বয়** প্রকাশ করে তিনি আমার ধন্যবাদার্হ হলেন।

রিচার্ড রাইট ১৯৬০ সালের ২৮শে নভেম্বর পারীর একটি হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং সঙ্গে রাখা হয় **ব্ল্যাক বয়**-এর একটি কপি।

– কবীর চৌধুরী

প্রথম খণ্ড ঃ দক্ষিণী রাত

প্রথম অধ্যায়

বহুদিন আগে আমার চার বছর বয়সের দিনগুলিতে এক শীতের সকালে আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলাম একটা উনুনের সামনে। গণগণ করে জ্বলতে থাকা কয়লার ঢাক্সড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার হাত গরম করতে করতে বাড়ির বাইরে শোঁ শোঁ করে বয়ে যাওয়া বাতাসের ধ্বনি শুনছিলাম কান পেতে। সারা সকাল আমার মা আমাকে বকেছেন, আমাকে চুপচাপ থাকতে বলেছেন, আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন আমি যেন কোনো রকম শব্দ না করি। পাশের ঘরে, রাত্রি-দিন, একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে অসুস্থ দাদী শুয়ে আছেন। আমি জানতাম যে মায়ের কথা না মানলে আমি শাস্তি পাবো। আমি অস্থির চিত্তে জানালার কাছে এগিয়ে যাই, নরম তুলতুলে লম্বা সাদা পর্দা পেছন দিক ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সতৃষ্ণ চোখে শূন্য রাস্তার দিকে তাকাই। ওই পর্দা স্পর্শ করতে আমাকে বারণ করা হয়েছিল। আমার ইচ্ছা করছিল বাইরে ছুটে যেতে, দৌড়াতে, খেলতে, চিৎকার করতে, কিন্তু আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দাদীর স্পষ্ট ছবি, বুড়ো, সাদা, কোঁচকানো একটা কঠোর মুখ, কালো এলোমেলো চুল, আর আমি ভয় পাই।

বাড়িটা চুপচাপ। আমার পেছনে আমার ভাই– আমার চাইতে এক বছরের ছোট–মেঝের ওপর বসে একটা খেলনা নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে খেলছে। জানালার পাশ দিয়ে একটা পাখি তীব্র গতিতে উড়ে যায়, আমি সানন্দ চিৎকার করে তাকে সম্ভাষণ করি। আমার ভাই বললো, এই, শব্দ করো না।

আমি বললাম, তুই চুপ থাক। মা দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর আমার কাছে এসে আমার মুখের সামনে আঙুল উঁচিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ও রকম চেঁচাবে না, বুঝলে? জানো তো, দাদী খুব অসুখ। কোনো শব্দ ক'রো না।

আমি গোমড়া মুখে মাথা নিচু করে থাকি। মা চলে যান। ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমিতে আমার ভেতরটা টনটন করে উঠে।

আমার ভাই আত্মতৃপ্তি নিয়ে খুশি গলায় বললো, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম।

আমি আবার ওকে বলি, তুই চুপ থাক।

আমি হতোদ্যম হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াই, কী করা যায় চিন্তা করার চেষ্টা করি, মা ফিরে আসতে পারেন সে আশঙ্কায় ভীত হই, আমাকে যে অবহেলা করা হচ্ছে সে জন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। আগুন ছাড়া ঘরের ভেতর কৌতূহলোদ্দীপক আর কিছুই ছিল না। অবশেষে আমি ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকা কয়লার খণ্ডগুলির সামনে গিয়ে দাঁড়াই,

থরথর কম্পন কয়লা খণ্ডগুলি আমাকে মুগ্ধ করে ধরে রাখে। আমার মধ্যে এক ধরনের খেলার চিন্তা জেগে উঠে, তারপর সেটা আমার মনে শক্ত হয়ে দানা বাঁধে। আগুনের ভেতর কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলে দিই না কেন, তারপর দেখি কিভাবে তা জ্বলে উঠে? আমি চারদিকে তাকাই। শুধু আমার ছবির বইটা আমার চোখে পড়লো, আর সেটা পোড়ালে মা আমাকে মার লাগাবেন। তাহলে কি করবো? চারদিকে খোঁজাখুঁজি করার পর আমি দেখলাম জিনিসপত্র রাখার ছোট আলমারিতে একটা ঝাড় হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। এই তো... ওখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কয়েক গুচ্ছ খড় যদি আমি আগুনে পোড়াই তাহলে কে তা নিয়ে ব্যস্ত হবে? আমি ঝাঁড় টা বার করে একগুচ্ছ খড় টেনে নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে দিলাম। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ধোঁয়া হলো, কালো হয়ে গেল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, অবশেষে আবছা হালকা সাদা কুণ্ডলির মতো হয়ে মিলিয়ে গেল। খড় পোড়ানোটা একটা দুষ্টুমি ভরা মজার ব্যাপার হয়ে উঠলো। আমি ঝাঁড় থেকে আরো খড় নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে দিলাম। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা খড়ের দিকে চোখ পড়ায় আমার ভাই আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

এ রকম করো না, ও বললো।

কেন? কি হবে? আমি প্রশ্ন করলাম।

তুমি গোটা ঝাঁড় টা পুড়িয়ে ফেলবে।

তুই চুপ থাক, আমি বললাম।

ও বললো, আমি বলে দেবো।

আর তোকে আমি পেটাবো। আমি বললাম।

আমার ধারণাটা বাড়তে থাকে, আরো প্রস্ফুটিত হয়। এবার আমার মনে হলো আমি যদি একগুচ্ছ জ্বলন্ত খড় ওই নরম তুলতুলে সাদা পর্দার নিচে ধরে রাখি তাহলে পর্দাটা কী রকম যে দেখাবে! একবার চেষ্টা করে দেখবো নাকি? নিশ্চয়ই। আমি ঝাঁড় থেকে বেশ কয়েক গুচ্ছ খড় ছিঁড়ে এনে তাতে আগুন ধরিয়ে জানালার কাছে ছুটে গেলাম, তারপর আগুনের শিখা পর্দার নিম্নপ্রান্তে ছুঁইয়ে দিলাম। আমার ভাই তার মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললো, না।

কথাটা ও বড় বেশি দেরি করে বলে। ততক্ষণে লাল বৃত্তগুলি সাদা কাপড়টা গ্রাস করতে শুরু করেছে আর তারপরই দাউ দাউ করা অগ্নিশিখা লাফিয়ে উঠতে থাকে। চমকে গিয়ে আমি পেছনে সরে আসি। আগুন ছাদ পর্যন্ত উঠে যায়, আমি ভয়ে কাঁপতে শুরু করি। তারপর একটা হলুদ চাদরে ঘরটা আলোকিত হয়ে যায়। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু ভয়ে পারলাম না। আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার ভাইয়ের খোঁজ করলাম কিন্তু ও নেই। ঘরের অর্ধেকটায় তখন আগুন লেগে গেছে। ধোঁয়ায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। আগুনের শিখা এখন আমার মুখ ছুয়ে যাচ্ছে। আমি অতি কষ্টে শ্বাস নিতে থাকি।

আমি ছুটে রান্নাঘরে যাই, ধোঁয়া সেখানেও প্রবল বেগে ঢুকতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই মা ধোঁয়ার গন্ধ পাবেন, আগুনটা দেখবেন তিনি, তারপরই আমাকে শিস্টি দেবেন। আমি একটা অন্যায় করেছি যা লুকাবার কিংবা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের আঙিনায় ছুটে গেলাম। কিন্তু কোথায় যাবো আমি? হ্যাঁ, বাড়ির নিচে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো, ওখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না। আমি বাড়ির তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যাই, তারপর একটা ইটের চিমনির অন্ধকার ফাঁপা খোলের মধ্যে নিজেকে শক্ত গুটি পাকিয়ে বসে থাকি। যেন আমাকে কিছুতেই খুঁজে না পায়। আমি যা করেছি তার জন্য মা আমাকে আস্ত রাখবেন। হো, এটা তো একটা দুর্ঘটনা। আমি তো সত্যি সত্যি বাড়িতে আগুন লাগাতে চাই নি। আগুন লেগে পোড়ার সময় পর্দাগুলি কেমন দেখায় আমি তো শুধু সেটা দেখতে চেয়েছিলাম। আর আমি যে এখন একটা আগুন লাগা বাড়ির তলায় লুকিয়ে আছি সে কথাও আমার খেয়াল হয় নি।

অল্প পরেই আমার মাথার উপরে মেঝের গায়ে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ পেলাম, তারপরই শুনলাম আর্ত চিৎকার। একটু পরই দমকলের ঘন্টা আর রাস্তার দিক থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। হ্যাঁ, সত্যিকার আগুন লেগেছে। এই রকম আগুনই আমি ইতিপূর্বে একদিন দেখেছি, গোটা একটা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল শুধু একটা কালো চিমনি দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। আমি যে চিমনিটা জড়িয়ে ধরেছিলাম উপরের বাজের মতো আওয়াজে তা থরথর করে কাঁপছিল। চিৎকারের শব্দ আরো জোরালো হলো। আমি আমার চোখের সামনে দাদীর মূর্তি দেখতে পেলাম, অসহায়ভাবে তার বিছানায় শুয়ে আছেন, তার কালো চুল ঘিরে হলুদ অগ্নিশিখা। আমার মায়ের গায়েও কি আগুন লেগেছে? আমার ভাই কি পুড়ে যাবে? হয়তো বাড়ির সবাই আগুনে পুড়ে মরবে। পর্দায় আগুন লাগাবার আগে কেন আমি এসব জিনিস সব ভাবি নি। আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইলাম, আমার মরে যেতে ইচ্ছা হলো। উপরে হট্টগোল বাড়ে। এবার আমি কাঁদতে শুরু করি। আমি যেন যুগযুগ ধরে এখানে লুকিয়ে আছি। তারপর যখন উপরের ধুপধাপ শব্দ আর চিৎকার থেমে যায় তখন আমার নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয়। আমার মনে হয় আমাকে যেন চিরদিনের জন্য জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। এমন সময় কাছেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমি কেঁপে উঠলাম।

রিচার্ড। আমার মা অস্থির হয়ে আমাকে ডাকছেন।

আমি তার পা ও পোশাকের প্রান্তদেশ দেখতে পেলাম, পেছনের আঙিনায় ছোটাছুটি করছেন। তার চিৎকারের মধ্যে আমি একটা তীব্র যন্ত্রণার বোধ অনুভব করি এবং সেটাই আমাকে আমার শাস্তির পরিমাণ বুঝিয়ে দেয়। তার পরপরই আমি বাড়ির কিনারা দিয়ে মায়ের টানটান মুখ দেখতে পেলাম, উঁকি দিয়ে তলাটা দেখার চেষ্টা করছেন। মা আমার খোঁজ পেয়ে গেছেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করলাম,

এখনই তার সময়ে হেঁটে আসার কারণ ব্যাখ্যা। কিন্তু না, টিমথির অবস্থার সেদায় বুঝতে পারিনে যখন আমাকে যা দেখতে পাচ্ছি। তার মুখ এখন থেকে সরে গেল। আমি আমার দু' হাত যতো দূর ঢেকা পড়ে থাকি। আমার দৃষ্টি তখন ঠেকাঠে করে ঝেঁপড়ে।

টিমথি!

তার ওষ্ঠাধরে যন্ত্রণার হাল আমার শরীরে সমুদ্রের আঘাতের মতো বারালো।

হিমথি। বাড়িতে আসল লোকেরা। কেন, তোমরা আমার বাড়ানে এসে গেছ।

হাঁ, বাড়িতে আসল লোকেরা, কিন্তু আমি আমার নিজেদের মুখ ছেড়ে না যাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের বাড়ির কিনারের কথা নিয়ে আমি আরেকটা মুখোশ টেনে নিয়েছি। সেখি। আমার বাবার মুখ। হাসমাত্র অবস্থানে এর চেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে আঙুল সেধিয়ে বাবা বললেন, ওই যে, ও ওইখানে।

আমি বেরিয়ে যাই, না।

বেরিয়ে যাও।

না।

বাড়িতে আসল লোকেরা।

মানু, আমাকে এখা থাকতে দাও!

বাবা হাতলাড়ি দিয়ে আমার কাছে এসে আমার একটা পা পাকড়ে ধরলেন। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি ইটের টিমনিটির একটা পাশ আঁকড়ে ধরি। বাবা আমার পা ধরে হাঁচকা টান দেন, আমি আরো জোরে টিমনি জড়িয়ে ধরি।

বেরিয়ে যাও, পাঁজ মেয়েকার!

আমাকে ছেড়ে দাও মুখি। বাবার টানাটানির সঙ্গে আমি আর পেরে উঠলাম না। আমার আঙুলগুলি শিথিল হয়ে যায়। আমি আর কোনো কিছু নিয়ে ভাবলাম না। বাবা আমাকে টেনে দেয়ালের অভিমুখে নিয়ে গেলেন। আর যে মুহূর্তে বাবা আমাকে ছেড়ে দিলেন সেই মুহূর্তেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো ছুটি লাগালাম রাস্তা লক্ষ্য করে। কিন্তু চল না না যেতেই ওরা আমাকে ধরে ফেলে।

এই মুহূর্তের পর থেকে আমার কাছে সব কিছু ঝাপ পড়িয়ে যায়। চারিদিকে অন্ধকারী, ঠোঁটকাটা আর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরগুলি মাথা থেকে আমি অনিবার্য করি যে আমার পুত্র কেউ মারা যায় নি। মনে হলো, আমার ভাই এক পর্যায়ে তার ভয় সমন করে মায়ের কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা করে দেয়, তবে তার আগেই বাড়ির অর্ধেকটা ফাল হয়ে গিয়েছিল। মানু আর আমার এক কাকা হোমকটাকে স্ট্রেচারের মতো ব্যবহার করে সরিয়ে হয় বিছানা থেকে এর মধ্যে ভুলে এক ছুটে একজন প্রতিবেশীর বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতি আর নীরবতায় এক সময় ওরা ধরে নেয় যে আমি সম্ভবত আমার পুত্র শেষ হয়ে গেছি।

মা একটা গাছের ডাল ভেঙে তার পাতা পরিষ্কার করেছিলেন। তাঁ চৈতি চক্ষিল আমার পিঠের কাল। বিড়বিড় করে মা বলছিল, তোমার জন্য তারা আসেনি আমাদের খাওয়াতে হবে পিতেছিল প্রায়।

আমাকে এতো দীর্ঘক্ষণ ধরে এতো জোরে বেয়োবার কথা হয় যে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। মায়ের কোলে আমার সব অনুভূতি লোপ পায়। পরে আমি দেখি যে আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি, চিকার করছি। আমি পালিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। বাবা আর মা আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন আর আমি তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। একটা ঘোরের কুয়াশার মতো আমি ডুবে যাই। পরে আমি শুনি যে একজন ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, তিনি নির্দেশ দেন যে আমাকে বিছানায় বসিয়ে রাখতে হবে, আর শান্ত ও স্থির রাখতে হবে, তার ওপরই আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। আমার পা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। আমি দুঃখাতে পারছিলাম না। কুছু কথাবার জন্য কাতর হলে হয়। তখনই আমি দুঃখাবার চেষ্টা করি তখনই আমি সেখতে পাই হাত থেকে আমার ওপর পড়ে যাচ্ছে পাতির ভয়াবি আলের মতো কাঁপাকাঁপা সাদা বিন্দুর কয়েকটা ঘোর। পরে আমার অবস্থা যখন আরো খারাপ হয় তখন আমি নিজের হেলাদের চোখ ঘোলা অবস্থায় ওই ঘোরগুলি সেখতে পাই। আমার জীবন তত হতে থাকে, ঘোরগুলি এক সময় ভুল করে নিচে পড়ে একটা ভয়ঙ্কর ভরল পদার্থ নিয়ে আমাকে ভিজিয়ে সেবে। আমি হাত-দিন আঙুল দিয়ে ওই ঘোরগুলি সেখিয়ে আমার বাবা ও মাকে মিনতি করি এরা যেন সেগুলি সরিয়ে নেয়। আমি ভয়ে কাঁদতে থাকি কারণ আমি ছাড়া আর কেউ ওগুলো সেখতে পাচ্ছিলো না। ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে আমি ঘুমের ভয়ত্রাসে পৌঁছে যাই, আর তখনই আমি চিকার করতে করতে পুরোপুরি জেগে উঠি। ঘুমকে আমি ভয় করতে শুরু করি। অবশেষে সময়ই আমার কাছ থেকে ওই ভয়ঙ্কর ঘোরগুলি সরিয়ে নেয়, কিন্তু আমার মা যে আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন সে ঘটনা আমাকে অনেকদিন সহজ ও পরিষ্কার করে রাখে। প্রতিটি ঘটনা নিজেকে প্রকাশ করতে থাকে এক মুর্দাবা ভাষায়। আর যেটে থাকার মুহূর্তগুলি ক্রমের সাপেক্ষিক অর্থাদমুহ প্রকাশ করে বীরে বীরে। আমি যখন সুস্থভাবে আটিকাতে একদম সাদা-কালো, দুপিনার, পাহাড়ের মতো ঘোড়াকে ধুলার মেরের মধ্য দিয়ে খটি খটি করে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখি তখন আমি অবাক হয়ে যাই।

আমি যখন লাল-সবুজ শাকগুলি ও কাঁচা তরিতরকারির দীর্ঘ সরল সারিগুলিকে উজ্জ্বল দিনালোকে দিকে এগারির হয়ে যেতে দেখি তখন আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

আমি খুব সকালে বাগানের ঘেরা সবুজ পথ দিয়ে ছুটে যাই, আমি শিশিরের ঘোরা পাই আমার পায়ে ও তলায়, আর আমি অনুভব করি একটা মৃদু, শীতল চুম্বনের ইন্দ্রিয়ানুভূতি। আমি যখন নাটোরের সাদা ডিবরণী ঘাড়া শ্যামল কূল থেকে ঝিলিমিলি নদীর ইলাসোটে হাসুমর জলরাশি লক্ষ্য করি তখন অতীতের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে।

আমি যখন বিরান শরতের আকাশে দক্ষিণের পাগে উড়ে যাওয়া এক পাল বুনো হাঁসের পাখা ঝাপটানির শব্দ শুনি তখন স্মৃতিকাতরতার প্রতিধ্বনির মধ্যে আমি নিমজ্জিত হই।

আমি যখন আমার নাকে বাদাম কাঠ পোড়াবার শির শির গন্ধ পাই তখন এক ধরনের অদ্ভুত বিষণ্ণতা আমাকে পেয়ে বসে।

আমি যখন কয়েকটা চড় ই পাখিকে গ্রামীণ রাস্তার লাল ধুলার মধ্যে ঈষৎ গর্বের সঙ্গে হুটোপুটি করতে দেখি তখন তাদের অনুকরণ করার একটা অসম্ভব ইচ্ছা জেগে উঠে আমার মধ্যে।

আমি যখন একটা নিঃসঙ্গ পিঁপড়াকে একটা বোঝা নিয়ে কোনো রহস্যময় ভ্রমণে এগিয়ে যেতে দেখি তখন আমার নিজের স্বরূপ আবিষ্কারের একটা প্রবল আকুতি আমি আমার মধ্যে অনুভব করি।

যখন একটা জংধরা টিনের পাত্রের কানায় একটা কোমল, নীলচে-গোলাপী চিংড়ি মাছকে ভয়ে গুটিগুটি মেরে পড়ে থাকতে দেখে আমি তাকে পীড়ন করি তখন প্রচণ্ড ঘৃণায় আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমি যখন অদৃশ্য এক সূর্যের সোনালি লাল আভায় মেঘ পুঞ্জকে জ্বলে উঠতে দেখি তখন তার গৌরবোজ্জ্বল ঐশ্বর্যে আমার বুক টনটন করে ওঠে।

আমি যখন সাদা চুনকাম করা বাড়িগুলির চতুষ্কোণ জানালার কাচে অস্তমিত সূর্যের শেষ চোখ-ধাধানো রক্ত-লাল রঙ প্রতিবিম্বিত হতে দেখি তখন একটা তরল আতঙ্ক আমাকে ছেঁকে ধরে।

আমি যখন সবুজ পত্রপল্লবকে বৃষ্টির মতো ঝিরঝির শব্দ করে উঠতে শুনি তখন আমি আমার মধ্যে একটা শিথিল অবসাদ অনুভব করি।

আমি যখন পচনোন্মুখ একটা কাঠের গুড়ির অন্ধকার ছায়ার মধ্যে সাদাটে ব্যাঙের ছাতাকে লুকিয়ে থাকতে দেখি তখন তার ভেতরের দুর্বোধ্য গোপন বিষয়টি আমাকে শিহরিত করে।

আমি যখন আমার বাবার হাতের দ্রুত মোচড়ে একটা ঘাড়ভাঙ্গা মুরগীকে অন্ধের মতো লাফিয়ে উঠে দাপাদাপি করতে দেখি তখন না-মরেও মৃত্যুর বোধের একটা অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

আমি যখন কুকুর-বেড়ালকে দুধ আর জল জিভ দিয়ে চেটেচেটে খেতে দেখি তখন ঈশ্বর যে তাদের নিয়ে একটা মস্ত বড় কৌতুক করেছেন আমি তা উপলব্ধি করি।

আমি যখন প্রথম একটা নীল ত্বকের সাপকে রোদের মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকতে দেখি তখন একটা উষ্ণ আতঙ্ক আমার গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে আমার রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

আমি যখন একটা শুয়োরের হৃৎপিণ্ড ছুরি দ্বারা বিদীর্ণ করার পর তাকে ফুটানো জলে

ডুবিয়ে, ছাল ছাড়িয়ে, পেট কেটে, নাড়িভুড়ি বার করে, আর তা করা বজাক মূর্তি দেখি তখন এক অবর্ণনীয় বিস্ময়ে আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়।

আমি যখন শ্যাওলাচ্ছাদিত, দীর্ঘ ওক গাছগুলির রাজকীয় ঐশ্বর্য লক্ষ্য করি তখন আমার মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা জেগে ওঠে।

আমি যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে একটা কাঠের কুপড়ির কড়িবর্গাকে বেঁকে যেতে দেখি তখন মহাজাগতিক নিষ্ঠুরতার একটা আভাস আমি পাই।

আমি যখন সদ্য বৃষ্টি পড়া কাদামাটির ধুলার গন্ধ পাই তখন আমার মুখ লালায় ভর্তি হয়ে যায়।

আমি যখন নতুন কাটা রক্ত ঝরানো ঘাসের গন্ধ নাকে টেনে নিই তখন ক্ষুধার একটা মেঘাচ্ছন্ন ধারণা আমার মধ্যে জেগে ওঠে।

আর আমি যখন নিস্তব্ধ রজনীতে নক্ষত্রের ভারে ভারি আকাশ থেকে বিশাল পুঞ্জ পুঞ্জ সোনালি কুয়াশার পাতকে দ্রুত বেগে ধরণীর পানে নেমে আসতে দেখি তখন একটা নীরব আতঙ্কে আমার মন ভরে ওঠে।

একদিন মা জানালেন যে আমরা কেট অ্যাডামস নামের এক জাহাজে করে মেক্সিস যাচ্ছি। কথাটা শোনার পর থেকে দিনগুলি আমার কাছে মনে হলো অনিঃশেষ। প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার সময় আমি ভাবতাম যে আগামীকালই বোধ হয় আমরা রওয়ানা হবো। জাহাজটা কত বড়? আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

পাহাড়ের মতো বড়, মা জবাব দেন।

বাঁশি আছে?

হ্যাঁ।

বাঁশি বাজায়?

হ্যাঁ।

কখন?

কাপ্তান যখন বাজাতে চায়।

জাহাজটার নাম কেট অ্যাডামস কেন?

কারণ ওটাই জাহাজটার নাম।

জাহাজটা কি রঙের?

সাদা।

আমরা কতক্ষণ জাহাজে থাকবো?

পুরো একদিন একরাত।

রাত্তিরে জাহাজে ঘুমাবো?

হ্যাঁ, যখন ঘুম পাবে তখন ঘুমাবো। এবার চুপ করো।

অনেকদিন ধরে আমি বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর ভাসমান একটা বিশাল সাদা

জাহাজের স্বপ্ন দেখি, কিন্তু আমার মা যখন আমাকে আমাদের বাবার দিন নদী তীরে বাঁদের কাছে নিয়ে যান তখন আমি শুধু দেখি একটা ছোট নোংরা জাহাজ, আদপেই আমার স্বপ্ন দেখা জাহাজের মতো নয়। যখন জাহাজে উঠবার সময় হয় তখন আমি ভীষণ হতাশ হই, আমি কাঁদতে থাকি, আর আমার মা ভাবেন যে আমি মেফিসে যেতে চাই না বলে কাঁদছি, আর আমার কষ্টটা কোথায় তা আমি ওঁকে বলতে পারলাম না। পরে যখন আমি জাহাজের মধ্যে ঘুরে বেড়াই, নিম্নশ্রেণীরকে পাশার ঘুঁটি চালতে, হুইস্কি পান করতে, তাস খেলতে, বাকসো প্যাটরার উপর অলসভাবে গড়াগড়ি করতে এবং খাওয়া-দাওয়া করতে দেখি যখন আমি তাদের কথাবার্তা ও গান শুনি তখন আমি সান্ত্বনা পাই। বাবা আমাকে ইঞ্জিন ঘরে নিয়ে যান আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে যন্ত্রগুলির ধাক্কাধাকানি শুনতে থাকি।

মেফিসে আমরা একটা একতলা ইটের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতাম। পাথরের দালান কোঠা আর সিমেন্টের ফুটপাথকে আমার মনে হতো নিষ্প্রাণ ও বৈরীভাবাপন্ন। সবুজ ও বিকাশমান জিনিসের অভাবে শহরটা মনে হতো মৃত। আমরা চারজন– আমার মা, আমার ভাই, আমার বাবা আর আমি– আমাদের থাকার জন্য জায়গা ছিল মাত্র একটা শোবার ঘর আর একটা রান্নাঘর। বাড়ির সামনে আর পেছনে কিছু পাকা জায়গা ছিল। আমার ভাই আর আমি সেখানে খেলতে পারতাম, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত আমি ভয়ে রাস্তায় একা একা বেরোই নি।

ওই ফ্ল্যাট বাড়িতেই প্রথমবারের মতো আমি আমার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হই। বাবা বীল স্ট্রিটের একটা অমুদের দোকানে রাত্রিকালীন দারোয়ানের কাজ করতেন। আমি যখন জানলাম যে, দিনের বেলায় বাবার ঘুমিয়ে থাকার সময়ে আমি কোনো রকম শব্দ করতে পারবো না তখন থেকে বাবা আমার কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর মানুষ হয়ে উঠেন। আমাদের পরিবারে সব নিয়মকানুন ঠিক করে দিতেন বাবা। তার সামনে আমি কখনো হাসতাম না। আমি রান্নাঘরের দরজার পাশে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে থেকে টেবিলে ধপ করে বসে থাকা তার বিশাল দেহটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। বাবা একটা বড় টিনের পাত্র থেকে ঢক ঢক করে গলায় বীয়ার ঢালতেন, অনেকক্ষণ ধরে খেতেন, আর খেতেন প্রচুর পরিমাণে, নিঃশ্বাস ফেলতেন, ঢেঁকুর তুলতেন, তারপর ভরা পেটে চোখ বুজে চুলতে থাকতেন, আর আমি ভীত বড় বড় দু'চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতাম। বাবা বেশ স্থূলকায় ছিলেন, তার বেল্ট সর্বদাই তার স্ফীত কোমরের ওপর দিয়ে নিচে নেমে আসতো। আমার কাছে বাবা সব সময়ই ছিলেন একজন অচেনা মানুষ, ভিনদেশী ও সুদূর।

একদিন সকালে আমাদের বাড়ির পেছন দিকে খেলার সময় আমার ভাই ও আমি একটা পথভ্রষ্ট বেড়ালের বাচ্চা দেখতে পাই। সেটা জোরে জোরে ক্রমাগত মিউ মিউ করে চেঁচাচ্ছিল। আমরা ওকে কিছু খাওয়ালাম, জল খেতে দিলাম, কিন্তু ও চেঁচাতেই

থাকে। আমার বাবা ঘুমঘুম চোখে, অন্তর্বাস পরা অবস্থায়, পেছনের দরজার বাইরে এসে আমাদের চুপ থাকতে আদেশ দেন। আমরা যখন বললাম যে বেড়ালটা গোলমাল করছে তখন বাবা ওটাকে তাড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। আমরা ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেড়ালটা নড়ে না। এবার বাবা রুদ্ধশ্বাস অবতীর্ণ হলেন। ভাগ। কথা চেঁচিয়ে ওঠেন।

হাচ্ছিসার বাচ্চা বেড়ালটা গেল না। আমাদের পায়ে গা ঘষতে ঘষতে বেড়ালটা বিষণ্ন গলায় মিউ মিউ করতে থাকে।

বাবা এবার ফেটে পড়লেন, শয়তানটাকে মেরে ফেল, যা কিছু একটা কর। কিন্তু এটাকে এখান থেকে সরা মেজাজে হোক। গজগজ করতে করতে বাবা ভেতরে চলে যান। বাবার চিৎকার আমাকে ক্ষুব্ধ করে, আর আমি যে আমার ক্ষোভটা তাকে জানাতে পারছি না তাতে আমার ভেতরটা জ্বলতে থাকে। কেমন করে আমি ওঁকে প্রত্যাঘাত করতে পারি? ওহকে, হ্যাঁ, উনি বেড়ালটা মেরে ফেলতে বলেছেন, আর বেড়ালটাকে এখন আমি মেরেই ফেলবো। আমি জানতাম যে বাবা সত্যিই চান নি যে আমি বেড়ালটা মেরে ফেলি, কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা তীব্র ক্ষোভ আমাকে তার কথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে প্ররোচিত করলো। আমি আমার ভাইকে বললাম, বাবা আমাদের ওটাকে মেরে ফেলতে বলেছেন।

ভাই বললো, বাবা সত্যি সত্যি সেটা চান নি।

চেয়েছেন, আর আমি এখন ওটাকে মেরে ফেলবো।

তাহলে ওটা ভীষণ চেঁচাবে।

মরে গেলে আর চেঁচাতে পারবে না।

আমার ভাই প্রতিবাদ করলো, বাবা বেড়ালটাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলতে বলেন নি।

আমি বললাম, বলেছেন, আর তুই সেটা শুনেছিস।

ভয় পেয়ে আমার ভাই ওখান থেকে ছুটে চলে যায়। আমি একটা দড়ি যোগাড় করে ফাঁস বানালাম, সেটা বাচ্চা বেড়ালটার গলায় পরিয়ে দিলাম, দড়িটা উপরে একটা পেরেকের গায়ে আটকালাম, তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বেড়ালটাকে মাটি থেকে তুলে ফেললাম। ওটা নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাসফাঁস করলো, ওর মুখ দিয়ে লালা নিসৃত হলো, এক পাক ঘুরে গেল, সম্পূর্ণ কুঁকড়ে গেল, পাগলের মতো বাতাসে নখ খামচালো। অবশেষে তার মুখ হা হয়ে গেল আর তার ভেতর থেকে তার গোলাপি সাদা জিভটা শক্ত হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এলো। আমি একটা পেরেকের সঙ্গে দড়িটা বেঁধে আমার ভাইয়ের খোঁজে গেলাম। দালানের এক কোণায় ও গুটিশুটি মেরে বসেছিল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, আমি ওটাকে মেরে ফেলেছি।

ভাই বললো, খুব খারাপ কাজ করেছো তুমি।

আমি গভীর সন্তোষের সঙ্গে বললাম, এখন বাবা ঘুমাতে পারবেন।

জাহাজের স্বপ্ন দেখি, কিন্তু আমার মা যখন আমাকে আমাদের যাবার দিন নদী তীরে বাঁধের কাছে নিয়ে যান তখন আমি শুধু দেখি একটা ছোট নোংরা জাহাজ, আদপেই আমার স্বপ্ন দেখা জাহাজের মতো নয়। যখন জাহাজে উঠবার সময় হয় তখন আমি ভীষণ হতাশ হই, আমি কাঁদতে থাকি, আর আমার মা ভাবেন যে আমি মেফিসে যেতে চাই না বলে কাঁদছি, আর আমার কষ্টটা কোথায় তা আমি ওঁকে বলতে পারলাম না। পরে যখন আমি জাহাজের মধ্যে ঘুরে বেড়াই, নিগ্রোদেরকে পাশার ঘুঁটি চালতে, হুইস্কি পান করতে, তাস খেলতে, বাক্সো প্যাটরার উপর অলসভাবে গড়াগড়ি করতে এবং খাওয়া-দাওয়া করতে দেখি যখন আমি তাদের কথাবার্তা ও গান শুনি তখন আমি সান্ত্বনা পাই। বাবা আমাকে ইঞ্জিন ঘরে নিয়ে যান আর আমি ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধ হয়ে যন্ত্রগুলির ঝকঝকানি শুনতে থাকি।

মেফিসে আমরা একটা একতলা ইটের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতাম। পাথরের দালান কোঠা আর সিমেন্টের ফুটপাথকে আমার মনে হতো নিষ্প্রাণ ও বৈরীভাবাপন্ন। সবুজ ও বিকাশমান জিনিসের অভাবে শহরটা মনে হতো মৃত। আমরা চারজন– আমার মা, আমার ভাই, আমার বাবা আর আমি– আমাদের থাকার জন্য জায়গা ছিল মাত্র একটা শোবার ঘর আর একটা রান্নাঘর। বাড়ির সামনে আর পেছনে কিছু পাকা জায়গা ছিল। আমার ভাই আর আমি সেখানে খেলতে পারতাম, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত আমি ভয়ে রাস্তায় একা একা বেরোই নি।

ওই ফ্ল্যাট বাড়িতেই প্রথমবারের মতো আমি আমার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হই। বাবা বীল স্ট্রিটের একটা অষুধের দোকানে রাত্রিকালীন দারোয়ানের কাজ করতেন। আমি যখন জানলাম যে, দিনের বেলায় বাবার ঘুমিয়ে থাকার সময়ে আমি কোনো রকম শব্দ করতে পারবো না তখন থেকে বাবা আমার কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর মানুষ হয়ে উঠেন। আমাদের পরিবারে সব নিয়মকানুন ঠিক করে দিতেন বাবা। তার সামনে আমি কখনো হাসতাম না। আমি রান্নাঘরের দরজার পাশে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে থেকে টেবিলে ধপ করে বসে থাকা তার বিশাল দেহটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। বাবা একটা বড় টিনের পাত্র থেকে ঢক ঢক করে গলায় বীয়ার ঢালতেন, অনেকক্ষণ ধরে খেতেন, আর খেতেন প্রচুর পরিমাণে, নিঃশ্বাস ফেলতেন, ঢেঁকুর তুলতেন, তারপর ভরা পেটে চোখ বুজে ঢুলতে থাকতেন, আর আমি ভীত বড় বড় দু'চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতাম। বাবা বেশ স্থূলকায় ছিলেন, তার বেল্ট সর্বদাই তার স্ফীত কোমরের ওপর দিয়ে নিচে নেমে আসতো। আমার কাছে বাবা সব সময়ই ছিলেন একজন অচেনা মানুষ, ভিনদেশী ও সুদূর।

একদিন সকালে আমাদের বাড়ির পেছন দিকে খেলার সময় আমার ভাই ও আমি একটা পথভ্রষ্ট বেড়ালের বাচ্চা দেখতে পাই। সেটা জোরে জোরে ক্রমাগত মিউ মিউ করে চেঁচাচ্ছিল। আমরা ওকে কিছু খাওয়ালাম, জল খেতে দিলাম, কিন্তু ও চেঁচাতেই

থাকে। আমার বাবা ঘুমঘুম চোখে, অন্তর্বাস পরা অবস্থায়, পেছনের দরজার কাছে এসে আমাদের চুপ থাকতে আদেশ দেন। আমরা যখন বললাম যে বেড়ালটা গোলমাল করছে তখন বাবা ওটাকে তাড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। আমরা ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেড়ালটা নড়ে না। এবার বাবা দৃশ্যে অবতীর্ণ হলেন। ভাগ। বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন। হাড্ডিসার বাচ্চা বেড়ালটা গেল না। আমাদের পায়ে গা ঘষতে ঘষতে বেড়ালটা বিষণ্ন গলায় মিউ মিউ করতে থাকে।

বাবা এবার ফেটে পড়লেন, শয়তানটাকে মেরে ফেল, যা কিছু একটা কর। কিন্তু এটাকে এখান থেকে সরা যেভাবে হোক। গজগজ করতে করতে বাবা ভেতরে চলে যান। বাবার চিৎকার আমাকে ক্ষুব্ধ করে, আর আমি যে আমার ক্ষোভটা তাকে জানাতে পারছি না তাতে আমার ভেতরটা জ্বলতে থাকে। কেমন করে আমি ওঁকে প্রত্যাঘাত করতে পারি? ওহকে, হ্যাঁ, উনি বেড়ালটা মেরে ফেলতে বলেছেন, আর বেড়ালটাকে এখন আমি মেরেই ফেলবো। আমি জানতাম যে বাবা সত্যিই চান নি যে আমি বেড়ালটা মেরে ফেলি, কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা তীব্র ক্ষোভ আমাকে তার কথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে প্ররোচিত করলো। আমি আমার ভাইকে বললাম, বাবা আমাদের ওটাকে মেরে ফেলতে বলেছেন।

ভাই বললো, বাবা সত্যি সত্যি সেটা চান নি।

চেয়েছেন, আর আমি এখন ওটাকে মেরে ফেলবো।

তাহলে ওটা ভীষণ চেঁচাবে।

মরে গেলে আর চেঁচাতে পারবে না।

আমার ভাই প্রতিবাদ করলো, বাবা বেড়ালটাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলতে বলেন নি।

আমি বললাম, বলেছেন, আর তুই সেটা শুনেছিস।

ভয় পেয়ে আমার ভাই ওখান থেকে ছুটে চলে যায়। আমি একটা দড়ি যোগাড় করে ফাঁস বানালাম, সেটা বাচ্চা বেড়ালটার গলায় পরিয়ে দিলাম, দড়িটা উপরে একটা পেরেকের গায়ে আটকালাম, তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বেড়ালটাকে মাটি থেকে তুলে ফেললাম। ওটা নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাসফাঁস করলো, ওর মুখ দিয়ে লালা নিসৃত হলো, এক পাক ঘুরে গেল, সম্পূর্ণ কুঁকড়ে গেল, পাগলের মতো বাতাসে নখ আমলো। অবশেষে তার মুখ হা হয়ে গেল আর তার ভেতর থেকে তার গোলাপি সাদা জিভটা শক্ত হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এলো। আমি একটা পেরেকের সঙ্গে দড়িটা বেঁধে আমার ভাইয়ের খোঁজে গেলাম। দালানের এক কোণায় ও গুটিশুটি মেরে বসেছিল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, আমি ওটাকে মেরে ফেলেছি।

ভাই বললো, খুব খারাপ কাজ করেছো তুমি।

আমি গভীর সন্তোষের সঙ্গে বললাম, এখন বাবা ঘুমাতে পারবেন।

বাবা সত্যি সত্যি চান নি যে তুমি ওটাকে মেরে ফেলো।
তাহলে কেন উনি আমাকে বেড়ালটা মেরে ফেলতে বলেছিলেন?
আমার অইয়ের মুখে এর কোনো উত্তর যোগালো না। সে আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে ঝুলতে থাকা বেড়ালটা লক্ষ্য করলো।
ও আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললো, বেড়ালটা তোমাকে দেখে নেবে।
ওটার এখন নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।
বাড়ির ভেতরে ছুটে যেতে যেতে ও বললো, আমি বলে দিচ্ছি।
আমি অপেক্ষা করতে থাকি। বাবার হঠকারী উক্তির উল্লেখ করে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেই। তার কথার পুনরাবৃত্তি করে আমি যে আনন্দ পাবো পূর্বাহ্নেই তার স্বাদ গ্রহণ করি, যদিও আমি ঠিকই জানতাম যে বাবা কথাটা রাগের মাথায় বলেছিলেন। কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মা দ্রুত পায়ে আমার কাছে আসেন। দড়ি থেকে বাচ্চা বেড়ালটাকে ঝুলতে দেখে মা দাঁড়িয়ে পড়েন, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।
দোহাই ঈশ্বরের, এটা তুই কি করেছিস?
বেড়ালটা খুব চেঁচামেচি করেছিল। বাবা ওটাকে মেরে ফেলতে বলেন।
গাধা কোথাকার! এর জন্য বাবার হাতে তুই মার খাবি।
কিন্তু বাবা-ই তো ওটাকে মেরে ফেলতে বললেন।
একদম মুখ বন্ধ কর। মা আমার হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে বাবার বিছানার পাশে নিয়ে গিয়ে আমি কী করেছি সেটা বলেন।
বাবা গর্জে ওঠেন, এটা তুই কী করেছিস!
আপনিই তো ওটাকে মেয়ে ফেলতে বলেছেন।
আমি তোকে ওটা তাড়িয়ে দেবার কথা বলেছিলাম।
আমি সজোরে প্রতিবাদ করলাম, আপনি ওটাকে মেরে ফেলতে বলেছিলেন।
বাবা বিতৃষ্ণায় আমাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললেন, আমি তোকে পিটিয়ে টিট করার আগে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা। এরপর বাবা পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়েন।
বাবার ওপর আমার প্রথম জিৎ হলো। আমি ওঁকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ি যে ওর কথা আমি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছিলাম। নিজের কর্তৃত্বকে ঝুঁকির মুখে দাঁড় না করিয়ে বাবা এখন আর আমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না। আমার সমালোচনাকে শেষ পর্যন্ত তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দেবার একটা পথ পেয়ে আমি এখন বেশি আনন্দ বোধ করলাম। আমি ওঁকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি যে বেড়ালটাকে মারার জন্য বাবা যদি এখন আমাকে চাবকান তাহলে ভবিষ্যতে আমি ওঁর কোনো কথার ওপর সত্যিকার গুরুত্ব দেবো না। আমি ওঁকে এটাও বুঝিয়ে দিতে পেরেছি যে আমি ওঁকে একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ বলে মনে করি, আর ওর কাছ থেকে কোনো রকম শাস্তি না পেয়েই আমি এ কাজটা

করতে পেরেছি।
কিন্তু আমার মা ছিলেন প্রবরতর কল্পনাশক্তির অধিকারী। মা ভিন্ন পথে আমার অনুভূতির ওপর আক্রমণ চালালেন। একটা প্রাণ ধ্বংস করার মতো যে নৈতিক ভারবহন বিরাজ করে তার গুরুভারে আমি নিষ্পেষিত হই। সারাটা বিকাল আমার উদ্দেশে মা সুপরিকল্পিত বাক্যাবলী নিক্ষেপ করতে থাকেন, আমি যা করেছি তার প্রতিশোধ নেবার জন্য মায়ের কথাগুলি আমার মনের মধ্যে অদৃশ্য ছোরার জন্ম নেয়। সন্ধ্যা নামতে থাকলে প্রবল দুর্ভাবনা আমাকে ঘিরে ধরে। শূন্য ঘরে একা যেতে আমার ভীষণ ভয় করে।
মা বললেন, তুমি এমন একটা কাণ্ড করেছো যা তুমি কখনো শোধ করতে পারবে না।
আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমি দুঃখিত।
তোমার দুঃখ ওই বেড়ালটার প্রাণ ফিরিয়ে দেবে না।
পরে, আমি শুতে যাবার আগে, মা আমার সর্বাঙ্গ বিকল করে দেয়া নির্দেশটা আমাকে দেন। আমাকে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে একটা কবর খুঁড়তে হবে, তারপর তার মধ্যে বেড়ালটাকে সমাধিস্থ করতে হবে।
আমি না বলে চিৎকার করে উঠলাম। আমার মনে হলো আমি বাড়ির বাইরে গেলেই কোনো একটা অশুভ আত্মা এসে ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।
মা আদেশ করলেন, বাইরে যাও, বেচারি বেড়ালছানাটাকে কবর দাও।
আমি বললাম, আমার ভয় করছে।
বেড়ালছানাটার গলায় যখন তুমি ফাঁসের দড়ি পরিয়ে দাও তখন তার ভয় করে নি?
আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা তো একটা বেড়ালছানা।
কিন্তু ওটা তো জীবন্ত ছিল, তুমি আবার ওটাকে জীবন দিতে পারো?
আমি নৈতিক অপরাধটা বাবার ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় বললাম, কিন্তু বাবাই তো ওটাকে মেরে ফেলার কথা বলেছিলেন।
মা তার হাতের চ্যাপ্টা পাতা দিয়ে আমার মুখে সজোরে চাপড় দিলেন। ওই মিথ্যা কথাটা আর বলো না। বাবা কী বলতে চেয়েছিলেন তুমি তা খুব ভাল করে জানো।
আমি গলা ছেড়ে কেঁদে উঠি, না, আমি জানতাম না।
আমার হাতে মা একটা ছোট কোদাল গুঁজে দিলেন। যাও, বাইরে গিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে বেড়ালছানাকে তার মধ্যে কবর দাও।
আমি টলতে টলতে অন্ধকার রাতের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। আমি তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি। ভয়ে আমার পা কাঁপছে। বেড়ালছানাটা আমি মেরে ফেলেছি তা জানা সত্ত্বেও আমার মায়ের কথার মধ্যে দিয়ে সেটা আমার মনের ভেতর আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ওটাকে এখন স্পর্শ করলে ওটা কী করবে আমার? ওটা কি তার নখ দিয়ে আমার দু'চোখ খামচে ধরবে? আমি অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে মৃত বেড়ালছানার

দিকে এগিয়ে যাই। আমার মা পেছনে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্ধকারে তাঁকে দেখা যায় না। তার কায়াহীন কণ্ঠস্বর আমাকে ঠেলে সামনে নিয়ে যায়।

আমি মিনতি করি, মা এসো, আমার পাশে দাঁড়াও।

তুমি তো বেড়ালটার পাশে এসে দাঁড়াবে? ভীতিপ্রদ অন্ধকারের মধ্য থেকে মা আমাকে ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার মনে হলো বেড়ালছানাটা তিরস্কার ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি কাতর গলায় বললাম, আমি ওটা ছুঁতে পারছি না, মা।

মা আদেশ করলেন, দড়িটা খোলো।

আমি কাঁপতে কাঁপতে অপটু হাতে দড়িটা খুলতে একটা ধপ শব্দ করে বেড়ালছানাটা ফুটপাথের ওপর পড়ে যায়। অনেকদিন অনেক রাত ধরে ওই শব্দ আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এরপর আমার মায়ের ভাসমান কণ্ঠস্বরের নির্দেশ পালন করে আমি একটা মাটির জায়গা খুঁজে বার করি, সেখানে একটা অগভীর গর্ত খুঁড়ি, তারপর শক্ত হয়ে যাওয়া বেড়ালছানাটাকে তার মধ্যে কবর দিই। ঠাণ্ডা মরা বেড়ালটার গায়ে হাত দিতেই আমার ত্বক শির শির করে ওঠে। সমাধিস্থকরণ শেষ হলে আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ির দিকে যেতে শুরু করি, কিন্তু মা তক্ষুণি আমার হাত পাকড়ে আমাকে আবার বেড়ালের কবরের কাছে নিয়ে গেলেন।

চোখ বন্ধ করে এবার আমার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করো, মা বললেন।

আমি আমার দু'হাত দিয়ে মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে আমার চোখ বন্ধ করি।

ডিয়ার গড, আওয়ার ফাদার, আমাকে ক্ষমা করো, কারণ আমি কি করছিলাম আমি বুঝতে পারি নি...

আমি পুনরাবৃত্তি করি, ডিয়ার গড, আওয়ার ফাদার, আমাকে ক্ষমা করো। কারণ আমি কি করছিলাম আমি বুঝতে পারি নি।...

এবং আমার দীন জীবনকে তুমি রেহাই দাও, যদিও ওই বেড়ালছানার জীবনকে আমি রেহাই দিই নি...

আমি পুনরাবৃত্তি করলাম এবং আমার দীন জীবনকে তুমি রেহাই দাও, যদিও ওই বেড়ালছানার জীবনকে আমি রেহাই দিই নি...।

এবং আজ রাতে যখন আমি নিদ্রা যাবো তখন আমার প্রাণবায়ু তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ো না...।

আমি আমার মুখ খুললাম কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না। ভয়ে আমার সমস্ত মন জমে যায়। আমি নিজের ছবিটা দেখতে পাই, নিঃশ্বাস নেবার জন্য আমি হাসফাঁস করছি, আমার ঘুমের মধ্যে আমি মরে যাচ্ছি। আমি আমার মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, রাতের অন্ধকারের মধ্যে ছুটে যাই। আমি ডুকরে কেঁদে উঠে বলি, না।

আমার মা আমাকে অনেক বার ডাকেন কিন্তু আমি তার কাছে ফিরে যাই না।

শেষে মা বললেন, তো, আমার মনে হয় তোমার একটা শিক্ষা হয়েছে।

কৃতকর্মের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়ে আমি শয্যা গ্রহণ করি। মনে মনে আমি ভাবি আর যেন কোনোদিন আমাকে কোনো বেড়ালছানা দেখতে না হয়।

ক্ষুধা এতো ধীরে ধীরে আমার ওপর চড়াও হয় যে আমি প্রথমে ক্ষুধার সত্যিকার অর্থ কী তা বুঝতেই পারি নি। আমি যখন খেলাধুলা করতাম তখন প্রায় সব সময়ই ক্ষুধা আমার কনুই-র কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। কিন্তু এখন রাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেই আমি দেখি যে ক্ষুধা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বড় বড় কর্কশ চোখে আমাকে দেখছে। এর আগে যে ক্ষুধাকে আমি চিনতাম সেটা এ রকম নির্মম অচেনা কেউ ছিল না। সেটা ছিল একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা। তার তাড়নায় আমি সারাক্ষণ রুটির জন্য মিনতি করতাম, আর রুটির শক্ত উপরিভাগের দু'এক টুকরা পেলেই আমি সন্তুষ্ট হতাম। কিন্তু এই নতুন ক্ষুধা আমাকে বিভ্রান্ত ও ভীত করলো, আমি ক্ষুব্ধ ও নাছোড়বান্দা হয়ে উঠি। এখন খাবারের জন্য আমি পীড়াপীড়ি করলেই মা আমাকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিতেন, এক কি দু' মুহূর্তের জন্য তা আমার পেটের ভেতরকার হট্টগোল থামিয়ে রাখতো, কিন্তু একটু পরেই আমি টের পেতাম ক্ষুধা আমার পাঁজর ধরে ঠেলাঠেলি করছে আর আমার শূন্য নাড়িভুড়ি এমন মুচড়ে দিচ্ছে যে তা ব্যথায় টনটন করতে থাকে। আমার মাথা ঘোরে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। আমি আর আগের মতো খেলাধুলায় অংশ নিই না। আমার জীবনে এই প্রথম বারের মতো আমাকে একটু চুপ করে থেকে আমার যে কী হয়েছে তা নিয়ে ভাবতে আমি বাধ্য হলাম।

একদিন বিকালে আমি মায়ের কাছে নালিশ জানালাম, মা, আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

মা আমাকে ভোলাবার ও হাসাবার চেষ্টা করলেন, বললেন, যাও, লাফ দিয়ে একটা ঘুধা ধরে ফেলো।

ঘুধা কি?

ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষুধা পেলে যা খায় ওটা হলো সেই জিনিস।

খেতে কেমন লাগে?

আমি জানি না।

তাহলে তুমি কেন ওটা আমাকে ধরতে বলছো?

মা স্মিত হাসি হেসে বললেন, কারণ তুমি বললে যে তোমার ক্ষুধা পেয়েছে।

আমি বুঝলাম যে মা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। আমার খুব রাগ হলো।

কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত, মা। আমি খেতে চাই।

তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আমি যে এখনই খেতে চাই।

মাকোনো খাবার নেই, বাবা।

নেই কেন?

নেই, তাই নেই।

কিন্তু আমি যে খেতে চাই। আমি কাঁদতে শুরু করি।

মা আবার বললেন, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, বাবা।

কিন্তু কি জন্য?

ঈশ্বর খাবার পাঠাবেন, সে জন্য।

কখন পাঠাবেন?

আমি জানি না।

কিন্তু আমার যে ক্ষুধা পেয়েছে।

মা কাপড় ইস্ত্রি করছিলেন। কাজ থামিয়ে মা আমার দিকে তাকালেন, তার চোখে অশ্রু টলটল করছে। তোমার বাবা কোথায়? মা আমাকে প্রশ্ন করলেন।

আমি বিভ্রান্ত চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। সত্যিই তো, বেশ কয়েকদিন ধরে বাবা আর ঘুমাবার জন্য বাড়ি আসছিলেন না, আর আমি ইচ্ছা মতো হট্টগোল করতে পারছিলাম। কেন বাবা আসছেন না তা না জানলেও, বাবা যে অনুপস্থিত এবং আমার উপর নানা রকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিতে পারছেন না তাতেই আমি খুশি ছিলাম। কিন্তু বাবার অনুপস্থিতির কারণে যে বাড়িতে খাবার থাকবে না এ কথা আমার কখনো মনে হয় নি। আমি জবাব দিলাম, আমি জানি না।

মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কে খাবার নিয়ে আসে?

বাবা। বাবা সব সময় খাবার নিয়ে আসতেন।

তো, এখন তোমার বাবা এখানে নেই।

কোথায় আছেন বাবা?

আমি জানি না।

আমি মেঝেতে পা ঠুকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, কিন্তু আমার যে ক্ষুধা পেয়েছে।

মা বললেন, আমি একটা চাকরি যোগাড় করে খাবার কেনার ব্যবস্থা না করতে পারা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

যতদিন কাটতে থাকে আমার বাবার মূর্তি ততোই আমার কাছে ক্ষুধার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আর ক্ষুধা বোধ করলেই আমি একটা তীব্র জৈবিক তিক্ততা নিয়ে তাঁর কথা ভাবতে থাকি।

অবশেষে মা একটি রাঁধুনির কাজ পেলেন। মা প্রতিদিন আমাদের পাউরুটি আর এক কেতলি চা দিয়ে ফ্ল্যাটে একা রেখে কাজে চলে যেতেন। সন্ধ্যার দিকে মা ফিরে

আসতেন ক্লান্ত ও নিস্তেজ হয়ে। অনেকক্ষণ কাঁদতেন তখন। মাঝে মাঝে মা যখন হতাশ হয়ে পড়তেন, তখন আমাদেরকে কাছে ডেকে এনে ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। বলতেন যে, এখন আমাদের বাবা নেই, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্য শিশুদের জীবনের চাইতে ভিন্ন রকম হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের লেখাপড়া আমাদের নিজেদেরই করতে শিখতে হবে, আমাদের কাপড় আমাদের নিজেদের পরতে হবে, আমাদের খাবার আমাদের নিজেদের বানাতে হবে, মা যখন বাইরে কাজ করবেন তখন বাড়ির দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। একটু ভয় পেলেও আমরা গম্ভীর মুখে ওঁর কথা শুনতাম। মা আর বাবার মধ্যে কী ঘটেছে তা আমরা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু মায়ের ওই সব দীর্ঘ কথাবার্তা আমাদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ভয়ের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতো। আমরা যখনই মাকে জিজ্ঞাসা করতাম, বাবা কেন চলে গেছেন, মা বলতেন, আমরা সেটা বুঝবো না, আমরা এখনও খুব ছোট।

একদিন বিকালে মা আমাকে বললেন যে এখন থেকে আমাকে দোকানে গিয়ে খাবার কিনে আনতে হবে। আমাকে কোথায় দোকানে নিয়ে গিয়ে মা আমাকে পথটা চিনিয়ে দেন। আমি বেশ গর্বিত বোধ করি, আমার মনে হলো আমি বড় হয়ে গেছি। পরদিন অপরাহ্নে আমি হাতে ঝুড়ি ঝুলিয়ে ফুটপাথ দিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে যাই। কোথায় পৌঁছতেই কয়েকটা ছেলের একটা দল আমাকে জাপটে ধরে ঘুসি মেরে মাটিতে ফেলে দিলো, আমার ঝুড়িটা কেড়ে নিলো, টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিলেন, আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমি ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে যাই। সন্ধ্যায় মাকে আমি ঘটনাটা বলি কিন্তু মা কোনো মন্তব্য করলেন না। মা আরেকটা ফর্দ বানালেন, আমার হাতে আরো কিছু টাকা দিলেন, তারপর আবার আমাকে দোকানে পাঠালেন। আমি চুপিচুপি নিচে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই দেখি যে ওই ছেলের দল সামনের রাস্তার উপরে খেলছে। আমি এক ছুটে বাড়িতে ফিরে আসি।

কি ব্যাপার? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

সেই ছেলেদের দল। ওরা আমাকে মারবে।

মা বললেন, তোকে এর মোকাবিলা করতে হবে। যা, আবার যা।

আমার ভয় করছে মা।

ওদের দিকে কোনো নজর না দিয়ে সোজা চলে যা।

আমি বাড়ির বাইরে যাই, ফুটপাথ দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকি, মনে মনে প্রার্থনা করি ওরা যেন আমার ওপর হামলা না করে। কিন্তু ওদের সামনে পড়তেই একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো, ওই যে!

ওরা আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি বাড়ির দিকে প্রাণপণে দৌড় দিই। কিন্তু ওরা আমাকে ধরে ফেলে, ফুটপাথের উপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আমি চেঁচিয়ে উঠি, মিনতি করি, পা দিয়ে লাথি মারি, কিন্তু আবারো ওরা আমার হাত থেকে টাকা পয়সা

ছিনিয়ে নেয়। তারপর ওরা আমাকে এক হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে, কয়েকটা চড়চাপড় দেয়, আর আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যাই। মার সঙ্গে আমার দেখা হলো দোরগোড়ায়।

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, ওরা আমাকে পি-পিটিয়েছে। আমার কাছ থেকে টা-টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ির ভেতরে নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজি। কিন্তু মা আমাকে সাবধান করে দেন, খবরদার, ওখানে ঢুকো না তুমি।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি, বড় বড় চোখ করে মাকে দেখি।

কিন্তু ওরা যে আমাকে মারার জন্য ছুটে আসছে এদিকে।

কঠিন শীতল গলায় মা বললেন, যেখানে আছো ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে থাকো। কি করে রুখে দাঁড়াতে হয়, নিজের জন্য নিজেকে কিভাবে লড়তে হয়, আমি আজ রাতে তোমাকে সে শিক্ষা দেবো।

মা বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন, আর ভীতসন্ত্রস্ত আমি অপেক্ষা করলাম, মা কী করতে চায় তা নিয়ে ভাবলাম। একটু পরেই মা আবার কিছু টাকা ও একটা ফর্দ নিয়ে ফিরে এলেন। এবার তার সঙ্গে একটা বেশ মোটা ভারি লাঠিও দেখলাম। মা বললেন, এই নাও, টাকা, ফর্দ, আর এই লাঠি। দোকানে গিয়ে জিনিসগুলি কিনে আনো। ওই ছেলেগুলি আবার তোমাকে জ্বালাতন করলে ওদের সঙ্গে লড়বে।

আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই। মা আমাকে মারামারি করতে বলছেন, যা এর আগে কখনো বলেন নি।

কিন্তু আমার যে ভয় করছে।

ওই জিনিসগুলি দোকান থেকে না নিয়ে তুই বাড়িতে ফিরবি না।

কিন্তু ওরা যে আমাকে মারবে।

তাহলে রাস্তাতেই থাক, এখানে ফিরে আসিস না।

আমি দৌড়ে দিয়ে মাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করি আর তখনই একটা প্রচণ্ড চড় এসে আমার গালে আঘাত করে। আমি ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকি।

শুধু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো, মা, আমি অনুনয় করে বলি।

না। এবার যাও! যদি বাজার না নিয়ে তুমি বাড়ি ফেরো তবে আমি তোমাকে চাবকাবো।

মা সশব্দ দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি চাবির শব্দ পেলাম। দরজা এখন তালাবন্ধ। ভয়ে আমার শরীরে কাঁপুনি জাগে। অন্ধকার বৈরী রাস্তায় আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। গুণ্ডা ছেলের দল এখনই আমার পিছু নেবে। আমার সামনে এখন দুটো পথ আছে। আমি বাড়িতে পিটুনি খেতে পারি নয়তো বাড়ির বাইরে। আমি কাঁদতে কাঁদতেই

লাঠিটা হাতে তুলে নিই, যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখার চেষ্টা করি। বাড়িতে মার খাওয়ার ফেরে আমার বিন্দুমাত্র কিছু করার থাকবে না, কিন্তু রাস্তায় মার খেলে আমার লড়াই করার একটা সুযোগ থাকবে, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারবো। আমি লাঠিটা শক্ত করে হাতে ধরে ফুটপাথের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ছেলেদের সমস্বরের কাছে এগিয়ে যাই। ভয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন প্রায় ওদের মুখোমুখি।

সমস্বরে একটা চিৎকার উঠলো, ওই যে আবার এসেছে।

ওরা দ্রুত আমাকে ঘিরে ফেলে আমার হাত ধরে ফেলতে চেষ্টা করলো। আমি ওদের সাবধান করে দিলাম, আমি কিন্তু খুন করে ফেলবো।

ওরা আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। ভয়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে আমি আমার লাঠি চালাই, টের পাই যে একটা ছেলের মাথার খুলিতে গিয়ে সেটা বেশ জোরে লেগেছে। আমি আবার লাঠি চালাই, আরেকটা খুলিতে গিয়ে লাগে, তারপর আরেকটা– আমি উপলব্ধি করি যে আমি যদি এক মুহূর্তের জন্য শৈথিল্য দেখাই তখনই ওরা প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি ওদের মাটিতে লুটিয়ে দিতে চাই, মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে চাই, একেবারে খুন করে ফেলতে চাই, যেন আর কোনোদিন আমার গায়ে ওরা হাত তুলতে না পারে। আমার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে, আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরি, নির্জলা ভয়ের তাড়নায় আমি প্রতিটি আঘাত করি আমার শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে। টাকা পয়সা আর বাজারের ফর্দ মাটিতে ফেলে দিয়ে আমি বারবার আঘাত করতে থাকি। ছেলেগুলি চিৎকার করতে করতে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে, আমার দিকে অবিশ্বাসভরা চোখে তাকাতে তাকাতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এ রকম উন্মত্ততা ওরা কখনো দেখে নি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাই, ওদের প্ররোচিত করি, ঠাট্টা করি, এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে লড়তে বলি। ওরা যখন রাজি হলো না তখন আমি ওদের দিকে ছুটে যাই, আর ওরা চিৎকার করতে করতে তাদের বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে। ছেলেদের বাবারা রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমাকে শাসালে আমি চেঁচিয়ে বলি যে, ওরা যদি থামোখা আমাকে ঘাটায় তাহলে আমি ওদেরও রেয়াত করবো না। আমার জীবনে এই প্রথম আমি বড়দের লক্ষ্য করে এ রকম চিৎকার করি। অবশেষে আমি আমার বাজারের ফর্দ আর টাকা কুড়িয়ে নিই, তারপর দোকানে যাই। বাড়ি ফেরার পথে আমি লাঠিটা হাতে ধরে থাকি, যেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু কোথাও একটা ছেলেরও দেখা পেলাম না। ওই রাতে আমি মেক্সিসের রাস্তার অধিকার জিতে নিই। এক গ্রীষ্মের সকালে, আমার মা কাজে বেরিয়ে গেছেন, আমি এক দঙ্গল কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়ের পেছন পেছন একটা ঢেউ খেলানো টিলার নিচের দিকে এগিয়ে যাই, ওই বাচ্চাদের মা-বাবা খেটে খাওয়া মানুষ, সারাদিনের জন্য কাজে গেছেন, ওরা এখন পরিত্যক্ত। টিলার উপর দিকে এক সারি কাঠের, জরাজীর্ণ, উন্মুক্ত শৌচাগার দাঁড়িয়ে আছে, তাদের খোলা পেছন দিকে একটা দৃশ্য দেখা গেল, নগ্ন, অশালীন, চমকে যাবার মতো। আমরা ঢালুর পাদদেশ গুড়ি মেরে

বসে মুখ তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি– হয়তো পঁচিশ ফুট কিংবা তার সামান্য বেশি দূরে হবে আমরা কালো, বাদামি, হলুদ এবং সাদা নরনারীর দেহের গোপন, অদ্ভুত এবং বিচিত্র অঙ্গসব দেখতে পাই। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঙুল দিয়ে দেখাই, ফিসফিস করি, হাসি, ঠাট্টা করি, আমাদের প্রতিবেশীদের দেহের বিচিত্র গড়নের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাদের শনাক্ত করি, তাদের ধীর গতি বর্জ্য নিঃসরণের কষ্ট অথবা রকেটের মতো তীব্র গতি সম্পর্কে মন্তব্য করি। শেষে বয়স্ক কয়েকজন মানুষ আমাদের দেখতে পেয়ে নিদারুণ বিরক্তিসূচক চিৎকার করে, আমাদেরকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে দু'তিন বছরের শিশুরা টিলার পেছন থেকে বেরিয়ে আসতো, তাদের মুখে আঠালো পদার্থ মাখানো, তাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত। শেষ পর্যন্ত বাচ্চাদের দূরে রাখার জন্য শৌচাগারগুলির পেছন দিকে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ বসাতে হয় এবং মানবদেহ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের আমাদের প্রক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে যায়।

দুষ্টামি থেকে দূরে রাখার জন্য মা আমার ভাই ও আমাকে প্রায়ই তার রান্নার কাজে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমরা রান্নাঘরের এক কোণায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ক্ষুধার্ত, তাকিয়ে তাকিয়ে মাকে দেখতাম স্টোভের কাছ থেকে জিনিসপত্র ধোয়ার জায়গায় যাচ্ছেন, দেরাজের কাছ থেকে টেবিলের পাশে যাচ্ছেন। মা রান্না করার সময় আমি সর্বদাই শ্বেতাঙ্গ লোকগুলির রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসতাম, কারণ মাঝে মাঝে দু'এক টুকরা রুটি ও মাংস আমার কপালে জুটতো। কিন্তু অনেক সময়ই মায়ের সঙ্গে আসার জন্য আমি অনুপাত করতাম, কারণ যে খাবারের গন্ধ আমার নাককে জর্জরিত করে তুলতো তার ওপর আমার কোনো অধিকার ছিল না, তা মুখে দিতে আমাকে বারণ করা হতো। রাতের দিকে রান্না করা গরম গরম পাত্রগুলি মা খাবার ঘরে নিয়ে যেতেন, সাদা মানুষগুলি টেবিলে বসে আছে, আমি খাবার ঘরের দরজার যথাসম্ভব কাছে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর বোঝাই করা খাবারের চারপাশে জড়ো হওয়া সাদা মুখগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, খাচ্ছে, হাসছে, কথা বলছে। যেদিন সাদা মানুষগুলির খাওয়ার পর কিছু বেঁচে যেতো সেদিন আমার ভাই ও আমার খাওয়াদাওয়া বেশ ভাল হতো, কিন্তু যেদিন কিছু বাঁচতো না সেদিন আমাদের খেতে হতো আমাদের চিরাচরিত রুটি আর চা।

সাদা মানুষগুলিকে খেতে দেখতে দেখতে আমার খালি পেটের ভেতরটা মুচড়ে উঠতো, আর আমার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ক্রোধ জাগতো। ক্ষুধা পেলে আমি খেতে পাবো না কেন? সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেন আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে? কেন কারো কারো জন্য যথেষ্ট খাবার থাকবে এবং কারো কারো জন্য কিছুই থাকবে না, আমি তা বুঝতে পারলাম না।

এই সময় মা যখন দিনের বেলায় শ্বেতাঙ্গদের বাড়ির রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তখন আমার জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়ানোটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।

আমাদের বাড়ি থেকে এক রক্ত দূরে একটা পানশালা ছিল। আমি সারাদিন ওর সামনে ঘুরঘুর করতাম। ওর অভ্যন্তর ছিল একটা মোহময় স্থান, আমাকে তা একই সঙ্গে আকৃষ্ট ও ভীত করতো। আমি দু' চার পয়সার জন্য মিনতি করতাম, তারপর হাত ঝোলানো দরজার নিচ দিয়ে উঁকি মেরে নারী-পুরুষদের সুরা পানের দৃশ্য দেখতাম। কোনো প্রতিবেশী যখন আমাকে তাড়া দিয়ে দরজার কাছ থেকে তাগিয়ে দিতো তখন আমি রাস্তায় মাতালগুলির পেছন পেছন যেতাম, তাদের বহস্যময় অস্পষ্ট বিড়বিড়ানির মর্মোদ্ধারের প্রয়াস পেতাম, আঙুল তুলে তাদের দেখাতাম, তাদের উপহাস করতাম, অনুকরণ করতাম, ব্যঙ্গ করতাম, সঙের মতো এঁকেবেঁকে ওদের চলনকে ঠাট্টা করতাম। আমি এক মাতাল মহিলাকে দেখতাম যে হোঁচট খেয়ে চলতে চলতে প্রস্রাব করছে, আর তার মোজাপরা পা ভিজে উঠতো। আমার কাছে সেটাই ছিল সব চাইতে মজাদার দৃশ্য। কিংবা আমি আতঙ্কিত চোখে একটা মানুষকে সশব্দে বমি করতে দেখতাম। একজন কেউ পানশালার প্রতি আমার এই আগ্রহের কথা মাকে জানিয়ে দিলে মা আমাকে প্রহার করেন, কিন্তু মা কাজে ব্যস্ত থাকার সময় পানশালার ঝোলানো দরজার নিচ দিয়ে উঁকি মেরে দেখা আর মাতালদের উদ্ভট কথাবার্তা শোনা থেকে তা আমাকে বিরত রাখতে পারে নি।

গ্রীষ্মের এক অপরাহ্নে– আমি তখন ছয় বছরে পা দিয়েছি। আমি যখন আমাদের এলাকার পানশালার ঝোলানোর দরজার তলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম, একজন কৃষ্ণাঙ্গ লোক তখন হঠাৎ আমার বাহু আঁকড়ে ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ধোঁয়ায় আকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ, পানশালার অভ্যন্তরে। মদের তীব্র গন্ধে আমার নাক জ্বালা করে ওঠে। আমি চিৎকার করি, লোকটার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার জন্য যুঝি, চারপাশের নারী-পুরুষের জনতাকে বড় বড় চোখে আমাদের লক্ষ্য করতে দেখে ভয় পাই, কিন্তু লোকটা আমাকে ছেড়ে দিলো না। সে আমাকে উঁচু করে তুলে কাউন্টারের উপর বসিয়ে দিলো, আমার মাথায় তার হ্যাট চাপালো, তারপর আমার জন্য এক পাত্র মদের অর্ডার করলো। মাতাল মেয়ে-পুরুষগুলি আনন্দে হইহই করে উঠলো। একজন আমার ঠোঁটের মধ্যে একটা চুরুট গুঁজে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি ঘাড় বাঁকিয়ে আমার মুখ সরিয়ে নিই।

একটি লোক জিজ্ঞাসা করলো, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতো এখানে এভাবে বসে থাকতে তোমার কেমন লাগছে, খোকা?

অরেকজন বললো, ওকে মাতাল বানিয়ে দাও, তাহলে আর এখানে উঁকি দেবে না।

আরেকজন বললো, চলো, ওর জন্য মদ কিনি আমরা।

চারিদিকে দেখতে দেখতে আমার ভয় কিছুটা হ্রাস পায়। আমার সামনে হুইস্কি রাখা হলো।

খাও, খোকা, একজন বললো।

আমি মাথা নাড়লাম। যে লোকটা আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে এসেছিল সে আমাকে বললো যে এটা খেলে আমার কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমি রাজি হলাম না।

খাও, তোমার ভাল লাগবে, লোকটা বললো।

আমি একটা চুমুক দিই, তারপর কেশে উঠি, মেয়ে-পুরুষগুলি সশব্দে হেসে ওঠে। এবার পানশালার সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়, আমাকে পান করতে তাগিদ দেয়। আমি এক চুমুক খাই, তারপর আবার চুমুক। আমার মাথা ঘুরতে থাকে, আমি হেসে উঠি। এবার আমাকে মেঝেতে নামিয়ে দেয়া হলো। আমি খিলখিল করে হাসতে থাকি, হইহই করা জনতার মধ্যে আমিও চিৎকার করে চলি। আমি লোকগুলির মধ্য দিয়ে যাবার সময় প্রতিটি লোকের বাড়িয়ে দেয়া গ্লাস থেকে এক চুমুক করে পান করতে থাকি। অল্পক্ষণের ভেতর আমি মাতাল হয়ে যাই।

একটা লোক আমাকে তার কাছে ডেকে এনে আমার কানে কানে কয়েকটা কথা বলে আমাকে জানালো, আমি যদি এই কথাগুলি ওই মেয়েলোকটার কাছে গিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে পারি তাহলে সে আমাকে এক পয়সা দেবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি বলবো। লোকটা আমাকে একটা পয়সা দিলো, আর আমি এক দৌড়ে মেয়েলোকটির কাছে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলাম। পানশালার ভেতর একটা প্রবল হাসির তরঙ্গরোল বয়ে যায়।

কেউ একজন বললো, ছেলেটাকে এসব জিনিস শিখিয়ো না।

আরেকজন বললো, ও এর কোনো অর্থই বোঝে না।

এর পর থেকে কেউ আমাকে দু'চার পয়সা দিয়ে তার শেখানো কথা আরেকজনের কাছে পুনরাবৃত্তি করতে বললেই আমি কাজটা করতাম। আমার কুয়াশাচ্ছন্ন অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় ওই রহস্যময় কথাগুলি মেয়ে আর পুরুষগুলির মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতো তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমি ছুটে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যেতাম, হিহি করে হাসতাম, আমার হেঁচকি উঠতো, আমার মুখ দিয়ে যেসব নোংরা কথা বেরোতো তা শুনে সবাই খুশিতে হাসতে হাসতে বাঁকা হয়ে যেতো।

একজন বলে ওঠে, ছেলেটাকে এবার যেতে দাও।

আরেকজন বললো, এতে তো ওর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

খিলখিল করে হাসতে হাসতে এক রমণী বললো, এটা খুব খারাপ হচ্ছে।

কে একজন আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো, বাড়ি যাও, খোকা।

সন্ধ্যা রাতের দিকে ওরা আমাকে যেতে দেয়। আমি তখন একেবারে মাতাল, টলমল পায়ে ফুটপাথ দিয়ে এগিয়ে যাই, অশ্লীল কথাগুলি উচ্চারণ করতে থাকি, পাশ দিয়ে যাওয়া মহিলারা তা শুনে আঁতকে উঠে, আর কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে পুরুষরা তা শুনে দারুণ মজা পায়।

পানশালায় গিয়ে সুরার জন্য কাকুতি মিনতি করা আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অনেক সন্ধ্যায় আমার মা আমাকে রাস্তায় একটা দোরের কাছে হাঁটাহাঁটি করতে দেখতেন। মা তখন আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতেন, পিটুনি দিতেন, কিন্তু পর দিন সকালে মা কাজে বেরিয়ে যেতেই আমি এক দৌড়ে পানশালায় চলে যেতাম, কোনো একজন আমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে এক গ্লাস মদ কিনে দেয় কিনা তার জন্য অপেক্ষা করতাম। অশ্রু সজল চোখে মা পানশালার মালিকের কাছে নালিশ করেন। সে আমাকে তার ত্রিসীমানায় ঢুকতে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু অন্যরা তাদের কৌতুক জীবনটা তাণ করতে চাইলো না। তারা আমার জন্য মদ কিনতো, রাস্তায় তাদের গ্লাস থেকে আমাকে মদ খেতে দিতো, অশ্লীল কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করতো।

আমার ষষ্ঠ বছরে আমি একজন পুরোপুরি মাতালে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে আমি রাস্তায় ঘুরতাম, পথচারীদের কাছ থেকে পয়সা ভিক্ষা চাইতাম, প্রতিদিনই বাড়ি থেকে আরো একটু দূরে চলে যেতাম। আমি যতটুকু বুঝতে পারতাম তার চাইতে বেশি দেখি, যতটুকু মনে রাখতে পারতাম, তার চাইতে বেশি গুলি। আমার জন্য জীবনের অর্থ একটা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, কখন আমি মদ খাবার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে পারবো। আমার মা হতাশ হয়ে পড়েন। মা আমাকে প্রহার করেন, আমার জন্য প্রার্থনা করেন, কাঁদেন, আমাকে ভাল হবার জন্য কাকুতি-মিনতি করেন, বলেন যে কাজ না করে তার কোনো উপায় নেই, কিন্তু আমার স্বেচ্ছাচারী মনের ওপর এসবের কোনো প্রভাব পড়লো না। শেষে মা আমাকে ও আমার ভাইকে এক বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গ রমণীর তত্ত্বাবধানে স্থাপন করেন যে প্রতিটি মুহূর্ত আমার ওপর চোখ রাখতো যেন আমি কিছুতেই পানশালায় ছুটে গিয়ে হুইস্কি পান করার জন্য লোকজনের কাছে ধর্না না দিই। তারপর এক সময় মদের জন্য আমার তীব্র ব্যাকুল ইচ্ছা মরে যায়, আমি তার স্বাদ ভুলে যাই।

আমাদের ঠিক পাশের এলাকায় বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র ছিল। অপরাহ্নে বাড়ি ফেরার পথে তারা কিছু সময় থেমে, ফুটপাথের ওপর তাদের বই ও খাতাপত্র রেখে, খেলাধুলা করতো। আমি বইগুলির পাতা উল্টেপাল্টে দেখতাম এবং বিভ্রান্তিকর ছাপার অক্ষরগুলি সম্পর্কে ওদেরকে নানা প্রশ্ন করতাম। আমি যখন কয়েকটা শব্দ চিনতে শিখলাম তখন আমি আমার মাকে গিয়ে বললাম যে আমি পড়তে শিখতে চাই। মা আমাকে উৎসাহ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই যে সব বাচ্চাদের বই আমার হাতে পড়ে আমি তার বেশির ভাগ এক রকম পড়ে ফেলতে সক্ষম হই। আমার চার পাশে কী ঘটছে তা জানার এক সর্বগ্রাসী কৌতূহল আমার মধ্যে বাড়তে থাকে, আর আমার মা সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের শেষে বাড়ি ফেরার পর আমি রাস্তায় যেসব জিনিস শুনেছি সে সম্পর্কে নিরন্তর প্রশ্ন করে তাকে এমন ব্যতিব্যস্ত করতাম যে মা আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দেন।

একদিন খুব ঠাণ্ডা এক সকালে মা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন যে, বাড়িতে কোনো কয়লা নেই, তাই মা আমার ছোট ভাইকে নিজের সঙ্গে তার কাজের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। মা কয়লা দিয়ে যাবার কথা বলে দিয়েছেন, আমি যেন কয়লা না আসা পর্যন্ত বিছানায় অবশ্যই শুয়ে থাকি। মা একটা চিরকুট আর কিছু টাকা টেবিলের কাপড়ের নিচে চাপা দিয়ে রেখে যান। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। বাইরের দরজায় ঘন্টার শব্দ শুনে আমি জেগে উঠে কয়লাঅলাকে ঘরে আসতে দিই। আমি তাকে চিরকুট আর টাকাটা দিলে সে কিছু কয়লা ঘরের ভেতর এনে রাখে। তারপর লোকটা কিছুক্ষণ দেরি করে, আমার শীত করছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। আমি হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে বলি, হ্যাঁ।

তখন লোকটা আগুন জ্বালিয়ে বসলো, তারপর ধূমপান করতে লাগলো। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাকে কতো খুচরা পয়সা ফেরৎ দিতে হবে?

আমি জানি না!

ছিঃ। লোকটা বললো, তুমি গুণতে জানো না।

না, স্যার।

তাহলে শোনো, তারপর আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

ও দশ পর্যন্ত গুণলো, আর আমি খুব মন দিয়ে শুনলাম। তারপর ও আমাকে একা একা গুণতে বললো, আর আমি ঠিক পেরে গেলাম। তারপর সে আমাকে বিশ, ত্রিশ চল্লিশ প্রভৃতি শব্দগুলি মুখস্ত করিয়ে এক, দুই, তিন ইত্যাদি কিভাবে যোগ করতে হয়, শিখিয়ে দিলো। এক ঘন্টার মধ্যে আমি একশো পর্যন্ত গুণতে শিখে ফেলি। আমার আনন্দের কোনো সীমা থাকলো না। কয়লাঅলা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে আমি আমার রাতের জামা পরেই বিছানার ওপর নাচানাচি করতে করতে বারবার একশো পর্যন্ত গুণতে থাকি। আমার ভয় হয় আমি যদি পুনরাবৃত্তি না করি তাহলে হয়তো সংখ্যাগুলি ভুলে যাবো। মা কাজ থেকে বাড়ি ফিরতেই আমি জোর দিয়ে বললাম যে তাকে একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আমি একশো পর্যন্ত গুণবো এবং তাকে মন দিয়ে তা শুনতে হবে। শুনে মা একেবারে বাকহারা হয়ে যান। এরপর থেকে মা আমাকে পড়তে শেখান, নানা গল্প শোনান। রবিবারগুলিতে আমি মায়ের সাহায্য নিয়ে বানান করে করে খবরের কাগজ পড়া শুরু করি। অল্পকালের মধ্যে সবাইকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমি নিজেকে একটা উৎপাতে পরিণত করে ফেলি। পাড়ার যে কোনো ঘটনা, যত তুচ্ছই হোক না কেন, আমার নিজস্ব ব্যাপার হয়ে উঠে। এর মধ্য দিয়েই আমি হঠাৎ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পর্কের বিষয়টি অবহিত হই এবং আমি যা দেখলাম তা আমাকে ভীত করে তুললো। আমি অবশ্য অনেকদিন ধরেই জানতাম যে সাদা মানুষ বলে কিছু মানুষ আছে, কিন্তু আবেগগত দিক থেকে আমার কাছে তার কোনো অর্থ ছিল না। আমি রাস্তাঘাটে হাজার হাজার সাদা নারী-পুরুষ দেখেছি, কিন্তু আমার কাছে তাদের

বিশেষভাবে সাদা বলে মনে হয় নি। আমার কাছে তারা অন্য মানুষদের মতো শুধু মানুষ বলেই মনে হয়েছে, অথচ কেমন অদ্ভুত ধরনের ভিন্ন রকমও বটে, কারণ তাদের কারো সঙ্গে আমার কখনো কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। বেশির ভাগ সময়ই আমি তাদের কথা ভাবতাম না। সামগ্রিকভাবে শহরের পটভূমিতে কোনো এক জায়গায় তাদের অস্তিত্ব ছিল, ব্যস, এই পর্যন্তই। সাদা মানুষদের সাদা বলে চিনতে আমার দেরি হওয়ার একটা কারণ ছিল। আমি লক্ষ্য করি যে আমার বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন প্রায় ওই রকমই সাদা দেখতে। আমার নানী ছিলেন যে কোনো সাদা মানুষের মতোই সাদা কিন্তু তাকে আমার কখনো শ্বেতাঙ্গ বলে মনে হয় নি। এবং একদিন যখন আমাদের এলাকার কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে একটি কালো ছেলে একজন সাদা মানুষ কর্তৃক ভীষণভাবে প্রহৃত হয়েছে তখন আমি আমার নির্বোধ সারল্যে ধরেই নিই যে সাদা লোকটি নিশ্চয়ই ছিল কালো ছেলেটির বাবা। আর আমার বাবার মতো সব বাবারই তো তাদের সন্তানদের প্রহার করবার অধিকার আছে, তাই না? ওই পৈতৃক অধিকারই হলো একমাত্র অধিকার। আমার বুদ্ধি অনুযায়ী একটা মানুষ তার সন্তানকে প্রহার করতেই পারে। কিন্তু আমার মা যখন আমাকে বললেন যে ওই সাদা লোকটি কালো ছেলেটির বাবা নয়, তার কোনো আত্মীয়ই নয়, তখন আমি খুব দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে সাদা লোকটি কালো ছেলেটিকে চাবুক মারলো কেন?

চাবুক মারে নি, সাদা লোকটি কালো ছেলেটাকে প্রহার করেছে।

কিন্তু কেন?

তুমি বুঝবে না, তুমি এখনো ছোট।

আমি জোরের সঙ্গে বললাম, আমি কাউকে আমাকে প্রহার করতে দেবো না।

মা বললেন, তাহলে ওরকম উচ্ছৃঙ্খলভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করো না।

একজন শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক একটি কৃষ্ণাঙ্গ বালকের ওই রকম আপাত অকারণ প্রহৃত হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আমি দীর্ঘকাল ভাবতে থাকি, আর আমি যত প্রশ্ন করি আমার কাছে ব্যাপারটা ততো বেশি বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। এখন সাদা মানুষ দেখলেই আমি স্থির দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করি, ওরা আসলেই কিরকম তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি।

আমি যখন হাওয়ার্ড ইন্সটিটিউটে ভর্তি হই, তখন আমার বয়স সাধারণের চাইতে বেশি হয়ে গিয়েছিল। আমার মা আমার জন্য উপযুক্ত জামাকাপড় কিনে দিতে পারেন নি। প্রথম দিন পাড়ার ছেলেরা আমাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যায়। স্কুল প্রাঙ্গণের কিনারে পৌঁছতেই আমার খুব ভয় করতে থাকে, আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই, আজকের মতো স্কুলে যাওয়াটা বাদ দিতে চাই, কিন্তু ছেলেরা আমার হাত টেনে ধরে আমাকে স্কুল ভবনের ভেতরে নিয়ে যায়। ভয়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না, অন্য ছেলেরা আমার পরিচয় দেয়, শিক্ষককে আমার নাম ও ঠিকানা জানায়। আমি বসে বসে ছাত্রদের আবৃত্তি শুনলাম, বুঝতে পারলাম, কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করা হলে আমি আমার

মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের করতে সক্ষম হলাম না। আমার চারপাশের ছেলেদের নিজেদের সম্পর্কে এতো সুনিশ্চিত মনে হয় যে আমি হতাশ হয়ে ভাবি ওই রকম আমি কোনোদিন হতে পারবো না।

দুপুরের বিরতির সময় আমি খেলার মাঠে একদল অপেক্ষাকৃত বড় ছেলের সঙ্গে লেগে থাকি, তাদের পেছন পেছন ঘুরি, তাদের কথাবার্তা শুনি, আর অন্তহীন প্রশ্ন করে চলি। ওই দিন দুপুরের এক ঘন্টার মধ্যে আমি অনেকগুলি অশ্লীল নোংরা কথা শিখে ফেলি, শরীর ও যৌন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত, আমি উপলব্ধি করি যে এগুলি আমার আগেও জানা ছিল, পানশালায় আমি এসব কথা আগেও উচ্চারণ করেছি, যদিও তখন এগুলির কোনো অর্থ আমি বুঝি নি। একটি দীর্ঘদেহী কালো ছেলে কৌতুক রসমণ্ডিত একটা লম্বা ছড়া আবৃত্তি করলো, অশ্লীল, তার মধ্যে ছিল মেয়ে-পুরুষের দৈহিক মিলনের নানা বর্ণনা। আমি একবার শুনেই তার প্রতিটি শব্দ মুখস্ত করে ফেলি। অথচ আমার মনে রাখবার চমৎকার ক্ষমতা সত্ত্বেও, ক্লাসে ফিরে যাবার পর আমাকে কিছু আবৃত্তি করতে বলা হলে আমি কিছুতেই একটা জিনিসও বলতে সক্ষম হলাম না। শিক্ষক আমার নাম ধরে ডাকেন, আমি উঠে দাঁড়াই, মুখের সামনে আমার বই ধরে রাখি, কিন্তু আমি আমার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বার করতে পারলাম না। ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, আমার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, আর এদিকে ভয়ে আমি অসাড় হয়ে গেছি। কিন্তু স্কুলের ছুটি হতেই আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি যাই, আমার মাথায় তখন চমকপ্রদ দুঃসাহসী জ্ঞান টগবগ করছে, তবে তার মধ্যে বইপত্রের এক কণাও ছিল না। টেবিলে ঢেকে রাখা ঠাণ্ডা খাবার আমি গপগপ করে গলধকরণ করে এক টুকরা সাবান হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। আজ সকাল থেকে যে সব জিনিস শিখেছি সেটা জাহির করার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি একটার পর একটা বাড়ির জানালার কাচে আমার হাতের সারাজ দিয়ে আমার নতুন শেখা অশ্লীল শব্দগুলি বড় বড় ছাপার অক্ষরের মতো করে লিখে চলি। পাড়ার প্রায় সবগুলি জানালায় লেখা শেষ করে এনেছি এমন সময় এক রমণী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সেদিন রাতে আমাদের বাড়ি এসে সে মাকে আমার কীর্তির কথা বলে, তাকে একটার পর একটা জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে আমার অনুপ্রাণিত লেখাগুলি দেখায়। মা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মা জানতে চান আমি কোথায় এসব জিনিস শিখেছি। আমি যখন বললাম যে স্কুলে তখন মা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মা একটা জলভর্তি বালতি আর তোয়ালে নিয়ে আমার হাত ধরে আমাকে একটা কলঙ্কিত জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন এবার শব্দটা সম্পূর্ণ মুছে না যাওয়া পর্যন্ত ঘষতে থাকো।

প্রতিবেশীরা এসে জোটে, খিকখিক করে হাসে, বিড়বিড় করে করুণা আর বিস্ময় প্রকাশ করে, এতো দ্রুত আমি এসব কথা কোথায় শিখলাম মাকে জিজ্ঞাসা করে। সাবান দিয়ে লেখা নোংরা কথাগুলি আমি ঘষে ঘষে মুছে ফেলি আর একটা অন্ধ ক্রোধে আমার

ভেতরটা জ্বলতে থাকে। আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাকে বলি মা যেন এবার আমাকে ছেড়ে দেয়, আর আমি কোনোদিন এসব কথা লিখবো না, কিন্তু শেষ শব্দটি মুছে অপসৃত হওয়ার আগে মা আমাকে রেহাই দিলেন না। আর কখনো আমি ওরকম কথা লিখি নি, আমি সেগুলি লুকিয়ে রাখি আমার নিজের মধ্যে।

বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পর আমার মায়ের প্রবল শক্তিশালী মনোভাব আমাদের সংসারের ওপর চেপে বসে। মা আমাকে প্রায় প্রায়ই রবিবাসরীয় স্কুল নিয়ে যান, আর সেখানে আমি দেখা পাই ঈশ্বরের প্রতিনিধির, এক দীর্ঘদেহী কৃষ্ণাঙ্গ যাজক তিনি।

এক রবিবার মা ওই দীর্ঘদেহী কৃষ্ণাঙ্গ যাজককে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান, সেদিন ভাজা মুরগির মাংস পরিবেশিত হবে। আমি আনন্দ বোধ করি মুরগির কারণে। দু'একজন পড়শীকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু যাজক উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমি তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি, কারণ আমি উপলব্ধি করি যে, আমার বাবার মতোই, তিনিও সব ব্যাপারে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলতেই অভ্যস্ত। খাবার সময় হতেই আলাপ ও হাস্যরত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আমাকে কোনোরকমে চেপেচুপে টেবিলে বসিয়ে দেয়া হলো। টেবিলের মাঝখানে একটা বিশাল থালায় ছিল সোনালি-বাদামি রঙের ভাজা মুরগি। আমার সামনে ছিল এক বাটি স্যুপ, আমি মুচমুচে মুরগির সঙ্গে তার তুলনা করে মুরগিকেই প্রাধান্য দিলাম। অন্যরা স্যুপ খেতে শুরু করে, কিন্তু আমি আমার স্যুপ স্পর্শ করতে পারছিলাম না।

মা বললেন, তোমার স্যুপটা খাও। স্যুপ না খেলে তোমাকে আর কিছু দেয়া হবে না।

যাজক ততক্ষণে তার স্যুপ শেষ করে মুরগির বড় থালাটা তার দিকে এগিয়ে দিতে বলেন। আমার ভেতরটা বিরক্তিতে ভরে যায়। যাজকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠে, তিনি এদিক-ওদিক তার মাথা নাড়েন, মুরগির ভাল অংশগুলি কেটে নিজের প্লেটে তুলে নেন। আমি জোর করে এক চামচ স্যুপ আমার গলায় ঢেলে দিই, আমার গতি যাজকের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে কিনা লক্ষ্য করি। না, চলছে না। তার প্লেটে ইতিমধ্যে মুরগির হাড় জমে উঠেছে, তিনি আরো মাংস তুলে নিচ্ছেন। আমি আরো তাড়াতাড়ি আমার স্যুপ খেতে চেষ্টা করি। এখন অন্য অতিথিরাও মুরগির মাংস নিতে শুরু করেছেন, বড় থালাটা অর্ধেকের বেশি খালি হয়ে গেছে। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে অপসৃয়মান ভাজা মুরগির টুকরাগুলি দেখতে থাকি। মা আমাকে সতর্ক করে দিলেন, তোমার স্যুপ শেষ করো, নইলে তুমি কিছুই পাবে না।

আমি কোনো জবাব দিতে পারি না, শুধু আবেদনভরা চোখে তাঁর দিকে তাকাই। একটার পর একটা মুরগির টুকরো খাওয়া হতে থাকলো, আর আমি এক চুমুক স্যুপও খেতে পারলাম না। রাগে আমার শরীর জ্বলতে থাকে। যাজক হাসছেন, রসিকতা

করছেন, আর বড়রা সাগ্রহে তার কথা গিলছে। শেষে যাজকের প্রতি আমার বিদ্বেষ ঈশ্বর অথবা ধর্মের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। আমি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। আমি বুঝি যে আমি যা করছি তার জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিজেকে থামাতে পারি না, আমি লাফ দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়ি, চিৎকার করি, অন্ধের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাই। যেতে যেতে আমি চেঁচিয়ে বলি, ওই যাজক গোটা মুরগিটাই খেয়ে ফেলবে।

যাজক ঝাঁকুনি দিয়ে তার মাথা পেছনে হেলিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন, কিন্তু আমার মা খুব রেগে যান। মা আমাকে বলে দেন যে আমার অসভ্য ব্যবহারের জন্য আজ রাতে আমার কোনো খাওয়া জুটবে না।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আমাকে জানানো হলো যে আমরা আজ জনৈক বিচারকের কাছে যাবো। আমার বাবা যেন আমার ভাই আর আমার ভরনপোষণের জন্য টাকা দেয় তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। ঘন্টা খানেক পরে আমরা তিনজন একটা বড় জনাকীর্ণ ঘরে গিয়ে বসে থাকি। এতো মানুষের মুখ দেখে এবং এতো মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে, যার কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না, আমি অভিভূত হয়ে যাই। আমার অনেক উপরে আমি একটি সাদা মুখ দেখতে পাই। মা বললেন যে, ওটাই জজ সাহেবের মুখ। বিমল ঘরটার ওপাশে বসেছিলেন আমার বাবা, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসছেন, আমাদেরকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। মা আমাকে সাবধান করে দিলেন, আমি যেন বাবার বন্ধুসুলভ ভাবভঙ্গি দেখে ভুলে না যাই। মা আরো বললেন, জজ সাহেব আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন, করলে আমি যেন অবশ্যই তাঁকে সত্য কথা বলি। আমি রাজি হই, তবে আশা করতে থাকি যে তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না।

কেন জানি না, আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা নিরর্থক বলে মনে হয়। আমার মনে হয়, বাবা যদি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে চাইতেন তাহলে নিজে থেকেই তা করতেন, জজ বলুন, আর নাই বলুন। আর বাবা আমাকে খাওয়াক আমি তা চাই না। আমি ঠিকই ক্ষুধার্ত কিন্তু এখন আর আমার খাবারের চিন্তা বাবাকে ঘিরে আবর্তিত হয় না। আমি অপেক্ষা করতে থাকি চঞ্চল হয়ে উঠি, ক্ষুধার্ত বোধ করি। মা আমাকে একটা শুকনো স্যান্ডউইচ দিলেন, আমি সেটা চিবাতে চিবাতে চারিদিকে তাকাই। আমি বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অবশেষে আমি আমার মায়ের নাম ডাকা হচ্ছে শুনতে পেলাম। মা উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু এমন প্রবল ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন যে কিছুক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলতে পারেন না। পরে মা বললেন যে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে, তাকে আর তার দুই সন্তানকে, তারা সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকে, মা কাজ করছে, সে একা তাদের দুই ছেলেকে বড় করার চেষ্টা করছে। এর পর আমার

বাবাকে ডাকা হলো। বাবা হাসতে হাসতে লঘুচিত্তে এগিয়ে আসেন। বাবা মাকে চুম্বন করার চেষ্টা করলে মা তার মুখ ঘুরিয়ে নেন। বাবার কথাবার্তার মাঝে মাঝে একটি বাক্যই আমার কর্ণগোচর হয়।

দাঁত বের করে হাসি মুখে বাবা অস্পষ্টভাবে বলেন, হুজুর, আমি আমার যথাসাধ্য করছি।

ওখানে বসে বসে মাকে কাঁদতে আর বাবাকে হাসতে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাইরের রৌদ্রস্নাত রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমার ভাল লাগে। বাড়িতে এসে আবার মা কান্নাকাটি করেন, বাবার কথা বিশ্বাস করে জজ যে অন্যায় করেছেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। আদালতের কর্মকাণ্ডের পর আমি আমার বাবাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করি। আমি তাকে ঘৃণা করতাম না। আমি শুধু তার কথা ভাবতে চাইতাম না। যখন আমাদের কোনো খাবার জুটতো না, তখন মা আমাকে মিনতি করতেন, আমি যেন বাবার কাজের জায়গায় গিয়ে তার কাছ থেকে একটা ডলার চেয়ে চিন্তে নিয়ে আসি, এক ডলার না হলে দশ পয়সা, কিংবা পাঁচ পয়সা। কিন্তু আমি কখনোই যেতে রাজি হতাম না। আমি তাঁর মুখ দেখতে চাই না।

আমার মা অসুখে পড়েন। খাদ্যের সমস্যাটা একটা দৈনন্দিন তীব্র যন্ত্রণা হয়ে ওঠে। ক্ষুধা এখন আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। মাঝে মাঝে প্রতিবেশিরা আমাদের খাওয়া পাঠাতো, কখনো কখনো আমার নানীর কাছ থেকে ডাকে এক ডলারের নোট আসতো। তখন শীত কাল। আমি কোণার কয়লার প্রাঙ্গন থেকে দশ পয়সার কয়লা কিনে কাগজের থলেতে করে বাড়িতে বয়ে নিয়ে আনতাম। কয়েকদিন আমি স্কুলে গেলাম না, বাড়িতে মায়ের দেখা শোনা করলাম। তারপর নানী আমাদের এখানে বেড়াতে আসেন, তখন আমি আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করি।

নানীর কাছে গিয়ে আমাদের থাকার বিষয় নিয়ে রাতে দীর্ঘ আলোচনা হতো, থেমে-থেমে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই স্থির হয় না। সম্ভবত রেলভাড়ার যোগাড় হতো না। এদিকে বাবাকে যে আদালতে টেনে নেয়া হয়েছিল সে জন্য বাবা রেগে যান, আর এখন আমাদেরকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করতে থাকেন। আমার মা ও নানীর দীর্ঘ ক্ষুব্ধ ফিসফিসানি শুনতাম আমি, যে মেয়েলোক একটা সংসার ভেঙ্গে দেয় তাকে খুন করা উচিত। অন্তহীন কথা কিন্তু কোনো কাজ নয়, এ জিনিসটা আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠে। যদি কেউ বলতো যে আমার বাবাকে খুন করা উচিত তাহলে হয়তো আমার মধ্যে কিছুটা সাড়া জাগাতো। কেউ যদি বলতো যে তার নাম আর কেউ যেন উচ্চারণ না করে তাহলে আমি নিঃসন্দেহে তাতে সায় দিতাম। কেউ যদি বলতো যে আমাদের অন্য কোনো শহরে চলে যাওয়া উচিত তাহলে আমি সত্যি খুশি হতাম। কিন্তু, না, শুধু পরিণামহীন অনিঃশেষ আলোচনা। অবশেষে যত বেশি সময় সম্ভব আমি বাড়ির বাইরে কাটাতে শুরু করি। বাড়ির নিষ্ফল কথাবার্তার চাইতে রাস্তার সহজ সারল্য আমার

অধিকতর কাম্য হয়ে ওঠে। শেষে আমাদের মলিন নিরানন্দ ফ্ল্যাটের ভাড়ার টাকা দেয়া আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। বাড়ি ফিরে যাবার আগে নানীর যে সামান্য টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তা ফুরিয়ে যায়। অসুস্থ শরীরে হতাশ হয়ে, আমার মা সাহায্যের খোঁজে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে যেতে শুরু করেন। অবশেষে একটা অনাথ সদন পাওয়া গেল, মা যদি কাজ করে সামান্য টাকা পয়সা দেন তাহলে তারা আমার ছোট ভাই এবং আমার দেখাশোনার ভার নেবে। আমার মা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান নি, কিন্তু তার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

অনাথ সদনটি ছিল একটা দোতলা বাড়ি, প্রশস্ত সবুজ মাঠের মধ্যে গাছ-গাছালি ঘেরা। মা এক সকালে আমাকে আর আমার ভাইকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আমরা এসে দাঁড়ালাম একজন দীর্ঘদেহী, কাঠখোট্টা বর্ণসঙ্কর মহিলার সামনে, নাম মিস সাইমন। তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে মহিলার পছন্দ হয়ে যায়, কিন্তু আমি ভয়ে নির্বাক হয়ে থাকি। প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকে তাকে আমার ভয় করে এবং যতদিন আমি ওই সদনে ছিলাম আমার সে ভয় কাটে নি।

ভবনটিতে ছিল বাচ্চাদের ভিড়, আর সার্বক্ষণিক হইচই। প্রতিদিনের রুটিন আমার স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি কখনই তা ঠিক মতো ধরতে পারি নি। প্রতিদিন আমার সব চাইতে প্রবল যে অনুভূতি হতো তা ছিল ক্ষুধা এবং ভয়ের। খাবার দেয়া হতো খুব অল্প পরিমাণে এবং তা দেয়া হতো দিনে মাত্র দু'বার। প্রতি রাতে ঠিক শুতে যাবার আগে আমাদের গুড়-মাখানো এক টুকরা করে রুটি দেয়া হতো। শিশুরা ছিল বৈরী মনোভাবাপন্ন, প্রতিশোধপরায়ণ; ওরা সারাক্ষণ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো। সার্বিক পরিবেশ ছিল অস্থিরতা এবং ষড়যন্ত্রের, শিশুরা একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগাতো, আর খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে তাদের শাস্তি দেয়া হতো।

বাইরের মাঠে বড় বড় ঘাস গজাতো অনেকখানি জায়গা জুড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে তা কাটাবার মতো টাকা সদনের ছিল না, তাই ওই ঘাসের গুচ্ছ তুলতে হতো হাত দিয়ে টেনে। প্রত্যেক দিন সকালে প্রাতঃরাশের পর, যে প্রাতঃরাশকে প্রাতঃরাশ বলে মনেই হতো না। একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলে আমাদের সবাইকে বিস্তীর্ণ মাঠটায় নিয়ে যেতো, আর আমরা উঁচু হয়ে বসে আঙুল দিয়ে টেনে কাদামাটির মধ্য থেকে ঘাসের গুচ্ছ গোড়া থেকে উপড়ে তুলে আনতাম। খানিক পর পর মিস সাইমন পর্যবেক্ষণে আসতো, প্রতিটি শিশুর পাশে জড়ো করা ঘাসের গুল্ম লক্ষ্য করতো তারপর তার পরিমাণ দেখে তিরস্কার কিংবা প্রশংসা বিতরণ করতো। বহু সকালেই আমার নিজেকে এতো দুর্বল লাগতো যে আমি ঘাস টেনে তুলতে পারতাম না, আমার মাথা ঝিমঝিম করতো, মন ফাঁকা হয়ে যেতো, আর কিছুক্ষণ পর আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেতাম। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আমি দেখতাম যে আমি উবু হয়ে পড়ে আছি, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, সবুজ ঘাসগুলির দিকে বিস্মিত শূন্য চোখে তাকিয়ে আছি, মনে হতো আমি কোনো স্বপ্নের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি...

প্রথম দিকে মা আমার ভাই আর আমাকে দেখতে প্রত্যেক রাতে আসতেন, তারপর একদিন তার আসা বন্ধ হয়ে যায়। আমি ভাবলাম তাহলে কি আমার বাবার মতো আমার মাও অজানার গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেলেন? আমি দ্রুত সবাইকে এবং সব কিছুকে অবিশ্বাস করতে শিখি। শেষে মা যখন এলেন তখন আমি তাকে এতো বেশী করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করি। মা বললেন যে, মিস সাইমন তাকে আসতে বারণ করেছে, মিস সাইমন বলেছে যে আমাদের প্রতি বেশি বেশি মনোযোগ দিয়ে মা আমাদের নষ্ট করছেন। আমি মাকে মিনতি করলাম, আমাকে যেন এখান থেকে নিয়ে যায়। মা চোখের জল ফেলে আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন, জানালেন যে মা শিগগিরই আমাদের অবকাশে নিয়ে যাবেন। মা বিদায় নেয়, আর আমি হতাশায় ডুবে যাই।

মিস সাইমন আমার আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন। মিস সাইমন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার মা রাজি হলে আমি ওর দত্তক পুত্র হবো কিনা। আমি না বলে দিই। তিনি আমাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যান, আমার সঙ্গে নানা কথা বলেন; কিন্তু কোনো লাভ হয় না। ভয় এবং অবিশ্বাস ইতিমধ্যে আমার দৈনন্দিন অস্তিত্বের অংশ হয়ে উঠেছিল। আমার স্মৃতি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে, অনুভূতিসমূহ প্রখর স্পর্শকাতরতা অর্জন করে। অন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমি আমার নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করি। আমি এখন নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখি, আমার চতুর্পার্শ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাজ করতে বা কথা বলতে আমার ভয় করে। বেশির ভাগ সময় আমার মনে হতো আমি যেন শূন্যে ঝুলে আছি। আমার কল্পনা আকাশচুম্বী হয়। আমি পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখি।

মিস সাইমন একদিন আমাকে বললেন যে, আমাকে তার দপ্তরে তাকে সাহায্য করতে হবে। আমি তার সঙ্গে দুপুরের খাবার খাই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, টেবিলে তার মুখোমুখি বসতেই আমার ক্ষুধা উবে যায়। ওই মহিলা আমার ভেতরে একটা কিছুকে মেরে ফেলে। এরপর মিস সাইমন আমাকে তার কাজের টেবিলে ডেকে নেয়। উনি কয়েকটা খামের ওপর ঠিকানা লিখছিলেন।

টেবিলের কাছে এগিয়ে আসো। অত ভয় পেতে হবে না।

আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাতের পাশে দাঁড়াই। ওর চিবুকের উপর একটা আচিল ছিল। আমি এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকি।

মিস সাইমন আমাকে নির্দেশ দেন : ওখান থেকে ওই ব্লটারটা নাও। এনভেলাপের ওপর আমার লেখা শেষ হলেই ব্লটার চেপে কালি শুষে নেবে। আমার হাত থেকে ফুট খানেক দূরে একটা ব্লটার দেখিয়ে দেন মিস সাইমন, কিন্তু আমি শুধু স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকি, নড়ি না, কোনো উত্তরও দিই না।

ব্লটারটা হাতে নাও।

আমি হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বাহু মোচড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে সমর্থ হলাম না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মিস সাইমন বললেন, এই নাও। তিনি হাত বাড়িয়ে ব্লটারটা নিয়ে আমার আঙুলের মধ্যে তা গুঁজে দেন।

কালি দিয়ে খামের ওপর লিখে মিস সাইমন খামটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ব্লটার হাতে নিয়ে আমি খামটার দিকে তাকিয়ে থাকি কিন্তু নড়তে পারি না।

ব্লট করো, মিস সাইমন বললেন।

আমি আমার হাত উঠাতে পারি না। উনি কী বলেছেন আমি বুঝতে পারি, উনি আমাকে দিয়ে কী করাতে চান আমি বেশ বুঝতে পারি। আমি তার কথা ঠিক মতো শুনেছি। আমি তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করি, কেন আমি নড়তে পারছি না সে কথা তাকে বলতে চাই, কিন্তু আমার দু' চোখ মেঝেতে স্থির নিবদ্ধ হয়ে থাকে। আমি সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি না, আর মিস সাইমন আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন, কখন আমি ওই বারো ইঞ্চির দূরত্ব অতিক্রম করে ব্লটার দিয়ে খামের ওপরকার কালি মুছে নেবো তার জন্য অপেক্ষা করেন।

ব্লট করো, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মিস সাইমন বললেন।

তবু আমি না পারলাম নড়তে, না উত্তর দিতে।

আমার দিকে তাকাও।

আমি চোখ তুলতে পারলাম না। মিস সাইমন আমার মুখের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেন, আর আমি মুখ ঘুরিয়ে নিই।

তোমার কি হয়েছে? তিনি জানতে চান।

আমি কাঁদতে শুরু করলে মিস সাইমন আমাকে ঘর থেকে বের করে দেন। আমি ঠিক করি যে রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। রাতের খাবার ঘন্টা বাজার পর আমি খেতে না গিয়ে হলঘরের এক কোণায় লুকিয়ে থাকি। আমি যখন খাবার টেবিলে বাসন-কোসনের নাড়াচাড়ার শব্দ শুনি তখন আমি দরজা খুলে রাস্তায় নেমে আসি। তখন সবে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। আমি দোটানায় পড়ে একটু থামি। আমার কি ফিরে যাওয়া উচিত? না। ওখানে আছে ক্ষুধা আর ভয়। আমি এগিয়ে যাই, পাকা ফুটপাথের কাছে পৌঁছাই। আমার পাশ দিয়ে লোকজন চলাচল করে। কোথায় চলেছি আমি? আমি জানি না। আমি যতো দূরে যেতে থাকি ততো মরীয়া হয়ে উঠি। একটা অস্পষ্ট, তালগোল পাকানো অনুভূতি হয় আমার। আমার মনে হয় কোনো একটা জিনিসের দিকে ছুটে যাওয়ার চাইতে আমি কোনো একটা জিনিসের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। আমি থামি। রাস্তাগুলি মনে হলো বিপদজনক। ভবনগুলি বিশাল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। চাঁদ উঠেছে, গাছগুলি ভীতিজনক ও আবছাভাবে আবির্ভূত হচ্ছে। না, আমি আর এগিয়ে যেতে পারি না। আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আমি এতো দূর চলে এসেছি আর এতো বেশি মোড় নিয়েছি যে পথের কোনো নিশানা মনে রাখতে পারি নি। কোন রাস্তা অনাথ সদনের দিকে গেছে? আমি জানি না। আমি হারিয়ে গেছি।

ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি কাঁদতে থাকি। একজন সাদা পুলিশ আমার কাছে এগিয়ে আসে। আমি ভয় পাই, ওকি আমাকে গ্রেপ্তার করবে? ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার কি হয়েছে? আমি ওকে জানাই যে আমি আমার মায়ের খোঁজ করছি। ওর সাদা মুখ আমার মধ্যে নতুন একটা ভয়ের জন্ম দেয়। একজন সাদা মানুষ যে একটি কালো ছেলেকে প্রহার করেছিল আমার সে কাহিনী মনে পড়ে। দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক জমে যায়, আমি কোথায় থাকি ওরা জানতে চায়। বিস্ময়করভাবে, আমার এতো ভয় করতে থাকে যে, আমার কান্না থেমে যায়। সাদা মুখটিকে আমি বলতে চাই যে, আমি একটা অনাথ সদন থেকে পালিয়ে এসেছি, মিস সাইমন তার কর্তা, কিন্তু ভয় পেয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। শেষে আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে আমাকে খেতে দেয়া হয়। এখন আমার একটু ভাল লাগছে। আমি একটা বড় চেয়ারে বসে আছি। আমার চারপাশে আমি বেশ ক'জন সাদা পুলিশ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তারা কেউ আমার প্রতি কোনো মনোযোগ দিচ্ছে বলে মনে হলো না। জানালা দিয়ে আমি দেখলাম যে ততক্ষণে পুরোপুরি রাত হয়ে গেছে, রাস্তার বাতিগুলি জ্বলছে। আমার ঘুমঘুম লাগে, আমি ঝিমুতে থাকি। কে একজন আমার কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দেয়, আমি আমার চোখ খুলে আরেকজন সাদা পুলিশের মুখ দেখতে পাই, আমার পাশে বসে আছে সে। ধীর, অন্তরঙ্গ, শান্ত সুরে আমাকে সে নানা প্রশ্ন করে, আর আমি ভালভাবে টের পাবার আগেই সে আর আমার কাছে সাদা থাকলো না। আমি তাকে বলে দিই যে আমি একটা অনাথ সদন থেকে পালিয়ে এসেছি, ওই সদন চালান মিস সাইমন। এর কয়েক মিনিট পরই আমি দেখলাম যে একজন পুলিশের পাশাপাশি আমি সদনের দিকে হেঁটে যাচ্ছি। পুলিশটি আমাকে সামনের ফটক দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। আমি সিঁড়ির ওপর মিস সাইমনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। মিস সাইমন আমাকে শনাক্ত করলে আমাকে তার হেফাজতে অর্পণ করা হয়। আমি তাকে অনুনয়-বিনয় করি আমাকে যেন প্রহার করা না হয়, কিন্তু উনি আমাকে উপরের একটা খালি ঘরে সজোরে টেনে নিয়ে যান, তারপর বেত দিয়ে বেদম পিটুনি দেন। কাঁদতে কাঁদতে আমি বিছানায় ঢুকে পড়ি, ঠিক করি যে আমি আবার পালাবো। কিন্তু এর পর থেকে আমার ওপর কড়া নজর রাখা হয়। মা পরের বার আমাকে যখন দেখতে আসেন তখন তাকে আমার পালিয়ে যাবার চেষ্টার কথা বলা হয়। মা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন।

মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি এরকম করলে?

আমি এখানে থাকতে চাই না।

কিন্তু তোমাকে তো থাকতেই হবে। তোমাকে নিয়ে যদি আমাকে দুর্ভাবনা করতে হয় তাহলে আমি কাজ করবো কিভাবে? তোমার বাবা নেই, সে কথা তোমার মনে রাখা দরকার। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমি করছি।

আমি আবার বলি, আমি এখানে থাকতে চাই না।

তাহলে আমি যদি তোমাকে তোমার বাবার কাছে...।

আমি তার কাছেও থাকতে চাই না।

কিন্তু আমি চাই যে তুমি ওর কাছে গিয়ে প্রয়োজনীয় টাকা চাইবে যেন আমরা আরকানসাসে আমার বোনের কাছে যেতে পারি।

আবার আমাকে এমন একটা কিছু বেছে নিতে হলো যা আমার আদতেই পছন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত আমি রাজি হলাম। বাবার প্রতি আমার ঘৃণা অনাথ সদনের প্রতি ঘৃণার চাইতে বেশি তীব্র ছিল না। মা তার পরিকল্পনা আঁকড়ে থাকেন।

সপ্তাহ খানেক পরে এক রাতে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি একটি কাঠের বাড়িতে, সেখানে একটি ঘরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার বাবা ও একজন অপরিচিত মহিলা একটা উজ্জ্বল আগুনের চুল্লির সামনে বসে আছে, মা আর আমি দাঁড়িয়ে আছি ফুট ছয়েক দূরে, যেন আর কাছে যেতে আমরা ভয় পাচ্ছি।

মা বললেন, আমার নিজের জন্য নয়, আমি তোমার কাছে টাকা চাইছি তোমার ছেলেদের জন্য।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, আমার হাতে কিছুই নেই।

অপরিচিত মহিলা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এদিকে আসো, খোকা।

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি, নড়ি না।

মহিলা বললেন, ওকে একটা নিকেল দাও। ও বেশ আকর্ষণীয়।

আমার বাবা তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এখানে আসো, রিচার্ড।

আমি মাথা নেড়ে পিছিয়ে যাই, স্থির চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকি।

মহিলা আবার বললেন, বেশ আকর্ষণীয় ছেলে ও।

মা অপরিচিত মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তোমার জন্য আমার ছেলে উপোস করছে।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, এই তোমরা ঝগড়া করো না।

আমি বোকার মতো বাবাকে বললাম, আমি ওই লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তোমাকে এক ঘা লাগাবো!

উনি আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি ওকে এটা বলতে শিখিয়ে দিয়েছো।

রিচার্ড, এসব বলবে না, মা বললেন।

আমি অপরিচিতা মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমার মরে যাওয়া উচিত।

মহিলা হেসে উঠে আমার বাবার গলা জড়িয়ে ধরলেন। আমার খুব লজ্জা হয়, ওখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছা করে আমার।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে তুমি তোমার ছেলেদের না খেয়ে থাকতে দিতে পারো?

বাবা বললেন, রিচার্ড আমার কাছে থাকুক।

মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি তোমার বাবার কাছে থাকতে চাও, রিচার্ড?

না, আমি জবাব দিই।

বাবা বললেন, এখানে প্রচুর নেতে পারে।

আমি বললাম, আমি এই মুহূর্তেই খুব ক্ষুধার্ত, কিন্তু আমি তোমার কাছে থাকবো না।

ওকে একটা নিকেল দাও, মহিলা বললেন।

বাবা তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা নিকেল বের করে বললেন, এই যে রিচার্ড, এটা নাও।

নিও না, মা বললেন।

ওকে বোকামি শিখিও না, বাবা বললেন। এসো রিচার্ড, এটা ধরো।

আমি আমার মাকে দেখি, ওই অপরিচিত মহিলাকে দেখি, আমার বাবাকে দেখি, তারপর আগুনের দিকে তাকাই। আমি নিকেলটা নিতে চাই, কিন্তু আমার বাবার হাত থেকে নিতে চাই না।

মা অশ্রুসজল চোখে বললেন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত তোমার ছেলে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে আর তুমি ওকে একটা নিকেল দিচ্ছো। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তবে এর শাস্তি তিনি তোমাকে দেবেন।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, আমার কাছে এটাই আছে। পয়সাটা বাবা আবার তাঁর পকেটে ঢুকিয়ে রাখেন।

আমরা চলে আসি। আমার মনে হয় আমি যেন একটা নোংরা কিছুর সংস্পর্শে এসেছিলাম। এই ঘটনার পর বহু বছর ধরে বহুবার আমার মুখের সামনে আমার বাবা আর ওই অপরিচিত মহিলার ছবি ভেসে উঠেছে, আগুনের নৃত্যরত শিখায় তাদের মুখ জ্বলজ্বল করছে, আমার কল্পনায় তাদের এতো জীবন্ত আর উজ্জ্বল দেখাতো যে আমার মনে হতো আমি হাত বাড়ালেই তাদের ছুঁতে পারবো। আমি স্থির চোখে ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি, আমার মনে হয় তার মধ্যে একটা অপরিহার্য অর্থ আছে যা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না।

ওই অপরিচিত মহিলার সঙ্গে বাবাকে বসে থাকতে দেখার পর আমি যখন আবার বাবাকে দেখি, দেখি তিনি লাল এটেল মাটির একটা মিসিসিপির তুলা ক্ষেতে একা দাঁড়িয়ে আছেন, এক ভাগাচাষী, পরনে জীর্ণ আলখাল্লা, তার শিরাওঠা, প্যাঁচানো, কর্কশ হাতে একটা নিড়ানি ধরে আছেন, ততদিনে পঁচিশ বছর কেটে গেছে– ওই পঁচিশ বছরে আমার মন ও চিন্তাভাবনা এতো তীব্র প্রচণ্ডভাবে বদলে গিয়েছিল যে আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করি তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, যদিও রক্তের বন্ধন আমাদের স্বজন করেছে, যদিও আমার কণ্ঠস্বরে আমি তার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনি,

যদিও তার মুখে আমি আমার নখের ছায়া দেখতে পাই, তবু আমরা এখন চিরকালের জন্য অপরিচিত মানুষ হয়ে গেছি, আমরা এখন ভিন্ন ভাষায় কথা বলি, বাস করি বাস্তবতার বিশাল দূরবর্তী দুই স্তরে। পঁচিশ বছর পর সেদিন আমি যখন তাকে ওই তুলা ক্ষেতে দেখতে যাই, আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন, দন্তহীন মুখে হাসছেন, চুল সাদা হয়ে গেছে, শরীর কুঁজো, আবছা স্মৃতিতে চোখ দুটি যেন কাচের প্রলেপ দেয়া, পঁচিশ বছর আগের তার ভয়ঙ্কর দাপুটে হাবভাব চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে– তখন আমি এটা উপলব্ধি করে আচ্ছন্ন ও বিধ্বস্ত হয়ে যাই যে উনি আর কখনো আমাকে বুঝতে পারবেন না যে, তীব্র জ্বালাময় অভিজ্ঞতাবলী আমাকে তার জীবনের বৃত্ত থেকে জীবনের অন্য একটা ক্ষেত্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেটা তিনি কোনোদিনই অনুভব করতে পারবেন না। আমার মন তার জীবনের সরল নগ্নতাকে আলিঙ্গন করে ব্যথায় টনটন করে ওঠে, ঋতুর ধীর প্রবাহ দ্বারা, রোদ আর বৃষ্টি আর হাওয়া দ্বারা তার আত্মা যে কী রকম পুরোপুরি বন্দি তা আমি অনুভব করি, তার স্মৃতি যে একটা স্থূল কর্কশ অতীতের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছে তা আমি বুঝতে পারি, তার বিবর্ণ মরে যাওয়া দেহের প্রত্যক্ষ জান্তব প্রণোদনার সঙ্গেই তার সকল কাজ ও আবেগ অনুভূতি এখন যে কিভাবে শৃঙ্খলিত তা আমার চেতনায় ধরা পড়ে...।

যে শ্বেতাঙ্গ ভূমি মালিকরা তার ওপর কর্তৃত্ব করেছে তাদের কাছ থেকে আনুগত্য, হৃদয়ানুভূতি, ঐতিহ্যের অর্থ শিখবার সুযোগ তিনি কখনো পান নি। তার কাছে আনন্দ যেমন অজানা ছিল, তেমনি অজানা ছিল হতাশা। ধরণীর একটি প্রাণীর মতো তিনি টিকে ছিলেন, অকপট, অক্ষত ও অটুট, মনে হয় অবিনাশী, খেদহীন, আশাহীন। তিনি আমার সম্পর্কে তার অন্য পুত্র সম্পর্কে, তার স্ত্রী সম্পর্কে সহজভাবে টেনে টেনে, নানা প্রশ্ন করেন, আর আমি যখন তাদের নিয়তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করি তখন তিনি হেসে ওঠেন, মজা পান। আমার দৃষ্টি যখন তাকে ছাড়িয়ে বিবর্ণ কাঠের ঝুপড়িটার ওপর পড়ে তখন আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিই, তাঁর ওপর আমার করুণা জাগে। দূর দিগন্তের ওপার থেকে, যা এই নিরানন্দ তুলাক্ষেতকে তাঁর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, সেখান থেকে, আমার যাপিত জীবনের মধ্য দিয়ে আমি এই জ্ঞান লাভ করি যে, আমার বাবা ছিলেন একজন কালো চাষী, যিনি জীবনের অন্বেষণে শহরে গিয়েছিলেন, যিনি সেখানে ব্যর্থ হয়েছেন; একজন কালো চাষী শহরে গিয়ে যার জীবন অবিশ্বাস্য রকম জট পাকিয়ে যায়, যিনি অবশেষে শহর ছেড়ে পালিয়ে আসেন– সেই একই শহর থেকে যা আমাকে তার জ্বলন্ত কোলে তুলে নিয়েছিল, আর আমাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল জ্ঞানের কতো অচেনা ও কল্পনাতীত বেলাভূমির পানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে আনন্দিত দিনগুলি আমার সামনে উন্মোচিত হয় তা আমার ভেতরের প্রাণোদ্যমকে দুর্ভাবনা ও নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্ত করে। আমি তখন স্বেচ্ছাচারিতা ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একদিন বিকালে মা একটা খবর নিয়ে এলেন। আমরা আরকানসাসে মায়ের বোন এলেনের ওখানে থাকতে যাবো। যাবার পথে আমরা নানীকে দেখে যাবো। তিনি তখন ন্যাট্যচেজ ছেড়ে মিসিসিপির জ্যাকসনে বাস করছিলেন। মায়ের কথা শোনা মাত্র আমার ওপর থেকে একটা দুশ্চিন্তার গুরুভার বোঝা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। উত্তেজিত হয়ে আমি ছোটাছুটি করে আমার ছেঁড়াখোড়া জামাকাপড় এক জায়গায় জড়ো করলাম। এই ঘৃণিত বাড়ি, ক্ষুধা আর ভয়কে পেছনে ফেলে আমি চলে যাচ্ছি। যে দিনগুলি ছিল মৃত্যুর মতো অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ তা এবার পেছনে পড়ে থাকবে।

আমি যখন আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করছি তখন আমার এক খেলার সাথী এসে আমাকে খবর দিলো যে কাপড় শুকাবার তারে আমার একটা ভেজা শার্ট ঝুলছে। ততটা উদারতা নয় যতটা আমার আসন্ন মুক্তির অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে আমি ওকে বলি যে সে আমার ওই সার্টটা নিয়ে নিতে পারে। এখন আমার কাছে একটা শার্টের কি দাম?

আমি আমার স্যুটকেসে আমার জিনিসপত্র ঠেলে ঢুকাতে থাকি। কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মার চারপাশে দাঁড়িয়ে ঈর্ষান্বিত চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকে কিন্তু আমি ওদের দেখি না। আমি যে মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাবার কথা শুনলাম সে মুহূর্ত থেকেই এসব ছেলেমেয়ে আমার কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এই বাড়ির গোটা আবহ ও পরিমণ্ডল আমার সত্তা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ওই ছেলেমেয়েদের মুখ আমি ভুলে যেতে ব্যাকুল এমন হাজারো স্মৃতি জাগিয়ে তোলার শক্তি ছিল। আমার বিদায় আমাকে ওদের আরো কাছে টেনে আনার পরিবর্তে চিরদিনের জন্য আমাকে তাদের বৃত্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

আমি এখান থেকে যাবার জন্য এতো ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম যে সামনের হলপথে আমার মালপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যাদের সঙ্গে আমি এতোদিন এক সঙ্গে কাটিয়েছি, খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার কথাও আমার মনে হয় নি। আমার উদাসীন্যের জন্য মা আমাকে তিরস্কার করলেন, ওদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে বললেন। আমি অনিচ্ছার সঙ্গে তার নির্দেশ পালন করলাম। আমার দিকে

বাড়িয়ে দেয়া ওদের ময়লা হাতগুলি নাড়ার সময় আমি আমার চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখি। আমার অনুভূতিতে ওই সব মুখ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল ক্ষুধা ও ভয়ের সঙ্গে এবং আমাকে তা তীব্রভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে আমি আমার মধ্যে সেই যন্ত্রণা নতুন করে জাগিয়ে তুলতে চাই নি। আমি ওদের করমর্দন করি, আগামী বছরগুলিতে আমি অসংখ্যবার এই কাজটি করেছি, যা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশিত তাই করছি, যদিও আমার জীবনের সত্যিকার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের, তাদের আশাআকাঙ্ক্ষার অংশীদার আমি হতে পারি নি।

শৈশবের প্রচণ্ড আঘাতগুলি পেরিয়ে আসার পর আমার মধ্যে অনুচিন্তনের অভ্যাস গড়ে উঠার পর, আমি নিগ্রোদের মধ্যে সত্যিকার মায়া মমতার অভাবের বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই ভাবতাম। আমাদের স্নেহ ছিল কতো অস্থিতিশীল, আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগে গভীরতা ছিল কতো কম, আমাদের মধ্যে বিপুল বিশাল কোনো আশা ছিল না, আমাদের আনন্দ-উল্লাস ছিল ভীরু ও সলাজ, আমাদের ঐতিহ্য ছিল কতো ফাঁকা, কতো ফাঁপা ছিল আমাদের স্মৃতি, যে সব স্পর্শাতীত অনুভূতি মানুষের সঙ্গে মানুষকে বেঁধে রাখে সেখানে আমাদের কতো ঘাটতি ছিল, এমনকি আমাদের হতাশাও ছিল কতো অগভীর! যারা মনে করতো নিগ্রোদের জীবনে উদ্দাম আবেগের অস্তিত্ব কী প্রবল তারা যে একটা অসচেতন আয়তরনিকে প্রশ্ন দিচ্ছে আমি এক ভিন্ন জীবনধারার পরিচয় লাভের পরই সে সম্পর্কে সচেতন হই। আমি দেখতে পাই যে যাকে আমাদের আবেগ-অনুভূতিজাত শক্তি বলে মনে করা হয় তা আসলে আমাদের নেতিবাচক বিভ্রান্তি, আমাদের পালিয়ে যাওয়া, আমাদের ভয় ভীতি, চাপের মুখে আমাদের উন্মত্ততা।

যখনই আমি আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জীবনের মৌলিক শূন্যতার কথা ভাবি তখনই আমি উপলব্ধি করি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপূর্ণ আত্মাকে নিগ্রোদের কখনই ধরতে দেয়া হয় নি, তারা তার মধ্যে কোনোরকমে বাস করেছে বটে, কিন্তু তারা তার একজন হয়ে উঠতে পারে নি। আর আমি যখন কালো জীবনের সাংস্কৃতিক উষ্ণতার বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি তখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে : পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট কোমলতা, ভালবাসা, সম্মানবোধ, আনুগত্য এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার ক্ষমতা কি মানুষের সহজাত? আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম, এই সব মানবিক গুণাবলীর কি পরিচর্যা করতে হয় না? সংগ্রাম ও কষ্ট করে কি এসব জেনে নিতে হয় না। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে এসব কি আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংরক্ষিত করতে হয় না?

জ্যাকসনে নানীর বাড়ি ছিল নানান কিছু আবিষ্কারের জন্য এক মনোমুগ্ধকর জায়গা। বাড়িটি ছিল দোতলা, কাঠের কাঠামো, আর সেখানে ছিল সাতটা ঘর। লম্বা সরু হলপথে আর সিঁড়ির ওপরে এবং নিচে আমি আর আমার ভাই লুকোচুরি খেলতাম। নানীর ছেলে ক্লার্ক মামা, কাকে এ বাড়ি কিনে দেন। এর সাদা পলেস্তরা করা দেয়াল, সামনের আর পেছনের রোয়াক এবং গোলাকার স্তম্ভ আর রেলিংগুলি দেখে আমার মনে হতো সারা

পৃথিবীতে বোধ হয় এর চাইতে সুন্দর বাড়ি আর কোথাও নেই।

সেখানে ছিল প্রশস্ত সবুজ মাঠ। আমার ভাই আর আমি সেখানে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতাম, খেলতাম, আর চিৎকার করতাম। আর সেখানে ছিল প্রতিবেশীদের ডীক ছেলেমেয়েরা। ওদের সম্পর্কে আমার ভাই আর আমার মনে হতো যে জাগতিক জ্ঞানের দিক থেকে আমরা ওদের চাইতে বেশ এগিয়ে আছি। গ্রীনে চড়তে কেমন লাগে; হলুদ, নিদ্রাতুর মিসিসিপি নদী কেমন দেখতে; কেট অ্যাডামস জাহাজে ভ্রমণ কেমন; মেফিস শহরটা দেখতে কি রকম, আর আমি কিভাবে অনাথদের নিবাস থেকে পালিয়ে এসেছিলাম আমরা এসব কথা সগর্বে ওদের শোনাতাম। আমরা ইঙ্গিত করতাম যে আমরা এখানে শুধু অল্প কয়েকদিন থাকবো, তারপর আবার বেরিয়ে পড়বো আরো অবিশ্বাস্য সব জায়গার উদ্দেশ্যে, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে।

সংসারের ভার নির্বাহে সহায়তার জন্য আমার নানী এলা নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীকে বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তার আচরণ ছিল এমনই সুন্দর, স্বপ্নময় ও নীরব যে আমি তাকে ভয় পাই, আবার তার প্রতি আকর্ষণও বোধ করি। প্রায় সারাক্ষণ সে একটা না একটা বই পড়তো। সে কি পড়ে জানার জন্য আমার ভীষণ আগ্রহ হতো, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস আমার হতো না। একদিন বিকালে আমি দেখলাম যে সে রোয়াকে বসে আছে, একা একা একটা বই পড়ছে। আমি খুব অনুনয় করে ওকে বললাম, এলা, তুমি কি পড়ছো আমাকে একটু বলো না, প্লীজ? ও শঙ্কিত চোখে চারপাশে তাকালো, তারপর এড়িয়ে গিয়ে বললো, এমনি একটি বই। কি সম্পর্কে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

উপন্যাস নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে দেখলে তোমার নানী পছন্দ করবেন না।

আমি ওর গলায় সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করি।

আমি সাহসের সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে বলি, আমি পরোয়া করি না।

শ্‌স্... এ রকম কথা বলো না তুমি।

কিন্তু আমি তো জানতে চাই।

এলা বললো, বড় হও, তখন তুমি বই পড়তে পারবে আর তার মধ্যে কি আছে জানবে।

কিন্তু আমি যে এখনই জানতে চাই।

এলা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো, তারপর তার হাতের বইটা বন্ধ করে বললো, এখানে আসো।

আমি ওর পায়ের কাছে বসে ওর দিকে আমার মুখ উঁচু করে ধরি। ও নিচু গলায় বলতে শুরু করে, খুব বুড়ো একজন লোক ছিল, তার নাম ছিল রুবিয়ার্ড।

ফিসফিস করে সে আমাকে রুবিয়ার্ড এবং তার সাত স্ত্রীর গল্প শোনালো। আমার

সামনে থেকে বাড়ির রোয়াক, সূর্যালোক, এলার মুখ, সব কিছু মুছে গেল। আমি তার কথা শুনি আর আমার ভেতর থেকে কিছু একটা উঠে এসে ওর কাহিনীকে বাস্তবতা মুড়ে দেয়। কেমন করে ব্লুবিয়ার্ড ফাঁকি দিয়ে তার সাত বউকে বিয়ে করে, তাদের সঙ্গে প্রেম করে এবং তাদের হত্যা করে, তারপর একটা অন্ধকার আলমারিতে চুল বেঁধে তাদের ঝুলিয়ে রাখে সে কাহিনী ও আমাকে শোনায়। আমার চারপাশের জগত থরথর করে কাঁপে, জীবন্ত হয়ে ওঠে। ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতা বদলে যায়, জিনিসপত্রের চেহারা রূপান্তরিত হয়, মায়াবি উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়ে উঠে পৃথিবী। আমার মধ্যে জীবনের বোধ গাঢ়তর হয়, যাবতীয় জিনিস ভিন্নভাবে আমাকে স্পর্শ করে। মন্ত্রমুগ্ধ এবং আলোড়িত হয়ে আমি তাকে অনবরত থামিয়ে দিই, বিস্তারিত বর্ণনা শুনতে চাই। আমার কল্পনা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ওই কাহিনী আমার মধ্যে যে সব অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল তা কোনোদিন লোপ পায় নি। ও যখন কাহিনী প্রায় শেষ করে এনেছে, যখন আমার কৌতূহল তীব্রতম বিন্দুতে পৌঁছেছে, যখন সমস্ত পৃথিবী আমার সামনে থেকে মুছে গেছে ঠিক তখুনি নানী দ্রুত পায়ে রোয়াকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন, হতচ্ছাড়ি মেয়ে, বন্ধ কর তোর গল্প! আমার বাড়িতে ওই সব শয়তানি কিচ্ছাকাহিনী চলবে না।

এলা উঠে দাঁড়িয়ে তোৎলাতে তোৎলাতে বললো, আমি দুঃখিত, মিসেস উইলস, কিন্তু ও আমাকে...

নানী জ্বলে উঠে বললেন, ও তো ছেলে মানুষ, একটা বুদ্ধু, তুমি তো জানো সে কথা!

এলা মাথা নিচু করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়।

আমি জানতাম আমার চুপ করে থাকা উচিত কিন্তু আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কিন্তু নানী, ও তো গল্পটা শেষ করে নি।

তিনি দাঁত খিঁচিয়ে তার হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে আমার মুখে আঘাত করে বললেন, এক দম চুপ। কি বলছিস তুই বুঝতে পারছিস না।

আমি কান্নাভরা গলায় বললাম, কিন্তু কি হলো শেষ পর্যন্ত আমি শুনতে চাই।

আরেকটা চড় আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসতেই আমি আমার মাথা সরিয়ে নিই।

তিনি চিৎকার করে বললেন, এসব হলো শয়তানের কারবার!

কোনো নিগ্রোর পক্ষে শ্বেতাঙ্গ না হয়েও যতখানি ফরসা হওয়া সম্ভব আমার নানী ছিলেন তাই। তার মানে তিনি শ্বেতাঙ্গই ছিলেন। তার মুখের শিথিল মাংসপেশী থরথর করে কেঁপে ওঠে। তার বড়, কালো, কড়া দু'চোখ মেলে তিনি আমার দিকে তাকান। সজোরে চেপে রাখা তার ঠোঁট দুটি রেখার মতো দেখায়। তার উঁচু কপালে গভীর খাঁজ পড়ে। রেগে গেলে তার চোখের পাতা ঝুলে নেমে এসে তার চোখের মনি প্রায় অর্ধেক

ঢেকে দিতো। তখন তার চেহারা হতো হিংস্র ও কুটিল। আমি বললাম, কিন্তু গল্পটা আমার ভাল লাগছিল।

তিনি বললেন, তুই নরকের আগুনে পুড়ে মরবি। কথাটা তিনি এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে, মুহূর্তের জন্য আমি তা বিশ্বাস করি।

গল্পের শেষটা না জানার ফলে আমি আমার মনের ভেতর একটা শূন্যতা বোধ করি, একটা হ্যানোর বেদনা অনুভব করি। ওটা আমাকে একটা তীক্ষ্ণ, ভয় জাগানিয়া, শ্বাসরুদ্ধকর, প্রায় যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনার স্বাদ দিয়েছিল। ওটা পাবার জন্য আমি বুভুক্ষু হয়ে উঠি। আমি যত উপন্যাস আছে সব কিনবো, সেসব পরবো, এবং আমার মধ্যে যে সহিংসতার তৃষ্ণা আছে, ষড়যন্ত্র ও কূট চক্রান্ত, গোপন কর্মকাণ্ড এবং রক্তাক্ত খুন-খারাবির জন্য আমার মনে যে বুভুক্ষা জমে আছে তার উপশম ঘটাবো। কাহিনীটা আমার মনে এমন একটা অনুকূল সাড়া জাগিয়েছিল যে আমার নানীর হাজারো ভীতিপ্রদর্শন আমার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করলো না। তারা আমার অতি-অগ্রহকে বিবেচনা করলো একগুয়েমি বলে, নির্বুদ্ধিতা বলে, ভাবলো যে সময়ের সঙ্গে এটা কেটে যাবে। গল্পই আমাকে যে কী রকম নিষ্ঠাবান ও চিন্তাশীল করে তুলেছিল সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই হয় নি। এলার ফিসফিস করে বলা প্রবঞ্চনা এবং হত্যার ওই কাহিনী আমার জীবনে প্রথমবারের মতো একটা অভিজ্ঞতা এনে দেয়, আমার মধ্যে একটা পরিপূর্ণ আবেগের সাড়া জাগিয়ে তোলে। সেখানে আমার জন্য কোনো তিরস্কার বা শাস্তির সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলার সাধ্য ছিল না। তার কাছে যা ছিল জীবন আমি তার স্বাদ গ্রহণ করেছি এবং যেভাবেই হোক, যে কোনো প্রকারেই হোক, আমি ওই স্বাদ আরো গ্রহণ করবো। আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার অনুভূতি ওরা একটুও বুঝতে পারছে না, তাই আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু কেউ যখন দেখছে না তখন আমি চুপি চুপি এলার ঘরে ঢুকে যেতাম, তার একটা বই চুরি করে সেটা সঙ্গে নিয়ে গোয়াল ঘরে চলে যেতাম, তারপর সেটা পড়ার চেষ্টা করতাম। সাধারণত অনেক শব্দই আমি বুঝতাম না, ফলে গল্পের মর্মোদ্ধার আমি করতে পারতাম না। উপন্যাসগুলি পড়তে সক্ষম হবার জন্য আমার মধ্যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জ্বলে উঠে। অচেনা কোনো শব্দের সাক্ষাৎ পেলেই তার অর্থ জানার জন্য আমি আমার মাকে অস্থির করে তুলতাম, অচেনা শব্দটির যে বিশেষ কোনো মূল্য আছে সে জন্য নয়, বরং এই জন্য যে সেটা ছিল একটা নিষিদ্ধ ও মায়াবি জগতে প্রবেশের সদর রাস্তা।

একদিন মা এতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হলো। রাত নেমে এলে আমার ভাই ও আমাকে স্নান করাবার কাজটা নানী নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি আমাদের ঘরে জলভর্তি দুটো টাব রেখে আমাদের কাপড়জামা খুলে ফেলতে বললেন। আমরা তাই করি। তিনি ঘরের এক কোণায় বসে সেলাই করতে করতে আমাদের ওপর নজর রাখলেন এবং নির্দেশ দিতে থাকলেন। আমার চোখে

সাবানের ফেনা ছিটিয়ে দেবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় মেতে উঠি মেঝেতে জল পড়ে এমন নোংরা হয়ে যেতে থাকে যে নানী আমাদের তিরস্কার করলেন।

এই, বাদরামি বন্ধ করে ঠিক মতো স্নান করো।

আমরা পুতুলের মতো জবাব দিই, হ্যাঁ, ম্যাম। তারপর আবার খেলতে থাকি।

আমি মাথাভর্তি সাবানের ফেনা তুলে আমার ভাইকে ডাক দিই। সে মাথা তুলে তাকাতেই তার দিকে ফেনা ছুঁড়ে দিই কিন্তু ও দ্রুত মাথা সরিয়ে নেয়, আর সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ে মেঝের বুকে।

রিচার্ড, খেলা বন্ধ করে গোসল করে নাও।

হ্যাঁ, ম্যাম। আমি আমার ভাইকে লক্ষ্য করতে থাকি সুযোগ পেলেই যেন আবার তার চোখে মুখে ফেনা ছিটিয়ে দিতে পারি।

নানী তার সেলাই একপাশে সরিয়ে ডাক দিলেন, রিচার্ড, এদিকে এসো।

আমি গোবেচারার মতো নগ্নদেহে মেঝের ওপর দিয়ে তার দিকে হেঁটে যাই। তিনি আমার হাত থেকে তোয়ালেটা টান দিয়ে নিয়ে আমার কান– আমার মুখ, আমার ঘাড় জোরে জোরে ঘষতে শুরু করেন।

এবার নিচু হও।

আমি নিচু হলাম আর নানী জোরে জোরে আমার মলদ্বার ঘষে দিলেন। আমার মন তখন ছিল এক ধরনের ঘোরের মধ্যে, দিবাস্বপ্ন আর ভাবনার মধ্যবর্তী কোনো জায়গায়। তারপর আমার অজান্তেই কয়েকটা কথা– যেসব কথার অর্থ আমি পুরোপুরি জানতামও না, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কোনোরকম পূর্বচিন্তা ছাড়া, অতি সাবলীলভাবে, আমি বলে উঠি, শেষ হয়ে গেলে ওইখানে তুমি চুমু দিও।

কিছু একটা যে সাংঘাতিক ভুল হয়েছে তা আমি প্রথম বুঝলাম নানীর ভয়ঙ্কর রকম স্থির হয়ে যাওয়া অবস্থা দেখে। তারপরই তিনি আমাকে হিংস্রভাবে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে তার সাদা মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে, তার কোটরাগত কালো চোখ আমার দিকে অপলক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। তার অদ্ভুত অভিব্যক্তি থেকে আমি বুঝলাম যে আমি একটা সাংঘাতিক অন্যায় করেছি কিন্তু ওই মুহূর্তে সেটা যে কতো সাংঘাতিক সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। নানী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর তার ষাট বছরের প্রচণ্ড তীব্র ক্রোধ নিয়ে তার মাথার উপর ভেজা তোয়ালেটা তুলে ধরে আমার নগ্ন দেহের ওপর সজোরে নামিয়ে আনলেন। আমার গায়ে যেন আগুনের লম্বা সরু একটা দাগ পড়লো। আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম, হাঁফালাম, নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলাম, চেষ্টা করলাম যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়তে। তারপরই আমি হাউমাউ করে চিৎকার করলাম আর ভয়ে নুয়ে পড়লাম। কি বলেছি তার অর্থ আমি বুঝি নি তখনো, তার নৈতিক ভয়াবহতার কোনো উপলব্ধি আমার হয় নি, নানীর

আক্রমণ আমার কাছে মনে হয় একেবারে অকারণ। তিনি ভেজা তোয়ালেটা তুলে আমাকে আবার এতো জোরে আঘাত করলেন যে, আমি হাঁটু মুচড়ে পড়ে যাই। আমি বুঝলাম যে আমি যদি তার হাতের আওতার মধ্য থেকে এক্ষুণি সরে না যাই তাহলে তিনি আমাকে মেরেই ফেলবেন। আমি উলঙ্গ অবস্থাতেই উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আমার মা তাড়াতাড়ি তার শয্যা ত্যাগ করে উঠে আসেন।

তিনি নানীকে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে, মা?

আমি তখন হলপথে দাঁড়িয়ে আছি, কাঁপছি, নানীকে দেখছি, তিনি কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছেন, তার ঠোঁট নড়ছে। আমার মনে হলো তিনি পাগল হয়ে গেছেন, কারণ আমি দেখলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পাথরের মতো, মুখে একটি কথাও নেই।

আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন, রিচার্ড কি করেছিস তুই?

আবার দৌড়ে পালাবার জন্য তৈরি হয়ে আমি শুধু আমার মাথা নাড়লাম।

আমার মা পরপর একবার আমার দিকে একবার নানীর দিকে, একবার আমার ভাই-এর দিকে তার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশ্বরের দোহাই, কি হয়েছে তা তোমরা আমাকে বলবে কি?

নানী যেন দুমড়ে মুচড়ে গেলেন, অর্ধেক ঘুরে তোয়ালেটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিলেন, তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে তিনি বললেন, আমি... আমি ওর গা ধুইয়ে দিচ্ছিলাম... এই খানে... আর ওই ক্ষুদে কালো শয়তানটা... শুপমান আর রাগে তার সারা শরীর তখন কাঁপছিল। তিনি বললেন, ও আমাকে বলে কিনা যে শেষ হয়ে গেলে তুমি ওইখানে আমাকে চুমু দিও।

এবার আমার মা নির্বাক হয়ে বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখলেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, না।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে নানী বললেন, তাই বলেছে ও।

মা প্রতিবাদ করলেন, না, না, ও কথা ও বলে নি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নানী বললেন, বলেছে।

আমি ওদের কথা শুনলাম, অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলাম যে আমি খুব গুরুতর একটা অন্যায় করেছি যা শোধরাবার কোনো পথ নেই। যদিও কী যে আমি বলেছি তা মনে করতে, তা মুছে ফেলতে, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে, কথাগুলি বলার আগের মুহূর্তে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমি আমার মনের ভেতর একটা প্রবল আকুতি অনুভব করছিলাম। যেন নিজেকে বাঁচাবার আরেকটা সুযোগ আমি পাই। মা ভেজা তোয়ালেটা হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। আমি ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকি, নগ্নদেহ চেঁচাচ্ছি প্রাণপণ। মা আমার পেছন পেছন ছুটে এলেন, আমি পেছনের আঙ্গিনায় দৌড়ে যাই, অন্ধের মতো ছুটি, বেড়ার গায়ে আমার মাথা ঠুকে যায়,

আমার মাথা গাছে লাগে, কাঠের টুকরায় লেগে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল থেঁতলে যায়, তবু আমি চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়াতে থাকি। আমার অন্যায় কাজের গুরুত্ব পরিমাণের কোনো আয় আমার জানা ছিল না। আমি ধরে নিই যে আমি এমন একটা অন্যায় করেছি যা ক্ষমার অতীত। আমার কথা ওদের কি রকম আহত করেছে সেটা বুঝতে পারলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের দেয়া শাস্তি মাথা পেতে নিতাম, কিন্তু যা কিছু ঘটতে পারে, ঘটবে, এই অনুভূতি ভয়ে আমাকে পাগল করে দেয়। মা চেঁচিয়ে বললেন, এদিকে আয়, নোংরা বেকুব কোথাকার।

আমি তার পাশ কাটিয়ে আবার বাড়ির ভেতর ছুটে যাই, তারপর হলপথে, বাতাসের মধ্যে দিয়ে আমার নগ্নদেহ পাগলের মতো ছোটে। আমি একটা কোণায় গিয়ে গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকি। মা আমার দিকে ছুটে আসেন। তার নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত এবং জোরে জোরে। আমি মাথা নিচু করে সরে যাই, হামাগুড়ি দিই, উঠে দাঁড়াই, তারপর আবার দৌড়াতে থাকি।

মা বললেন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই তোর ভাল হবে। এটা আমার জীবনের যদি শেষ কাজও হয় তবু আজ রাতে তোকে আমি পেটাবোই!

আবার মা আমার দিকে ছুটে আসেন, আবার আমি কৌশলে তার আক্রমণ এড়িয়ে যাই। ভেজা তোয়ালের তীব্র আঘাত হুশ করে আমার একেবারে পাশ দিয়ে চলে যায়। আমার ভাই যে ঘরে দাঁড়িয়েছিল আমি এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে ঢুকি।

ভাই জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি?

আমি কি বলেছি তা ও শোনে নি।

একটা ঘুসি পড়লো আমার মুখে। আমি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াই। নানী আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে তিনি আবার আমার মাথায় আঘাত করলেন। তারপরই আমার মা ঘরে ঢুকলেন। আমি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমি হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে ঢুকে গেলাম।

মা চিৎকার করে বললেন, বেরিয়ে আয়!

না।

বেরিয়ে আয় বলছি, নইলে আমি তোকে মেরে তুলাধুনা করে ছাড়বো।

আমি আবারো বললাম, না।

নানী বললেন, নানাকে ডাকো। আমি কেঁপে উঠলাম। নানাকে আমি যমের মতো ভয় করতাম। আমার ভাই ওকে ডেকে আনতে গেছে। নানা ছিলেন দীর্ঘকায়, চর্মসার, নির্মম, নীরব প্রকৃতির এক কৃষ্ণাঙ্গ, যিনি গৃহযুদ্ধের সময় ইউনিয়ন সেনা দলের সঙ্গে এক হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। রাগলে তার দাঁত থেকে একটা ভয়ঙ্কর কিড়মিড় শব্দ নির্গত হতো। তার ঘরের এক কোণে দাঁড় করানো থাকতো তার সৈনিক জীবনের বন্দুকটা। টোটা ভর্তি। তিনি সব সময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকতেন, রাজ্যগুলির মধ্যে যে কোনো

সময় বোধ হয় আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমি আমার ছোট ভাইকে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার শব্দ শুনলাম। আমি বুঝলাম যে দু'এক মিনিটের মধ্যেই নানা এখানে এসে পড়বেন। আমি নিজেকে একটা শক্ত কুণ্ডলির মতো পাকিয়ে কান্নাভরা গলায় বলতে লাগলাম, না, না, না...। নানা এসে আমাকে খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে আসতে আদেশ করলেন। আমি নড়তে অস্বীকার করি। তিনি বললেন, বেরিয়ে আয়।

না।

তুই কি চাস যে আমি আমার বন্দুকটা নিয়ে আসি?

আমি চিৎকার করে বলি, না, না। আমাকে গুলি করবেন না, প্লীজ।

তাহলে বেরিয়ে আয়।

আমি স্থির হয়ে পড়ে থাকি। নানা খাটটা ধরে টান দেন। আমি খাটের পায়া আঁকড়ে ধরি। মেঝের ওপর দিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। নানা ছুটে এসে আমার পা জাপ্টে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাই। আমি চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে খাটের ঠিক মাঝখানে অবস্থান নিই, যেদিকে খাট নড়ে আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে সরে যাই।

মা চেঁচিয়ে বললেন, বেরিয়ে এসে তোর পাওনা চাবকানি খেয়ে নে!

আমি নিশ্চল হয়ে থাকি। খাট নড়ে, আমিও নড়ি। আমি চিন্তা করে কিছু করি না। কোনো পরিকল্পনা ছিল না আমার। কোনো রকম কৌশল করি নি আমি। স্বজ্ঞা আমাকে বলে দেয় আমাকে কী করতে হবে। ভয়ঙ্কর বিপদ আমার সামনে এবং আমাকে সেটা এড়াতে হবে। অবশেষে নানা হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

মা বললেন, যখন বেরিয়ে আসবি তখনই তোর পিঠে বেতের বাড়ি পড়বে।

যতক্ষণই তুই ওখানে পড়ে থাকিস না কেন চাবকানির হাত থেকে তোর রেহাই নেই। আর আজ রাতে তোর খাওয়া বন্ধ।

আমার ভাই জানতে চাইলো, ও করেছে কি?

নানী বললেন, এমন একটা কাজ করেছে যার জন্য ওকে খুন করে ফেলা উচিত।

কিন্তু কি করেছে? আমার ভাই জিজ্ঞাসা করলো।

মা বললেন, মুখ বন্ধ করে বিছানায় শুতে যাও।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত খাটের নিচে পড়ে থাকি। সারা বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। অবশেষে ক্ষুধার জ্বালা আমাকে বাইরে বের করে আনে। আমি বেরিয়ে এসে উঠে দাঁড়াতেই দেখি যে দরজার কাছে আমার জন্য ওঁৎ পেতে আমার মা দাঁড়িয়ে আছেন।

মা বললেন, আয়, রান্নাঘরে চল। আমি তার পেছন পেছন গেলাম। তিনি মারলেন আমাকে, তবে ভেজা তোয়ালে দিয়ে নয়, নানা বারণ করে দিয়েছিলেন। একেকটা বেত মারেন আর মা জিজ্ঞাসা করতে থাকেন কোথায় আমি ওই নোংরা কথাগুলি শিখেছি। কিন্তু আমি তাকে বলতে পারি না, আর আমার ওই অক্ষমতা তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে।

মা বলে দিলেন, না বলা পর্যন্ত আমি তোকে মারতে থাকবো।

কিন্তু আমি তাকে বলতে পারলাম না, কারণ উত্তরটা আমার জানা ছিল না। আমি মেম্ফিসে ফেসব নোংরা শব্দ শিখেছিলাম তার কোনোটার মধ্যেই কোনো ধরনের বিকৃতির ছোঁয়া ছিল না, যদিও সেলুনে মাতাল হয়ে ঘোরাঘুরির সময় আমি এসব কথা শিখে থাকতে পারি।

পরদিন নানী দৃঢ় গলায় বললেন যে, কে আমার এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে তিনি তা জানেন। এলার বইগুলি পড়ে আমি ওই সব কুৎসিত আচরণের কথা জেনেছি। মা তখন আমাকে আরেক দফা পিটুনি দিলেন। আমি যে ওসব জিনিস কোনো বই-এ পড়ি নি, কোথাও শুনেছি বলেও স্মরণ করতে পারছি না, বারবার এটা বলা সত্ত্বেও ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। শেষে নানী সরাসরি এলাকে বললেন যে আমার যে সব কথা জানা উচিত না সে সব কথা সেই আমাকে শিখিয়েছে, আর বিপর্যস্ত এলা কাঁদতে কাঁদতে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। আমার কথা যে প্রচণ্ড আলোড়নের জন্ম দেয় তা থেকে আমি বুঝি যে আমি যতটুকু ধারণা করেছি তার চাইতে অনেক বেশি কিছু এর মধ্যে রয়েছে, আর আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে, যে জন্য আমি এতো মার খেলাম তিরস্কৃত হলাম তার কারণটা কি, তার অর্থ কি, ভবিষ্যতে আমি অবশ্যই তা আবিষ্কার করবো।

এখন দিন আর ঘন্টা স্পষ্টতর ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। প্রতিটি অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে স্বকীয় অর্থে ভরপুর।

উড়ন্ত জোনাকির পেছনে শ্বাসরুদ্ধকর উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘুম-ঘুম গ্রীষ্মের রাতে ছুটে যাবার আনন্দ।

ম্যাগনোলিয়ার পরিব্যাপ্ত মিষ্টি গন্ধের মধ্যে উদার আতিথেয়তায় সিক্ত হওয়া।

রোদের মধ্যে লম্বা সবুজ ঘাস– ঢেউ-এর মতো বাতাস আর দুলছে আর তা থেকে ছেনে আনা অসীম মুক্তির স্বাদ।

তুলার একটা বীজকোষ ফেটে গিয়ে তার ভেতর থেকে হাসফাঁস করে একটা সাদা তন্তু বেরিয়ে মাটির দিকে নেমে আসে আর তার মধ্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রাচুর্যের অনুভূতি লাভ করা।

একটা মোটা হাঁসকে হেলেদুলে আমাদের পেছনের আঙিনায় চলতে দেখে আমার গলা থেকে অনুকম্পা ভরা একটা হাসি বেরিয়ে আসা।

একটা সাদা গোলাপের ওপর হলদে-কালো মৌমাছির চঞ্চল কিন্তু ধৈর্যশীল ওড়াওড়ির সময় তার টানটান তীক্ষ্ণ গুঞ্জন শুনে আমার ভেতরে জেগে ওঠা উৎকণ্ঠা।

গ্লাসের পর গ্লাস দুধ খাওয়া, আস্তে আস্তে খাওয়া যেন অনেকক্ষণ সময় লাগে,

আমার জীবনে এই প্রথম বারের মতো যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পান করা আর তারপর একটা মাতাল-মাতাল ঘুমঘুম ভাব। নানীর সঙ্গে শহরে যাবার একটা স্থির আনন্দ, একজন সাদা বৃদ্ধাকে সুনিশ্চিত দুটি নিগ্রো বালক নিয়ে ক্যাপিটাল স্ট্রিটের দোকানে দোকানে ঘুরতে দেখে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের বিভ্রান্ত দৃষ্টি। তুলা বীজ রান্নার গন্ধে ধীরে ধীরে জিভে তাজা জল আসা। মেঘলা দিনে গ্রামের কর্দমাক্ত নালায় নানার সঙ্গে মাছ ধরার উত্তেজনা।

নানা যখন আমাকে একটা করাত-কল দেখাতে নিয়ে যান তখন তার ইস্পাতের বিশাল দৈত্যের মতো চাকাগুলি কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে সবুজ ভেজা গাছের গুঁড়িগুলি চিরে ফেলার দৃশ্য দেখার ভয় ও আতঙ্ক। আমি যখন প্রথম আধ-পাকা একটা খেঁজুর খাই তখন তার কটু স্বাদে মুখ কুঁচকে ফেলা।

বুনো কাটবাদামের ফাঁকালো স্বাদের লোভী আনন্দ।

এক গুরু গ্রীষ্মের সকালে কালোজাম পাড়ার সময় কাটার আঘাতে আমার অনাবৃত বাহু ছড়ে যাওয়া আর জামের মিষ্টি রসসিক্ত আঙুল আর ঠোঁট নিয়ে বাড়ি ফেরা।

প্রথমবারের মতো ধীরে ধীরে একটু একটু করে উপভোগ করতে করতে আমার ভাজা মাছের স্যান্ডউইচ খাওয়া এবং আশা করা যেন কখনই ওই খাওয়া শেষ না হয়ে যায়।

এক প্রতিবেশীর গাছে চড়ে লুকিয়ে কাঁচা পীচ ফল খেয়ে সারা রাত পেটের ব্যথায় যন্ত্রণা ভোগ করা।

এক সকালে বাগানে একটা ছোট উজ্জ্বল সবুজ সাপের ওপর আমার পা পড়া এবং মরে যাবার নিশ্চিন্ত ভয়।

আর দীর্ঘ, ধীর গতি, নিদ্রাতুর দিবস-যামিনীর গুড়িগুড়ি বৃষ্টিপাত...।

অবশেষে আমরা একদিন আমাদের মালপত্র নিয়ে রেল স্টেশনে হাজির হই, অপেক্ষা করি ট্রেনের জন্য, যেটা আমাদের নিয়ে যাবে আরকানসাসে, আর এই প্রথমবারের মতো আমি টিকেট ঘরের জানালায় দেখলাম লোকজনের দুটি সারি, একটা সাদা সারি, আরেকটা কালো সারি। নানীর ওখানে থাকার সময় আমার ভেতর একটা কঠিন তীক্ষ্ণ বাস্তব বোধ জেগে উঠেছিল, যা আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখনো মরে যায় নি। গাড়িতে উঠার পর আমি লক্ষ্য করি যে আমরা নিগ্রোরা আছি গাড়ির এক অংশে আর সাদারা অন্য অংশে। অবোধ সারল্যের সঙ্গে আমার ইচ্ছা হলো ট্রেনে তাদের নিজেদের অংশে সাদাদের কেমন দেখাচ্ছে তা দেখে আসি।

মাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি ওদিকে গিয়ে উঁকি দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের একটু দেখে আসতে পারি?

মা বললেন, চুপ করে থাকো।

কিন্তু গেলে সেটা অন্যায় হবে না, তাই না?

তুমি চুপ থাকবে কি?

কিন্তু কেন আমি যেতে পারবো না?

বোকার মতো প্রশ্ন করা বন্ধ করো তো?

সাদা আর কালোদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মা যে বিরক্ত হয়ে ওঠেন আমি সেটা লক্ষ্য করতে শুরু করেছিলাম। আর এ ব্যাপারটা আমি ঠিক মতো বুঝতে পারছিলাম না। আমি এই দু'ধারার মানুষদের বুঝতে চাই, যারা পাশাপাশি বাস করেও একে অন্যকে স্পর্শ করে না, শুধু সহিংসতার সময় ছাড়া। এই যে আমার নানী, তিনি কি সাদা?... কতটুকু সাদা তিনি? সাদারা তার সাদাত্ব সম্পর্কে কি ভাবে?

ট্রেন এগিয়ে চলে। আমি জিজ্ঞাসা করি, মা, নানী কি সাদা?

তোমার চোখ থাকলে তাঁর রঙ কি তা তুমি নিজেই দেখতে পাবে।

আমি বলতে চাই, সাদারা কি তাঁকে সাদা বলে মনে করে?

মা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি সাদাদের সে কথা জিজ্ঞাসা করো না কেন?

আমি লেগে থাকি। কিন্তু তুমি তো জানো।

মা বললেন, আমি কেমন করে জানবো? আমি তো সাদা না।

অন্তত একটা তথ্য প্রতিষ্ঠা করার আশায় আমি বললাম, নানীকে তো দেখতে সাদা দেখায়। তাহলে কেন তিনি আমাদের কালোদের সঙ্গে থাকেন?

আমার প্রশ্নটা ভোঁতা করে দিয়ে মা বললেন, নানী আমাদের সঙ্গে থাকেন তুমি কি তা চাও না?

সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

তাহলে জিজ্ঞাসা করছো কেন?

আমি জানতে চাই।

মা এড়িয়ে গিয়ে আমাকে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, তুমি নিজেই নানীকে জিজ্ঞাসা করো না কেন?

নানী যখন নানাকে বিয়ে করেন তখন কি তিনি কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে যান?

তোমার বোকার মতো প্রশ্নগুলি তুমি বন্ধ করবে কি?

কিন্তু তিনি কি তখন কালো হয়ে গিয়েছিলেন?

মা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন, না, নানী কালো হয়ে যান নি। এখন তাঁর যে রঙ সে রঙ নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন।

আবার আমাকে গোপন রহস্য থেকে, ওই জিনিসটা থেকে, ওই বাস্তবতা থেকে, যা আমি সব কথা ও নীরবতার আড়ালে অনুভব করছিলাম, দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, নানী একজন সাদা মানুষকে বিয়ে করেন নি কেন?

মা বিরক্ত গলায় জবাব দিলেন, কারণ তার ইচ্ছা হয় নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না কেন?

মা আমার গালে একটা চড় কষিয়ে দিলেন। আমি কেঁদে উঠি। পরে বেশ কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে, মা আমাকে বললেন যে নানী এসেছেন আইরিশ, স্কচ এবং ফরাসী বংশ থেকে, যার মধ্যে কোথাও এবং কোনো এক সময় নিগ্রো রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল। মা সব ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন সাদামাটাভাবে, নিরপেক্ষভাবে, আবেগের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া ছাড়া।

নানাকে বিয়ে করার আগে নানীর নাম কি ছিল?

বোল্ডেন।

ওই নাম ওকে কে দিয়েছিল?

যে শ্বেতাঙ্গ মানুষটি তার মালিক ছিল তিনি।

নানী ক্রীতদাসী ছিলেন?

হ্যাঁ।

আর বোল্ডেন ছিল নানীর বাবার নাম?

তাঁর বাবা কে ছিলেন নানী জানেন না।

অতএব ওরা তাঁকে যে কোনো একটা নাম দিয়ে দেয়?

আমি শুধু এটুকু জানি যে ওরা ওঁকে একটা নাম দেয়।

তাঁর বাবা কে ছিলেন সেটা কি নানী বার করতে পারতেন না?

তাতে কী লাভ হতো, বোকারাম?

উনি জানতে পারতেন।

কিসের জন্য?

বাঃ, জানার জন্য।

কিন্তু কি জন্য?

আমি এর জবাব দিতে পারলাম না। কোনো কিছুরই সদুত্তর আমি পেলাম না।

মা, আমার বাবা কোথা থেকে তাঁর নাম পেয়েছিলেন?

তাঁর বাবার কাছ থেকে।

আর আমার বাবার বাবা কোথা থেকে তার নাম পান?

যেভাবে তোমার নানী তার নাম পেয়েছিলেন। সেইভাবে। এক শ্বেতাঙ্গ মানুষ থেকে।

লোকটা কে ছিল ওঁরা কি তা জানেন?

আমি বলতে পারবো না।

ওঁরা সেটা আবিষ্কার করেন না কেন?

মা কঠোর গলায় প্রশ্ন করলেন, কিসের জন্য? আর আমার বাবা তাঁর বাবার বাবা কে ছিলেন সেটা কেন জানার চেষ্টা করবেন তার কোনো যুক্তিসঙ্গত অথবা প্রয়োগিক কারণের কথা আমি ভাবতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবার মধ্যে কী আছে?

কিছুটা সাদা, কিছুটা লাল আর কিছুটা কালো।

রেড ইন্ডিয়ান, সাদা, আর নিগ্রো?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি কি?

মা বললেন, তুমি যখন বড় হবে তখন ওরা তোমাকে কৃষ্ণাঙ্গ বলবে।

তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে উপহাস করার সুরে বললেন, আপনার কি আপত্তি আছে, মিস্টার রাইট?

আমার রাগ হয়, আমি কোনো উত্তর দিই না। কালো বলে অভিহিত হতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে আমার মা কিছু একটা চেপে যাচ্ছেন। তিনি কোনো তথ্য গোপন করছেন না, কিন্তু তিনি আমাকে জানতে দিতে চান না এমন কিছু অনুভূতি, কিছু দৃষ্টিকোণ, কিছু বিশ্বাস আমার কাছ থেকে তিনি গোপন করে রাখছেন। আর আমি যখন তাঁকে এসব বিষয়ে খোঁচাই তখন তিনি রেগে যান। ঠিক আছে, একদিন আমি ঠিকই খোঁজ পাবো। একটু অপেক্ষা করো। ঠিক আছে আমি কৃষ্ণাঙ্গ। চমৎকার। ভয় পাওয়ার মতো অথবা আগাম কিছু আশঙ্কা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আমি তখনো অর্জন করি নি। সত্য বটে, কালো মানুষদের নিহত এবং প্রহৃত হবার কথা আমি শুনেছি, কিন্তু সে সব আমার কাছে মনে হতো বহু দূরের ঘটনা। অবশ্য এই সব ঘিরে একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি আমি অনুভব করতাম, কিন্তু আমার মনে হয় যথাসময়ে আমি তার মোকাবিলা করতে পারবো। ব্যাপারটা খুব সহজ। কেউ আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে আমি তাকে আগে হত্যা করবো।

ইলেনে পৌঁছে আমি দেখলাম যে ম্যাগি খালা একটা দেয়াল ঘেরা বাংলোতে বাস করেন। বাড়িটা মনে হলো আমার, আর আমি খুশি হয়ে উঠি। এখানে যে আমি অল্প সময়ের জন্য থাকবো সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আর যেভাবে আমাকে চলে যেতে হয় তা ছিল বর্ণবাদী আবেগের ক্ষেত্রে আমার প্রথম দীক্ষা গ্রহণ।

বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা চওড়া ধুলিধূসরিত সড়ক। সড়কের উভয় পাশেই ছিল বুনো ফুলের সম্ভার। তখন গ্রীষ্মকাল, দিন-রাত সব সময় সর্বত্র পাওয়া যেতো লালচে ধুলার গন্ধ। আমি খুব ভোরে উঠে খালি গায়ে রাস্তার ঘন ধুলার মধ্যে পা ডুবিয়ে হাঁটতাম। উপরের দিকের ঠাণ্ডা শিশির সিক্ত শক্ত স্তর আর তার নিচে রোদে ভাজা উষ্ণ ধুলোর স্পর্শ আমার মনে আনন্দে পূর্ণ করে তুলতো।

সূর্য ওঠার পর মৌমাছির দল বেরিয়ে আসতো আর আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি আমার দুই করতল দ্রুত চেপে ধরে সহজেই একটা মৌমাছিকে মেরে ফেলতে পারি। মা চাইলেন আমি এ কাজটা বন্ধ করি, তিনি আমাকে বললেন যে, মৌমাছিরা মধু বানায়, আর যারা খাবার তৈরি করে তাদের ধ্বংস করা ভাল নয়, তাছাড়া শেষ পর্যন্ত

আমি মৌমাছির কামড় খাবো। কিন্তু আমার আত্মপ্রত্যয় ছিল প্রবল। আমি মনে করি যে, যে কোনো মৌমাছিকে পরাস্ত করার মতো বুদ্ধি আমার আছে। তারপর এক সকালে আমি বিশাল এক মৌমাছিকে একটা ফুলের ওপর নেমে এসে বসতে দেখি, আমি দু হাত একত্র করে তাকে চাপড় দিই, আর মৌমাছিটা আমার বাঁ হাতের তালুর কোমল অংশে তার হুল ফুটিয়ে দেয়। আমি চিৎকার করতে করতে বাড়িতে ছুটে যাই।

মা নিরস গলায় বললেন, ঠিক হয়েছে।

আর কোনো মৌমাছি আমি পিষে মারি নি।

ম্যাগি খালার স্বামী হসকিনস খালুর একটা পানশালা ছিল। চারপাশের করাত কলগুলিতে যে শত শত নিগ্রো কাজ করতো তারা ওই পানশালায় গিয়ে মদ খেতো। আমার মেক্সিসের দিনগুলি মনে পড়ে যায়। আমাকে একদিন তার পানশালায় নিয়ে যাবার জন্য আমি খালুকে কাকুতি-মিনতি করি। তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বলে কথা দেন কিন্তু আমার মা বারণ করে দিলেন। আমার মায়ের ভয় ছিল আমি যদি ওই ছোট বয়সে আবার একটা পানশালায় ঢুকি তাহলে বড় হয়ে ঠিক একটা মদাপ হবো।

খাবার সময় ম্যাগি খালার টেবিলে এতো খাদ্যবস্তুতে পূর্ণ থাকতো যে ব্যাপারটা সত্য বলে আমার বিশ্বাস হতে চাইতো না। তো, পানশালা দেখা আমার না হোক, খাওয়ার কোনো অভাব আমার হয় নি। কিন্তু সব সময়ই যে প্রচুর খাদ্য মজুত থাকবে সে কথা আমার বিশ্বাস হতো না। আমার মনে হতো আমি যদি প্রচুর পরিমাণে খেয়ে ফেলি তাহলে পরের বারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। প্রথমবার ম্যাগি খালার টেবিলে আমি যখন খেতে বসি তখন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে আমি কিছুই মুখে তুলতে পারি নি। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার যতো খুশি ততো খেতে পারি আমি?

হনকিনস খালু বললেন, হ্যাঁ, যতো তোমার খুশি তুমি খেতে পারো।

ওঁর কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি এতো খাই যে শেষে আমার পেট ব্যথা করতে থাকে। কিন্তু তখনো আমার টেবিল থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না।

মা বললেন, তোমার পেটের চাইতে চোখ বড়।

খালু বললেন, ওর যতো ইচ্ছা থাক। খাবারে ও অভ্যস্ত হয়ে উঠুক।

খাওয়ার পর আমি দেখি যে রুটির থালায় অনেক বিস্কুট উঁচু করে ধরা আছে, আমার জন্য এক বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য দৃশ্য। বিস্কুটগুলি যদিও আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং যদিও আমি জানতাম যে রান্নাঘরে আরো ময়দা আছে তবু আমার আশঙ্কা হয় যে কাল সকাল বেলা প্রাতঃরাশের সময় বোধ হয় কোনো রুটি থাকবে না। আমার ভয় হয় আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় রাতের বেলায় কোনো না কোনোভাবে বিস্কুটগুলি উধাও হয়ে যাবে। অতীতে প্রায়ই আমি ক্ষুধা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠেছি, আমি জানতাম যে বাড়িতে খাবার কিছু নেই, সে রকম অনুভূতি নিয়ে আমি আর জেগে উঠতে চাই না। তাই, লুকিয়ে লুকিয়ে আমি থালা থেকে কয়েকটা

বিস্কুট তুলে আমার পকেটে রেখে দিই, খাবার জন্য নয়, ক্ষুধার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে একটা রক্ষা প্রাচীর হিসেবে। প্রত্যেকবার খাবার সময় টেবিলভর্তি খাদ্যবস্তু দেখতে অভ্যস্ত হবার পরও আমি রুটি চুরি করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখতাম। আমার জামাকাপড় ধোয়ার সময় মা আমার পকেটে নরম আঠালো পুঁটলি দেখতে পেয়ে আমাকে তিরস্কার করেন, ওই অভ্যাসটা ত্যাগ করতে বলেন। আমি তখন আর আমার পকেটে রুটি লুকিয়ে না রেখে বাড়ির আনাচে-কানাচে, টেবিলের পেছনে, বিভিন্ন কোণা-ঘুপচিতে লুকিয়ে রাখতে শুরু করি। প্রত্যেকবার খাওয়ার সময়ে যে পর্যাপ্ত খাবার টেবিলে পাওয়া যাবে আমার মনে ওই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি রুটি চুরি করে জমিয়ে রাখার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি নি।

হসকিনস খালুর একটা ঘোড়া ও বগি গাড়ি ছিল। হেলেনাতে বাজার-সওদা করতে যাবার সময় মাঝেমাঝে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদিন গাড়িতে তাঁর সঙ্গে যাবার সময় তিনি বললেন, রিচার্ড, এই ঘোড়াটা কেমন করে মাঝ-নদীতে জল খায় তুমি দেখতে চাও?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চাই। কিন্তু এই ঘোড়ার পক্ষে ওটা করা সম্ভব নয়।

খুব সম্ভব। একটু অপেক্ষা করো, তুমি দেখতে পাবে।

তিনি ঘোড়ার পেটে চাবুক কষালেন আর গাড়িটা সোজা মিসিসিপি নদীর দিকে ছুটলো।

আমি ভয় পেয়ে যাই, জিজ্ঞাসা করি, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

তিনি বললেন, আমরা মাঝ-নদীতে যাচ্ছি যেন ঘোড়া জল খেতে পারে।

তিনি বাঁধের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন, খোয়া বাঁধানো লম্বা ঢালু বেয়ে নদীর কিনারায় গিয়ে পৌঁছলেন, আর ঘোড়াটা উত্তেজনা ভরে নদীতে ঝাপ দিলো। আমি সামনের এক মাইল ব্যাপী জলের বিশাল বিস্তারের দিকে তাকিয়ে ভয়ে লাফ দিয়ে উঠলাম।

আমার মুখ দিয়ে আর্ত চিৎকার বেরোলো, না।

কঠোর গলায় হসকিনস খালু বললেন, ঘোড়াটাকে জল খেতে হবে।

নদী খুব গভীর, আমি চিৎকার করে বলি।

ঘোড়ার গায়ে চাবুক চালাতে চালাতে খালু বললেন, এখানে তো জল খেতে পারবে না ঘোড়া।

গাড়ি আরো এগিয়ে যায়। ঘোড়া তার গতি একটু কমায়, স্রোতের ওপর দিয়ে তার কেশর ঝাঁকায়। আমি গাড়ির পাশটা আঁকড়ে ধরি, সাঁতার না জানলেও লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিই।

হসকিনস খালু চিৎকার করে বললেন, বসে পড়ো, নইলে পড়ে যাবে।

আমার কণ্ঠ থেকে আর্ত চিৎকার নির্গত হয়, আমাকে নেমে যেতে দিন।

জল এখন গাড়ির চাকার মাঝখান পর্যন্ত উঠে এসেছে। আমি লাফ দিয়ে নদীতে পড়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু খালু আমার পা চেপে ধরলেন। আমাদের চারপাশে এখন জল।

আমি চেঁচাতে থাকি, আমাকে নেমে যেতে দিন।

গাড়ি এগিয়ে চলে, জলও বাড়তে থাকে। ঘোড়া এপাশ-ওপাশ আর মাথা দোলায়, ঘাড় বাঁকা করে, চারপাশে লেজ আছড়ায়, তার চোখের সাদা অংশ অস্বাভাবিক বড় দেখায়, নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে সে। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে গাড়ির পাশ ধরে থাকি, গাড়ি যদি নদীর আরো গভীরে যেতে থাকে তাহলে আমি সেরকমই হোক লাফ দিয়ে এখান থেকে নেমে পড়বো। খালু আর আমার মধ্যে টানাটানি চলতে থাকে।

অবশেষে খালু ঘোড়ার উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন, এই! এই!

ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ে হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো। ঘূর্ণমান হলুদ জলরাশি তখন এতো কাছে যে আমি হাত বাড়িয়ে তা স্পর্শ করতে পারতাম। হসকিনস খালু আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সত্যিই ভেবেছিলে যে আমি গাড়িটা একেবারে মাঝ নদীতে নিয়ে যাবো?

আমি এতো ভয় পেয়েছিলাম যে আমার মুখ দিয়ে কোনো উত্তর বেরোলো না। আমার মাংসপেশীগুলি টানটান হয়ে ব্যথা করছিল।

খালু আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, সব ঠিক আছে।

তিনি গাড়ি ঘুরিয়ে বাঁধের দিকে চললেন। আমি তখনো গাড়ির পার্শ্বদেশ এতো জোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম যে আমার হাত ছাড়িয়ে আনতে পারছিলাম না।

আমরা এখন নিরাপদ, খালু বললেন।

শুকনো ভূমির ওপর গাড়ি এগিয়ে আসে, আমার ভয় ধীরে ধীরে অপসৃত হয়। আমার মনে হয় আমি যেন বহু উঁচু কোনো জায়গা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছি। আমার মনে হলো আমি একটা তীক্ষ্ণ টাটকা গন্ধ পাচ্ছি। আমার কপাল ঘামে ভিজে গেছে, বুক ধড়ফড় করছে।

আমি বললাম, আমি নেমে যেতে চাই।

কেন, কি হলো?

আমি নেমে যেতে চাই।

শোনো, আমরা তো এখন ডাঙায় ফিরে এসেছি।

না। থামুন। আমি নেমে যেতে চাই!

তিনি গাড়ি থামালেন না, মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত, আমাকে তিনি বুঝতেই পারেন নি। আমি একটা হ্যাঁচকা টানে আমার পা ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়ি

থেকে সোজা লাফ দিয়ে ধুলার মধ্যে নিচে পড়ি, অক্ষত অবস্থায়। তিনি গাড়ি থামিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কি সত্যিই এতোটা ভয় পেয়েছিলে? আমি জবাব দিই না। কথা বলার শক্তি ছিল না আমার। এতোক্ষণে আমার ভয় চলে গিয়েছিল। আমার সামনে তিনি ভেসে উঠলেন একজন অচেনা মানুষের মতো, এমন একজন মানুষের মতো যাকে আমি আগে কখনো দেখি নি, এমন একজন মানুষ যার সঙ্গে আমি আমার জীবনের একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তও কাটাতে পারবো না।

তিনি বললেন, এসো, রিচার্ড, গাড়িতে উঠে বসো, আমি তোমাকে এখন বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

আমি আমার মাথা নেড়ে কান্না শুরু করে দিই।

তিনি বললেন, শোনো, বাবা, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না? আমি এই প্রাচীন নদীর কোলেই জন্মেছি। এই নদী আমি চিনি। এর জলের নিচে অনেক দূর পর্যন্ত পাথর আর ইট বিছানো আছে। তুমি আধ মাইল পর্যন্ত জল ভেঙ্গে চলে যেতে পারবে, এখনো জল তোমার মাথা ছাড়িয়ে যাবে না।

তাঁর কথা আমার জন্য কোনো অর্থ বহন করে না। আমি আর ওই গাড়িতে উঠবো না।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, চলো, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

আমি ধুলিধূসরিত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলি। তিনি গাড়ি থেকে নেমে আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকেন। সেদিন তিনি আর তাঁর বাজার-সওদা করেন নি। আমাকে ভয় খাওয়াবার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা যখন তিনি আমার কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন তখন তাঁর কোনো কথা আমার কানে যায় না। তাঁর মুখ দেখা মাত্র আমার মধ্যে নদীর সে আবহ-স্মৃতি জেগে উঠতো, প্রবল ও উজ্জ্বলভাবে এবং সেই স্মৃতি আমাদের দুজনের মধ্যে একটা দেয়ালের মতো উঠে দাঁড়াতো।

হসকিনস খালু প্রত্যেক দিন রাতে তাঁর পানশালায় যেতেন আর পরের দিন খুব সকালের আগে বাড়ি ফিরতেন না। আমার বাবার মতো তিনি ঘুমাতেন দিনের বেলায়, তবে গোলমাল আর হইচই-এ তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতো না। আমার ভাই আর আমি ইচ্ছা মতো চেঁচাতাম আর শব্দ করতাম। তিনি যখন ঘুমিয়ে থাকতেন, তখন আমি প্রায়ই পা টিপে টিপে তাঁর ঘরে ঢুকতাম আর তাঁর মাথার কাছে রাখা ঝকঝকে বড় রিভলবারটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। ওটা তিনি এমন জায়গায় রাখতেন যেন হাত বাড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে সেটা তুলে নিতে পারেন। আমি ম্যাগি খালাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি কেন উনি অস্ত্রটা তাঁর এতো কাছে রাখেন। খালা আমাকে জানান, কিছু লোক তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়েছে... কিছু শ্বেতাঙ্গ...।

এক সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে শুনি যে খালু পানশালা থেকে ফিরে আসেন নি। খালার ভ্রু কুঁচকে যায়। তিনি ছটফট করতে থাকেন। তিনি পানশালায় গিয়ে কি ব্যাপার

জেনে আসবার কথা চিন্তা করেন, কিন্তু হসকিনস খালু তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কঠোরভাবে। গোটা দিনটা কেটে যায়, রাতের খাবার সময় হয়ে আসে।

খালা বললেন, আমি যাচ্ছি।

কিছু ঘটেছে কিনা দেখে আসি।

মা বললেন, তোমার যাওয়া বোধ হয় উচিত হবে না। বিপদজনক হতে পারে তো।

উনুনের ওপর খাবার গরম রাখা হলো। ম্যাগি খালা বাড়ির সামনের রোয়াকে দাঁড়িয়ে ঘনায়মান অন্ধকারের ভেতর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন। তিনি আবার বললেন, তিনি পানশালায় যাচ্ছেন, কিন্তু আবারও আমার মা তাঁকে নিরস্ত করলেন। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসে, খালু তখনো ফেরেন না। ম্যাগি খালা নীরব হয়ে যান কিন্তু তার অস্থিরতা থামে না।

এক সময় তিনি বললেন, হে ঈশ্বর, আশা করি সাদারা ওর ওপর কোনো হামলা করে নি।

একটু পরে তিনি শোবার ঘরে যান, যখন ফিরে আসেন তখন ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, ও ওর পিস্তল নিয়ে যায় নি। কী যে ঘটেছে কে জানে!

আমরা নীরবে খাওয়া শেষ করি। ঘন্টা খানেক পর সামনের রোয়াকে ভারি পদশব্দ শোনা গেল, তারপরই দরজায় সজোরে ধাক্কা পড়লো। ম্যাগি খালা ছুটে দরজার কাছে গিয়ে সেটা হাট করে খুলে দিলেন। একটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঘামছে, হাঁফাচ্ছে, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। সে তার মাথার টুপি খুলে বললো, মিস্টার হসকিনস... ওঁকে গুলি করা হয়েছে... একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ ওঁকে গুলি করেছে।

ছেলেটি অতি কষ্টে শ্বাস টেনে টেনে বললো, মিসেস হসকিনস, উনি মারা গেছেন।

ম্যাগি খালা চিৎকার করে উঠে রোয়াক থেকে নেমে ধুলিধূসরিত সড়ক দিয়ে রাতের অন্ধকারে ছুটে গেলেন।

আমার মা আর্তনাদ করে উঠলেন, ম্যাগি!

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললো, আপনারা কেউ ওই পানশালায় যাবেন না।

আমার মা ম্যাগি খালার পেছনে ছুটতে ছুটতে ডাকলেন, ম্যাগি!

ছেলেটি আবারো চেঁচিয়ে বললো, ওখানে গেলে ওরা আপনাদের মেরে ফেলবে। সাদা লোকগুলো বলেছে যে ওরা ওঁর সব আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করবে!

মা ম্যাগি খালাকে টেনে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। আতঙ্কের নিচে শোক চাপা পড়ে যায়। ওই রাতে আমরা আমাদের জামাকাপড় আর থালাবাসন গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে কৃষি পণ্য বহনকারী একটি গাড়িতে তুলে দেই। ভোর হবার আগেই আমরা প্রাণ রক্ষার তাগিদে ছুটে চলি। আমি পরে জানতে পারি যে সাদারা দীর্ঘকাল ধরে হসকিনস খালুর সমৃদ্ধ মদের ব্যবসাটা করায়ত্ত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। বহুবার তাঁকে হত্যা করার ভয় দেখানো হয়েছিল, বহুবার তাঁকে সতর্ক করে এখান থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল,

কিন্তু খালু আরো কিছুদিন টিকে থেকে আরো কিছু টাকা জমাবার সিদ্ধান্ত নেন।

আমরা ওয়েস্ট হোলেনাতে ঘর নিই। ম্যাগি খালা আর আমার মা সারাদিন সারারাত পা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকেন, রাস্তায় বেরোতে তাদের সাহস হয় না, কে দেখে ফেলবে কে জানে। অবশেষে ম্যাগি খালা তার ভয় উপেক্ষা করে প্রায়ই ইসেনে যেতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সর্বদাই গোপনে এবং রাতে, আর কখন যাচ্ছেন সেটা আমার মা ছাড়া আর কাউকেই বলতেন না।

কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হলো না। গান হলো না। শোক পালনের কাল উদযাপিত হলো না। কোনো ফুল ছিল না। শুধু ছিল নীরবতা আর নিঃশব্দ কান্না, ফিসফিসানি, আর আতঙ্ক। আমি জানলাম না কখন এবং কোথায় হসকিনস খালুকে সমাধিস্থ করা হয়। ম্যাগি খালাকে ওঁর মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে দেয়া হয় নি। ওঁর মালিকানাধীন কোনো কিছুই তাঁকে দাবি করতে দেয়া হয় নি। হসকিনস খালুকে আমাদের মাঝ থেকে শুধু ছিঁড়ে উঠিয়ে নিয়ে যায় ওরা, আর আমরা প্রত্যক্ষী অর্থে, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি যেন আমাদের উপরে কোথাও ভাসতে থাকা উষ্ণ-সাদা আতঙ্কের মুখটা আমাদের দেখতে না হয়। আমরা জানতাম যে ওই মুখটা ঠিক ওখানে আছে। এই প্রথম শ্বেত আতঙ্ককে আমি আমার এতো কাছে অনুভব করি। আমার মন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন আমরা পাল্টা লড়াই করলাম না, আর তাঁর ভেতরকার আতঙ্ক-তাড়িত হয়ে তিনি আমার গালে এক চড় কষে দিলেন।

সংক্ষুব্ধ, আতঙ্কিত, স্বাধীনহীন, বক্তৃহীন, আমার মা ও ম্যাগি খালা তাঁদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তারপর অনেক আলোচনা, বিতর্ক ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর তাঁরা নানী কাছে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে তাঁরা বিশ্রাম নেবেন, চিন্তা ভাবনা করবেন, তাদের জীবনকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। আকস্মিকভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং আবার একটা ভ্রমণ যাত্রার সম্ভাবনায় আমি কোনো উত্তেজনা অনুভব করলাম না। দুঃখবোধ ছাড়াই পুরানো জায়গা ছেড়ে যেতে এবং নতুন জায়গা যেমন দেখায় সেভাবেই তাকে গ্রহণ করতে আমি শিখে গিয়েছিলাম। যদিও আমার বয়স প্রায় নয় বছর হয়ে গিয়েছিল তবু আমি কখনো এক সঙ্গে একটানা এক বছর কোনো স্কুলে পড়তে পারি নি, আর এ ব্যাপারে আমার কোনো সচেতনতাও গড়ে উঠে নি। আমি পড়তে পারতাম, গুণতে পারতাম, আর আমার সঙ্গে যেসব মানুষের দেখা হতো তাদের অধিকাংশও শুধু এটুকুই পারতো। বয়স্ক বা শিশু উভয় ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য ছিল। আমাদের সংসার আবার ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। আমাদের জিনিসপত্র বিক্রি করা হলো, দিয়ে দেয়া হলো, কিংবা শুধুই ফেলে রাখা হলো, আর আবার আমরা একটা দীর্ঘ রেল ভ্রমণের জন্য গাড়িতে উঠে বসলাম।

নানীর ওখানে পৌছার কয়েকদিন পর আমি যখন একদিন একটা বুনো প্রান্তরে একা

খেলছিলাম, পুরানো একটা ঘুরি দিয়ে যখন মাটি খুঁড়ছিলাম তখন হঠাৎ একটা বিচিত্র সুরেলা ধ্বনি শুনে আমি মাথা তুলে তাকাই। হলুদ বঙ-এর কাপড় পরা কালো মানুষের একটা ঢেউ পাহাড়ের মাথা থেকে ভীতিকরভাবে আমার দিকে ধাবমান হয়ে আসছে। নিজের অজান্তে আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াই, আমার বুক দড়ফড় করে। কি এটা? ওই লোকগুলি কি আমাকে ধরতে আসছে? লাইনের পর লাইন আর সারির পর সারি ধরে আদিম জামাকাপড় পরে ওই অদ্ভুত মানুষগুলি সোজা আমার দিকে নেমে আসছে। দুলকি চালে ওরা হাঁটছে, মাটির বুকে তাদের পদধ্বনি শুনে মনে হচ্ছে কেউ যেন একটা বিশাল ঢোলে বাড়ি দিচ্ছে।

আমি ছুটে বাড়ির ভেতর চলে যেতে চাই, কিন্তু আমি নড়তে পারি না, স্বপ্নের মধ্যে যেমন হয়। আমি পাগলের মতো চারিদিকে তাকাই। এ সমস্যার সমাধানকল্পে কেউ কি আমাকে কোনো সূত্র দিতে পারে? কিন্তু আমি কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে পাই না। আমার হৃৎপিণ্ড এতো জোরে ধকধক করছিল যে আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। আমি দৌড়াতে চেষ্টা করি কিন্তু একটুও নড়তে পারি না। আমার মায়ের নাম আমার জিভের ডগায় আসে, চিৎকার করে মাকে ডাকার জন্য আমি আমার মুখ খুলি, কিন্তু কোনো শব্দ বেরোয় না। আর এখন ওই লোকগুলি ঢেউ-এর মতো ধেয়ে আসছে, সবাই হুবহু এক রকম দেখতে, তারা এক পাশে সরে যায়, আমার চতুর্দিকে ভেঙে পড়ে, মাটি কাঁপিয়ে একতালে তাদের পা পড়ে। আমার পাশ দিয়ে বন্যার মতো চলে যাওয়ার সময় আমি তাদের কালো মুখকে আমাকে লক্ষ্য করতে দেখি, কেউ কেউ আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপরই আমি লক্ষ্য করি যে তারা প্রত্যেকে একটা লম্বা কালো ভারি লাঠির মতো জিনিস তাদের কাঁধে বহন করছে। ওদের একজন আমার উদ্দেশ্যে কিছু একটা চেঁচিয়ে বলে, আমি বুঝতে পারি না। এখন ওরা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, বিশাল এক বাদামি ধুলার মেঘ উড়িয়ে তারা মিলিয়ে যায়, আর ওই ধুলোকে মনে হলো যেন তাদের পোশাকেরই একটা অংশ, তাদেরকে মনে হলো এই আদিম প্রাকৃতিক ধরণীর সমগোত্রীয়। আমার ভয়কে জয় করার মতো দূরত্বে ওরা চলে যেতেই আমি এক ছুটে বাড়ি গিয়ে মাকে হড়বড় করে আমি কি দেখেছি তা বলি, ওই অদ্ভুত মানুষগুলি কারা তাঁর কাছে তা জানতে চাই।

মা বললেন, ওরা সৈনিক।

সৈনিক কি?

যারা যুদ্ধ করে?

কেন যুদ্ধ করে?

কারণ তাদের দেশ তাদেরকে যুদ্ধ করতে বলে।

আর ওদের কাঁধে ওই লম্বা কালো লাঠিগুলি কি?

রাইফেল।

রাইফেল কি?

বন্দুক। বুলেট ছোঁড়ে।

পিস্তলের মতো?

হ্যাঁ।

বুলেট গায়ে লাগলে মানুষ কি মরে যাবে?

হ্যাঁ, যদি ঠিক জায়গায় আঘাত হানে।

ওরা কাদের গুলি করবে?

জার্মানদের।

জার্মান কারা?

জার্মানরা শত্রুপক্ষ।

শত্রুপক্ষ মানে?

যারা তোমাকে হত্যা করতে চায়, যারা তোমার দেশকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

ওরা থাকে কোথায়?

অনেক দূরে, সমুদ্রের ওপারে। তোমার মনে নেই? আমি তোমাকে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলেছিলাম।

আমার মনে পড়ে। কিন্তু মা যখন আমাকে সে কথা বলেন তখন তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি। আমি মাকে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি আমাকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জার্মানির কথা বলেন, যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয়া মানুষদের কথা বলেন, কিন্তু বিষয়টা আমার জন্য ছিল এতোই বিশাল ও অচেনা যে তা আমার মনে কোনো আলোড়ন তোলে নি, কোনো উৎসাহ বা কৌতূহল জাগায় নি।

আরেক দিন আমি বাড়ির সামনে বাইরে খেলছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলতেই আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। আমার মনে হলো রাস্তা দিয়ে একটা হাতির পাল ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আগের বার সৈনিকদের দেখে আমি যে রকম প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম এবার আর সে রকম ভয় অনুভব করলাম না। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলি এগিয়ে আসছিল ধীর গতিতে এবং নিঃশব্দে। এদের মধ্যে ভয় জাগানো কোনো ইঙ্গিত ছিল না। তবু আমি সন্তর্পণে বাড়ির সিঁড়ির কাছে সরে আসি। যেমন দেখাচ্ছে আচরণের ক্ষেত্রে তারা যদি তার চাইতে বেশি সহিংস হয়ে ওঠে তাহলে আমি এক ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে যাবো। বিচিত্র হাতিগুলি আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে এসে পৌঁছলে আমি দেখি যে ওদের মুখ মানুষের মুখের মতো। আমি চোখ বড় বড় করে ওদের দেখি, বাস্তবতার সঙ্গে আমার স্মৃতিকে মেলাবার চেষ্টা করি। কি ধরনের মানুষ এরা? আমি এই প্রাণীদের দুটি সারি লক্ষ্য করলাম, রাস্তার দু'পাশে দুটি সারি। তাদের মধ্যে কয়েকটি মুখ সাদা, কিন্তু অনেক অনেক মুখই কালো। আমি দেখলাম যে সাদা

মুখগুলি শ্বেতাঙ্গদের আর কালো মুখগুলি কৃষ্ণাঙ্গদের। সাদা মুখের মানুষগুলি পরে আছে সাধারণ পোশাক, কিন্তু কালো মুখের মানুষগুলি পরে আছে, আমার মনে হলো হাতির পোশাক। অদ্ভুত জন্তুগুলি আমার সামনাসামনি আসতেই আমি দেখলাম যে কালো প্রাণীগুলির পা লোহার বেড়ি দিয়ে আটকানো আর তাদের বাড় ভারি শেকল দিয়ে বাঁধা, নড়াচড়া করলেই সেই শেকল থেকে মৃদু সুরেলা ঝনঝন শব্দ উঠে। কালো প্রাণীগুলি রাস্তার দু'পাশে অগভীর গর্ত খুঁড়ছিল। তারা কাজ করছিল নীরবে, কোদাল ভর্তি মাটি তুলে রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে দিচ্ছিল দোঁতদোঁত শব্দ করতে করতে। অদ্ভুত চেহারাকাটা প্রাণীদের একজন তার কালো মুখ ঘুরিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে।

হাতির সঙ্গে সত্যি সত্যি কেউ বাক্যালাপ করে কিনা না জেনেই আমি ফিসফিস করে তাকে জিজ্ঞাসা করি, কি করছো তোমরা?

সে মাথা নেড়ে, তার পেছনের এক শ্বেতাঙ্গের দিকে সতর্ক চোখ তুলে, আবার মাটি খুঁড়তে থাকে, হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম যে সাদা লোকগুলির কাঁধের ওপর ধরা রয়েছে লম্বা কালো লাঠি। রাইফেল! ওরা পাশ দিয়ে চলে যেতেই আমি রুদ্ধশ্বাসে বাড়িতে ঢুকে চিৎকার করে ডাকি, মা।

মা রান্নাঘর থেকে জবাব দিলেন, কি?

রাস্তায় হাতির পাল, মা।

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখলেন।

হাতি?

হ্যাঁ। দেখবে, এসো। রাস্তা খুঁড়ছে তারা।

মা তাঁর অ্যাপ্রনে হাত মুছে সামনের দরজার কাছে ছুটে গেলেন। আমি তার পেছন পেছন যাই। যে ধাঁধায় ফেলা দৃশ্য আমি দেখেছি তার একটা ব্যাখ্যা আমি শুনতে চাই আমার মায়ের কাছ থেকে।

তিনি দরজার বাইরে তাকিয়ে তাঁর মাথা নাড়লেন, আমাকে বললেন, ওগুলি হাতি নয়!

তাহলে ওগুলি কি?

মা বললেন, ওরা হলো চেইন গ্যাঙ্গ।

চেইন গ্যাঙ্গ কি?

তুমি যা দেখছো ঠিক তাই। শেকল বাঁধা একটা দল, যাদের দিয়ে কাজ করানো হয়।

কেন?

কারণ তারা কোনো একটা অপরাধ করেছিল এবং সে জন্য সাজা ভোগ করছে।

কি করেছিল তারা?

আমি জানি না।

কিন্তু ওদের ও রকম দেখায় কেন?

ওরা যেন পালিয়ে না যেতে পারে সে জন্য। ওদের ওই ডোরাকাটা কাপড় দেখলেই মানুষ বুঝবে যে ওরা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী।

সাদারা কেন ডোরাকাটা কাপড় পরে না?

ওরা প্রহরী।

সাদারা কি কেউ কখনো ডোরাকাটা কাপড় পরে?

কখনো কখনো পরে।

তুমি কাউকে পরতে দেখেছো?

না।

ডোরাকাটা কাপড় পরা কালো মানুষদের সংখ্যা এতো বেশি কেন?

কারণ... ইয়ে, কালোদের ক্ষেত্রে ওরা বেশি কঠোর হয়।

কারা? সাদারা?

হ্যাঁ।

তাহলে সব কালোরা এক হয়ে সাদাদের বিরুদ্ধে লড়ে না কেন? সাদাদের চাইতে কালোরা তো সংখ্যায় বেশি... কিন্তু সাদা মানুষদের হাতে যে বন্দুক আছে, কালোদের নেই।

আমার মা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওদের হাতি বলেছিলেন কেন?

সে মুহূর্তে আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি, কিন্তু কালো মানুষদের সাদা-কালো ডোরাকাটা কাপড়ের কথা ভাবতে গিয়ে আমার একটা বই-এর কথা মনে পড়ে যায়। ইলেনে থাকার সময় আমার একটা বই ছিল, তার মধ্যে অরণ্যের বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য ছবি ছিল, তাদের নাম দেয়া ছিল সেখানে। আমার মনে যা সব চাইতে বেশি দাগ কাটে তা হলো ডোরাকাটা জেব্রা, আমার মনে হতো কেউ যেন তুলি দিয়ে ওই ডোরাগুলি এঁকে দিয়েছে। অন্য যে প্রাণীগুলি আমার কল্পনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় তারা ছিল হাতি। ওই সম্পৃক্ততার ফলে আমার মনে জেব্রা আর হাতি এমনভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল যে জেব্রার মতো ডোরাকাটা সাদা-কালো পোশাক পরা কয়েদিদের দেখা মাত্র আমার মনে অরণ্যের প্রাণী হাতির কথা জেগে উঠে।

একটি অনির্দিষ্টকালের পর আমার মা আবার জানিয়ে দিলেন যে আমরা আমাদের বর্তমান বাসস্থান ত্যাগ করে ওয়েস্ট হেলেনাতে ফিরে যাবো। নানীর বাড়ির কঠোর ধর্মীয় রুটিন তাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। নানীর নির্দেশে প্রতিদিন দশ বারো কিংবা তারও বেশি বার পারিবারিক প্রার্থনায় অংশ নিতে হতো। তার হুকুমে দিন শুরু হতো সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আর রাত শুরু হতো সূর্যাস্ত হওয়া মাত্র। তা ছাড়া ছিল দীর্ঘ অসংলগ্ন বাইবেল পাঠ, প্রতিটি খাবারের আগে ব্যক্তিগত প্রার্থনা করা। নানী ঘোষণা

করে দিয়েছিলেন যে শনিবার হলো প্রভুর বিশ্রাম-দিবস এবং সেদিন তার বাড়ির কোনো বাসিন্দা কাজে যেতে পারবে না। নানীর ওখানে কয়েক মাস ধরে আমাদের আত্মার জন্য তার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দেখে আমাদের মনে হলো যে ওয়েস্ট হেলেনাতে নিজেদের একটা বাসভবন হওয়া খুবই আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। আর স্বভাবতই আবার একটা ভ্রমণ যাত্রা ছিল আমার জন্য খুবই প্রীতিপ্রদ। আমরা আবার আমাদের মালপত্র বাঁধাছাঁদা করলাম। আবার বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। আবার রেলগাড়িতে চড়লাম। আবার আমরা উপস্থিত হলাম ওয়েস্ট হেলেনাতে। মোড়ের একটা দৈত বাড়ির অর্ধেক আমরা ভাড়া নিলাম। এর সামনে ছিল আবর্জনাবহনকারী একটা জলাবদ্ধ ডোবা। গোটা পাড়ায় গিজগিজ করতো ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর, গণক, খোঁড়া, অন্ধ, বারবণিতা, জিনিসপত্রের বিক্রেতা, ভাড়া আদায়কারী, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে ছিল একটা বিশাল গোলবাড়ি। সেখানে রেলের ইঞ্জিন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ও মেরামত করা হতো। সেখান থেকে ভেসে আসতো বাষ্পের অন্তহীন হিসহিস শব্দ, ইস্পাতের ইঞ্জিনগুলির গভীর ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ, আর ঘণ্টাধ্বনি। ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যেতো, কয়লার গুঁড়া ভেসে আসতো বাড়ির ভেতরে, আমাদের বিছানায়, আমাদের রান্নাঘরে, আমাদের খাবারে, আর বাতাসে সব সময় পাওয়া যেতো আলকাতরার মতো একটা গন্ধ। খালি মাথায় আর খালি পায়ে আমি এবং আমার ভাই নামহীন অগুণতি কালো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু মানুষকে ধাতুনির্মিত বিশাল কালো ইঞ্জিনগুলির ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে, তার উপরে চড়তে, তার নিচে ঢুকে যেতে দেখতাম। ওরা যখন লক্ষ্য করতো না তখন আমরা ইঞ্জিনিয়ারের গাড়িতে উঠতাম, আমাদের ছোট শরীরকে গাড়ির জানালার কাছে টেনে নিতাম, বাইরে তাকাতাম, কল্পনা করতাম যে আমরা বড় হয়ে গেছি, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ট্রেন চালাবার চাকরি পেয়েছি, এখন রাত, বাইরে ঝড় উঠেছে, আমাদের ইঞ্জিনের পেছনের বগিগুলিতে রয়েছে অনেক যাত্রী, আমরা চেষ্টা করছি নিরাপদে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে।

আমরা আওয়াজ তুলি, হুউউউ হুইইই! ঢং ঢং ঢং! হুশ হুশ হুশ! হুশ হুশ হুশ!

কিন্তু আমাদের সব চাইতে বেশি মজা হতো যখন আমরা পয়ঃনিষ্কাশনের ডোবার মধ্যে পা ডুবিয়ে হাঁটতাম। আমরা সেখানে পেতাম পুরানো বোতল, চিংড়ি ঢুকে পাওয়া টিনের কৌটা, মরচে ধরা চামচ, ধাতুর টুকরো-টাকরা, পুরনো টুথব্রাশ, মরা বেড়াল ও কুকুর এবং মাঝে-সাঝে পয়সা। চুরুটের বাক্স দিয়ে আমরা কাঠের নৌকা বানাতাম, কাঠের বৈঠা বানিয়ে রবারের অংশ পেঁচিয়ে তা আটকে দিতাম, তারপর চুরুটের বাক্সের নৌকাগুলি ডোবার জলে ভাসিয়ে দিতাম, আপন শক্তিতেই তারা চলতে থাকতো। অনেক বিকালে ছেলেদের বাবারাও এসে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিতেন, তাদের জুতো খুলে এগিয়ে এসে নিজেরা নৌকা বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দিতেন।

মা আর ম্যাগি খালা শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন আর তাদের কাজের সময়ে আমি আর আমার ভাই স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াতাম।

প্রত্যেক দিন আমাদের দুজনকে দুপুরের খাওয়ার জন্য দশ পয়সা করে দেয়া হতো। আর ওই পয়সা দিয়ে কি কি কিনবো সারাটা সকাল আমরা সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম। দশটা-এগারোটার দিকে আমরা কোণার মুদি দোকানে চলে যেতাম। তার মালিক ছিল জনৈক ইহুদি। ওখানে গিয়ে আমরা আদার তৈরি একটা চটজলদি খাবার আর এক বোতল কোকাকোলা কিনতাম। ওটাই ছিল আমাদের লাঞ্চ।

আমি এর আগে কোনো ইহুদি দেখি নি। কোণার মুদি দোকানের ওই মালিক ছিল আমার জীবনে এক বিচিত্র বস্তু। তখন পর্যন্ত আমি কোনো বিদেশী ভাষা শুনি নি। ইহুদিরা কথা বলার সময় যেসব অদ্ভুত শব্দ করতো তা শোনার জন্য আমি কোণার মুদি দোকানের দরজার কাছে ঘুরঘুর করতাম। ওই পাড়ায় আমরা যেসব কৃষ্ণাঙ্গ বাস করতাম সবাই ইহুদিদের ঘৃণা করতাম, তারা যে আমাদের শোষণ করতো সে জন্য নয়, এই জন্য যে আমাদের বাড়িতে আর রবিবাসরীয় স্কুলে আমাদের শেখানো হয়েছে যে ইহুদিরা হলো যিশুর হত্যাকারী। এইভাবে ইহুদিদের চিহ্নিত করে দেয়ার ফলে আমরা সোল্লাসে তাদেরকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ করার কাজে নেমে পড়লাম।

আমরা, সাত, আট আর নয় বছরের কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েরা ইহুদির দোকানটার সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতাম ঃ

ইহুদি ইহুদি ইহুদি
তোমার জিভের নিচে কি?

কিংবা আমরা একটা লম্বা সারি বেঁধে তার দোকানের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করতাম আর ছড়ার সুরে গাইতাম ঃ

ইহুদি ইহুদি
পাঁচ পয়সা নিয়ে দু'পয়সার জিনিস দাও
এভাবেই তোমরা লুটেপাটে খাও ॥

কিংবা আমরা সুর করে গান ধরতাম ঃ

যিশুর খুনি যিশুর খুনি
তোমাদের আমরা চিনি গো চিনি
তোমরা সবাই ভীষণ পাঁজি
তাবৎ নোংরা কাজের নিখুঁত কাজী ॥

একটি লোহিত-কেশ ইহুদি বালককে দেখলেই আমরা গেয়ে উঠতাম ঃ

লালচুলো
ইহুদি মুলো
ইহুদির মাথা অতি খাসা
দাম মাত্র পাঁচ পয়সা ॥

জনৈক মোটা ইহুদি নারীকে দেখে আমরা অবজ্ঞাভরে বলতাম ঃ

নীল সাদা আর লাল
তোমার বাবা ছিলেন এক ইহুদি মাল
তোমার মা ছিলেন নোংরা পতুর্গিজ
বলো তবে, তুমি তাহলে কিবা চিজ ॥

আর দোকানটার টেকো ইহুদি মালিক আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা কালো ছেলেমেয়েরা, হতদরিদ্র, অর্ধভুক্ত, অশিক্ষিত, বর্ণবাদী পক্ষপাতিত্বের দুর্ভাগা শিকার, আমরা সগর্বে সুর করে গান ধরতাম ঃ

একটা পচা ডিম
যায় না কখনো ভাজা।
ফাঁকিবাজ কুত্তা
হয় না কখনো রাজা ॥

আরো অনেক লোকগান ছিল, কিছু নীচ, কিছু নোংরা, সবগুলিই নিষ্ঠুর। আমাদের এ জাতীয় আচরণ করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার কথা কেউ ভাবে নি। মা-বাবারা সাধারণত সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবে এটা অনুমোদনই করতেন। ছেলেবেলা থেকেই ইহুদিদের বিরুদ্ধে আমাদের মনে বৈরী অথবা অবিশ্বাসের ভাব গড়ে তোলা হতো। এটা শুধু বর্ণবাদী সংস্কার ছিল না, এটা ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা অংশ। একদিন বিকালে এক দল কালো ছেলেমেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে খেলছিল আর গল্প ও হাসাহাসি করছিল। এমন সময় আলখাল্লা জড়ানো একটি কৃষ্ণাঙ্গ লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমি যেখানে থাকতাম তার পাশের ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়।

একটা কালো মেয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললো, আজ শনিবার।

হ্যাঁ, কিন্তু কেন এ কথা বলছো?

যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ওই লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায় সেদিকে আঙুল দেখিয়ে মেয়েটা বললো, আজ ওখানের ওরা অনেক টাকা কামাই করবে।

কিভাবে?

এমন সময় আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়।

অবিশ্বাসের সঙ্গে মেয়েটি প্রশ্ন করলো, তুমি জানো না?

কি জানি না?

ওরা কি বিক্রি করে...

কোথায়?

ওখানে, যেখানে লোকগুলি গেল।

আমি বললাম, ওখানে ওরা কিছুই বিক্রি করে না।

মেয়েটি এবার সত্যিকার অবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, তুমি ঠাট্টা করছো?

না, না। কি বিক্রি করে ওরা? বলো আমাকে।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে একটা খোঁচা দেওয়া হাসি হেসে বললো, ওরা কি বিক্রি করে তুমি জানো।

আমি বললাম, ওরা ওখানে কিছুই বিক্রি করে না। মেয়েটি তার নোংরা করতল উঁচু করে ধরে আমার উদ্দেশ্যে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ভঙ্গি করে বললো, ওহ্ তুমি একটা দুধের বাচ্চা।

আমি দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই। আমি যেখানে বাস করি তার পাশেই কিছু একটা ঘটছে, আর আমি তার কিছুই জানি না? আমার ধারণা ছিল ওই মহল্লার সম্ভাব্য সব কিছু আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। এখন আমার পাশের বাড়িতে যদি কোনো কিছু বেচাকেনা চলে তাহলে আমি সেটা অবশ্যই জানতে চাই। আমি যে দালানে থাকি সেটা ছিল একটা একতলা দ্বৈত-ভবন। আদিতে এটা ছিল। এখন দুটি ফ্ল্যাটে রূপান্তরিত করা হয়। আমাদের ফ্ল্যাটে যে দরজাগুলি ছিল তা দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে যাওয়া যেতো। ওই দরজাগুলিতে তালা দেয়া হয়, বল্টু দিয়ে আটকানো হয়, শক্ত করে পেরেক মারা হয়। পাশের বাড়ির পরিবারটি তো শান্তশিষ্ট। লোকজন আসতো, যেতো, কিন্তু আমার কাছে তা অস্বাভাবিক মনে হয় নি। কিন্তু এখন ওই মেয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শুনে আমার মনে হলো ওই বাড়িতে কি হচ্ছে তা আমাকে জানতে হবে। আমি আমাদের বাড়িতে ঢুকে দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম, তারপর দু' ফ্ল্যাটের মাঝখানকার হালকা দেয়ালে কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম। মৃদু আওয়াজ আমার কানে আসে কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমি বল্টু দিয়ে বন্ধ করা দরজায় কান পাতি, এবার আরেকটু জোরে শব্দ শুনি, তবু কী যে হচ্ছে বুঝতে পারি না।

আমি আস্তে একটা চেয়ার টেনে এনে তার উপর একটা বাক্স বসাই, তারপর তার উপরে উঠে দরজার ওপর দিকে যে ছোট্ট ফাঁক ছিল তার মধ্য দিয়ে উঁকি দিই। ও ধারের ঘরের ছায়াচ্ছন্ন আলো-আঁধারের মধ্যে আমি একটা খাটের ওপর একজন নগ্নদেহ পুরুষ ও একজন নগ্নদেহ রমণীকে দেখি, পুরুষটি রমণীটির উপরে। হঠাৎ আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পেছন দিকে মেঝেতে পড়ে যাই। আমি চুপ করে শুয়ে থাকি। ও ঘরের লোকটি আর রমণীটি আমার শব্দ পেয়েছে কিনা ভাবি। কিন্তু সব মনে হলো চুপচাপ, আর আমার কৌতূহল আবার জেগে উঠে আমি আবার দেখার জন্য চেয়ারের উপরে উঠতেই আমার পেছন দিকের জানালার শার্সিতে তীক্ষ্ণ ঠকঠক শব্দ শুনলাম। মাথা ঘুরিয়ে ওদিকে তাকাতেই আমি দেখলাম যে পাশের বাড়ির বাড়িওয়ালি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার বুক ধড়ফড় করে ওঠে, আমি দ্রুত চেয়ার থেকে নেমে পড়ি। বাড়িওয়ালি তার কালো মুখ সজোরে শার্সির ওপর চেপে ধরেছে, তার মুখ নড়ছে হিংস্রভাবে, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। আমার বাড়ির ভেতরে থাকতে ভয় হয়,

বাইরে যেতেও ভয় হয়। শার্সির ওপর পর্দা টেনে নামিয়ে দেয়ার কথা কেন আমার মনে হয় নি? মহিলার ভীষণ ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে মনে হয় আমি একটা সাংঘাতিক কাজ করেছি। তার মুখ জানালার পাশ থেকে সরে যায়, আর এক মুহূর্ত পরেই সামনের দরজায় প্রচণ্ড জোরে ধাক্কার শব্দ হয়।

এই, দরজাটা খোলো, ছেলে।

আমি কাঁপতে থাকি, কোনো জবাব দিই না।

দরজা খোলো, নইলে আমাকে এটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

আমি আবছা গলায় বলি, আমার মা বাড়ি নেই।

মহিলা চিৎকার করে বললো, এটা আমার বাড়ি। দরজা খোলো তুমি।

ওর কণ্ঠস্বর আমাকে কাবু করে ফেলে। আমি দরজা খুলে দিই। ও দ্রুতবেগে ঘরে ঢোকে, থামে, ওর ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখার জন্য আমি যে নড়বড়ে মই-এর মতো জিনিসটা বানিয়েছিলাম স্থির দৃষ্টিতে তা লক্ষ্য করে। ওহ্, দরজা খোলার আগে কেন আমি ওটা নামিয়ে ফেলি নি?

এই ছেলে, তোমার মতলবটা কি?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। মহিলা বললো, তুমি আমার খদ্দেরদের ভয় পাইয়ে দিয়েছো।

খদ্দের?

পুঁচকে শয়তান! তোমাকে আচ্ছা করে পিটুনি দিতে ইচ্ছা করছে আমার।

আমি বলে উঠি, না!

মহিলা ক্রুদ্ধ গলায় বললো, তোমাদের আমি এখান থেকে উঠিয়ে দেবো। আমাকে তো বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে, নাকি? আর তুমি আমার শনিবারটা এভাবে নষ্ট করে দিচ্ছো!

আমি বললাম, আমি... আমি তো শুধু দেখছিলাম...।

দেখছিলে?

মহিলা হঠাৎ হেসে ওঠে, একটু কোমল হয়, তারপর বলে, তো, তুমিও অন্যদের মতো আসো না কেন, পঁচিশ পয়সা খরচ করো না কেন?

আমি আমার নয় বছরের উষ্মা নিয়ে জবাব দিই, আপনার বাড়িতে ওই কাজে আমি যেতে চাই না।

মহিলা স্থির করে যে, না, আমি ওর খদ্দের হবো না। আমাকে লক্ষ্য করে ও বললো, জ্বালাতন একটা! যাই হোক, আমি তোমাদের এখান থেকে উঠিয়ে দেবো!

সে রাতে আমার মা ও ম্যাগি খালা বাড়ি ফেরার পর তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। মহিলারা সামনের রোয়াকের কাঠের রেলিং-এর দু'পাশে অবস্থান নিয়ে পরস্পরের উদ্দেশ্যে এমন জোরে চিৎকার করেন যে আধ মাইল দূর থেকেও তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে

পারা যোগে। প্রতিবেশীরা কান খাড়া করে শোনে, বাচ্চারা জমায়েত হয়ে মুখ হা করে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সব তর্ক বিতর্ক একটা জায়গায় এসে স্থির হয়। বাড়িওয়ালির দাবি, আমার মা আমাকে পিটুনি দিক। আর আমার মা একবারের মতো হলেও, ও কাজটা করতে অস্বীকার করলেন। তিনি ওকে বললেন, তোমার বাড়িতে ওসব করা ঠিক হয় নি।

বাড়িওয়ালি বললো, এটা আমার বাড়ি এবং আমার যা খুশি তাই আমি করবো!

মা বললেন, আমি যদি অনুমান করতাম যে তুমি এ জাতীয় ব্যবসা করছো তাহলে আমি এখানে উঠে আসতাম না।

বাড়িওয়ালি চিৎকার করে উঠলো, এই উঁচু নামওয়ালি কুত্তি, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলিস না!

মা বললেন, এসব বলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তুমি কি আশা করতে পারো?

বাড়িওয়ালি বললো, তোমার ওই বেজন্মা বাচ্চাগুলো ফেরেশতা না!

ম্যাগি খালা এবার যোগ দিলেন, তুমি তো একটা সাধারণ বেশ্যা!

আর তুমি? তুমি কি ধরনের বেশ্যা? বাড়িওয়ালি চিৎকার করে উঠে।

মা ওকে সাবধান করে দেন, নাথো, আমার বোনের সঙ্গে ও রকম করে কথা বলবে না।

বাড়িওয়ালি আদেশ করে, এই, কালো বেজন্মার দল, তোমাদের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে এখনই এখান থেকে বিদায় হও!

এ ঘটনার পরিণতি হলো, আমরা আমাদের মালপত্র বাঁধাছাঁদা করে ওই রাতেই এ রাস্তারই অল্প একটু দূরে আরেকটা বাড়িতে উঠে যাই। ওই বাড়িওয়ালি কি বিক্রি করেন সে সম্পর্কে তখনো আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা হয় নি। ছেলেরা পরে আমাকে তার নাম বলেছিল কিন্তু আমার মনে তা কোনো সুস্পষ্ট অর্থ জাগিয়ে তোলে নি। যদিও আমি বুঝেছিলাম যে ওটা সাংঘাতিক খারাপ একটা কিছু তবু আমি তখনো কৌতূহলী হয়ে উঠি নি। পরে এক সময়ে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি।

এদিকে আমাদের বাড়িতে গোপন কিছু একটা ঘটছিল এবং কিছু জানার আগেই তা একটা গুরুতর অবস্থায় পৌঁছে যায়। প্রতিদিন রাতে ঘুমে ঢুলে পড়ার আগের মুহূর্তে আমি ম্যাগি খালার ঘরের জানালার শার্সিতে একটা মৃদু টোকার শব্দ শুনতাম, তারপর একটা দরজা খোলার ক্যাচক্যাচ আওয়াজ, কিছু ফিসফিসানি, তারপর দীর্ঘ নীরবতা। একদিন আমি আমার বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে সামনের ঘরে যাই এবং চুপিচুপি সেদিকে তাকাই। একজন সুবেশধারী কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সোফায় বসে নিচু গলায় ম্যাগি খালার সঙ্গে কথা বলছেন। তো, ওই মানুষটার সঙ্গে কেন আমি দেখা করতে পারবো না? আমি পা টিপে টিপে আবার আমার বিছানায় ফিরে আসি, কিন্তু ওরা নিচু গলায় যখন

পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানায় তখন আমার ঘুম ভেঙে যায়। পরদিন সকালে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি, কে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন?

মা বললেন, কেউ আসে নি।

কিন্তু আমি তো একজন লোককে কথা বলতে শুনেছি।

মা বললেন, না, শোনো নি। তুমি ঘুমুচ্ছিলে।

কিন্তু আমি একজন লোককে দেখেছি, মা। তিনি সামনের ঘরে ছিলেন।

তুমি স্বপ্ন দেখেছো।

এক রবিবারের সকালে আমি ওই নৈশকালীন গোপন সাক্ষাতের রহস্য কিছুটা জানতে পারি। ম্যাগি খালা আমাকে আর আমার ভাইকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়া ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে, উনি হলেন প্রফেসর ম্যাথুস এবং উনি আমাদের খালু হতে যাচ্ছেন। আমরা লক্ষ করলাম তাঁর উঁচু ভুরুর ওপর কালার আর রিমলেস চশমা। তার ঠোঁট ছিল পাতলা, আর চোখের পলক যেন কখনো পড়ে না। আমি তাঁর মধ্যে দেখি শীতল এবং সুদূর একটা কিছু এবং তিনি যখন আমাকে ডাকলেন তখন আমি তার কাছে গেলাম না। তাঁর ওপর যে আমার আস্থা নেই এটা তিনি বুঝতে পারেন। আমাকে নমনীয় করার উদ্দেশ্যে তিনি আমায় একটা দশ পয়সার মুদ্রা উপহার দিলেন, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে, তাঁর ভাষায় আমরা দুই বেচারা পিতৃহীন ছেলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনার পর ম্যাগি খালা আমাদের জানালেন যে, তিনি আর প্রফেসর মাথুস শিগগিরই উত্তরাঞ্চলে চলে যাবেন। শুনে আমার মন খারাপ হয়ে যায়, কারণ ম্যাগি খালা আমার কাছে আমার আরেক মা হয়ে উঠেছিলেন।

আমাদের নতুন খালু যে বাড়িতে আসেন প্রতিদিন সকালে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পেলেও তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আমার ভাই আর আমি রীতিমত বিভ্রান্ত হই। আমাদের নতুন খালু করছেনটা কি? কেন তিনি সব সময় ওরকম নিচু গলায় কথা বলেন, প্রায় ফিসফিস করে? আর ওই রকম শ্বেতশুভ্র কলার আর চমৎকার নীল স্যুট কেনবার টাকাই বা তিনি কোথায় পান? একদিন মা আমাদের দুজনকে কাছে ডেকে নিয়ে সাবধান করে দিলেন, খালু যে কখনো আমাদের এখানে এসেছেন সে কথা যেন কাউকে না বলি। এর ফলে আমাদের বিভ্রান্তি আরো বেড়ে যায়। মা আরো বলেন, লোকজন খালুর খোঁজ করছে।

কারা?

মা বললেন, শ্বেতাঙ্গরা।

দুশ্চিন্তা আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়। অজ্ঞাত কোনো এক জায়গায়, কাছেই, আবার শ্বেত আতঙ্ক আমাদের উপরে স্থির হয়ে ভাসছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর কাছে ওদের কি দরকার?

মা জবাব দিলেন, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

উনি করেছেন কি?

মা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, তুমি তোমার মুখ বন্ধ রাখো, নইলে শ্বেতাঙ্গরা তোমার পেছনেও লাগবে।

মা বুঝলেন যে আমরা আমাদের নতুন খালুর ব্যাপারে ভয় পেয়েছি, বিভ্রান্ত বোধ করছি, তাই, আমার অনুমান, মা ম্যাগি খালাকে বলে দেন তিনি যেন খালাকে আমাদেরকে ঘুম দিয়ে আমাদের নীরবতা ও আনুগত্য আদায়ের ব্যবস্থা করতে বলে দেয়।

এখন আমাদের জন্য প্রতিদিনই হয়ে উঠলো বড়দিনের মতো। আমরা সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই খালু আমাদের জন্য কি রেখে গেছেন দেখার জন্য রান্নাঘরে ছুটে যেতাম। একদিন সকালে দেখলাম যে আমার জন্য তিনি কোঁকড়া লোমঅলা একটা ছোট্ট কুকুর নিয়ে এসেছেন, একটা পুডল, আমি তার নাম দিলাম বেটসি। আমার পোষা প্রাণী আর সাথী হয়ে গেল বেটসি।

আমাদের অবাক করে দিয়ে খালু এখন দিনের বেলাতে আমাদের বাসায় আসতে শুরু করলেন। তবে তিনি এলেই বাড়ির জানালার সব পর্দা টেনে নামিয়ে দেয়া হতো, তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকতো। আমি এই নীরব, কৃষ্ণাঙ্গ, শিক্ষিত, খালু সম্পর্কে আমার মাকে ফিসফিস করে হাজারটা প্রশ্ন করি, আর মা উত্তর দেন, এটা এমন একটা বিষয় যা তোমাকে জানানো যাবে না। এখন চুপ করে থাকো। যাও, খেলাধুলা করো।

এক রাতে চাপা কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি আলতো পায়ে সামনের ঘরের কাছে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিই । আমি দেখি যে খালু জানালার পাশে মেঝের উপর বসে আছেন, পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে অন্ধকার রাতের দিকে উঁকি দিয়ে দেখছেন। আমার মা ঝুঁকে পড়ে একটা ছোট ট্রাঙ্কে জিনিসপত্র প্যাক করছেন। প্রচণ্ড ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরে। মা কি চলে যাচ্ছেন? ম্যাগি খালা কাঁদছেন কেন? শ্বেতাঙ্গরা কি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?

খালু বললেন, তাড়াতাড়ি করুন। আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

মা বললেন, ওহ্, ম্যাগি, তোমার যাওয়া ঠিক হবে কিনা আমি জানি না।

খালু বললেন, আপনি এর মধ্যে নাক গলাবেন না। তিনি তখনো বাইরের অন্ধকারের দিকে অর্ধনীমিলিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন।

ম্যাগি খালা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি করেছো কি?

পরে বলবো। এখন ওরা এসে পড়ার আগে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।

ম্যাগি খালা বললেন, তুমি নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু করেছো নইলে এভাবে তুমি পালাতে চাইতে না।

খালু বললেন, বাড়িটা আগুনে পুড়ছে। ওরা ওটা দেখলেই বুঝবে কাজটা কার।

আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন?

খালু অধৈর্য গলায় বললেন, না দিয়ে উপায় ছিল না। আমি টাকাটা নিই। মহিলাকে আমি আঘাত করেছিলাম, তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। ওরা তাকে পেলে তিনি সব বলে দিতেন, তখন আমার বাঁচার কোনো উপায়ই থাকতো না। সে জন্যই আমি আগুন ধরিয়ে দিই।

ম্যাগি খালা তাঁর দু'হাতে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কিন্তু ও তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তো, আমি কি করতে পারতাম? ওটা আমাকে করতেই হয়। ওকে ওইখানে ওভাবে ফেলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। লোকজন এসে ওকে দেখলেই বুঝতো যে একজন কেউ তাকে আঘাত করেছে। পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কেউ কিছুই জানতে পারবে না।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা পূর্ণ হয়ে যায়। কী ঘটছে? শ্বেতাঙ্গ মানুষরা কি আমাদের সবার পেছনে ছুটে আসছে? আমার মা কি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? আমি মা বলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের মধ্যে ছুটে যাই।

খালু এক লাফে উঠে দাঁড়ান। তার হাতের পিস্তল সোজা আমার দিকে তাক করা।

আমি অপলক চোখে পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে থাকি, আমার মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘটবে।

মা তীব্র কণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন, রিচার্ড!

আমি চেঁচিয়ে উঠি, তুমি চলে যাচ্ছো!

মা ছুটে এসে আমার মুখের ওপর তাঁর হাত চাপা দিলেন। তিনি আমাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, তুই কি চাস যে আমরা সবাই মারা পড়ি?

আমি শান্ত হই।

মা বললেন, যাও, এবার আবার ঘুমিয়ে পড়ো।

আমি বললাম, তুমি চলে যাচ্ছো।

না, আমি কোথাও যাচ্ছি না।

যাচ্ছো। আমি তোমার ট্রাঙ্ক দেখতে পাচ্ছি। আমি আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠি।

মা বললেন, এই তুই চেঁচানি থামাবি।

তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে আমার বাহু এতো জোরে চেপে ধরেন যে তার যন্ত্রণায় আমার কান্না থেমে যায়।

যাও, এবার শুতে যাও বলে তিনি আমাকে বিছানায় নিয়ে গেলেন। আমি শুয়ে থাকি, ঘুমাই না, শুনতে পাই ফিসফিসানি, পায়ের আওয়াজ, অন্ধকারে দরজার ক্যাচ ক্যাচ আর ম্যাগি খালা কান্নার শব্দ। অবশেষে বাড়ির দরজায় এসে একটা ঘোড়া ও বগির

দাঁড়াবার শব্দ পেলাম। মেঝের উপর দিয়ে একটা ট্রাঙ্ক টেনে নিয়ে যাবার শব্দ হয়। ম্যাগি খালা আমার ঘরে আসেন। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। আমাকে চুমু খেয়ে তিনি ফিসফিস করে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তিনি আমার ভাইকেও চুমু খেলেন। ও তখন অঘোর ঘুমে অচেতন। তারপরই ম্যাগি খালা চলে গেলেন।

পরদিন সকালে মা আমাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিলেন, আমি যা দেখেছি ও শুনেছি তা যেন ঘুনাক্ষরেও কাউকে না বলি। সাদা মানুষগুলো যদি চিন্তাও করে যে আমি জানি তাহলেই ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, কি জানি আমি?

মা বললেন, সেটা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। এখন কাল রাতে যা দেখেছো তার কথা ভুলে যাও।

কিন্তু খালু করেছেন কি?

সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, উনি কাউকে খুন করেছেন।

কেউ যদি তোমার মুখ থেকে এ কথা শোনে তাহলে তুমি মারা পড়বে।

ওতেই কাজ হয়। এ কথা আমি কাউকে বলবো না। কয়েকদিন পর একজন দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ মানুষ আমাদের বাড়িতে এসে আমার মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেন। তার বুকে লাগানো ছিল ঝকমকে একটা তারা আর কোমরে আটকানো একটা পিস্তল। আমি শুধু আমার মাকে বলতে শুনলাম, আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। ইচ্ছা হলে আপনি আমাদের বাড়ি তল্লাশি করে দেখতে পারেন। দীর্ঘদেহী লোকটি আমার ভাই ও আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু আমাদেরকে কিছু বললেন না। খালু কী করেছিলেন তা নিয়ে আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে ভাবি, কিন্তু কখনো তা জানার ভাগ্য আমার হয় নি, বহু বছর পরেও না। ম্যাগি খালা চলে যাবার পর আমার মা একা আর আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। সারাক্ষণ আমার পেট খালি থাকে, দিনের বেশির ভাগ সময় আমি মাথা ব্যথায় কষ্ট পাই। একদিন দুপুর বেলা ক্ষুধার যন্ত্রণা আমাকে এতো কাবু করে ফেলে যে আমি আমার কুকুর বেটসিকে বিক্রি করে কিছু খাবার কেনার সিদ্ধান্ত নিই। ছোট্ট, সাদা নরম তুলতুলে বেটসিকে গোসল করিয়ে তার লোম আঁচড়ে দেবার পর তাকে একটা পুতুলের মতো দেখালো। আমি তাকে কোলে নিয়ে প্রথমবারের মতো একটা শ্বেতাঙ্গ পাড়ায় যাই। রাস্তাগুলি সেখানে প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, সাদা বাড়িগুলি বড় বড়। আমি একটার পর একটা বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা বাজাই। দরজা খুলেই কয়েকজন সাদা মানুষ আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। কয়েকজন আমাকে ঘুরে বাড়ির পেছনের দরজায় যেতে বললো কিন্তু আমার অহঙ্কারে ঘা লাগে, আমি ওদিকে যাই না। অবশেষে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণী একটা বাড়িতে তাদের দরজা খোলে, আমাকে দেখে মৃদু হাসে, জিজ্ঞাসা করে, কি চাই?

আমি বলি, আপনি, একটা খুব সুন্দর কুকুর কিনতে চান?

তরুণী বললো, দেখি?

ও কুকুরটা কোলে নিয়ে আদর করে, চুমু খায়, তারপর জিজ্ঞাসাকরে, নাম কি?

বেটসি।

খুব মিষ্টি। কতো দাম চাও?

এক ডলার।

একটু দাঁড়াও, দেখি আমার কাছে এক ডলার আছে কিনা।

ও বেটসিকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে যায়, আমি রোয়াকে অপেক্ষা করি আর এই সাদা জগতের পরিচ্ছন্নতা ও প্রশান্তি দেখে মুগ্ধ হই। সব কিছু কী রকম সুশৃঙ্খল। তবু আমি অস্বস্তি বোধ করি। এখানে বাস করার কোনো ইচ্ছা জাগে না আমার মনে। আমার মনে পড়ে যে এ সব বাড়ির সাদা বাসিন্দারাই নিগ্রোদের তাদের বাড়িঘর ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। কেউ কি বলে উঠবে যে আমি একটা বদ নিগার আর এখানেই আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে? ওই মেয়ে হয়তো একটা জনতা যোগাড়ের ব্যবস্থা করছে। আমার হয়তো বেটসির কথা ভুলে গিয়ে এখান থেকে এখনই সরে পড়া উচিত। ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তার নিচে আমার ক্ষুধা চাপা পড়ে যায়। পরিচিত কালো মুখগুলির নিরাপত্তার মধ্যে ছুটে যাবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠি।

এমন সময় দরজা খুলে গেল, হাসতে হাসতে মেয়েটি এগিয়ে এলো, ও এখনো বেটসিকে কোলে জড়িয়ে ধরে আছে। কিন্তু এখন আর ওর হাসি আমার চোখে পড়ে না, যে আতঙ্ক আমি আমার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছি তাতে আমার দু' চোখ পূর্ণ। মেয়েটি বললো, কুকুরটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, আমি এটা কিনবো। কিন্তু আমার কাছে এখন এক ডলার নেই। সর্বসাকুল্যে আমার কাছে সাতানব্বই সেন্ট আছে। ও বুঝতে পারে নি, কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছে আমি আমার কুকুর বিক্রি করতে চাই না। এ কথা না বলেও আমার কুকুর ফেরত পাবার একটা সুযোগ ও করে দেয়। আমি আস্তে করে বললাম, না, ম্যাম, আমি এক ডলার চাই।

কিন্তু বাড়িতে আমার কাছে তো এখন এক ডলার নেই।

সেক্ষেত্রে আমি আমার কুকুর বিক্রি করতে পারবো না।

আজ রাতে আমার মা বাড়ি ফিরে এলে আমি তোমাকে বাকি তিন সেন্ট দিয়ে দেবো।

আমি কঠিন মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললাম, না, ম্যাম।

শোনো, তুমি তো এক ডলার চেয়েছিলে...

হ্যাঁ, ম্যাম। এক ডলার।

ও আমার দিকে মুঠাভর্তি ভাংতি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এখানে সাতানব্বই সেন্ট আছে।

তখনো তার কোলে বেটসি।

আমি আমার মাথা নেড়ে বললাম, না, ম্যাম, আমি এক ডলার চাই।

কিন্তু আমি তোমাকে আরো তিন সেন্ট তো দেবো পরে।

আমার মা আমাকে এক ডলারে কুকুরটা বিক্রি করতে বলে দিয়েছেন।

আমি বুঝি যে আমি বেশি আগ্রাসী হয়ে যাচ্ছি, তাই আমার আগ্রাসনের নৈতিক দোষটা আমার মায়ের ওপর চাপাতে চাইছি।

মেয়েটি বললো, তুমি পুরো এক ডলারই পাবে। আজ রাতে বাকি তিন সেন্ট পাবে।

না, ম্যাম।

এক্ষুণি তোমার এক ডলারের কি দরকার?

আমি কিছু খাবার কিনবো।

সাতানব্বই সেন্ট দিয়ে তো তুমি প্রচুর খাবার কিনতে পারবে।

না, ম্যাম। আমি আমার কুকুরটা ফেরত চাই।

ও এক মুহূর্তে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে। তারপরই সে রূঢ় অসহিষ্ণু গলায় বললো, এই নাও তোমার কুকুর।

বেটসিকে আমার দু'বাহুর মধ্যে সজোরে ঠেলে দিয়ে বললো, এখন এখান থেকে ভাগো! তোমার মতো উদ্ভট নিগার ছেলে আমি আর দেখি নি।

আমি বেটসিকে নিয়ে সারা পথ ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে আসি। বেটসিকে যে আমি বিক্রি করি নি সেজন্য আমার আনন্দ হয়। কিন্তু এখন আমি আবার ক্ষুধায় আক্রান্ত হই। আমার হয়তো ওই সাতানব্বই সেন্ট নেয়াই উচিত ছিল? কিন্তু এখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। আমি বেটসিকে আদর করি, মায়ের ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকি। সে রাতে মা বাড়ি ফিরলে আমি তাঁকে সব কথা খুলে বলি।

মা বললেন, তাহলে ওই সাতানব্বই সেন্ট তুমি নাও নি। কেন?

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বলি, জানি না।

মা বললেন, সাতানব্বই সেন্ট যে প্রায় এক ডলার তা তুমি জানো না?

আমি আমার আঙুলের আটানব্বই একশো গুণতে গুণতে বলি, জানি, ম্যাম। কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছে বেটসিকে বিক্রি করতে আমার ইচ্ছা হয় নি।

কেন?

ওরা যে শ্বেতাঙ্গ, তাই।

মা বললেন, তুমি একটা বোকা।

এর এক সপ্তাহ পরে একটা কয়লার গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে বেটসি মারা পড়ে। আমি ওর জন্য কাঁদি, পেছনের আঙ্গিনায় ওকে কবর দিই, কবরের মাথার দিকে একটা লাঠি পুতে দিই। মায়ের একমাত্র মন্তব্য হলো, তুমি একটা ডলার পেতে পারতে। মরা কুকুর খাওয়া যায় না, যায় কি?

আমি কোনো জবাব দিই না। ভেজা কিংবা ধূলিধূসরিত রাস্তায় যাওয়া-আসার সময়, ঘরের ভেতরে কিংবা বাইরে, আমার দিন আর রাতগুলি শুধু নানা জাদু-মন্ত্রার সম্ভাবনার কথা বলে।

আমি যদি একটা ঘোড়ার লেজ তুলে আনি আমার নিজের প্রস্রাবভর্তি শিশিতে রেখে দিই তাহলে ওটা রাতারাতি একটা সাপে রূপান্তরিত হবে।

আমি যদি রাস্তায় কালো পোশাক পরা কোনো ক্যাথলিক সিস্টার বা যাজিকা দেবি আর তিনি যদি হেসে উঠে আমাকে তাঁর দাঁত দেখান তাহলে আমি নির্ঘাৎ মারা যাবো।

আমি যদি কোনো হেলান দেয়া মই-এর তলা দিয়ে যাই তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে দুর্ভাগ্যের শিকার হবো।

আমি যদি আমার কনুই চুম্বন করি তাহলে আমি মেয়ে হয়ে যাবো।

আমার ডান কান চুলকালে বুঝতে হবে যে কেউ আমার সম্পর্কে ভাল কথা বলছে।

আমি যদি কোনো কুঁজোর কুঁজে স্পর্শ করি তাহলে কখনো আমার কোনো রোগ হবে না।

আমি যদি ইস্পাতের রেল লাইনের ওপর সেফটি পিন রাখি আর রেলগাড়ি যদি তার ওপর দিয়ে চলে যায় তাহলে সেফটি পিনটা একটা নতুন ঝকঝকে কাঁচি হয়ে যাবে।

আমি যদি একটা কণ্ঠস্বর শুনি অথচ কাছে পিঠে কোনো মানুষ না দেখি তাহলে বুঝতে হবে যে ঈশ্বর অথবা শয়তান আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে।

যখনই আমি প্রস্রাব করবো তখনই আমার উচিত হবে তাতে থুতু নিক্ষেপ করা, তাহলে তা আমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে।

আমার নাক চুলকালে বুঝতে হবে যে কেউ একজন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে।

আমি যদি কোনো খোঁড়া মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি তাহলে ঈশ্বর আমাকে খোঁড়া বানিয়ে দেবেন।

আমি যদি অনর্থক ঈশ্বরের নাম করি তাহলে ঈশ্বর আমার মৃত্যু ডেকে আনবেন।

যদি রোদের মধ্যে বৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে শয়তান তার বউকে পিটুনি দিচ্ছে।

যদি আকাশের তারাগুলি কোনো রাতে সাধারণের চাইতে বেশি মিটমিট করে তাহলে বুঝতে হবে যে স্বর্গের দেবদূতরা স্বর্গের দরজাগুলির সামনে দিয়ে দ্রুত ছোটাছুটি করছেন, কারণ তারাগুলি তো স্বর্গে বায়ু চলাচলের জন্য ফুটো ছাড়া আর কিছু নয়, আর ঈশ্বরের পবিত্র বাস ভবনে বায়ু প্রবেশের জন্য যে ফুটোগুলি তার সামনে দিয়ে দেবদূতের ছোটাছুটির জন্যই তারাগুলির মিটমিট করা আমরা দেখি।

আমি যদি আমার মাকে খুশি করি তাহলে আমি বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচবো এবং ধনী হবো।

আমি যদি কোনো আয়না ভেঙে ফেলি তাহলে সাত বছর আমার দুর্ভাগ্যের মধ্যে কাটবে।

আমার সর্দি হলে আমি যদি গলায় একটা ময়লা পুরানো মোজা জড়িয়ে রাতে শুতে যাই তাহলে ভোর নাগাদ আমার সর্দি ভাল হয়ে যাবে।

আমি যদি একটা ছোট থলিতে একটু আসাফেতিদা বেঁধে আমার গলায় ঝুলিয়ে রাখি তাহলে জীবনে আমার কোনো রোগ হবে না।

আমি যদি ইস্টার সানডের সকালে ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে তাকাই তাহলে আমি দেখবো যে সূর্য পুনরুত্থিত প্রভুর জয়গান গাইছে উচ্চ কণ্ঠে।

যদি কেউ তার মৃত্যুশয্যায় কিছু স্বীকার করে তাহলে তা সত্য বলে ধরে নিতে হবে, কারণ কারো পক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিছে কথা বলা সম্ভব নয়।

যদি কেউ রোপন করার সময় প্রতিটি শস্য কণার গায়ে থুতু দেয় তাহলে শস্য দীর্ঘ হয়ে বেড়ে উঠবে এবং তার ফলন ভাল হবে।

আমি যদি অসতর্কতা বশত লবন ছড়িয়ে ফেলি তাহলে এক চিমটি লবন বাঁ পিঠের উপর দিয়ে পেছনে ছুঁড়ে দিলে আমি আর দুর্ভাগ্যের শিকার হবো না।

ঝড়ের সময় আমি যদি কাপড় দিয়ে আয়না ঢেকে দিই তাহলে আমার উপর বজ্রপাত হবে না।

যদি আমি মেঝের উপর পড়ে থাকা কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে যাই তাহলে আমি দুর্ভাগ্যের শিকার হবো।

যদি আমি ঘুমের মধ্যে হাঁটি তাহলে বুঝতে হবে যে ঈশ্বর আমাকে তার জন্য কোনো ভাল কাজ করার লক্ষ্যে আমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন।

সব কিছুই মনে হয় সম্ভব, বাস্তবায়নযোগ্য, ঘটতে পারে, কারণ আমি চাই যে সব কিছু সম্ভব হোক। যেহেতু নৈর্ব্যক্তিক জগতে আমার পক্ষে কিছু ঘটানো সম্ভব ছিল না সেহেতু আমি সব কিছু ঘটাতাম আমার নিজের ভেতরে। যেহেতু আমার পরিবেশ ছিল অনাবৃত এবং বিবর্ণ সেহেতু আমি তাকে ভরিয়ে তুলতাম অসীম সম্ভাবনার দ্বারা, আমার নিজের বুভুক্ষা এবং মেঘাচ্ছন্ন আকুতিকে ওইভাবে আমি মুক্তি দিতাম।

শ্বেতাঙ্গ মানুষদের একটা ভীতি এখন আমার অনুভূতি ও কল্পনায় স্থায়ী বাসা বাঁধার জন্য এসে উপস্থিত হয়। যুদ্ধ যত কাছে এগিয়ে আসে সমগ্র দক্ষিণ জুড়ে জাতিগত সংঘাত ততো বৃদ্ধি পায়। যদিও আমি যুদ্ধের কিছুই দেখি নি তবু আমি তার দ্বারা এতো প্রভাবিত হই যে আমার মনে হয় আমি যেন প্রতিটি সংঘর্ষে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছি। আসল যুদ্ধটা আমার কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে নি, কিন্তু জাতিগত দ্বন্দ্বের প্রতিটি ইঙ্গিত, গুঞ্জন, শব্দ, ব্যঞ্জনা, খবর, কানাঘুষা ও গুজব আমার মধ্যে আবেগগত সাড়া জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। অদৃশ্য শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা এবং হুমকির চাপ আমার ব্যক্তিত্বের সমগ্রতাকে যেভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে এমন আর কোনো কিছুই করে না। আমি

ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতিবেশীদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকি, কান পেতে তাদের কথা শুনি, কিভাবে এক শ্বেতাঙ্গ রমণী এক কৃষ্ণাঙ্গ রমণীকে চড় দিয়েছে, এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষকে হত্যা করেছে সে কথা শুনি। এসব খবর আমাকে ভয়, বিস্ময় এবং আতঙ্কে পূর্ণ করে তোলে, আর আমি অনিঃশেষ প্রশ্ন করে চলি।

একদিন সন্ধ্যায় আমি একটা কাহিনী শুনলাম যা আমাকে রাতের পর রাত ঘুমাতে দেয় নি। এক নিগ্রো রমণীর স্বামীকে একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। রমণী তার স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নেয়, একটা বন্দুক চাদরে জড়িয়ে বিনীতভাবে শ্বেতাঙ্গদের কাছে যায়, তাদের কাছে অনুনয়-বিনয় করে তারা যেন তার স্বামীর মৃতদেহ তার কাছে হস্তান্তর করে, সে তাকে সমাধিস্থ করবে। মনে হয়, তাকে তার স্বামীর মৃতদেহের কাছে যাবার অনুমতি দেয়া হয়, শ্বেতাঙ্গরা নীরবে, অস্ত্রসজ্জিত হয়ে, তাকে লক্ষ্য করে। শোনা যায়, নিগ্রো রমণী হাঁটু মুড়ে বসে, প্রার্থনা করে, তারপর চাদরটা খুলতে শুরু করে। শ্বেতাঙ্গরা কী ঘটছে বুঝে উঠবার আগেই রমণী তার হাঁটুর কাছ থেকে বন্দুক তাক করে চার শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে।

কাহিনীটা তথ্যগতভাবে সত্য কিংবা মিথ্যা তা আমি জানতাম না, কিন্তু আমার আবেগগত দিক থেকে তা ছিল সত্য, কারণ আমি ইতিমধ্যে অনুভব করি যে এমন সব মানুষের যথার্থই অস্তিত্ব আছে যাদের বিরুদ্ধে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, যারা ইচ্ছা হলেই আমার জীবনকে ধুলায় মিলিয়ে দিতে পারে। আমি স্থির করি, আমি যদি কখনো কোনো উচ্ছৃঙ্খল শ্বেতাঙ্গ জনতার মুখোমুখি হই তাহলে আমি ওই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার সমকক্ষ হবার চেষ্টা করবো। আমি একটা অস্ত্র লুকিয়ে রাখবো, ভাব করবো যে আমার প্রিয়জনদের নিহত হবার ঘটনায় আমি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে আছি, আর ওরা যখন ভাববে যে তাদের সীমাহীন নিষ্ঠুরতাকে আমি আমার জীবনের বিধিলিপি হিসাবে মেনে নিয়েছি ঠিক তখনই, ওরা আমাকে হত্যা করবার আগে, আমি ওদের যতজনকে সম্ভব ততজনকে হত্যা করবো। আমার মধ্যে যে বিভ্রান্ত অনুভূতিসমূহ দীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে ছিল ওই রমণীর প্রতারণার কাহিনী তাকে আকার দিলো এবং অর্থে মণ্ডিত করলো।

অবশ্য, আমার কল্পনাসমূহের বিন্দুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক মূল্য ছিল না। আমার স্বতঃউৎসারিত অলীক কল্পনাসমূহ বাস করতো আমার নিজের ভেতরে। যে হুমকি আমার উপর যে কোনো সময়ে নেমে আসতে পারে তার সামনে আমি নিজেকে পুরোপুরি অসহায় অনুভব করি। যদি কখনো আমি একটা উচ্ছৃঙ্খল শ্বেতাঙ্গ জনতার মুখোমুখি হই তাহলে আত্মরক্ষার জন্য কোনো সম্ভাব্য কর্মপন্থার কথা আমার জানা ছিল না। আমার অলীক কল্পনাগুলি ছিল আত্মরক্ষাকারী একটা নৈতিক প্রাকার, যার সাহায্যে আমি আমার আবেগগত সততাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হই, যার সাহায্যে সহিংসতার হুমকির মুখে আমার ব্যক্তিত্ব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিনাতিপাত করতে সক্ষম হয়।

এই অলীক কল্পনাগুলি এখন আর শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে আমার প্রতিক্রিয়ার চিত্র নয়,

এগুলি আমার বেঁচে থাকার, আমার আবেগগত জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। এগুলি পরিণত হয়েছে একটা সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং ধর্মে। শ্বেতাঙ্গদের বৈরিতা আমার মনের গভীরে এতো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে আমার যাপিত জীবনের দৈনন্দিন পরিবেশের সঙ্গে তা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। এই বৈরিতার বিরুদ্ধে আমার প্রতিক্রিয়া তার নিজের ভেতর থেকেই পুষ্ট হয়ে ওঠে, শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে আমি যেসব খবরাখবর পাই তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী তা বাড়ে কিংবা কমে। শ্বেতাঙ্গদের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে টানটান উত্তেজনা জেগে ওঠে, আমার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে আবেগের একটা বিশাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, আমি যেন কোনো একটা প্রকৃতিক শক্তি দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হচ্ছি, যে শক্তির দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হচ্ছি, যে শক্তির আচরণ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। আমার জীবনে আমি কখনো কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষ দ্বারা লাঞ্ছিত হই নি, কিন্তু তাদের নিছক অস্তিত্বই আমাকে এমনভাবে গড়ে তোলে যে আমার মনে হয় আমি হাজারটা রিঞ্চিং-এর শিকার।

স্কুলে প্রত্যাবর্তন করে নিয়মিত পড়ালেখা শুরু করার আগ পর্যন্ত আমি দীর্ঘ এক অনির্দিষ্টকাল ওয়েস্ট হেলেনাতে বাস করি। সৌভাগ্যক্রমে আমার মা জনৈক শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকের দপ্তরে সপ্তাহে পাঁচ ডলারের অশ্রুতপূর্ব বেতনে চাকুরি পান এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে তার সন্তানরা এখন আবার স্কুলে যাবে। আমি খুব খুশি হই। কিন্তু বহু মানুষের উপস্থিতিতে আমি এখনো লজ্জা পাই, অর্ধ-পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অসাড় হয়ে পড়ি। আর নতুন স্কুলে প্রথম দিনেই আমি ক্লাসরুমে নিজেকে হাসির খোরাক করে তুলি। আমাকে ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখতে বলা হয়। আমি আমার নাম ও ঠিকানা জানতাম, আমি কিভাবে তা লিখতে হয় তাও জানতাম, আমি এসব বানান করতে জানতাম, কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে, অনেকগুলি মেয়ের দৃষ্টি আমার পিঠের উপর অনুভব করে, আমার ভেতরটা বরফের মতো জমে যায়, আমি একটা অক্ষরও লিখতে পারি না।

শিক্ষয়িত্রী বললেন, তোমার নাম লিখো।

আমি সাদা চকটা ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে তুলে ধরি, কিন্তু লিখতে শুরু করার মুহূর্তেই আমার মন একেবারে ফাঁকা ও শূন্য হয়ে যায়। আমি আমার নাম মনে করতে পারি না, প্রথম অক্ষরটা পর্যন্ত আমার মনে পড়ে না। কে একজন খিকখিক করে হেসে ওঠে। আমি কাঠ হয়ে যাই।

শিক্ষয়িত্রী আমাকে মিষ্টি কথায় ভোলাবার মতো করে বললেন, আমাদের কথা ভুলে যাও। এবার তোমার নাম ও ঠিকানা লিখো।

লেখার একটা প্রণোদনা আমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে, কিন্তু লেখার জন্য আমার হাত উঠে আসে না। ছেলেমেয়েরা খিলখিল করে হাসতে শুরু করে। আমি লাল হয়ে উঠি।

শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাস করলেন, তুমি তোমার নাম জানো না!

আমি তাঁর দিকে তাকাই, কোনো জবাব দিতে পারি না। শিক্ষয়িত্রী উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন, আমার আত্মবিশ্বাস জাগাবার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিনি সস্নেহে আমার কাঁধের উপর তাঁর হাত রেখে বললেন, তোমার নাম কি?

আমি ফিসফিস করে বললাম, রিচার্ড।

রিচার্ড কি?

রিচার্ড রাইট।

বানান করো।

আমি হড়বড় করে দ্রুত বেগে আমার নাম বানান করি। আমার সর্বাঙ্গ অসাড় করে দেওয়া লজ্জার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাই।

শিক্ষয়িত্রী বললেন, ধীরে ধীরে বলো যেন আমি বুঝতে পারি।

তাই করলাম আমি।

তুমি লিখতে জানো?

জানি, ম্যাম।

তাহলে লেখো এবার।

আবার আমি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে যাই, লেখার জন্য হাত তুলি, তারপরই সব কিছু আমার মধ্য থেকে উবে যায়, আমি ফাঁকা হয়ে যাই। আমি আমার চেতনাকে সংহত করার প্রয়াস পাই, কিন্তু আমি কিছুই স্মরণ করতে পারি না। আর সব কিছু বাদ দিয়ে আমার পেছনে বসা ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি আমার অন্তরকে পূর্ণ করে রাখে। আমি যে কি রকম পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছি তা আমি বুঝতে পারি। আমি আমার উত্তপ্ত কপাল ঠাণ্ডা ব্ল্যাকবোর্ডের উপর ঝুঁকে নামিয়ে রাখি। সমস্ত ঘর উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়ে। আমার মাংশপেশিগুলি জমে যায়।

শিক্ষয়িত্রী বললেন, তুমি তোমার আসনে গিয়ে বসতে পারো।

আমি নিজের জায়গায় গিয়ে বসে নিজেকে শাপশাপান্ত করি। অনেক লোকের মাঝে আমাকে কিছু করতে বললে কেন আমি একটা বুদ্ধ হাবা হয়ে যাই? ক্লাসের কোনো ছেলের চাইতে আমি কম ভাল লিখতে পারি না। নিঃসন্দেহে আমি ওদের যে কারো চাইতে বেশি ভাল পড়তে পারি। যখন আমি নিজের সম্পর্কে সুনিশ্চিত হই তখন আমি সাবলীল ও অভিব্যক্তিপূর্ণভাবে কথা বলতে পারি। তাহলে কেন অচেনা মুখের সারি আমাকে অশান্ত করে দেয়? আমি চুপ করে বসে থাকি। আমার কান আর ঘাড় যেন পুড়ে যায়, আমি শুনতে পাই অপর ছাত্ররা আমাকে নিয়ে ফিসফিস করে আলাপ করছে, ওদের ঘৃণা করার জন্য আমি নিজেকে ঘৃণা করি। আমি পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে থাকি আর আমার ভেতরে আবেগের ঝড় বয়ে যায়।

একদিন ক্লাসে বসে থাকার সময় আমি বাঁশির শব্দ আর ঘন্টাধ্বনি শুনে চমকে উঠি।

তারপরই কানে তালা লাগানো হৈ-হল্লা শুরু হয়ে যায়। শিক্ষয়িত্রী ক্লাসের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। ছেলেমেয়েরা ছুটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। শিক্ষয়িত্রী ক্লাস ছেড়ে চলে যান। একটু পরে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন। সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে যাও।

ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে চায়, কেন? কি হয়েছে?

শিক্ষয়িত্রী বললেন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

অন্য ছেলেমেয়েদের পেছন পেছন আমি রাস্তায় এসে দাঁড়াই। আমি দেখি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ লোকজন হাসছে, গান গাইছে, চিৎকার করছে। শ্বেতাঙ্গদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার সময় আমার ভয় করতে থাকে, কিন্তু নিজের পাড়ায় পৌঁছে কৃষ্ণাঙ্গদের হাসি মুখ দেখে আমার ভয় অন্তর্হিত হয়। আমি তাদের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াই, যুদ্ধ কী তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করি যে অনেক ছেলে-মেয়ে আকাশে কী একটা জিনিস আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। আমিও চোখ তুলে উপরের দিকে তাকাই। আমার মনে হলো একটা ছোট্ট পাখি যেন আকাশে ঘুরছে, ডানা মেলে উড়ছে।

দেখো! দেখো!

একটা প্লেন!

আমি কখনো প্লেন দেখি নি।

আমি বললাম, একটা পাখি।

জনতা হেসে ওঠে।

একজন লোক বললো, ওটা একটা প্লেন, খোকা।

আমি আবার বললাম, ওটা একটা পাখি। আমি দেখতে পাচ্ছি ওটাকে।

একজন লোক আমাকে তার কাঁধে তুলে নিয়ে বললো, খোকা, কথাটা মনে রেখো। তুমি মানুষকে উড়তে দেখছো।

তবু ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হলো না। আমার কাছে তখনও ওটাকে একটা পাখির মতো মনে হয়। সেদিন রাতে মায়ের কথা শুনে আমি বিশ্বাস করি যে, হ্যাঁ, মানুষ উড়তে পারে।

বড়দিন এসে পড়ে। আমি পেলাম একটা মাত্র কমলা লেবু। আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বাইরে পাড়ার ছেলেমেয়েরা শিঙ্গা বাজায়, বাজি পোড়ায়। আমি তাদের সঙ্গে খেলতে যাই না। সারাদিন আমি কমলাটা নাড়াচাড়া করি। রাতে ঠিক ঘুমাতে যাবার আগে আমি ওটা খাই। প্রথমে ওপর দিকে একটা কামড় দিই, কমলাটা টিপে রস বার করে চুষতে থাকি, সব শেষে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ধীরে ধীরে সেগুলি কচকচ করে চিবুতে থাকি।

তৃতীয় অধ্যায়

আমি আরেকটু লম্বা হয়েছি আমার বয়স আরো একটু বেড়েছে। আমি এখন বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করি, আর তাদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করি, আর তাদের দলে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য আমাকে কতিপয় বর্বরোচিত মনোভাব লালন করতে হয়। এই ভ্রাতৃত্বের কষ্টিপাথর ছিল শ্বেতাঙ্গদের প্রতি আমার অনুভূতি, তাদের প্রতি আমি কতটা বৈরিভাব পোষণ করি, জাতির উপর আমি কতোটা মূল্য এবং মর্যাদা দিই সেটা। এসব কিছুই পূর্বপরিকল্পিত ছিল না। যে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে জমায়েত হতো তাদের আলাপচারিতার মধ্য থেকে এগুলি সাবলীলভাবে উৎসারিত হতো।

মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করা ছিল মর্যাদা হানিকর। আমাদের আলাপচারিতায় আমরা তাদের সুদূর একটা দ্বীপে ঠেলে দিই। আমরা আমাদের লিঙ্গের ভূমিকাটি কোনো একভাবে আত্মস্থ করে ফেলি, এবং একটা এজমালি নৈতিক শিক্ষা লাভের জন্য আমরা সংঘবদ্ধ হই। আমরা গর্বভরে গুরুগম্ভীর স্বরে কথা বলি। আমাদের অনুভূতির চাঁচাছোলা কঠিন রূপটি তুলে ধরার জন্য আমরা নিগার শব্দটি ব্যবহার করি। আমরা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি সেটা বোঝাবার জন্য আমরা অতিরিক্ত অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করি। আমাদের সিদ্ধান্তগুলি যে আর কারো কাছ থেকে নয়, একমাত্র আমাদের কাছ থেকেই উঠে এসেছে, আমরা একে অন্যকে তা বিশ্বাস করাবার প্রয়াস পাই। অথচ আমরা যে একে অন্যের উপর কতোটা নির্ভরশীল তা লুকিয়ে রাখবার জন্য আমরা প্রাণান্তকর চেষ্টা করি।

বিকালে স্কুল ছুটি হবার পর আমি রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটি, অলসভাবে একটা খালি টিনের কৌটায় লাথি মারি, পাশের একটা কাঠের বেড়ার গায়ে হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করি এবং অবশেষে রাস্তার মোড়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকা অথবা কোনো মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে অথবা কোনো বাড়ির সিঁড়িতে বসে থাকা এক কিংবা একাধিক ছেলেদের দঙ্গলের মাঝখানে গিয়ে পড়ি।

এই! ভীরু গলায়।

তোর খাওয়া হয়েছে? অস্বস্তির সঙ্গে, আলাপ শুরু করার প্রয়াস।

হ্যাঁ রে। খুব খেয়েছি আজ। ঘরোয়া সুরে।

আমি আজ বাঁধাকপি আর আলু খেয়েছি। আস্থার সঙ্গে।

আমি খেয়েছি ঘোলের সঙ্গে মটরশুঁটি। মৃদু কণ্ঠে, তথ্য প্রদানের ভঙ্গিতে।

বলিস কি, নিগার! তাহলে তো তোর কাছে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। একটা ঘোষণা।

কেন ? সারল্যের ভান।

কারণ এক মিনিটের মধ্যে তুই হাওয়াটাকে দুর্গন্ধময় করে তুলবি। উচ্চকণ্ঠের অভিযোগ।

ভিড়ের মধ্যে হাসির কলরোল জেগে ওঠে।

নিগার, তোর মন খানাখন্দে ডুবে আছে। কৌতুকপূর্ণ নীতিকথার উচ্চারণ।

খানাখন্দ কিরে! তুই এখনই বাতকর্ম করতে শুরু করবি। বিজয়সূচক ঘোষণা উৎকণ্ঠার জন্য দেয়।

হ্যাঁ। মটরশুঁটি ঘোলকে বলবে সরে গিয়ে জায়গা দিতে, ঘোল সরতে চাইবে না, তখন তোর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, আর তোর পেট ফুলে ফেঁপে ফটাস করে ফেটে যাবে! চূড়ান্ত পরিণতি।

ভিড় দীর্ঘস্থায়ী উচ্চকণ্ঠ হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

এই! শ্বেতাঙ্গদের উচিত তোকে পাকড়াও করে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য চিড়িয়াখানায় আটকে রাখা। বিষয়টাকে এবার প্রশস্তর ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারপর যুদ্ধ শুরু হলে তোকে মটরশুঁটি আর ঘোল খাওয়াবে আর তোকে দিয়ে বাতকর্ম করাবে! বিষয়টা গৃহীত এবং সম্প্রসরিত হয়।

একটা নতুন বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে তুই যুদ্ধে জিতে যাবি! উচ্চকণ্ঠে চূড়ান্ত পরিণতি।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে, তারপর ধীরে ধীরে হাসি থেমে যায়।

বিষাক্ত গ্যাস পেলে হয়তো একটা ভাল কাজ হবে। নানা অনুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের বিষয়টা আলাপচারিতার বৃত্তে ঢুকে পড়ে।

হ্যাঁ, এখানে বর্ণবাদী দাঙ্গা বাধলে আমার বিষ দিয়ে আমি সব শ্বেতাঙ্গগুলোকে মেরে ফেলবো। তিক্ত অহঙ্কার।

আনন্দোচ্ছল হাসির কলরোল। তারপর নীরবতা। আর কে নতুন কি বলে শোনার জন্য প্রত্যেকে অপেক্ষা করে। ওই শ্বেতাঙ্গগুলো কিন্তু আমাকে ভয় পায়। একটা পুরানো সমস্যার শান্ত উচ্চারণ। হ্যাঁ ওরা আমাদের যুদ্ধে পাঠায়, আমাদের দিয়ে জার্মানদের হারায়, আমাদের লড়াই করতে শেখায়, তারপর ফিরে আসার পর আমাদের ভয় পেয়ে আমাদের মেরে ফেলতে চায়। আধা গর্ব, আধা অভিযোগ।

আমার মা বলেছেন, যে শ্বেতাঙ্গ বুড়ির ওখানে মা কাজ করে সে তাকে চড় মারলে মা ওকে শাসিয়ে দেয়ঃ মিস গ্রীন, আপনি যদি আরেকবার আমাকে চড় মারেন তাহলে আমি আপনাকে ঠিক মেরে ফেলবো, তার জন্য নরকে যেতে হলে নরকে যাবো, এবং

যা শাস্তি পাবার তা মাথা পেতে নেবো। সম্প্রসারণ, সংযোজন, উৎসর্গের ভঙ্গিতে সগর্ব উচ্চারণ।

আমাকে ওই রকম কিছু করলে আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতাম। জাতিগত অধিকারের চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করা একটা ক্রুদ্ধ মৌতমৌতানি।

নীরবতা।

শ্বেতাঙ্গগুলো সত্যিই খুব হীন প্রকৃতির। অভিযোগপূর্ণ উক্তি।

সেজন্যই কালোরা দলে দলে দক্ষিণ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তথ্য প্রদান।

কিন্তু ওদের চলে যাওয়াটা সাদারা একটুও পছন্দ করছে না। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত মূল্য সম্পর্কে অহঙ্কারের ইঙ্গিত।

হ্যাঁ, তারা ওদের এখানে আটকে রেখে খাটাতে খাটাতে মেরে ফেলতে চায়।

কোনো শ্বেতাঙ্গ হারামজাদা আমাকে ধাঁটালে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কপাল ফুটো করে দেবো। অতি সরল বিদ্রোহ। হা-হা-হা। তাতে তোর কোনো লাভ হবে না, বুদ্ধু। ওরা তোকে ঠিক পাকড়াও করবে। শ্বেতাঙ্গ জঙ্গীদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা। অতি-সরল বিদ্রোহের প্রত্যাখ্যান।

হ্যাঁ। শ্বেতাঙ্গগুলো দিন-রাত তাদের সাদা পাছার উপর বসে থাকে, নিগারদের দিয়ে তাদের সব কাজ করিয়ে নেয়, আর এই পৃথিবীতে যত ভালকুত্তার জন্ম হয়েছে তাদের সবাইকে ওদের পেছনে লাগিয়ে রাখে। তাদের হারাবার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তার উপলব্ধিতে তিক্ত অহঙ্কার।

এই, ওই সাদাগুলোর মধ্যে কোনোদিন পরিবর্তন আসবে বলে তোর মনে হয়? ভীরু সপ্রশ্ন আশা।

নাঃ। ওরা জন্মই নেয় ওইভাবে। ওই আশা যে কোনোদিন সত্য হবে না সে-আশঙ্কায় তার প্রত্যাখ্যান।

আমি বড় হলেই উত্তরে চলে যাবো। নিরর্থক আশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পলায়নকে আঁকড়ে ধরা।

উত্তরে কালোরা ভালই থাকে। পলায়নকে বৈধতা দান।

শুনেছি যে সেখানে কোনো শ্বেতাঙ্গ কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে আঘাত করলে কৃষ্ণাঙ্গ পাল্টা আঘাত করে শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দেয়, আর এ নিয়ে কেউ কোনো হৈ চৈ করে না। পলায়নে বিশ্বাস করার জরুরি ইচ্ছা।

সেখানে সব মানুষ সমান। ন্যায় বিচারে আস্থা রাখার কাতর মিনতি।

নীরবতা।

শোন, উত্তরের দালানগুলি ওরা যত উঁচু বলে সত্যিই কি অত উঁচু? অনুষঙ্গের মাধ্যমে কোনো একটা কঠিন মূর্ত জিনিস ধরে আস্থাটাকে বাস্তব করে তোলার প্রয়াস।

শুনেছি নিউইয়র্কে নাকি চল্লিশ তলা উঁচু বাড়ি আছে। এটা তো অবিশ্বাস্য মনে

হয়। ওরকম বাড়ি দেখে আমি ভয় পাবো রে! পলায়নের চাপা দেয়া ইচ্ছা এখন পরিত্যাগে প্রস্তুত।

শুনেছি যে ওই দালানগুলি বাতাসের ধাক্কায় দোলে। অবিশ্বাস্য।

না, নিগার! প্রচণ্ড বিস্ময় এবং প্রত্যাখ্যান।

হ্যাঁ, রে। ওরা বলে যে সত্যিই বাতাসে দোলে। অলৌকিক ঘটনার সত্যতার উপর জোর দেয়।

তোর কি মনে হয়? সত্যিই দোলে? সন্দিগ্ধ আশা।

না, না! কোনো দালান যদি সত্যি সত্যি বাতাসের ঝাপ্টায় দুলতো তাহলে সেটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তো। যে কোনো গাধা তা জানে। বোকা ব্যানীর জন্য লোকে এসব কথা বলে। এসব কথায় কান দিস না। উত্তেজিতভাবে দেহের নড়াচড়া, অধৈর্য ভাবে মাটিতে পা ঠোকা, নিরাপদ বাস্তবতায় দ্রুত প্রত্যাবর্তন।

নীরবতা। কেউ একটা পাথর হাতে তুলে নিয়ে মাঠে ছুড়ে দেয়।

শ্বেতাঙ্গরা কেন এতো হীন প্রকৃতির হয় বলতে পারিস? পুরানো সমস্যার মোকাবেলায় প্রত্যাবর্তন। কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষ চোখে পড়লেই আমি থুতু ফেলি। শ্বেতাঙ্গদের আবেগগত প্রত্যাখ্যান।

কী কুৎসিত ওরা, তাই না! বর্ধিত আবেগগত প্রত্যাখ্যান।

তুই কখনো কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষের খুব কাছে গেছিস? তার গায়ের গন্ধ শুঁকবার মতো কাছে? একটা উক্তির পূর্বাভাস। ওরা বলে আমাদের গা নাকি দুর্গন্ধ ছড়ায় কিন্তু আমার মা বলেন যে শ্বেতাঙ্গদের শরীর থেকে মরা মানুষের গন্ধ বের হয়। শত্রুর মৃত্যু কামনা।

নিগারদের গা থেকে গন্ধ বের হয় ঘামের জন্য, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের গা থেকে সব সময়ই গন্ধ বের হয়। শত্রু হচ্ছে একটা পশু, তাকে দেখা মাত্র হত্যা করা দরকার।

এইভাবে কথাবার্তা এঁকেবেঁকে অগ্রসর হয়, গড়িয়ে চলে, ঢেউ-এর মতো ধাবিত হয়, অকস্মাৎ সবেগে উৎসারিত হয়, এক পাশে সরে যায়, ফুলে ওঠে, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা গতিপথ হীন, জীবনের বিশাল এলাকাকে স্পর্শ করে, শৈশবের পরীক্ষামূলক প্রণোদনাগুলিকে ভাষা দেয়। অর্থ, ঈশ্বর, জাতি, যৌনতা, বর্ণ, যুদ্ধ, বিমান, যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ি, সাঁতার, বক্সিং, সব কিছু। একটা কৃষ্ণাঙ্গের বাড়ির সংস্কৃতি পৌঁছে যায় আরেকটা কৃষ্ণাঙ্গের বাড়িতে, আর লোক ঐতিহ্য সঞ্চারিত এক দল থেকে আরেক দলে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, সূক্ষ্মতা অর্জন করে, স্থিতিশীল অথবা সংশোধিত হয়। আমাদের ধ্যানধারণা আবিষ্কৃত হয়, পরিত্যক্ত হয়, সম্প্রসারিত হয়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় এবং গৃহীত হয়। রাত্রি নেমে আসে। বাতাসের মধ্য দিয়ে হুশ করে বাদুড় উড়ে যায়। ঘাসের ভেতর থেকে ঝি ঝি পোকা ডেকে ওঠে। ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। আকাশে তারা জ্বলে। দূরে আমাদের বাড়িঘরে কেরোসিনের বাতি জ্বালানো হয়, উজ্জ্বল হলুদ আলোর

বর্ণক্ষেত্রগুলি চোখে পড়ে। অবশেষে, মাঠের ওপাশ কিংবা সড়কের অন্য প্রান্ত থেকে একটা প্রলম্বিত ধীর লয়ের চিৎকার ভেসে আসে ঃ

ওরে এএএএ, ডেএএএ ভিইইই!

ছেলেদের মধ্যে সহজ হাসির রোল ওঠে, কিন্তু কোনো উত্তর না।

শুয়োরকে ঘরে ডাকছে।

বাড়ির যা, শুয়োর!

আবার হাসি। একটা ছেলে আস্তে আস্তে নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়।

ওরেএএএএ, ডেএএএ ভিইইই!

ও মায়ের ডাকে সাড়া দেবে না, কারণ সেটা হবে তাঁর পরনির্ভরতার স্বীকৃতি। ছেলেটি বলে, ওই চাষী আলুর ক্ষেত্রে যা করেছিল তোমাদের সবার ক্ষেত্রে আমি তাই করবো।

সেটা কি জিনিস?

এখন মাটিতে পুঁতবো, পরে খুঁড়ে তুলবো।

ছেলেটি ছোট ছোট পা ফেলে ধীর গতিতে বাড়ির পথ ধরে, আবার অনায়াস হাসির রোল ওঠে। আরো কথা হয়। একে একে ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা গৃহে ফিরি, কেউ পেছনের আঙ্গিনার কল থেকে জল আনবো, কেউ দোকানে যাবো বাঁধাকপি আর আগামীকালের খাবার কিনেতে, কেউ জ্বালানির জন্য কাঠ চিরতে।

রোববার, আমাদের জামাকাপড় ঠিক থাকলে, মা আমাকে আর আমার ভাইকে রবিবাসরীয় স্কুলে নিয়ে যান। আমরা আপত্তি করি না, কারণ গির্জায় আমরা ঈশ্বর অথবা তাঁর বিধিবিধানের কথা শিখতাম না, কিন্তু সেখানে আমাদের দেখা হতো আমাদের স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আর তখন আমরা আবার চালিয়ে যেতাম আমাদের দীর্ঘ এলোমেলো আলাপচারিতা। বাইবেলের কিছু কাহিনী ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু আমরা সর্বদা সেগুলি বিকৃত করতাম, আমাদের রাস্তার জীবনের স্তরে এনে সেগুলিকে ইহজাগতিক করে তুলতাম, আমাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না এমন সব অর্থ বাতিল করে দিতাম। সুন্দর সুন্দর ঈশ্বর-বন্দনার স্তোত্রগীতিগুলির ক্ষেত্রেও আমরা একই জিনিস করতাম। যাজক সুর করে বললেন ঃ

'আশ্চর্য ঐশ্বরিক করুণা, কী মধুর তার ধ্বনি'

আর, আমরা একে অন্যের দিকে চোখ টিপে নিচু গলায় গুণগুণ করি ঃ

'একটা ডালকুত্তা ছুটে এসে আমার নানীকে গুইয়ে ফেললো মাটিতে।'

এখন আমরা বেশ বড় হয়েছি। শ্বেতাঙ্গ ছেলেরা এখন আমাদের ভয় পায়, আমাদের দু'ভাইকেই। শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ বালকরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী বর্ণবাদী ভূমিকা পালন করতে থাকি, যেন আমরা তার মধ্যেই জন্মেছি, যেন তা আমাদের রক্তের মধ্যেই ছিল, যেন আমরা পরিচালিত হচ্ছিলাম স্বত্তা দ্বারা। একে অন্যের সম্পর্কে আমরা যেসব ভয়াবহ

বর্ণনা শুনেছিলাম, ঘৃণা এবং বৈরিতার যে সহিংস অভিব্যক্তিগুলি আমাদের পরিপার্শ্ব থেকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এখন তা উপরন্তরে উঠে এসে আমাদের কর্মাবলী পরিচালিত করতে থাকে। গোলবাড়িটা ছিল এ এলাকার সীমারেখা। আর আমরা মৌন স্বীকৃতি দিই যে শ্বেতাঙ্গ বালকরা থাকবে গোলবাড়ির ওই দিকটায় আর আমরা কৃষ্ণাঙ্গ বালকরা থাকবো এদিকে, আমাদের নিজেদের দিকে। যখনই আমরা আমাদের দিকে কোনো শ্বেতাঙ্গ বালককে পেতাম তখনই তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তাম, আর আমরা যদি ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে গিয়ে তাদের এলাকায় গিয়ে পড়তাম তখন তারা আমাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তো।

আমাদের লড়াইগুলি ছিল বাস্তব এবং রক্তাক্ত। আমরা পাথর, পোড়া কয়লা, কয়লা, লাঠি, লোহার টুকরা আর ভাঙ্গা বোতল ছুঁড়ে মারতাম, আর ওই সব ছুঁড়ে মারার সময় আমরা আরো মারাত্মক অস্ত্রের জন্য মনে মনে হাপিত্যেস করতাম। আঘাত পেলে আমরা শান্তভাবে তা গ্রহণ করতাম, কোনো রকম প্যান প্যান বা কান্নাকাটি করতাম না। আমাদের আঘাত গুরুতর হলে আমরা তা আমাদের মা-বাবার কাছে থেকে লুকিয়ে রাখতাম। মারামারি করার জন্য আমরা মার খেতে চাইতাম না। একবার শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের একটা দলের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় একটা ভাঙ্গা বোতলের কোণা এসে আমার কানের পেছনে লাগে। জায়গাটা গভীরভাবে কেটে যায় এবং সেখান থেকে প্রচুর রক্ত পড়ে। আমি কাটা জায়গাটায় একটা ন্যাকড়া গুঁজে দিয়ে রক্তের প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করি। আমার ডাক্তারি চিকিৎসার দরকার হয়। মা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলেই আমি তাঁকে আমার আঘাতের কথা জানাই। তিনি তাড়াতাড়ি করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার আমার মাথার কাছের ত্বক সেলাই করে দেন। মা আমাকে বাড়িতে আনার পর পিটুনি লাগান, শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের সঙ্গে আর কখনো মারামারি করতে নিষেধ করেন, বলেন যে ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারতো, বলেন যে তাঁকে কাজ করতে হয় এবং আমার মারামারি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মতো সময় তাঁর নেই। তাঁর কথা আমার মনের মধ্যে ভাল করে ঢোকে নি, কারণ তা ছিল রাস্তার নীতিমালার বিরোধী। মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি আর মারামারি করবো না, কিন্তু আমি জানতাম যে আমি আমার কথা রাখবো না, কারণ তাহলে দলের মধ্যে আমার মান থাকবে না, আর দলের জীবনই ছিল আমার জীবন।

আমার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব হয় না। আমি পাড়ায় টুকিটাকি কাজ করতে শুরু করি। আমার প্রথম কাজ ছিল গোলবাড়িতে কর্মরত মানুষদের জন্য দুপুরের খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি এজন্য সপ্তাহে পঁচিশ সেন্ট পেতাম। লোকরা তাদের খাওয়া শেষ করার পর যদি কিছু পড়ে থাকতো আমি তা তুলে নিতাম। পরে ছোট একটা ক্যাফেতে আমি কাজ পাই। ক্যাফের বড় স্টোভটা চালু রাখার জন্য আমি দু'হাতে করে কাঠ নিয়ে আসতাম, আধ ঘন্টার জন্য ট্রেন থামলে ট্রেনে খাবার

সাজিয়ে যাত্রীদের জন্য স্টেশনে নিয়ে যেতাম। এ কাজের জন্য আমি সপ্তাহে এক ডলার করে পেতাম। কিন্তু ওই দায়িত্ব পালনের জন্য আমি ছিলাম বয়সে বড় শেশ ছোট। একদিন একটা খাবার বোঝাই ভারি ট্রে নিয়ে রেলগাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় আমি পড়ে যাই, ট্রে-ভর্তি খাবার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

ভাড়া দিতে না পারায় আমরা অন্যত্র উঠে যেতে বাধ্য হই। এ বাড়িটি ছিল বড় বড় কাঠের গুড়ির ওপর উঁচুতে বসানো শহরের এমন একটা অঞ্চলে যেখানে সর্বদা বন্যার জল ঢুকে পড়তো। আমার ভাই আর আমি মহানন্দে উঁচু নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতাম।

আবারো ভাড়া দেয়ার সমস্যা দেখা দিলো। এবার আমরা শহরের কেন্দ্রের কাছাকাছি উঠে গেলাম। আমি একটা কাপড় ইস্ত্রি করার দোকানে কাজ পেলাম। আমার কাজ ছিল হোটেলে কাপড় পৌঁছে দেয়া, মেঝে ঝাড় দেয়া, আর নিগ্রো পুরুষদের গৌন জীবনের বাহাদুরির গল্প কান পেতে শোনা।

তারপর আবারও আমাদের অন্য জায়গায় উঠে যেতে হলো। এবার আমাদের আস্তানা হলো শহরের প্রান্তদেশে, রেল লাইনের পাশে প্রশস্ত এক জায়গায়। প্রতিদিন সকালে স্কুলে যাবার আগে আমি আর আমার ভাই একটা বস্তা নিয়ে রেল লাইনের কাছে চলে যেতাম, আমাদের কাঠের বাড়িকে গরম রাখার জন্য বিশাল কালো ফোসফোস করা ইঞ্জিনের সামনে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়লা কুড়াতাম।

আমার মায়ের স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপ হতে থাকে। মা এখন প্রায় সারাক্ষণ নানীর বাড়ির কথা বলেন, মৃত্যুর আগে তিনি দেখে যেতে চান যে আমরা বড় হয়েছি। সারাক্ষণ মায়ের মুখে ওই কথা। এরই মধ্যে তাঁর কথার মধ্যে একটা জড়তা এসে গেছে। আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যতের ছায়া দেখা গিয়েছিল এর ভেতর। আমার মা সম্পর্কে আমি আগে কখনো এতো সচেতন হই নি। তিনি একেবারে না থাকলে যে কী হবে আমি ইতিমধ্যে তা অনুভব করতে পারছিলাম। একটা আতঙ্ক ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে আমাকে আচ্ছন্ন করে। আমি দীর্ঘক্ষণ আমার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম কিন্তু আমার উপর তাঁর চোখ পড়তেই আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নিতাম। তারপর তিনি ঘন ঘন অসুস্থ হতে শুরু করলে সত্যিকার ভয় আমাকে গ্রাস করলো। সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার ভাই আর আমি অপেক্ষা করি, ক্ষুধার্ত এবং ভীত।

এক সকালে একটা চিৎকার শুনে আমি জেগে উঠি।

রিচার্ড! রিচার্ড!

আমি শয্যা ত্যাগ করি। আমার ভাই ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে। সে বললো, রিচার্ড এসো, মাকে দেখে যাও। মা ভীষণ অসুস্থ।

আমি ছুটে মায়ের ঘরে যাই, দেখি যে তিনি তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন, পোশাক পরা, চোখ খোলা, মুখ হা করে। একদম স্থির নিশ্চল।

মা! আমি ডাক দিই।

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, তাঁর মাথাও ঘোরালেন না। আমি তাঁকে নাড়া দেবার জন্য এগিয়ে গিয়েও পিছিয়ে আসি, ভয় হয় তিনি হয়তো মরে গেছেন।

আমি আবার ডাকি, মা! তিনি যে কথা বলতে পারছেন না তা আমার মাথায় ঢোকে না।

অবশেষে আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর শরীর ধরে নাড়া দিই। অল্প একটু নড়লেন তিনি। মুখ দিয়ে সামান্য গোঙানির শব্দ হলো। আমার ভাই আর আমি বারবার ডাকতে থাকি কিন্তু মা কোনো উত্তর দেন না। তিনি কি মারা যাচ্ছেন? এ তো চিন্তার বাইরে। আমার ভাই আর আমি একে অন্যের দিকে তাকাই, কি করবো বুঝতে পারি না। আমি বললাম, একজন কাউকে বরং ডেকে আনি।

আমি ছুটে হলপথে গিয়ে একজন প্রতিবেশীকে ডাকি।

একজন দীর্ঘদেহী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা তাড়াতাড়ি করে একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

আমি বললাম, প্লীজ, একটু এসে আমার মাকে দেখবেন। আমরা তাঁকে জাগাতে পারছি না। ভীষণ অসুস্থ উনি।

তিনি আমার পেছন পেছন আমাদের ফ্ল্যাটে আসেন।

মিসেস রাইট! মাকে ডাকলেন তিনি। মা নিশ্চল নির্বাক হয়ে শুয়ে থাকেন, কোনো কিছু যেন তিনি দেখছেন না। মহিলা নিজের হাতে মায়ের হাত তুলে নিয়ে বললেন, বেঁচে আছেন, কিন্তু ভীষণ অসুস্থ যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখি আর দু'চারজন প্রতিবেশীকে পাই কিনা।

পাঁচ-ছয়জন মহিলা এসে পড়েন। আমি আর আমার ভাই হলপথে অপেক্ষা করি।

ওরা মায়ের জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়। অনুমতি পেয়ে আমরা আবার ঘরে ঢুকি। একজন মহিলা বললেন, আমার মনে হয় স্ট্রোক হয়েছে।

আরেকজন বললেন, ঠিক পক্ষাঘাতের মতো।

অন্য একজন বললেন, আর এতো অল্প বয়স ওর!

আমার ভাই আর আমি দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আর মহিলারা চরম উদ্বেগ ও উত্তেজনা নিয়ে আমার মায়ের শুশ্রূষা করতে থাকেন। স্ট্রোক? পক্ষাঘাত? ওগুলি কি জিনিস? এক মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কোনো টাকা-পয়সা আছে কিনা। আমি কিছুই জানতাম না। ওরা দেরাজ হাতড়ে ডলার দুয়েক পান, তারপর একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। ডাক্তার আসেন। তিনি আমাদের জানালেন, হ্যাঁ, মা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর অবস্থা গুরুতর। দিন-রাত দেখাশোনা করার জন্য

একজন লোক দরকার হবে। ওষুধ দরকার হবে। তাঁর স্বামী কোথায়? আমি ডাক্তারকে আমাদের পরিস্থিতি জানাই। তিনি দু'পাশে তাঁর মাথা নাড়লেন।

ডাক্তার বললেন, ওর সম্ভাব্য সব রকম সেবাযত্ন প্রয়োজন। শরীরের পুরো বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাঁর কথা বলার ক্ষমতা নাই। তাঁকে বাইরে নিতে হবে।

সেদিন পরে এক সময় দেরাজের জিনিসপত্র তছনছ করে খুঁজে আমি নানীর ঠিকানা পাই। আমি ওঁকে অনুনয় করে চিঠি লিখি তিনি যেন এসে আমাদের সাহায্য করেন। প্রতিবেশীরা রাতদিন আমার মায়ের সেবা করেন, আমাদের খাওয়ান, আমাদের জামাকাপড় ধুয়ে দেন। আমাদের দিন কাটে একটা বিমূঢ় চেতনার মধ্য দিয়ে। যা ঘটেছে তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। নানী যদি না আসেন? আমি সেকথা না ভাবার চেষ্টা করি। ওঁকে আসতেই হবে। চরম একাকীত্ব এখন ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। আবেগগত দিক থেকে এখন আমাকে হঠাৎ সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। যে অর্ধ-বন্ধুভাবাপন্ন জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল তা আধ ঘন্টার মধ্যে শত্রুতে এবং শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গেছে। ভয়ে আমি কাঁদতে পর্যন্ত পারি না। মা যে মারা যান নি তাতে আমি খুশি হই, কিন্তু তিনি এখন দীর্ঘকাল অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবেন, হয়তো তার বাকি পুরো জীবনই। একটা গাঢ় বিষণ্ণতা আমাকে আচ্ছন্ন করে। বাচ্চা হলেও আর বাচ্চার মতো অনুভব করতে পারি না। আমার প্রতিক্রিয়া আর শিশুর মতো হয় না। খেলাধুলার ইচ্ছা উবে যায়, আমি কেবলই চিন্তা করতে থাকি, নানী কি এসে আমাদের সাহায্য করবেন? আমি আগামীকালের কথা চিন্তা না করতে চেষ্টা, আগামীকাল ছিল অবান্তর, অনাকাঙ্ক্ষিত। সব আগামীকাল ধারণ করেছিল এমন সব প্রশ্ন আমি যার উত্তর দিতে অপারগ।

প্রতিবেশীরা আমাকে খাবার দিলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। আমার জীবনে ইতিমধ্যে অচেনা মানুষরা আমাকে এতোবার খাইয়েছে যে আমি লজ্জায় মরে যাই। যখন কেউ আমাকে অনেক বলে কয়ে খাওয়ায় তখন আমি যথাসম্ভব কম খাই। আমার মনে হয় এতে করে হয়তো দয়া গ্রহণের লজ্জা কিছুটা হ্রাস পায়। অন্য ছেলেরা হয়তো ভাবছে যে আমি ক্ষুধার্ত, এই চিন্তা আমাকে বেদনার্ত করে। ওরা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার কোনো খাবার চাই কিনা, তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা সত্ত্বেও আমি বলি যে, না, চাই না। নানীর জন্য অপেক্ষা করে থাকার দিনগুলিতে আমি টানটান হয়ে থাকি, আর তিনি এসে পৌঁছবার পর আমি সব কিছু তাঁর হাতে ছেড়ে দিই, যন্ত্রের মতো তাঁর যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই, তাঁর নির্দেশগুলি পালন করি। কোনো এক ভাবে আমি বুঝতে পারি যে আমাকে একাই আমার সব সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। আমি নিজেকে পুরোপুরি নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিই।

নানী মুখে মুখে বলেন আর আমি তাঁর আট ছেলেমেয়ের কাছে চিঠি লিখি। আমার মাকে নিয়ে ওরা ছিলেন নয় জন। ওরা ছিলেন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাঁদের

কাছে চিঠি লেখা হলো টাকা চেয়ে, এলা আর তার দুই ছেলেকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। টাকা আসে। আবার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার পালা। মাকে এ্যাম্বুলেন্সে করে ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা স্ট্রেচারে করে তাঁকে গাড়িতে তুলে দেয়া হলো। নীরবে আমরা জ্যাকসনে পৌঁছলাম। মাকে শুইয়ে দেয়া হলো দোতলার একটা ঘরে। ডেট্রয়েট থেকে ম্যাগি খালা এলেন, মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করবেন, তাঁকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। বড় বাড়িটা নিশ্চুপ হয়ে থাকে। আমরা চাপা গলায় কথা বলি, হাল্কা পায়ে হাঁটি। বাতাস জুড়ে ওষুধের গন্ধ ভাসে। ডাক্তাররা আসেন, যান। রাত-দিন আমি মায়ের গোঙানি শুনি। আমাদের মনে হয়, যে কোনো মুহূর্তে তিনি মারা যাবেন।

ক্লিও খালা শিকাগো থেকে আসেন। ক্লার্ক মামা আসেন মিসিসিপির রিনউড থেকে, এডওয়ার্ড মামা মিসিসিপির কার্টার্স থেকে। চার্লস মামা আসেন অলাবামার মোবাইল থেকে, আডি খালা আসেন আলাবামার হান্টসভিলের এক ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গণ থেকে। টমাস মামা আসেন মিসিসিপির হেজেলহার্স্ট থেকে। বাড়ির সর্বত্র একটা প্রত্যাশার আবহাওয়া। ফিসফিস কথাবার্তা আমার কানে আসে– ওর ছেলেদের কি হবে? আমার মধ্যে ভয় জেগে ওঠে। আত্মীয় হলেও অচেনা মানুষজন আমার ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করছে। আমি এর আগে আমার মায়ের ভাইবোনদের দেখি নি। ওদের উপস্থিতি আমার মধ্যে আমার পুরানো লাজুক স্বভাবকে আবার জাগিয়ে তোলে। একদিন এডওয়ার্ড মামা আমাকে তাঁর কাছে ডেকে আমার হাত-পা টিপে দেখে বললেন, এর গায়ে আরো মাংস লাগা দরকার। তিনি তাঁর ভাইবোনদের লক্ষ্য করে মন্তব্যটা করলেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে।

আমি ভয়ানক বিব্রত বোধ করি। আমার মনে হলো আমার সারা জীবন যেন নামহীন অন্যায় এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে পরিপূর্ণ।

নানী বললেন, খেতে পারলেই ওর ওজন বাড়বে।

পারিবারিক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হলো যে আমি আর আমার ভাই দু'জায়গায় যাবো, কোনো এক মামা বা খালার পক্ষে একসঙ্গে আমাদের দুজনের ভার নেয়া সম্ভব হবে না। কোথায় যাবো আমি। কে নেবেন আমাকে? কোনো মামা বা খালা আমার সামনে এলে আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতে পারি না। আমি সব সময় মনে মনে বলি আমি যেন কখনো এমন কিছু না করি যার জন্য ওঁদের কেউ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিতে না চান।

রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে আমি উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখি। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত চিৎকার করে আমি জেগে যাই। বড়রা ছুটে আমার কাছে আসেন, আমি বড় বড় চোখ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওঁদেরকে আমার মনে হয় দুঃস্বপ্নের প্রাণী। তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। একদিন রাতে আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম বাড়ির পেছনের আঙ্গিনায়। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশ দিনের মতো চন্দ্রালোকে ভেসে যাচ্ছে। নীরবতা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে আছে। হঠাৎ কে যেন আমার হাত

ধরলো। আমি তাকিয়ে দেখি আমার এক মামা। তিনি নিচু গলায় কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, বাবা?

আমি স্থির চোখে ওকে লক্ষ্য করি, তিনি কি বলছেন বোঝার চেষ্টা করি। আমার মনে হয় আমি যেন এক ধরনের কুয়াশায় পরিবৃত।

রিচার্ড, কি করছো তুমি?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না।

আমার মনে হলো আমি যেন জেগে উঠতে পারছি না। তিনি আমাকে নাড়া দিলেন। আমি তখন সম্বিত পেয়ে চন্দ্রালোক সিক্ত আঙ্গিনার চারপাশে তাকাই।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

উনি বললেন, তুমি ঘুমের মধ্যে হাঁটছিলে।

নানী আমাকে বেশি করে খেতে দেন। দুপুরের পর আমাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটু ঘুমাতে হয়, আর ক্রমে ক্রমে আমার ঘুমের মধ্যে হাঁটা বন্ধ হয়ে যায়। নানীর বাড়িতে আসার দিন আর রাত কাটে অস্বস্তির মধ্যে। আমি স্থির করি যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো বড় হওয়া মাত্র আমি নানীর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। ওরা যে আমার প্রতি মমতাহীন ছিলেন তা নয়, কিন্তু আমি বুঝতাম যে আমার ভাই ও আমাকে খাওয়াবার মতো যথেষ্ট টাকা ওদের নেই। এখন আমি আর আমার মায়ের ঘরে বিশেষ যাই না। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকাটা ছিল বেদনাদায়ক। ভীষণ তাকিয়ে গেছেন উনি। এখনো বাক্যহীন, দৃষ্টিহীন পাথরের মতো চোখ মেলে শুধু তাকিয়ে থাকেন।

একদিন বিকালে আমার ভাই আর আমাকে সামনের ঘরে ডেকে পাঠানো হলো। সেখানে মামা ও খালাদের আলোচনা সভা চলছিল।

এক মামা বললেন, রিচার্ড, তোমার মা যে খুব অসুস্থ তুমি তা জানো?

হ্যাঁ মামা।

তো, তোমাদের দুজনকে দেখা শোনা করার মতো শক্তি তোমার নানীর নেই।

হ্যাঁ মামা। আমি তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করি।

ম্যাগি তোমার ভাইকে ডেট্রয়েটে নিয়ে যাবেন। উনি ওকে সেখানে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

আমি অপেক্ষা করি। আমাকে কে নিচ্ছেন? আমি ম্যাগি খালার কাছে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওদের সিদ্ধান্তের উপর কথা বলার সাহস আমার হয় না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কোথায় যেতে চাও?

প্রশ্নটা শুনে আমি চমকে যাই। আমি একটা রায়ের প্রতীক্ষা করছিলাম, এমন সময় আমাকে দেয়া হলো একটা বাছাই-এর সুযোগ। কিন্তু ওদের কেউ যে আমাকে নিতে আগ্রহী হবেন তেমন বিশ্বাস করার সাহস আমার হলো না। আমি বললাম, যে কোনো জায়গায়।

তিনি বললেন, আমরা প্রত্যেকেই তোমাকে নিতে রাজি আছি। কে জ্যাকসনের সব চাইতে কাছে গিনি বাস করেন আমি দ্রুত তার একটা হিসাব করে ফেলি। ক্লার্ক মামা থাকেন গ্রিনউডে, সেটা মাত্র অল্প কয়েক মাইল দূরে।

আমি বললাম, আমি ক্লার্ক মামার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি এখানকার এই বাড়ির কাছে বাস করেন।

সত্যি সত্যি তুমি তা চাও?

হ্যাঁ, মামা।

ক্লার্ক মামা আমার কাছে এসে আমার মাথার উপর তাঁর হাত রেখে বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো, সেখানে তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবো। আমরা আগামীকাল তোমার জামাকাপড় কিনবো।

আমার উদ্বেগ উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলো, কিন্তু পুরোপুরি গেল না। আমার ভাই খুব খুশি, সে উত্তরে যাচ্ছে। আমারও সেখানে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি কোনো কথা বলি না।

আবার ট্রেন যাত্রা। আবার আমি দক্ষিণের একটা ছোট শহরে গিয়ে হাজির হই। গ্রিনউডের বাড়িটা ছিল চার ঘরের একটা বাংলো, একটা দ্বৈত-ভবনের অর্ধাংশ, শান্ত ছায়াচ্ছন্ন রাস্তার পাশে অবস্থিত। জোডি মামী ছিলেন মাঝারি আকারের এক ছিমছাম, স্বল্পভাষী, বর্ণসঙ্কর মহিলা। তিনি টেবিলে রাতের জন্য গরম খাবার সাজিয়ে রেখেছেন। তাঁর গম্ভীর, অতি-সংযমী ব্যবহার আমি বিভ্রান্ত বোধ করি। আমার মনে হয় তিনি একটা সুস্পষ্ট বিধি-মালা অনুযায়ী আচরণ করেন যা আমার অজানা। আমি ধরে নিই যে তিনি আমাকে একটা 'বেঠিক' বালক বলে ভাবেন, যে কোনো কারণে গৃহহীন। আমি অনুভব করি যে তিনি আমাকে জীবনের বহিঃপ্রান্তে ঠেলে দেবেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমি আড়ষ্ট ও আত্মসচেতন হয়ে পড়ি। ক্লার্ক মামা ও জোডি মামী দুজনেই আমার সঙ্গে কথা বলতেন এমনভাবে যেন আমি প্রাপ্তবয়স্ক। আমার ভাবনা হতো, আমার কাছে যা প্রত্যাশা করা হচ্ছে আমি কি তা পূরণ করতে পরবো? আমাদের চরম দরিদ্র অবস্থার মধ্যেও আমি আমার মায়ের সান্নিধ্যে একটা উষ্ণতা অনুভব করেছি, এখানে তার ছিটেফোঁটাও অনুভব করি না, হয়তো আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্যই করি না।রাতের খাওয়ার সময় ঠিক হয় যে আমাকে আগামীকাল স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হবে। ক্লার্ক মামা এবং জোডি মামী দুজনই কাজ করেন। আমাকে বলা হয় যে দুপুরে আমি আমার খাবার চৌভের উপর দেখতে পাবো।

মামা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, রিচার্ড, এটা তোমার নতুন বাড়ি।

জ্বী, মামা।

স্কুলের পর তুমি আগুনের চুল্লির জন্য কাঠ আর কয়লা আনবে।

জ্বী, মামা।

কাঠ চিরবে, তারপর রান্নাঘরের চৌভের আগুন ঠিক করে রাখবে।

জ্বী, মামা।

আঙ্গিনা থেকে এক বালতি জল এনে রাখবে যেন পরদিন সকালে তোমার মামী রান্না চড়াতে পারেন।

জ্বী, মামা।

এর আগে আমাকে কেউ কখনো কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের ভার দেয় নি। শুতে যাবার সময় আমার ভয় হয়। আমার ঘুম আসে না। আমি ভাবতে থাকি, আমার এখানে আসা কি ঠিক হয়েছে? এই অন্ধকার রাত, অচেনা মানুষজন, অচেনা ঘর বাড়ি, অচেনা রাস্তাঘাট। আমি এখানে কিভাবে চলবো? কেমন মহিলা জোডি মামী? তাঁর সঙ্গে আমি কি রকম ব্যবহার করবো? ক্লার্ক মামা কি আমাকে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেবেন? সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে আমি দেখি আমার ঘর রোদে ভেসে যাচ্ছে। আমার মন অনেকটা শান্ত হয়।

মামার ডাক শুনি আমি, রিচার্ড! আমি মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় পরে রান্নাঘরে গিয়ে চুপচাপ টেবিলে বসি।

জোডি মামী বললেন, গুড মর্নিং।

আমি বিড়বিড় করে বলি, ওহ্, গুড মর্নিং। আমি মনে মনে বলি, কেন সম্ভাষণটা আমি আগে করতে পারলাম না।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানকার মানুষেরা কি গুড মর্নিং বলে না?

বলে, মামী।

মামী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, আমারও তাই ধারণা।ক্লার্ক মামা আর জোডি মামী আমাকে আমার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। আমি এতো আত্মসচেতন হয়ে পড়ি যে আমার ক্ষুধা উবে যায়। প্রাতঃরাশের পর মামা আমাকে স্কুলে নিয়ে গেলেন, অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্কুলের প্রথমার্ধের সময় কোনো রকম ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল। আমি অপরিচিত পড়ার বই লক্ষ্য করি, পাঠ অনুসরণ করি। বিষয়গুলি আমার কাছে সহজ মনে হলো। কোনো অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হলো না। তবে আমার দুশ্চিন্তা তখনো আমাকে ছেড়ে যায় নি। অন্য ছেলেদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হবে আমার? প্রতিটি নতুন স্কুল ছিল জয় করবার জন্য জীবনের নতুন একটি অঙ্গন। এখানকার ছেলেরা কি খুব কড়া? কতোখানি তীব্র ভাবে এরা মারামারি করে? ওরা যে মারামারি করে তা আমি ধরেই নিয়েছিলাম।

দুপুরে বিরতির সময় আমি স্কুলের মাঠে যাই। এক দল ছেলে অলস পায়ে আমার কাছে এসে আমাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। আমি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আমার ভেতরের অস্বস্তি গোপন

রাখার চেষ্টা করি।

হঠাৎ একটা ছেলে প্রশ্ন করে, কোত্থেকে এসেছো তুমি?

আমি জবাব দিই, জ্যাকসন।

ছেলেটি জানতে চায়, কি ব্যাপার? ওখানকার মানুষগুলো দেখতে এতো বিশ্রী কেন?

একটা হাসির রোল ওঠে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই, তুমিইবা এমন কী আহা-মরি সুন্দর!

ওহ্!

আহ্!

ছেলেটা ওকে কি বললো শুনেছো?

প্রথম ছেলেটি ব্যঙ্গভরে বললো, নিজেকে তুমি খুব চালাক মনে করো, তাই না?

আমি বললাম, দেখো, আমি মারামারি করতে চাই না, কিন্তু তুমি যদি চাও তা হলে ঠিক আছে, মারামারি করবো।

ওহ্, ভারী কঠিন লোক তুমি, তাই না?

তুমি যতখানি কঠিন ততখানি কঠিন তো বটেই।

ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এ কথা তুমি কার কাছে বলতে পারো জানো? আর, তুমি এ কথা কার কাছে বলতে পারো সেটা কি তুমি জানো? আমি উত্তর দিই।

একটু সামনে এগিয়ে এসে ছেলেটি বললো, তুমি কি আমার মায়ের কথা বলছো?

আমি বললাম, তুমি যদি তা মনে করো তবে তাই।

এটা ছিল আমার পরীক্ষা। এখন যদি আমি ফেল করি তাহলে স্কুলে আমি ফেল করবো, কারণ প্রথম পরীক্ষটা বই-এর জগতে হয় না, একজনের সাথীরা তাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করে, সে মারামারি করতে কতোটা ইচ্ছুক তার উপর তা নির্ভর করে।

ছেলেটি আমাকে চালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, তুমি যা বলেছো ফিরিয়ে নাও।

আমি বললাম, আমাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করো তুমি!

ছেলেরা হৈ হৈ করে ওঠে, তারা বুঝতে পারে যে একটা মারামারি আসন্ন। ছেলেটি ইতস্তত করে, আমাকে হারাবার সম্ভাবনা কতটুকু তা হিসেব করে দেখে।

অন্য ছেলেদের মধ্য থেকে একজন ওই ছেলেটিকে বিদ্রুপ করে বললো, কি রে, এই নতুন ছেলের খোঁচাটা হজম করবি নাকি?

ছেলেটা আমার কাছে এগিয়ে আসে। আমি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের দুজনের মুখের মাঝখানে এখন শুধু চার ইঞ্চির ব্যবধান।

ছেলেটা বললো, তুমি ভাবছো আমি তোমার ভয়ে ভীত?

আমি কি ভাবছি তাতো তোমাকে বলেছি।

একজন কেউ, যে আমাদের মারামারিটা দেখার জন্য ব্যগ্র, যার ভয় হয় যে আমরা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত মারামারি করবো না, ছেলেটাকে একটা ধাক্কা দেয় আর সে আমার উপর এসে পড়ে। আমি সজোরে ঠেলে ওকে সরিয়ে দিই।

ছেলেটা বললো, আমাকে ধাক্কা দিও না।আমি বললাম, তাহলে তুমি আমার গায়ের উপর এসে পড়ো না!

ওদের একজন ছেলেটাকে আবার ধাক্কা দেয়। আমি আমার ডান হাত দিয়ে ওর মুখে একটা ঘুসি বসিয়ে দিই। ছেলের দল চিৎকার করে ওঠে, ঠেলাঠেলি করে, জোয়ারের মতো এতো কাছে চলে আসে যে ঘুসি মারার জন্য আমি আমার হাত প্রায় তুলতেই পারি না। আমাদের দুজনের একজন অপর জনকে যখনই আঘাত করার চেষ্টা করি তখনই ছেলেদের চেঁচামেচির ধাক্কায় আমরা আমাদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। কোনো একটা ঘুসি জায়গা মতো পড়তেই ওরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। আমি বুঝতে পারি আজ যদি আমি না জিতি, একটা ভাল রকম লড়াই যদি না করতে পারি, তাহলে প্রত্যেক দিন আমাকে নতুন কোনো ছেলের সঙ্গে লড়তে হবে। তাই আমি বাঘের মতো লড়ি, ওর গায়ে একটা আঁচড় ফেলার জন্য হন্যে হয়ে উঠি, আমি যে কাপুরুষ নই, আত্মরক্ষা করতে সক্ষম, তা প্রমাণ করার জন্য আমি ওর শরীর থেকে রক্ত বরাতে চাই। এমন সময় ঘন্টা বাজে, ছেলের দল আমাদের দুজনকে টেনে আলাদা করে দেয়। লড়াইটা মনে হলো ড্র হয়েছে। ছেলেটা আমাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বললো, তোমার সঙ্গে আরো হবে, এটাই শেষ নয়।

ক্লাস রুমে ছেলেরা আমাকে নানা প্রশ্ন করে। আমি পরিচিত হওয়ার মতো একজন মানুষ। স্কুল ছুটির ঘন্টা পড়লে আমি আবার মারামারির জন্য তৈরি হই, কিন্তু ছেলেটাকে কোথাও দেখা গেল না।

বাড়ি ফেরার পথে আমি রাস্তায় একটা শক্ত আংটি পরে থাকতে দেখি। আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা দিয়ে কি করবো ঠিক করে ফেলি। চারপাশ থেকে ছোট ছোট কাটার সাহায্যে আংটির মাঝখানে একটা লাল পাথর বসানো ছিল। আমি পাথরটা খুলে নিই, চারপাশের তীক্ষ্ণ খোঁচা খোঁচা কাঁটাগুলি রেখে দিই। আমি আংটিটা আমার আঙুলে ঢুকিয়ে মুষ্টিযুদ্ধের অভিনয় করি। এবার ওই অত্যাচারী ছেলেদের কেউ আসুক, লড়াই কিভাবে করতে হয় আমি দেখিয়ে দেবো। প্রতিটি ঘুসির সঙ্গে আমি তার গায়ে লাল দাগ ফুটিয়ে তুলবো।

কিন্তু ওই আংটি আমাকে কখনো ব্যবহার করতে হয় নি। আমার নতুন অস্ত্র স্কুলে দেখাবার পর ছেলেদের মধ্যে তার বর্ণনা ছড়িয়ে পড়ে। আমি আমার শত্রুকে আরেকটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি কিন্তু সে সাড়া দেয় না। এখন আর মারামারির দরকার নেই। ওরা আমাকে গ্রহণ করেছে।

স্কুলের মাঠে বিজয় অর্জনের পর পরই কিন্তু আরেকটা আতঙ্কের উদ্ভব হয়। একদিন

রাতে, ঘুমাতে যাবার সময়ের একটু আগে, আমি সামনের ঘরে বসে পড়াশোনা করছিলাম। মামা ছিলেন কুক্তিতে কাজ করা ছুতোর মিস্ত্রী। তিনি তাঁর আঁকার টেবিলে বসে বসতবাড়ির জন্য কয়েকটা নকশা তৈরি করছিলেন। জোডি মামী কাপড় রিপু করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দরজার ঘন্টি বেজে উঠলো। মামী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে ঘরে ঢুকলেন আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী, আমরা যে বাড়িতে থাকি তার মালিক এবং প্রাক্তন বাসিন্দা। ভদ্রলোকের নাম বার্ডেন, দীর্ঘদেহী, বাদামি রঙ, ঈষৎ কুঁজো। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর করমর্দন করি।

মিস্টার বার্ডেন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তো, বাবা, এ বাড়িতে আরেকটি ছেলে দেখে আমার সত্যি খুব ভাল লাগছে।

আমি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে আরেকটা ছেলে আছে নাকি?

মিস্টার বার্ডেন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমার ছেলে ছিল, কিন্তু চলে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কতো বয়স তার?

বেদনার্ত কণ্ঠে মিস্টার বার্ডেন বিড়বিড় করে বললেন, এই, তোমার বয়েসী।

আমি বোকার মতো প্রশ্ন করি, কোথায় গেছে ও?

মারা গেছে।

ওহ!

আমি ওঁর কথা বুঝতে পারি নি। একটা দীর্ঘ নীরবতা নেমে আসে। মিস্টার বার্ডেন সতৃষ্ণ চোখে আমাকে লক্ষ্য করেন। আমার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, তুমি ওখানে ঘুমাও?

হ্যাঁ, স্যার।

আমার ছেলেও ওখানে ঘুমাতো।

ওখানে? আমি নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, ঠিক ওইখানে।

ওই খাটে?

হ্যাঁ, ওটা ছিল ওর খাট।

আমি যখন শুনলাম যে তুমি এখানে আসছো তখন আমি তোমার মামাকে ওই খাটটা দিয়ে দিই।

আমি দেখলাম যে ক্লার্ক মামা মিস্টার বার্ডেনকে লক্ষ্য করে জোরে জোরে তাঁর মাথা নাড়ছেন কিন্তু ততক্ষণে বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আমার কল্পনায় ভূত-প্রেতের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। আমি সত্যি সত্যি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমাকে শেখানো হয়েছিল যে ঈশ্বর বলে একজন আছেন এবং এক ধরনের অস্বস্তির সঙ্গে আমি তাঁর অস্তিত্ব মেনে নিই, আর ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে প্রেতাত্মারাও অবশ্য আছে। মুহূর্তের মধ্যে ওই ছেলেটি যেখানে মৃত্যু বরণ করেছে সেখানে শোবার

ব্যাপারে আমার ভেতরে একটা তীব্র বিরূপতা জেগে ওঠে। যুক্তি দিয়ে আমি বুঝি যে মৃত ছেলেটি আমাকে কোনো রকম ক্ষতিবিরক্ত করতে পারবে না কিন্তু আমার কাছে সে এতো জীবন্ত হয়ে ওঠে যে আমি তাকে মুছে ফেলতে পারি না। মিস্টার বার্ডেন চলে যাবার পর আমি ভয়ে ভয়ে ক্লার্ক মামার কাছে গিয়ে বলি, আমার ওখানে ঘুমাতে ভয় করছে।

কেন? একটা ছেলে ওখানে মারা গেছে সেজন্য?

হ্যাঁ, মামা।

কিন্তু বাবা, এর মধ্যে তো ভয়ের কিছু নেই!

আমি জানি, কিন্তু তবু আমার ভয় করছে।

আমাদের সবাইকে একদিন মরতে হবে, তাই ভয় করে কি হবে?

এর কোনো উত্তর আমার কাছে ছিল না।

তুমি যখন মারা যাবে তখন তুমি কি চাইবে যে মানুষ তোমাকে ভয় করুক?

এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব আমি দিতে পারি না। আমি শুধু বললাম, কিন্তু আমার যে ভয় করছে।

ওটা কেটে যাবে।

আমি কি অন্য কোথাও ঘুমাতে পারি না?

তোমার ঘুমাবার মতো অন্য কোনো জায়গা তো এখানে নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করি, ক্যান আই স্লীপ অন দি সোফা?

জোডি মামী ব্যঙ্গের সুরে আমাকে শুধরে দেন, মে আই স্লীপ অন দি সোফা?

আমি তাঁকে অনুসরণ করে বলি, মে আই স্লীপ অন দি সোফা?

মামী বললেন, না।

আমি অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকার ঘরটিতে ঢুকি, আনাড়ির মতো বিছানাটা হাতড়ে বেড়াই। আমার মনে একটা বিভ্রম জাগে যে বিছানাটা স্পর্শ করলেই আমি সেখানে মৃত ছেলেটির সাক্ষাৎ পাবো। আমি কাঁপতে থাকি। অবশেষে আমি হুড়মুড় করে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে আমার মুখের উপর চাদর টেনে দিই। সারারাত আমি ঘুমাই না। পরদিন সকালে দেখা গেল আমার দুচোখ লাল আর ফোলা ফোলা।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে তোমার ঘুম ভাল হয় নি?

আমি বললাম, ও ঘরে আমি ঘুমাতে পারবো না।

জোডি মামী বললেন, ওই ছেলেটি ওখানে মারা গেছে সেকথা শোনার আগে তো ওখানে দিব্যি ঘুমাতে।

জ্বী, মামী।

তাহলে এখন পারবে না কেন?

আমার ভয় করে।

বাচ্চা খোকার মতো করো না।

পরের রাতেও একই ব্যাপার ঘটে। ভয়ে আমার ঘুম আসে না। মামা-মামী শুতে যাবার পর আমি উঠে পা টিপে টিপে সামনের ঘরে যাই তারপর নিজেকে একটা গোল্লা পাকিয়ে কোনো কিছু গায়ে না দিয়েই সোফায় শুয়ে থাকি। পরদিন সকালে ক্লার্ক মামার ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এরকম করছো তুমি?

আমি জানালাম, ওখানে ঘুমাতে আমার ভয় করে।

তিনি বললেন, তুমি ও ঘরে ফিরে যাও। আজ রাতে তুমি ওখানে ঘুমাবে। এ ভয়টা তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

আমি আরেকটা নিদ্রাহীন রাত কাটাই। মৃত বালকটির ঘরে আমি সারারাত হি হি করে কাঁপি। ওই ঘর এখন আর আমার ঘর নয়। ভয়ে আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। বাড়ির কোথাও ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলেই আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন স্কুলে আমি নির্জীবের মতো বসে থাকি। বাড়ি ফিরে এসে আমি আরেকটা দীর্ঘ রাত জেগে কাটাই আর পরের দিন ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়ি। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। ভয় থেকে মুক্ত হতে না পেরে আমি বাড়ির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে শুরু করি। এক সপ্তাহের অনিদ্রা আমাকে স্নায়বিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

রবিবার এলে আমি গির্জায় যেতে অস্বীকার করি। ক্লার্ক মামা ও জোডি মামী অবাক হয়ে যান। গির্জায় যেতে অস্বীকৃতির মাধ্যমে আমি যে অন্য কোথাও ঘুমাবার অনুমতি দানের জন্য তাদের কাছে নীরব মিনতি জানাচ্ছি এটা তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁরা আমাকে বাড়িতে একা রেখে চলে যান আর আমি সারাদিন বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে থাকি। রান্নাঘরে গিয়ে খাবার সাহস আমার হয় না। তেষ্টা পেলে বাড়ির ভেতরে না গিয়ে আমি বাড়ি ঘরে পেছনের আঙ্গিনায় যাই, সেখানে কল থেকে জল পান করি। রাতে শোবার সময় আমি মরীয়া হয়ে আবার ঘরের প্রশ্ন উত্থাপন করি।

আমি অনুনয় করি, প্লীজ, আমাকে সামনের ঘরের সোফায় শুতে দিন।

মামা বললেন, শোনো, তোমাকে ওই ভয়টা কাটিয়ে উঠতেই হবে।

আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার কথা বলতে আমি মন স্থির করি। আমি জানতাম যে আমাকে এখানে আনতে মামার 'টাকা-পয়সা' খরচ হয়েছে, আমি জানতাম যে তিনি মনে কনে যে তিনি আমাকে সাহায্য করছেন, আমি জানতাম যে তিনি আমাকে জামাকাপড় ও বইপত্র কিনে দিয়েছেন, তবু আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলি, মামা, আমাকে জ্যাকসনে ফেরত পাঠিয়ে দিন। তিনি একটা ছোট টেবিলের উপর ঝুঁকে কি একটা কাজ করছিলেন, এবার সোজা হয়ে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে সুখী নও?

আমি সত্যি জবাব দিলাম, না, মামা।

আমার ভয় হয় এবার বোধ হয় হুড়মুড় করে আমার মাথার উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়বে।

তুমি সত্যিই বাড়ি ফিরে যেতে যাও?

হ্যাঁ, মামা।

এখানে যত আরামে আছো বাড়িতে কিন্তু ততো আরাম পাবে না। খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিসের জন্য বিশেষ টাকা পয়সা ওদের নেই। আমি আমার অনুরোধকে জোরালো করার প্রয়াসে বলি, আমার মা যেখানে আমি সেখানে থাকতে চাই।

আসলে এটা ওই ঘরের ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ, মামা।

মামা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমরা তোমাকে এখানে সুখী রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, হয়তো তার উপায় আমরা জানতাম না। কিন্তু তুমি যদি ফিরে যেতে চাও তাহলে যেতে পারো।

আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কখন?

তোমার স্কুলের টার্ম শেষ হলেই তুমি যেতে পারবে।

কিন্তু আমি এখনই যেতে চাই!

তাহলে তোমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে একটা ছেদ পড়বে।

আমি বললাম, আমি তাতে কিছু মনে করবো না।

মামা বললেন, করবে। ভবিষ্যতে। তুমি কখনো একটানা কোনো স্কুলে এক বছর পড়ো নি।

আমি আবারো বললাম, আমি বাড়ি যেতে চাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি অনেকদিন ধরে এ চিন্তা তোমার মনের মধ্যে পুষে রেখেছো?

হ্যাঁ, মামা।

মামার চোখে বিস্ময়ের আলো দেখা যায়। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমি আজ রাতেই তোমার নানীকে চিঠি লিখবো।

আমি রোজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নানীর চিঠি এসেছে কিনা, রোজ জবাব পাই যে, না, আসে নি। অনিদ্রার জন্য আমার দিনগুলিকে মনে হয় উত্তপ্ত উষ্ণকাল স্বপ্ন।

স্কুলে পড়াশোনার ক্ষতি হতে থাকে। আগে আমি বেশ ভাল নম্বর পেতাম, এখন কম নম্বর পেতে থাকি, এবং অবশেষে পুরোপুরি, অকৃতকার্য হই। আমি মুহূর্ত থেকে মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকি। আমার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

একদিন রাতে আমার গৃহকর্মগুলি সম্পাদন করার সময় আমি জল ভর্তি করার জন্য জলের বালতি নিয়ে পেছনের আঙ্গিনায় যাই। আমি তখন ক্লান্ত, শরীর টানটান, আধা-

ঘুমন্ত, পা টলমল করছে। আমি বালতিটা কলের বেরিয়ে থাকা ধাতব মুখে আটকে নিয়ে জল ভর্তি হবার অপেক্ষায় থাকি। হঠাৎ বালতিটা পিছলে পড়ে গিয়ে আমার পায়ে জুতো, মোজা সব ভিজিয়ে দেয়। ঘৃণা ও হতাশায় ক্ষেপে গিয়ে আমি নিচু গলায় গাল দিয়ে উঠি, নিকুচি করি তোর, হারামজাদা কুত্তার বাচ্চা গডড্যাম বালতি!

আমার পেছনে অন্ধকারের মধ্য থেকে জোডি মামীর বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, রিচার্ড!

আমি ঘুরে তাকাই। মামী পেছনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তিনি আঙ্গিনায় নেমে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছেলে, তুমি কী বললে?

আমি অনুতপ্ত হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম, কিছু না।

মামী ছাড়লেন না, বললেন, কী বলেছো আবার বলো।

আমি কোনো উত্তর দিই না। নিচু হয়ে আমি বালতিটা তুলে নিই। তিনি একটানে বালতি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করেন, কী বলেছিলে তুমি?

আমি মাথা নিচু করে থাকি, মনে মনে চিন্তা করি, তিনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, মামী আমার শাপশাপান্তের কথাগুলি সত্যিই জানতে চান?

অবশেষে তিনি বললেন, আমি তোমার মামাকে বলছি গিয়ে। তখন আমি তাঁকে ঘৃণা করি। আমি ভেবেছিলাম আমার মাথা হেঁট করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকাকে তিনি তাকে আমার অপরাধের স্বীকারোক্তি এবং ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন বলে গ্রহণ করবেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না।

আমি বললাম, আমি পরোয়া করি না।

তিনি আমাকে বালতিটা দিলেন, আমি তাতে জল ভরে বাড়িতে নিয়ে যাই, তিনি আমার পেছন পেছন আসেন। আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, রিচার্ড, তুমি একটা খারাপ, খুব খারাপ ছেলে।

আমি এ উত্তর দিই, আমি পরোয়া করি না।

আমি ওঁকে এড়িয়ে সামনের রোয়াকে গিয়ে বসে থাকি। উনি আমার শাপ-শাপান্ত শুনতে পান সেরকম কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু উনি শুনে ফেলেছেন এবং এখন ওঁকে শান্ত করার কোনো উপায় ছিল না। আমি স্থির করলাম ঘটনা প্রবাহ যে দিকে যাক যাবে। আমি বাড়ি চলে যাবো। কিন্তু বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, পালিয়ে যাবো।

ক্লার্ক মামা এসে আমাকে সামনের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, জোডি বললো তুমি খুব খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছো।

হ্যাঁ, মামা।

তুমি এটা স্বীকার করছো?

হ্যাঁ, মামা।

কেন এমন করলে?

আমি জানি না।

আমি চাবুক মারবো তোমাকে। শার্ট খোলো।

আমি নিঃশব্দে খালি পিঠ পেতে দিই। তিনি চামড়ার বেল্ট দিয়ে আমাকে মারলেন। আমি দাঁতে দাঁত টিপে রাখি, চিৎকার করি না। মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আবার কখনো ওই ভাষা ব্যবহার করবে?

আমি বললাম, আমি বাড়ি যেতে চাই।

শার্ট পরো।

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করি। তারপর আবার বলি, আমি বাড়ি যেতে চাই।

কিন্তু এটাই তো তোমার বাড়ি।

আমি জ্যাকসনে যেতে চাই।

জ্যাকসনে তোমার কোনো বাড়ি নেই।

আমি আমার মায়ের কাছে যেতে চাই।

তিনি একটু নরম হয়ে বললেন, ঠিক আছে। শনিবার দিন আমি তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

কিছুটা বিভ্রান্ত চোখে তিনি আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, শোনো, জোডি তোমাকে যে কথা বলতে শুনেছে সেসব তুমি কোথায় শিখেছো? আমাকে বলো।

আমি তাঁর দিকে তাকাই কিন্তু কোনো উত্তর দিই না। আমার মনের চোখের সিনেমা দ্রুত কিছু ছবি ছুটে যায়। যেসব জীর্ণ নোংরা কুঁড়েঘরে আমার জীবন কেটেছে আমি তার ছবি দেখতে পাই এবং এখন ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে আরো বেশি অচেনা ও অপরিচিত বলে মনে হয়। আমি কেমন করে তাঁকে বলতে পারতাম যে পড়তে শেখার আগেই আমি শাপশাপান্ত করার বিদ্যা আয়ত্ব করি? কেমন করে তাঁকে আমি বলতে পারি যে ছ'বছর বয়সেই আমি মাতাল হই?

সেদিন শনিবার সকালে তিনি যখন আমাকে ট্রেনে তুলে দেন তখন আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আমি তাঁর দিকে তাকাতে চাই না। তিনি আমাকে আমার টিকেট দিলে আমি দ্রুত গাড়িতে উঠে গিয়েছিলাম। ট্রেন চলতে শুরু করলে আমি জানালা দিয়ে তাঁকে একটা শুকনো বিদায় সম্ভাষণ জানাবার লক্ষ্যে আমার হাত নাড়ি। যখন তাঁর মুখ আর দেখা গেল না তখন আমি সেতিয়ে পড়ি, স্বস্তি বোধ করি। চোখের জলে আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। আমি পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করি। সারাটা পথ আমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই।

মাকে দেখে আমি খুশি হই।

এখনো শয্যাশায়ী হলেও তিনি এখন আগের চাইতে ভাল আছেন। ডাক্তার আরেকটা অস্ত্রোপচারের কথা বলেছেন, তার ফলে তাঁর সেরে উঠবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমার চিন্তা হয়। আবার অস্ত্রোপচার কেন? আমি নিজে বহু আশাভঙ্গের শিকার

হয়েছি, তাই আমার ইচ্ছা ছিল মা যেমন আছেন তেমনই থাকুন। আমার অনুভূতির পেছনে কাজ করে আমার ভয়। কিন্তু আমি এ কথা কাউকে বলি না। আমি এরই মধ্যে বুঝতে শুরু করেছিলাম যে আমার আবেগ-অনুভূতি আমার চারপাশের লোকজনের চাইতে ভিন্ন রকম এবং সে সব কথা উচ্চারণ করার কোনো অর্থ হয় না।আমি আর স্কুলে ভর্তি হই নি। তার বদলে আমি একা একা পেছনের আঙ্গিনায় খেলা করি, দেয়ালের গায়ে একটা রবারের বল ছোড়াছুড়ি করি, একটা পুরানো ছুরি দিয়ে নরম ধূলোর বুকে নানা রকম ছবি আঁকি। অথবা বাড়িতে যে সব বইপত্র পাই সেগুলি পড়ি। কখন আমি স্থনির্ভর হতে পারবো সে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমার মাকে অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে ক্লার্কমডেলে নিয়ে যাবার জন্য কার্টার্স থেকে এডওয়ার্ড মামা এসে উপস্থিত হন। শেষ মুহূর্তে আমি জেদ ধরি। আমাকে ওঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিই, তারপর আমরা ষ্টেশনে যাই। সারাটা পথ আমি বিষণ্ন চিন্তায় ডুবে থাকি। মায়ের মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করে, আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই, আবার ওদের সঙ্গে যেতেও ইচ্ছা করে আমার। আমরা ক্লার্কমডেলে পৌছে ডাক্তারের দপ্তরে যাবার জন্য একটা ট্যাক্সি ভাড়া করি। মা বেশ খোশমেজাজে আছেন, নির্ভীক, মুখে হাসি, কিন্তু আমি জানি তিনিও আমার মতোই সন্দেহাকুল। ডাক্তারের অপেক্ষা-কক্ষে বসে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগে যে আমার মা আর কখনো ভাল হবেন না। অবশেষে সাদা কোট পরিহিত ডাক্তার বেরিয়ে আসেন, আমার সাথে করমর্দন করেন, তারপর মাকে ভেতরে নিয়ে যান। এডওয়ার্ড মামা একটা ঘর ভাড়া নেয়া এবং একজন নার্সের ব্যবস্থা করার জন্য বাইরে গেলেন। আমার নিজেকে বিধ্বস্ত মনে হলো। আমি অপেক্ষা করতে থাকি। কয়েক ঘণ্টা পর দরজার কাছে ডাক্তার দেখা দিলে আমি জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছেন আমার মা?

খুব ভাল! ডাক্তার জানালেন।

উনি ঠিক হয়ে যাবেন তো?

কয়েক দিনের মধ্যেই সব পরিষ্কার বোঝা যাবে।

আমি কি এখন ওঁকে দেখতে যেতে পারি?

না, এখন না।

কিছু পরে এডওয়ার্ড মামা একটা অ্যাম্বুলেন্স ও দুজন লোক নিয়ে ফিরে এলেন। লোক দুজন বয়ে নিয়ে আসে একটা স্ট্রেচার। ওরা ডাক্তারের দপ্তরে ঢুকে মাকে বাইরে নিয়ে আসে। মা শুয়ে আছেন, তাঁর দু'চোখ বোঁজা, সারা শরীর সাদা কাপড়ে মোড়া। আমার ইচ্ছা হয় স্ট্রেচারের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করি, কিন্তু আমি নড়তে পারি না।

আমি মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাকে ওরা ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

মামা বললেন হাসপাতালে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই আমাদের এ ব্যবস্থাই করতে হবে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ওরা সিঁড়ি দিয়ে স্ট্রেচার নিচে নামালো, মাকে এ্যাম্বুলেন্সে তুললো, তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। আমার মনে হলো আমার মা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলেন। আমি সেটা অনুভব করতে পারি।

এডওয়ার্ড মামা আর আমি একটা বোর্ডিং হাউসে থাকি। প্রত্যেক দিন ভোরে মামা রুজিং-হাউসে গিয়ে মায়ের খোঁজ নিয়ে আসেন। প্রত্যেক দিন তিনি ফিরে আসেন মুখ অন্ধকার করে, কোনো কথা বলেন না। অবশেষে তিনি বললেন যে আমার মাকে তিনি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, মায়ের সেরে উঠবার সম্ভাবনা সত্যি সত্যি কতটুকু আছে?

ও খুব অসুস্থ, তিনি জানালেন।

আমরা ক্লার্কমডেল ত্যাগ করলাম। মামা মালপত্রের গাড়িতে একটা স্ট্রেচারে শুয়ে থাকলেন। তাঁর দেখাশোনার জন্য মামা তাঁর সঙ্গে রইলেন। বাড়ি ফিরে মা অনেকদিন বিছানায় পড়ে থাকেন, প্রায় সারাক্ষণ কাতর আর্তনাদ করেন, শূন্য দৃষ্টিতে তাকান। ডাক্তার এসে দেখে যান, কোনো মন্তব্য করেন না। নানী উদ্বেগে প্রায় পাগল হয়ে যান। এডওয়ার্ড মামা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তিনি আবার ফিরে আসেন। আরো ডাক্তার ডাকা হয়। তাঁরা বললেন যে মায়ের মগজে একটা রক্তের ফোঁটা জমাট বেঁধেছে এবং আরেকটা পক্ষাঘাতের আক্রমণ হয়েছে।

এক রাতে মা আমাকে তাঁর বিছানার কাছে ডেকে বললেন যে এই যন্ত্রণা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না, তিনি এবার মরতে চান। আমি তাঁর হাত ধরে তাঁকে শান্ত হবার জন্য অনুনয় করি। ওই রাতে মায়ের সম্পর্কে আমার সব প্রতিক্রিয়া যেন শেষ হয়ে যায়। আমার সব অনুভূতি জমে বরফের মতো কঠিন হয়ে পড়ে। আমি শুধু তাঁর সেবা করে চলি। আমি শুধু জানি যে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি দশ বছর শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন, ক্রমে ক্রমে একটু ভাল হন, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হন না। কিছুদিন বিরতির পর আবার পক্ষাঘাতের শিকার হতে থাকেন। আমার মায়ের রোগের সঙ্গে লড়তে গিয়ে গোটা পরিবার তাদের সব সঞ্চয় প্রায় শেষ করে ফেলে, আর কোথাও থেকে কোনো সাহায্য আসে না। ধীরে ধীরে বাড়ির সবাই তাঁর অসুস্থতাকে মেনে নেয়, এটা রোধ করা যাবে না, কিছুই করার নেই আর।

আমার মনের ভেতর আমার মায়ের যন্ত্রণা একটা প্রতীক হয়ে বেড়ে ওঠে। নিজের মধ্যে তা জড়ো করে নেয় তাবৎ দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, অসহায়ত্ব; বিভ্রান্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক, ক্ষুধায় পীড়িত ঘণ্টা আর দিনগুলি, অস্থির নড়াচড়া, ব্যর্থ অন্বেষণ, অনিশ্চয়তা, ভয়, আতঙ্ক; অর্থহীন বেদনা এবং অনিঃশেষ কষ্ট। তাঁর জীবন আমার জীবনের আবেগ-অনুভূতির সুর বেঁধে দেয়, ভবিষ্যতে যে সব নারী-পুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হবে তাদের রাঙিয়ে দেয়, যেসব ঘটনা এখনো ঘটে নি তার চরিত্র নিরূপণ করে দেয়,

ভবিষ্যতে যে সব পরিস্থিতি ও পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে তার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থির করে গড়ে দেয়। আমার মায়ের নিরন্তর যন্ত্রণাভোগের প্রথম বছরগুলিতে আমার মনের ওপর একটা গভীর বিষণ্ণতার ভার চেপে বসে যা থেকে আমি কখনো মুক্ত হই নি, যে বিষণ্ণতা আমাকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখে, যা অত্যধিক আনন্দকে সন্দেহের চোখে দেখতে আমাকে শেখায়, পরবর্তীকালে যা আমাকে আত্মসচেতন করে রাখে, সব সময় আমাকে যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়িয়ে বেড়ায়, যেন যে অনামা নিয়তি আমাকে পাকড়াও করতে চাইছে আমি তার হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করছি।

বারো বছর বয়সের সময় আমি প্রথম পুরো এক বছরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করি। জীবন সম্পর্কে আমার এমন একটা ধারণা গড়ে ওঠে যা কোনো অভিজ্ঞতাই মুছে দেবে না, বাস্তব সম্পর্কে এমন একটা পক্ষপাত তৈরি হয় যা কোনো যুক্তিই খণ্ডন করতে পারবে না, জগৎ সম্পর্কে এমন একটা বোধ জন্ম নেয় যা আমার এবং একমাত্র আমারই, জীবনের অর্থ সম্পর্কে আমি এমন একটা ধারণা অর্জন করি যা কোনো শিক্ষাই বদলে দেবে না, এমন একটা বিশ্বাস যে মানুষ যখন অর্থহীন দুঃখযন্ত্রণার মধ্য থেকে একটা অর্থ বের করার জন্য সংগ্রাম করে তখনই শুধু সে বেঁচে থাকার অর্থ আবিষ্কারে সক্ষম হয়।

বারো বছর বয়সের সময় জীবন সম্পর্কে আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করি তা স্থায়ী হয়ে যায়। এর ফলে আমি জীবিকার জন্য সেই সব ক্ষেত্রেই অন্বেষণ করি যা ওই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাঁচিয়ে রাখে, সব কিছু অন্বেষণ করলেও যা আমাকে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে তোলে, সহনশীল কিন্তু সমালোচনামূলক করে রাখে। যে সচেতনতা আমি লাভ করি তা অপরের দুঃখযন্ত্রণা সম্পর্কে আমাকে একটা অন্তর্দৃষ্টি দান করে, যাদের আবেগ-অনুভূতি আমার নিজের মতো তাদের দিকে আমাকে আকর্ষণ করে। অন্যরা যখন তাদের জীবনের কথা বলে তখন আমি ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের পাশে বসে তাদের কথা শুনি। আমাকে তা বিচিত্র ভাবে একই সঙ্গে কোমলপ্রাণ ও নিষ্ঠুর, সহিংস এবং শান্তিপূর্ণ করে তোলে।

এটা আমাকে নিরাবেগ শীতলতার সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের প্রাণকেন্দ্রের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, দুঃখবেদনার যে মর্মমূল আমি সেখানে খুঁজে পাবো বলে জানতাম তা আমার জন্য উন্মোচিত করে দেয়। এর ফলেই আমি খোঁড়াখুঁড়ি করতে ভালবাসি মনোবিজ্ঞানের গভীরে, বাস্তবতাবাদী এবং প্রকৃতিবাদী সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে, রাজনীতির সেই সব ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে যা মানুষের আত্মার গোটাটুকু দাবি করার শক্তি রাখে। এটা আমার আকুলতাকে বিদ্রোহী মানুষদের পক্ষে নিয়ে যায়। এর জন্যই আমি সেই সব আলাপচারিতা ভালবাসি যা এমন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায় যে উত্তর কারো কোনো কাজে আসবে না, যা শুধু জীবনের বাইরের দিকের নাটককে লুকিয়ে রাখা মানবিক অনুভূতির নাটককে দেখার জন্য আমার মধ্যে জাগিয়ে রাখবে একটা বিমুগ্ধকর বিস্ময় এবং ত্রাসোদ্দীপক সম্ভ্রমের বোধ।

চতুর্থ অধ্যায়

নানী ছিলেন সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের একজন অত্যন্ত উৎসাহী সদস্য। আমাকে তিনি ভগবৎগোয়ণ করছেন, তার মূল্য হিসাবে আমি বাধ্য হই তাঁর ঈশ্বরের উপাসনা করার ভান করতে। তাঁর গির্জার কর্মচারীরা বাইবেলের যে ব্যাখ্যা-ভাষ্য দিতেন তা ছিল এই সব চিত্রকল্পে আকীর্ণ– চিরন্তন আগুনের বিশাল বিশাল হ্রদ, উধাও হয়ে যাওয়া সাগর, শুষ্ক অস্থিমালার উপত্যকা, সূর্য পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, চাঁদ রক্তাপ্লুত হচ্ছে শোনিতে, নক্ষত্ররাজি খসে খসে মাটিতে পড়ছে, একটা কাঠের লাঠি পরিবর্তিত হচ্ছে সাপে, মেঘের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর, মানুষ বেঁচে যাচ্ছে জলের ওপর দিয়ে, ঈশ্বর চলেছেন ঘূর্ণিবায়ুর উপর আরোহণ করে, জল পরিণত হচ্ছে সুরায়, মৃত জেগে উঠে প্রাণ পাচ্ছে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করছে, খঞ্জ হাঁটতে সক্ষম হচ্ছে; একটা মুক্তি ও পরিত্রাণ যেখানে গিজগিজ করছে বহু মস্তক, শিং, চোখ এবং পা বিশিষ্ট অত্যাশ্চার্য পশুরা; সোনার মাথা, রুপার কাঁধ, পিতলের পা এবং মাটির চরণ বিশিষ্ট মূর্তি সম্পর্কে ধর্মীয় অভিভাষণ; এক মহাজাগতিক কাহিনী যার শুরু অনাদিকাল থেকে, যা শেষ হবে মহাকালের অন্তে শুভ ও অশুভ শক্তির সর্বশেষ যুদ্ধের সমাপ্তিতে, তখন আকাশের মেঘমালা খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের সামনে থেয়ে চলে যেতে থাকবে; যে কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থেকেছে কিংবা ঈশ্বরের বিচারে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের অজস্র নাটকে পরিপূর্ণ ছিল ওই সব ধর্মীয় ভাষণসমূহ।

ধর্মীয় ভাষণগুলির জীবন্ত ভাষা শুনতে শুনতে আমি একটা আবেগতাড়িত বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়তাম কিন্তু গির্জার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই আমি যখন দেখতাম উজ্জ্বল সূর্যালোক, যখন অনুভব করতাম পথচারীদের স্পন্দিত জীবন তখনই আমি বুঝতাম যে ওসব একেবারেই সত্য নয়, ওরকম কিছুই ঘটবে না।

আমি আবার ক্ষুধার্ত বোধ করতে থাকি, কুরে কুরে খাওয়া ক্ষুধা, যে ক্ষুধা আমার শরীরে এতোটা লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে, আমাকে খিটখিটে করে, হঠাৎ আমার মেজাজ ভীষণ চড়িয়ে দেয়, যে ক্ষুধার তাড়নায় আমার অন্তরের ভেতর থেকে ঘৃণা সাপের জিভের মতো হিস হিস করে বেরিয়ে আসে, যে ক্ষুধা আমার ভেতরে বিচিত্র সব কামনার জন্ম দেয়।

পাতলা ভ্যানিলা বিস্কুটের মতো অর্ধেক মুখরোচক কোনো খাবারের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। একটা নিকেল হাতে পেলেই আমি দৌড়ে কোণার মুদি দোকানে যাই, এক বাক্স ভ্যানিলা বিস্কুট কিনি, তারপর বাড়ির পথে হাঁটি আস্তে আস্তে,

যেন কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করবার আগেই আমি সব শেষ করে খেয়ে ফেলতে পারি। তারপর আমি সামনের সিঁড়িতে বসে থাকি, আরেক বাক্স বিস্কুট খাবার স্বপ্ন দেখি। ইচ্ছাটা এতো প্রবল হয়ে ওঠে যে আমি ভুলে থাকার জন্য অন্য দিকে সক্রিয় হয়ে উঠি। আমি জল খাবার একটা পদ্ধতি শিখে ফেলি, যাতে তৃষ্ণা থাকুক বা না থাকুক আমি জল পান করে সাময়িকভাবে আমার পেট ভর্তি করে ফেলি। আমি কলের নিচে আমার মুখ পেতে তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে কলটা ছেড়ে দিই আর জলের তোড় প্রপাতের মতো আবার পাকস্থলিতে ঢুকে গিয়ে জায়গাটাকে শক্ত নিরেট না করা পর্যন্ত জল পান করতে থাকি। মাঝে মাঝে আমার পেট ব্যথা করতো কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য আমার পেট ভর্তি মনে হতো।

নানীর বাড়িতে কখনোই ডয়োর বা বাছুরের মাংস খাওয়া হতো না, কদাচিৎ অন্য কোনো মাংস খাবার টেবিলে পরিবেশিত হতো। আমরা মাছও খেতাম কালে ভদ্রে, তাও শুধু সেই সব মাছ যার আঁশ এবং মেরুদণ্ড নেই। কখনোই বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হতো না, তার মধ্যে নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান আছে। প্রাতঃরাশের সময় আমি খেতাম ভুট্টার জাউ আর ময়দা ও ডয়োরের চর্বি দিয়ে বানানো কাথ, যার ফলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখের মধ্যে ঢেকুর উঠে আসতো। বদ হজমের জন্য আমরা সারাক্ষণই কার্বনিক এসিড মেশানো সোডা খেতাম। বিকাল চারটায় আমি ডয়োরের চর্বি দিয়ে রাঁধা এক প্লেট বাঁধাকপির সব্জি খেতাম। মাঝে মাঝে রবিবারে আমরা দশ পয়সার গরুর মাংস কিনতাম, সাধারণতঃ যা খাওয়া যেত না। নানীর প্রিয় পদ ছিল টিনাবাদামের একটা রোস্ট যা তিনি দেখতে মাংসের মতো করে তৈরি করতেন, কিন্তু যার স্বাদ ছিল অন্য কিছুর মতো।

সংসারে আমার অবস্থান ছিল বেশ নাজুক। আমি নাবালক, অনাহূত এক পৌষা, রক্তের সম্পর্কে এমন একজন আত্মীয় যে ত্রাণলাভের কথা বলে না, যার আত্মা মারাত্মক বিপদের মুখে। ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের উপর তাঁর যুক্তিকে ভিত্তি করে নানী প্রবল আস্থার সঙ্গে জানালেন যে সংসারে একজন পাপীর কারণে গোটা সংসারের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসতে পারে, নিরপরাধ ও দোষী উভয়ের উপরই ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে। আর তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমার মায়ের দীর্ঘ অসুস্থতা আমার অবিশ্বাসেরই ফল। এই সব মহাজাগতিক হুমকি উপেক্ষা করার ব্যাপারে আমি বেশ দক্ষ হয়ে উঠি, এবং সকল অধিবিদ্যামূলক বিমূর্ত উপদেশের প্রতি আমি একটা প্রগাঢ় নিস্পৃহতা গড়ে তুলি।

কিন্তু তাঁর ঈশ্বরের কাছে আমার পাপ স্বীকার করানোর জন্য নানী একজন মিত্র পেয়ে যান। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, অ্যাডি খালা, অ্যালাবামার হাল্টসভিলে সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট ধর্মীয় শিক্ষালয়ে সবে পড়াশোনা শেষ করে বাড়ি এসেছেন। তিনি বললেন, পরিবার যদি আমাকে খাওয়াবার মতো দয়া প্রদর্শন করতে পারে তাহলে আমাকে কম

পক্ষে পরিবারের নির্দেশ-পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। তিনি বহুত করলেন, স্কুলের শরৎকালীন টার্ম শুরু হলেই আমাকে ইহজাগতিক স্কুলে নয়, বর্গীয় স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হবে। আমি এতে আমার অস্বীকৃতি জানালাম এবং এর ফলে আমি নিজেকে শুধু একজন ভয়ঙ্কর নাস্তিকে পরিণত করলাম না, একজন কঠিন হৃদয় অকৃতজ্ঞ প্রাণীতেও রূপান্তরিত করলাম। আমি একের পর এক যুক্তি ও আপত্তি তুললাম কিন্তু আমার মা পক্ষ নিলেন নানী ও অ্যাডি খালার। শেষ পর্যন্ত আমাকে মেনে নিতে হলো।

ধর্মীয় স্কুল শুরু হয়, আমি গোমড়া মুখে যোগ দিই। মোট শিক্ষার্থী বিশজন, বয়স পাঁচ থেকে উনিশ, প্রাথমিক স্তর থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত, সবাই বসেছে গাদাগাদি করে একটি ঘরে। অ্যাডি খালা একমাত্র শিক্ষক। প্রথমদিন থেকেই তাঁর আর আমার মধ্যে একটা তিক্ত ও প্রবল বিরোধিতা জেগে ওঠে। এই প্রথম তিনি কোনো স্কুলে পড়াতে এসেছেন, একটু বিচলিত তিনি, আর আমি, তাঁর একজন রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়, যে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়, যে তাঁর চার্চের একজন সদস্যও নয় সে তাঁর ক্লাসরুমে আছে। সে কারণে তিনি একটু আত্মসচেতনও। তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন যে ক্লাসের প্রতিটি ছাত্র জানবে যে আমি একজন পাপী এবং আমার অবস্থান তিনি অনুমোদন করেন না এবং আমার প্রতি কোনো বিবেচনাই দেখানো হবে না।

ছাত্ররা ছিল খুব বাধ্য। পাবলিক স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব থাকতো। সেখানে একটা ছেলেকে যাচাই করা হয়, তাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তার মধ্য দিয়ে বাইরের জগৎটা কি রকম তার একটা ধারণা সে লাভ করে। এখানকার ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা-শক্তি বলে কিছু নেই, তাদের কথাবার্তা এক ঘেঁয়ে, তাদের ভাবভঙ্গি অস্পষ্ট, তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ক্রোধ, আশা, হাসি, উদ্দীপনা, তীব্র অনুভূতি বা হতাশা কিছুই নেই। আমি এমন একটা নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে তাদের দেখতে সক্ষম হই যা ছিল তাদের বোধের অগম্য। তাদের পরিবেশ তাদেরকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছিল, ভিন্ন কোনো পরিবেশ তারা কল্পনা করতে পারতো না, আর আমি এসেছি জীবনের একটা ভিন্ন পরিমণ্ডল থেকে, যেখানে পানশালার দরজা অনবরত ঘুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, যেখানে আছে রেলগাড়ির পাশের আঙ্গিনা, গোলবাড়ি, রাস্তায় ছেলেদের দঙ্গল, নদীতীরে মাটির বাঁধ, একটা অনাথ সদন। আমি ছিটকে গেছি এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক সংসার থেকে আরেক সংসারে। আমি বেশি মিশেছি বড়দের সঙ্গে, আমার জন্য শুভ হওয়ার পক্ষে বেশি মাত্রায়। আমার শাপ-শাপান্ত করার অভ্যাস আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় কিন্তু তার আগেই আমি ক্লাসের অর্ধেকের বেশি ছাত্রছাত্রীকে চমকে দিই আর অ্যাডি খালাকে অসহায় বানিয়ে ভীষণ বিব্রত করি।

স্কুলের প্রথম সপ্তাহ যখন শেষ হবার পথে তখন একদিন অ্যাডি খালা ও আমার মধ্যে বিরোধের যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল তা প্রকাশ্য রূপ নিলো। একদিন অপরাহ্নে তিনি তাঁর টেবিল থেকে উঠে দু'সারি আসনের মাঝ দিয়ে হেঁটে এসে আমার পাশে

দাঁড়ালেন। আমার আঙুলের গাঁটে তাঁর হাতের রুলার ঠুকে তিনি বললেন, এটা করা যে ঠিক নয় তুমি নিশ্চয় তা জানো?

আমি আমার আঙুলের গাঁটে হাত বুলাতে বুলাতে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করা ঠিক নয়?

তিনি বললেন, মেঝের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে দেখো।আমি তাকিয়ে দেখলাম যে চারপাশে কাঠবাদামের ছোট ছোট শাঁস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তার কয়েকটা পিষ্ট হয়ে পরিষ্কার সাদা পাইন কাঠের তক্তার উপর চিটচিটে দাগ ফেলেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝলাম যে আমার সামনে বসা ছেলেটি বাদাম খাচ্ছিল। আমার বাদাম তখনো ধরা ছিল আমার পকেটে, তখনো সেগুলি ফাটানো হয় নি। আমি বললাম, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তিনি বললেন, ক্লাস রুমে যে কিছু খেতে হয় না এ তুমি নিশ্চয়ই জানো।

আমি কিছু খাই নি, আমি বললাম।

তিনি ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, মিছে কথা বলো না! এটা শুধু স্কুল নয়, ঈশ্বরের পবিত্র ভূমি এটা।

অ্যাডি খালা, আমার বাদাম এখনো আমার পকেটে...তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি মিস উইলসন!

আমি নির্বাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি, অবশেষে কোন জিনিসটা তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলছে তা বুঝতে পারি। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আমি যেন ক্লাসরুমে তাঁকে মিস উইলসন বলে সম্বোধন করি। বেশিরভাগ সময় আমি তাই করেছি। তাঁর আশঙ্কা ছিল আমি যদি তাঁকে অ্যাডি খালা বলে সম্বোধন করি তাহলে সেটা ক্লাসের মনোবলকে ক্ষুণ্ন করবে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী কিন্তু জানতো যে তিনি আমার খালা, আর তাঁর সঙ্গে ওদের অনেকের চেনাজানা ছিল আমার চাইতেও দীর্ঘদিনের।

আমি বললাম, আমি দুঃখিত। তারপর আমি মুখ ঘুরিয়ে একটা বই খুললাম।

রিচার্ড, উঠে দাঁড়াও।

আমি নড়ি না। গোটা ঘর এখন উত্তেজনায় টানটান। আমি বইটা আমার আঙুল দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি। আমি টের পাই যে ঘরের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী দৃশ্যটা দেখছে। আমি বাদাম খাই নি, তাঁকে অ্যাডি খালা সম্বোধন করার জন্য আমি দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু অহেতুক শাস্তি ভোগের জন্য আমি আলাদাভাবে চিহ্নিত হতে চাই না। তাছাড়া আমি আশা করছিলাম যে আমার সামনে বসা ছেলেটি আমাকে বাঁচাবার জন্য কোনো একটা মিথ্যা উদ্ভাবন করবে। আসলে সেই তো অপরাধী।

অ্যাডি খালা চিৎকার করে বললেন, আমি তোমাকে উঠে দাঁড়াতে বলেছি!

আমি আমার বই-এর উপর থেকে চোখ না তুলে চুপ করে বসে থাকি। হঠাৎ তিনি আমার জামার কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে আমাকে আমার আসন থেকে টেনে তুলে ফেললেন। আমি হুমড়ি খেয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে যাই।

তিনি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চিৎকার করে উঠলেন, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি!

আমি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকাই। আমার দু'চোখে ঘৃণার আগুন।

শোন, ছোড়া! আমার দিকে ওরকম করে তাকাবি না।

ওই বাদামের শাঁসগুলি আমি মেঝেতে ফেলি নি।

তাহলে কে ফেলেছে?

আমার পথের নীতিমালা আমার জন্য ব্যাপারটা কঠিন করে তোলে। পাবলিক স্কুলে আমি কখনো কোনো ছেলের কথা বলে দিই নি। আমি তখনো অপেক্ষা করছিলাম যে আমার সামনের ছেলেটি আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে মিথ্যা করে কিছু বলবে, কোনো একটা অজুহাত দেবে, একটা কিছু করবে। অন্তীতে দলের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল না আমি সে-শাস্তি গ্রহণ করেছি। অন্য ছেলেদেরও আমি অনুরূপ করতে দেখেছি। কিন্তু ওই ধর্মপ্রাণ ছেলেটি, ঈশ্বরের সাহায্যে, কোনো কথা বললো না।

অবশেষে আমি বললাম, কে ফেলেছে আমি জানি না।

অ্যাডি খালা বললেন, সামনে যাও।

আমি ধীরে ধীরে তাঁর টেবিলের কাছে যাই, ভাবলাম এবার একটা বড়তা শুনতে হবে, কিন্তু আমি যখন তাঁকে ঘরের কোণার দিকে এগিয়ে সেখানে রাখা বেতগুলির মধ্য থেকে একটা সবুজ লম্বা নমনীয় লিকলিকে বেত তুলে নিয়ে আমার দিকে আসতে দেখলাম তখন আমার বুক ধ্বকধ্বক করে উঠলো, তারপরই আমি আমার মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। আমি চিৎকার করে বললাম, আমি কিছু করি নি!

তিনি বেত চালালেন, আমি পাশে সরে এড়িয়ে যাই।

রাগে আগুন হয়ে তিনি বললেন, স্থির হয়ে দাঁড়া, ছোড়া। ভয়ঙ্কর ক্রোধে তাঁর মুখের রঙ সীসার মতো হয়ে যায়, তাঁর সারা শরীর কাঁপতে থাকে।

আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আমার মনে হয় অ্যাডি খালার চাইতে ওই নীতিবান ছেলেটির হাতেই আমি বেশি পরাজিত হয়েছি।

তোমার হাত পাতো!

আমি হাত বাড়িয়ে দিই, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, যত মূল্যই দিতে হোক ভবিষ্যতে আর কখনো আমি এটা মেনে নেবো না। তিনি বেত মারতে থাকেন, আমার হাতের তালু লাল হয়ে যায়, তারপর তিনি আমার অনাবৃত পায়ে আঘাত করেন, সেখানে মোটা হয়ে কালশিরা পড়ে যায়। আমি দাঁতে দাঁতে টিপে থাকি, আমার মুখ দিয়ে সামান্য গোঙানির শব্দও বেরোয় না। তিনি শেষ করার পরও আমি আমার হাত পেতে রাখি, তাঁকে বুঝতে দিই যে তাঁর প্রহার আমাকে সত্যিকারভাবে স্পর্শ করতে পারে নি, আমি স্থির অপলক চোখে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাকি।

যাও, হাত নামিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসো।

আমি হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াই। আমার করতল আর পা যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, আমার সারা শরীর উত্তেজনায় টানটান। আমি ক্রোধের একটা কুয়াশার মধ্য দিয়ে আমার আসনের দিকে হেঁটে যাই। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া এখনও কিন্তু শেষ হয় নি!

এবার তাঁর দিকে থেকে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। আমি কী করছি তা বুঝে উঠবার আগেই আমি বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াই, বিস্ফারিত মুখে, অগ্নিবর্ষী দু'চোখ নিয়ে, আমি তাঁর কথার পুনরুক্তি করি, বোঝাপড়া? আমি আপনার কি করেছি?

অ্যাডি খালা চিৎকার করে বললেন, বসো, আর একদম চুপ!

আমি বসি। একটা জিনিস সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হই, তাঁর হাতে আমি আর দ্বিতীয়বার প্রহৃত হবো না। আমি প্রায়ই যন্ত্রণাদায়ক প্রহারের শিকার হয়েছি কিন্তু সে সব সময়ে আমার সাধারণভাবে মনে হয়েছে যে ওই পিটুনি ছিল ন্যায়সঙ্গত ও অর্থবহ, অন্যায় ছিল আমার দিকেই। কিন্তু এবার আমি যে কারণে প্রহৃত হই তা ঠিক ছিল না। এবার, এই প্রথমবারের মতো, নিজেকে প্রাপ্ত বয়স্কের সমকক্ষ বলে মনে হলো। স্কুলে আমার যাওয়ার ব্যাপার ছাড়াও, আমার মনে হলো, অ্যাডি খালা কোনো একটা আবেগগত সমস্যায় ভুগছেন। আমার উপস্থিতি কি তার মধ্যে এতোটা নিরাপত্তাহীনতার জাগিয়ে তোলে যে তাঁর মনে হয় স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর সামনে আমাকে তাঁর শাস্তি দিতে হবে এবং তার মাধ্যমে তিনি তাদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হবেন? সারা বিকাল আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবি, কিভাবে আমি স্কুল ত্যাগ করতে পারবো চিন্তা করি। খালা বাড়ি ফেরার আগেই আমি ফিরে আসি। তিনি বাড়িতে পা দিয়েই আমাকে রান্নাঘরে ডেকে পাঠান। আমি সেখানে ঢুকেই দেখি যে তিনি আরেকটা বেত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মাংসপেশীগুলি শক্ত হয়ে ওঠে। আমি বললাম, আপনি আবার বেত মারবেন!

আমি তোমাকে একটু আদব-কায়দা শিক্ষা দেবো!

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে যুঝতে থাকি, এ রকম লড়াই আমি আমার জীবনে আর কখনো লড়ি নি। হয়তো আমার অস্থির শৈশব, হয়তো আমার এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তরিত হওয়া, হয়তো যে সহিংসতা আমি ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি তা আমাকে অধিকার করে। রান্নাঘরের টেবিলের কাছে গিয়ে, সেখানে ড্রয়ারে রাখা ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে, আত্মরক্ষা করার একটা প্রচণ্ড প্রণোদনা আমি দমন করার প্রাণপন চেষ্টা করি। কিন্তু ওই মহিলা, যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আমার খালা, আমার মায়ের বোন, নানীর মেয়ে। তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে আমার নিজের রক্ত; তাঁর অনেক কাজের মধ্যে আমি আমার আপন সত্তার কিছু কিছু পলায়নপর অংশ দেখতে পাই; তাঁর কথার মধ্যে আমি আমার নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো হিংস্র আচরণ করতে চাই না; তবু যে অন্যায় আমি করতে চাই না, তবু যে

অন্যায় আমি করি নি তার জন্য আমি মার খেতেও চাই না।

আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, কোনো একটা কারণে আপনি আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে আছেন!

দেখো, আমাকে ক্ষ্যাপা বলবে না!

আপনি এতোটাই ক্ষিপ্ত যে আমার কোনো কথাই আপনি বিশ্বাস করেন না।

আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি!

তাহলে কিভাবে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো? মেঝেতে কাঠবাদামের খোসা ফেলার জন্য আপনি আমাকে মারলেন, অথচ সে কাজটা আমি করি নি!

তাহলে কে করেছে?

এখন আমি একা তাঁর সামনে ছিলাম, তাছাড়া আমি মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম, তাই আমি আমার আনুগত্যকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে দোষী ছেলেটির নাম বলে দিলাম, আমার মনে হয় সে কোনো বিবেচনা দাবি করতে পারে না।

তুমি আমাকে একথা আগে বলো নি কেন?

অন্যের নামে আমি কিছু লাগাতে চাই নি।

তাহলে তুমি মিথ্যা কথা বলেছিলে, হুঁ

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না। সংহতির নীতিমালাকে যে আমি কতোখানি মূল্য দিই সেকথা তাঁকে ব্যাখ্যা করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।

হাত পাতো!

আপনি আমাকে মারতে পারেন না! আমি ও কাজটা করি নি।

মিথ্যা কথা বলার জন্য আমি তোমাকে মারবো!

না, মারবেন না আমাকে। মারলে পর আমি আপনাকে ছেড়ে দেবো না!এক মুহূর্ত তিনি ইতস্তত করলেন, তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বেত চালালেন, আমি পাশ কাটিয়ে সরে যাই, তারপর এক কোণায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি। তিনি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মুখে বেত্রাঘাত করলেন। আমি লাফিয়ে উঠে, চিৎকার করে, তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে যাই, হ্যাঁচকা টানে রান্নাঘরের ড্রয়ারটা খুলি, প্রচণ্ড শব্দ করে সেটা মাটিতে পড়ে যায়। আমি ছুরিটা আঁকড়ে ধরে ওঁর জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করি। আমি চেঁচিয়ে বলি, আমি আপনাকে থামতে বলেছিলাম!

ছুরিটা ফেলে দাও!

আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান, নইলে আমি ঠিক আপনার গায়ে এই ছুরি চালাবো।

তিনি পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখেন, তারপর মন স্থির করে আমার দিকে এগিয়ে আসেন, আমি ছুরি হাতে তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তিনি আমার হাত আঁকড়ে ধরে আমার হাত মুচড়ে ছুরিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। আমি আমার ডান পা তাঁর পায়ে

আটকে রাখে নিচে ফেলে দিই। আমরা দুজনেই মেঝেতে পড়িয়ে পড়ি। তুমি ছিলেন আমার চাইতে বেশি শক্তিশালী। আমি টের পাই যে আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। তিনি তখনো আমার ছুরিটা নেবার জন্য লড়ছিলেন। আমি তাঁর চুলের মুঠোয় দেখে বুঝতে পারি যে ছুরিটা হাতে পেলে তিনি নির্দিধায় আমার গায়ে ছুরি বসিয়ে দেবেন। আমি তাঁর হাত কামড়ে নিই। আমরা মেঝেতে গড়াতে থাকি। শার্লি মাঝি, মাঝখানে নিই, পালপরাকে আঘাত করি। আমরা যেন একে অন্যকে তিনি মা, দুজন মরণাঘাত শত্রু, নিজ নিজ প্রাণের জন্য লড়ছি।

আমি হঠাৎই লক্ষ্য করে চেয়ারটা উঠি, আমার সামনে থেকে চলে যান আপনি। ছেড়ে দিন আমাকে!

তোমার হাতের ছুরিটা আমাকে দাও, তোকরা!

আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে না যান তাহলে আমি আপনাকে খুন করে ফেলবো! সত্যিই খুন করে ফেলবো!

নানী সৌড়ে ছুটে আসেন। আমাদের অবস্থা দেখে তিনি বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন।

আন্টি, কি করছো তুমি?

আন্টি থালা ইাপাতে ইাপাতে বললেন, ওর হাতে ছুরি আছে। ওকে ছুরিটা ফেলে দিতে বলুন।

নানী চিৎকার করে বললেন, রিচার্ড, ছুরিটা ফেলে দাও।

আমার মা সৌড়াতে সৌড়াতে সরাসরি এসে দাঁড়ালেন। তিনিও চিৎকার করে বললেন, রিচার্ড, থামাও এসব!

না! আর আমি ওঁকে আমাকে মারতে দেবো না!

মা বললেন, আন্টি, ওকে ছেড়ে দাও।

আন্টি থালা দীতে দীতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ঠোঁট তখনও ছুরির উপর। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে রান্নাঘর থেকে চলে গেলেন, যাবার সময় পা দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা পুরো খুলে দিলেন।

মা বললেন, রিচার্ড, এবার ছুরিটা আমাকে দাও।

কিন্তু, মা, আমি বললাম, উনি আমাকে মারলেন, অহরহ মারলেন! আর আমি ওঁকে আমাকে এভাবে মারতে দেবো না। যা ঘটার ঘটুক, আমি পরোয়া করি না! নানী অশ্রুসিক্ত গলায় বললেন রিচার্ড, তুমি বাবাপ, খুব বাবাপ।

কী ঘটেছে আমি তাদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি কিন্তু তাঁরা কেউ আমার কথা কান দেয় না। আমার হাত থেকে ছুরিটা নেবার জন্য নানী আমার দিকে এগিয়ে আসেন কিন্তু আমি চৌকাঠে তাঁকে এড়িয়ে পেছনের আঙিনায় ছুটে চলে যাই। আমি পেছনের সিঁড়িতে একা বসে থাকি, আবেগের চাপে কেমনটা কাঁপা হয়ে গেছে, আমি আপন মনে

বকবক করে চলি। একটি গাছ নানা গলায় এসে হাজির হন। আন্টি থালা তাঁকে কী ঘটেছে তা বলেছেন।

নানা বললেন, নাও, বাপু, ছুরিটা আমাকে দাও।

আমার হাতের দিকে ছুরিটা লুকিয়ে রেখে আমি মিথ্যা করে বললাম, এটা আমি নিজের জায়গায় রেখে দিয়েছি।

তিনি বললেন, কেন তুমি এই কাজটা করলে?

আমি বললাম, আমি ওঁর হাতে মার খেতে চাই নি।

তিনি গাড়ি করে উঠলেন, তুমি তো একটা বাচ্চা!

কিন্তু আমি ওঁর হাতে মার খেতে চাই না!

নানা বললেন, নিয়ে কথা বলার তোমার ছুটি নেই। শোনো, বাবের বাড়ানো কানু না হলে আমি তোমার পাগলী ফুপো তোমার পাওনা মাফা করে বাবের বা বেরের বাড়ি ফিরিয়ে দিবাম। কী কাও! তোমার মাতো একটা পুঁচকে ছোড়া ছুরি নিয়ে লোকের ভয় দেখাচ্ছে!

আমি আবার বললাম, আর আমি ওঁকে আমাকে মারতে দেবো না নানা বললেন, তুমি খুব বাবাপ, বুঝলেন যদি সারাবেন না হও তাহলে তুমি একদিন ঠিক জেলখানায় যুমবে।

বহুদিন যাবেই নানাকে আমি ভয় করি না। অসুস্থ এক বুড়ো মানুষ, বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কোনো খবরই তিনি রাখেন না। মাঝে মাঝে বাড়ির সেয়ালা কাউকে ভয় দেখাবার জন্য তাঁর কাছে নালী দিতো, কিন্তু আমি জানতাম যে তিনি খুব মুর্খ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে আমি ভয় পেতাম না। তাঁর পৌত্রসের ভারপাপীও নিজস্বলির কুয়াশাবেরা পুরিয়ে আজকিনে হয়ে তিনি বুপচাপ তাঁর ঘরে বসে থাকতেন। এক কোণায় নীড় করানো থাকে টেলিফোনির তাঁর পুরাতুচ্ছের সময়ের বরইসলটা আর মুখস্থ করে তাঁরা করা তাঁর ইউনিয়ান সেনাবাহিনীর নীল ইউনিফর্মটি।তাঁর পরাজয় আন্টি থালাকে খুব দুঃখ করে। আমার প্রতি তিনি একটা শীতল ও তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করতে থাকেন। আমি বুঝতে পারি যে আমাকে শাসন করার প্রয়াসে তিনি নিজেকে আয়নাপাত দিক থেকে আমার ঘরে নামিয়ে এনেছিলেন, এর ফলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। বহু বছর পরে তাঁর নিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা কদাচিৎ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি, যদিও আমরা বাস করতাম একই ছাদের নিচে, আহার করতাম একই টেবিলে, যদিও আমি ছিলাম একটা অভিভাবকহীন ছোক বালক আর তিনি ছিলেন চার্চের সেক্রেটারি আর চার্চের নিবাহকালীন কুলের শিক্ষিকা। যে ভালবাসা মানুষকে একত্রে বেঁধে রাখে নিশ্চয়ই সেই ভালবাসা বর্তিত হয়েছিল আমাদের সংসারের উপর....আন্টি থালা আমাকে কখনো কিন্তু আদুরি করতে কিংবা হাসকেরার্ডে গিয়ে কিন্তু নিখাতে না বললেও আমি চার্চ কুলে যেতে থাকি। কিন্তু আমি পড়াশোনা করা ছেড়ে দিই। আমি ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা

করে সময় কাটাই কিন্তু আমি দেখলাম যে কিছু নিষ্ঠুর বর্বর ক্রীড়া ছাড়া তারা অন্য কোনো খেলা জানতো না। বেসবল, মার্বেল, বক্সিং, দৌড় প্রভৃতি ছিল নিষিদ্ধ বিনোদন, শয়তানের কাজ। তার বদলে তারা খেলতো একটা হাঁকারি খেলা, তারা যার নাম দিয়েছিল চাবুক-চালানো। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে একটা সরল আমোদ বলে মনে হতো, এর উদ্ভাবন প্রকাশ পেতো অকস্মাৎ সবেগে উৎসারিত তরল আগুনের শিখার মতো, হঠাৎ-হঠাৎ, কিন্তু সেটা একজনকে একেবারে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছুঁড়ে ফেলতে পারতো। আমাদেরকে স্কুলের মাঠের একপাশে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই অ্যাডি খালা আমাদের চাবুক-চালানো খেলাটা খেলতে বলতেন। এর বদলে তিনি যদি আমাদের জুয়া খেলতে বলতেন তাহলে সেটা হতো আমাদের শরীরের জন্য বেশি নিরাপদ আর আমাদের আত্মার জন্য বেশি স্বাস্থ্যপ্রদ।

একদিন দুপুরে অ্যাডি খালা আমাদের চাবুক-চালানো খেলা খেলতে বললেন। আমি আগে কখনো ওই খেলা খেলি নি। সরল চিত্তে আমি খেলতে নামি। আমরা একটা লম্বা লাইন করি, প্রত্যেক ছেলে পাশের ছেলের হাত ধরে একটা লম্বা মানুষের মালা হই। আমি জানতাম না, কিন্তু আমার জায়গা হয় ওই মানুষী মালার শেষ প্রান্তে। প্রথম ছেলেটি, চাবুকের হাতল, দুলকি চালে দৌড়াতে শুরু করে, বাঁয়ে-ডাইনে এঁকেবেঁকে ছোটে, গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়, শেষে প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমার পাশের ছেলেটির হাত আঁকড়ে ধরি। আমি বুঝতে পারি যে আমি ওর হাত না ধরে থাকতে পারলে ছিটকে পড়ে যাবে। চাবুকটা মানুষের মাংস আর হাড় যতখানি সহ্য করতে পারে ততখানি টানটান হয়ে ওঠে। আমার মনে হলো আমার বাহু বোধহয় তার কোটর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। হঠাৎ আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটা ছোট তীক্ষ্ণ বজ্রবেগময় আমি দুলে উঠি। চাবুকটা এবার চালানো হবে, আমি আর হাত ধরে রাখতে পারলাম না। চাবুকের গতিবেগ আমাকে মাটি থেকে তুলে আকাশে ছুঁড়ে দিলো, আমি যেন ঘোড়ার চাবুকের গা থেকে ছিঁড়ে উঠে আসা চামড়ার একটা টুকরা। আমি প্রচণ্ড বেগে শূন্যের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হই, তারপর একটা গর্তের ভেতরে গিয়ে পড়ি। আমি হতভম্ব হয়ে যাই, মাথায় আঘাত পাই, সেখান থেকে রক্ত ঝরে। অ্যাডি খালা হেসে ওঠেন। ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাঁকে আমি ওই প্রথম ও শেষ বারের মতো হাসতে দেখি।বা.ড়তে নানী একটা কড়া ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। আমাদের প্রার্থনা করতে হতো সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়, প্রাতঃরাশ ও নৈশাহারের সময়, তারপর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে বাইবেলের একটি পংক্তি শোনাতে হতো। আর এটা ধরে নেয়া হয় যে আমি রাতে শোয়ার আগে প্রার্থনা করি। আমি সাপ্তাহিক কাজের দিনগুলিতে গির্জায় প্রার্থনাসভায় যোগদান যতটা সম্ভব পরিহার করতাম, অজুহাত দেখাতাম যে আমার পড়াশোনা আছে; আমার কথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করতো না, কিন্তু ওরা কেউ ঝগড়া-বিবাদের ঝুঁকি নিতে চাইতো না, তাই আমার

কথা মেনে নিতো। প্রতিদিনের প্রার্থনা ছিল একটা যন্ত্রণা বিশেষ। এতো বেশিক্ষণ এবং এতো ঘনঘন হাঁটু গেড়ে বসে থাকার ফলে আমার হাঁটু বেদনাসায়ক ভাবে সর্পশকারে হয়ে ওঠে। অবশেষে সত্যিকার নম্রজানু না হয়েও নম্রজানু হবার একটা পদ্ধতি আমি উদ্ভাবন করি। আমি কঠিন অনুশীলন করে কিভাবে দেয়ালের একটা সুবিধাজনক কোণায় গিয়ে একটু ঝুঁকে সেখানে মাথা ঠেকিয়ে আমার জুতোর বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় সেটা আয়ত্ত করে ফেলি। ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ এটা টের পায় নি, আর আমার মনে হয় তিনি এ নিয়ে মাথা ঘামান নি।

কিন্তু নানী একটা বিষয় বাধ্যতামূলক করে দেন। কয়েকটি সারারাতের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনাসভায় আমাকে যোগ দিতেই হবে। তাঁর চার্চের তিনি ছিলেন প্রবীণতম সদস্য এবং তাঁর বাড়িতে বাস করা তাঁর একমাত্র গতিকে তিনি ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনাসভাগুলিতে না আনতে পারলে তা তাঁর জন্য খুবই অশোভন দেখাতো। তাঁর মনে হয় তা তাঁর নিজের ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহের জন্ম দেবে, তিনি যে অন্যের চিত্তে বিশ্বাস জাগাতে অসমর্থ সে-সন্দেহ জাগাবে, নিদেন পক্ষে তিনি যে আমার পশ্চাদ্দেশে বেত্রাঘাত করতে পারেন না সে ব্যাপারে সবাই সন্দিহান হয়ে পড়বে।

সারারাতের প্রার্থনাসভাগুলির জন্য নানী খাবার তৈরি করে নিয়ে যেতেন। আমার মা আর নানাকে বাসায় রেখে আমরা তিনজন- নানী, অ্যাডি খালা আর আমি বেরিয়ে পড়তাম। আবেগপূর্ণ প্রার্থনা আর স্তোত্রগীতির সময় আমি একটা বেঞ্চে বসে আকুপাকু করতাম, কখন বড় হবো আমি, কখন এসব থেকে পালিয়ে যেতে পারবো, মহাজাগতিক প্রলয়ের কথা শুনতাম উদাসীন্য ভরে, তবে স্তোত্রগীতিগুলির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোমল স্পর্শ আমি উপভোগ করতাম, অবশেষে নানীর দিকে চোরাচোখে তাকাতাম, মনে মনে ভাবতাম কখন এই বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া নিরাপদ হবে। দশটা-এগারোটার দিকে আমি একটা স্যান্ডউইচ খেতাম, আর নানী তাঁর মাথা হেলিয়ে আমাকে একটু ঘুমিয়ে নেবার অনুমতি দিতেন। আমি মাঝে মাঝে জেগে যেতাম, স্তোত্রগীতি এবং প্রার্থনার টুকরো টুকরো অংশ শুনতাম, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপর, সব শেষে, নানী আমার গা ধরে ঝাঁকুনি দিতেন আর আমি চোখ খুলে রঙিন কাঁচের জানালা দিয়ে সূর্যালোককে প্রবাহিত হয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখতাম।

ধর্মীয় প্রতীকের অনেকগুলি আমার উপর একটা সংবেদনশীল আবেগাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। জীবনের যে নাটকীয় চিত্র চার্চ তুলে ধরতো আমি তাতে সাড়া দিতাম। মৃত্যুকে একমাত্র চিন্তার বিষয় করে দিনের পর দিন বেঁচে থাকা, মানুষ প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা, এটা আমার মধ্যে সকল জীবনের প্রতি একটা সহৃদয় স্পর্শকাতরতা জাগিয়ে তোলে, নিয়তি সম্পর্কে আমার ভেতর একটা মধুর ও বিষণ্ন বোধ উৎসারিত হয়, যে-বোধ আমি ইতিমধ্যে জীবন থেকে লাভ করেছিলাম তা এখন স্তোত্রগীতিগুলি থেকে পাওয়া বোধের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু

পরিপূর্ণ আবেগগত ও বৌদ্ধিক বিশ্বাস আমি কখনো অর্জন করি নি। জীবনের বোধ ও ধারণা আমি যদি চার্চ থেকে প্রথম লাভ করতাম তাহলে হয়তো আমার পক্ষে পুরোপুরি বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করা সম্ভব হতো, কিন্তু জীবনের মানচিত্রহীন পরিবেশসমূহ আমার ব্যক্তিত্বকে গড়ে আকৃতিদানের অনেক পরে স্তোত্রগীতিগুলি এবং গির্জার ধর্মীয় ভাষণসমূহ আমার হৃদয়ে হানা দেয়। আমার মনে হয় চার্চ আমার মধ্যে জীবনের যে বোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে তা আমার ভেতর ইতিমধ্যে বিরাজমান, এবং পরিমানে আমার মধ্যে মৌলিক কোনো প্রভাব পড়ে না।

জাউ আর ওয়োরের চর্বিতে রান্না করা ঝোল খেয়েও আমার শরীরের বৃদ্ধি ঘটে। এটা ছিল একটা অলৌকিক ব্যাপার, যার জন্য চার্চের অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করা উচিত ছিল। আমি যে খাবার খেয়ে আমার দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করি তা একটা প্রমাণ সাইজের কুকুরকেও বাঁটকুল করে ফেলতে পারতো। আমার রক্তে গ্রন্থিগুলি রস সঞ্চার করতে থাকে, বসন্তকালে উদ্ভিদদেহে যেমন প্রাণরস সঞ্চারিত হয় সেইভাবে, ওই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে আমি বালিকা ও রমণীদের বিচিত্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি। গির্জার এন্তার তথা অন্যতম কর্মচারীর স্ত্রী ধর্মসঙ্গীতে নেতৃত্বদানকারী দলের সদস্যরূপে সঙ্গীতে অংশ নিতেন। আমি তার প্রেমে পড়ে যাই। বারো বৎসরের এক বালকই পারে ওই রকম সুদূর ও অলভ্য কোনো রমণীর আরাধনায় মগ্ন হয়ে যেতে। প্রার্থনার সময় আমি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, তার সঙ্গে বিয়ে হলে কেমন লাগতো মনে মনে তা ভাবতাম, উনি কী রকম আবেগপূর্ণ সে কথা চিন্তা করতাম। দেহজ কামনার প্রথম স্ফুরণ যে আমার মধ্যে একটা পবিত্র স্থানে ঘটে সেজন্য আমার বিবেক কোনো অস্বস্তি বোধ করে নি। বিকাশোন্মুখ কামসজ্ঞি আর স্তোত্রগীতিগুলির বেদনাতুর একাকীত্ব আমার মধ্যে কোনো অপরাধবোধ জাগায় নি।

এটা সম্ভব যে মধুর সুললিত স্তোত্রগীতিগুলি আমার যৌনতাকে উদ্দীপিত করেছিল এবং তার প্রতিক্রিয়াতেই হয়তো আমার শরীরী মায়াকল্পনাগুলি আমার ইতিমধ্যে ক্ষীত অনুভূতিসমূহের উপর ভর করে আমাকে মর্মকামী প্রার্থনার অনুরাগী করে তোলে। এটাও খুবই সম্ভব যে পাপের যে সর্পকুল আমার হৃদয়ের কুঠুরিতে ঘোরাঘুরি করছিল তারা স্তোত্রগীতি এবং আমার স্বপ্নমালা উভয় কর্তৃকই কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল ক্ষুধার সঙ্গে আর পরস্পরকে তারা সমৃদ্ধ করে চলেছিল। চার্চের আধ্যাত্মিক জীবন নিঃসন্দেহে আমার হীন কামনা এবং মাংসের জন্য আমার রক্তের দপদপানি দ্বারা কলুষিত হয়েছিল, কারণ আমি গির্জা কর্মচারীটির স্ত্রীর পানে ঘন্টার পর ঘন্টা অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, চেষ্টা করতাম তার চোখকে আমার চোখের উপর ফেলতে, তাকে সম্মোহিত করতে চেষ্টা করতাম, চেষ্টা করতাম আমার চিন্তার মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। আমার কামনাগুলিকে যদি একটা বাস্তব ধর্মীয় প্রতীকী রূপ দেয়া যেত তাহলে সেই প্রতীক কতকটা এই রকম হতো–দু'শিং বিশিষ্ট একটা কালো খুদে শয়তান; লম্বা,

বাঁকানো দ্বিধাবিভক্ত লেজ; চেরা দ্বিখন্ডিত খুর, ঔশসৃক্ত নগ্ন শরীর; চেরা আঁচালো আঙুল; ঈষৎ অদ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঠোঁট, এবং গির্জা-কর্মচারীর স্ত্রীর মুখের দিকে বুভুক্ষুর মতো তাকিয়ে থাকা কামুক দুটি চোখ...ধর্মীয় উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সময় একটি পুনর্জাগরণী অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। আমি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ও সবর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি আর ধর্মীয় স্কুলে পড়বো না। নানী অনুভব করলেন যে পাবলিক স্কুলের পাপের আঙ্গিনায় আমি প্রবেশ করবার আগেই তিনি আমাকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করার শেষ সুযোগটি ওই পুনর্জাগরণী অনুষ্ঠানের সময় পেতে পারেন। আন্টি খালার বৈরিতা লক্ষ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। হয়তো তিনি এ উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে ক্ষুদ্র অহমিকার চাইতে আমার পরাভূত আত্মাকে রক্ষা করা অধিকতর মূল্যবান। আমার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল এই রকম– রিচার্ড, কোনো একটা চার্চের মাধ্যমে ঈশ্বরকে তোমার জানা উচিত।

গোটা পরিবার সদয় ও ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে কিন্তু এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারি এবং এর ফলে তাদের সঙ্গে আমার আবেগগত দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। আমার কতিপয় সহপাঠী, যারা তাদের বাবা-মায়ের পরামর্শে আমাকে এড়িয়ে চলতো, তারা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদেরকে কী বলতে শেখানো হয়েছে আমি তা মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলতাম। একটি ছেলে, তার বাড়ি ছিল রাস্তার ওপারেই, এক বিকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার আত্মসচেতন ভাবভঙ্গি দেখেই আমি তার অভিসন্ধি বুঝে ফেলি। সে এমন অতি-সরল ও এলোমেলোভাবে কথা বললো যে আমি তার পবিত্র যড়যন্ত্রের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত দেখতে পেলাম, আর নানীর কুশলী অভিযান-যন্ত্রের ক্যাচকোচ শব্দও শুনতে পেলাম। ছেলেটি বললো, রিচার্ড, আমরা সবাই যে তোমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা কি তুমি জানো?

আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত? কে আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত? আমার গলায় কপট বিস্ময়ের সুর ফুটে ওঠে।

ছেলেটি আমার চোখে চোখ না রেখে বললো, আমরা সবাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

দুঃখের সঙ্গে ছেলেটি বললো, তুমি ত্রাণ লাভ করো নি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি ঠিক আছি।

হেসো না, রিচার্ড। এটা হাসির বিষয় নয়।

কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে আমি ঠিক আছি।

শোনো, রিচার্ড, আমি তোমার একজন ভাল বন্ধু হতে চাই।

আমার ধারণা ছিল যে আমরা বেশ ভাল বন্ধু।

আমরা সত্যিকার ভাই হবো, যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে।

আমি নিচু গলায় ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললাম, আমরা তো একে অন্যকে জানি।

কিন্তু খ্রিস্টের মাধ্যমে নয়।

আমার কাছে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই।

কিন্তু তুমি কি তোমার আত্মার মুক্তি চাও না?

সে যে রকম আত্মার কথা ভাবে আমি যে সে রকম আত্মার অধিকারী নই তাকে সেকথা বলার পরিবর্তে আমি বললাম, দেখো, ধর্মের ব্যাপারটা আমি অনুভবই করতে পারি না।

তুমি কি কখনো সত্যি সত্যি ঈশ্বরকে অনুভব করার চেষ্টা করেছো?

না। কিন্তু আমি জানি যে ও রকম কোনো কিছু আমি অনুভব করতে পারবো না।

রিচার্ড, ব্যাপারটা তুমি এভাবে ছেড়ে দিতে পারো না।

ছেড়ে দেবো কেন?

ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করো না, রিচার্ড।

আমি তোমাকে বলছি যে ঈশ্বরকে আমি কখনোই অনুভব করবো না। কোনো লাভ নেই এ সম্পর্কে কথা বলে।

তুমি কি অহমিকা আর অসার দম্ভের উপর তোমার আত্মার নিয়তিকে ছেড়ে দেবে?

এসব ব্যাপারে আমার কোনো অহমিকা আছে বলে আমি মনে করি না।

রিচার্ড, শুধু একবার স্মরণ করো যে তোমার জন্য যিশু খ্রিস্ট মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁর রক্তপাত করেছেন, ক্রুশকাঠে তাঁর অমূল্য রক্ত ঝরিয়েছেন।

আমি সাহস করে বলে ফেললাম, অন্যরাও তো রক্ত ঝরিয়েছেন।

কিন্তু দুটো এক জিনিস নয়। তুমি বুঝতে পারছো না।

আমার মনে হয় না যে আমি কোনোদিন বুঝতে পারবো।

রিচার্ড, ভাই রিচার্ড, এই জগতের আঁধারে তুমি পথ হারিয়েছো। চার্চকে সাহায্য করতে দিতেই হবে তোমাকে।

আমি তোমাকে বললাম তো আমি ঠিক আছি।

বাড়ির ভেতরে চলো, আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করবো।

আমি তোমার অনুভূতিকে আহত করতে চাই না...

তা করতে তুমি পারবে না; আমি ঈশ্বরের জন্য কথা বলছি।

আমি ঈশ্বরের অনুভূতিকেও আহত করতে চাই না।

এর পূর্ণ অর্থ সম্পর্কে সচেতন হবার আগেই কথাগুলি অশ্রদ্ধা ভরে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

ছেলেটি স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে তার চোখের জল মোছে। আমি দুঃখিত হই।ও ফিসফিস করে বললো, ওকথা বলো না, ঈশ্বর হয়তো কোনোদিন তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

ধর্ম সম্পর্কে আমার মনোভাব তাকে বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়

না। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কিংবা করি না সে বিষয়ে আমি তখনো নিজের মনে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি। তাঁর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নিয়ে আমার কখনো কোনো দুশ্চিন্তা হয় নি। আমার যুক্তি ছিল এই রকম- যদি একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন, যিনি আদি ও অন্ত সব জানেন, সবার ক্ষেত্রে যিনি ন্যায় বিচার করেন, যিনি মানব নিয়তির নিয়ন্ত্রক তাহলে ওই ঈশ্বর নিশ্চয়ই জানবেন যে আমি তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান এবং তাঁকে আমার মূর্খ অস্বীকারের চেষ্টা দেখে তিনি অবশ্যই হেসে উঠবেন। আর ঈশ্বর যদি আদপেই না থাকেন তাহলে কেন এতো হৈ- হল্লা করার অকারণীয় বিশাল জগৎ পরিচালনা করার সময় একটু থেমে আমাকে নিয়ে ঈশ্বর ভাববেন এ আমি কল্পনা করতে পারি না।

জীবনে দুঃখযন্ত্রণা সম্পর্কে আমার মনের গভীরে একটা ধারণা প্রোথিত ছিল, কিন্তু তা যে আদি পাপের ফল সে কথা আমার কখনো মনে হয় নি। আসলে আমি মহাজাগতিক ভঙ্গিতে নিজেকে দুর্বল কিংবা পথ-হারা ভাবতে পারতাম না। চার্চ যেতে আমাকে বাধ্য করার পূর্ব পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে একটা মৌন সম্মতি দিয়েছিলাম কিন্তু তাঁর প্রাণীরা তাঁকে কিভাবে সেবা করে তা সরেজমিনে দেখার পর আমার মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। যেমনই তার প্রকৃতি হোক আমার বিশ্বাস ছিল জীবনের সাধারণ বাস্তবতার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, তার শেকড় ছিল আমার নেয়ের অনুভূতিসমূহের মধ্যে, আর আমার চিন্ত যা ধারণ করতে সক্ষম তার মধ্য, এবং ওই বিশ্বাস থেকে আমাকে নড়াবার সাধ্য কোনো কিছুর ছিল না, কোনো অদৃশ্য শক্তির ভয়ের তো নয়ই।

আমি ছেলেটিকে বললাম, ওসবের কোনো ভয় আমার নেই।

তুমি ঈশ্বরকে ভয় করো না?

না। কেন করবো? আমি তো তাঁর কোনো ক্ষতি করি নি।

কিন্তু তিনি খুব ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর।

আশা করি তিনি দয়ালু ঈশ্বরও বটে।

তুমি যদি দয়ালু হও, তাহলেই তিনি দয়ালু ঈশ্বর। কিন্তু তুমি যদি তাঁর দিকে না তাকাও তাহলে তিনিও তোমার দিকে তাকাবেন না।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমি একটা উপপ্রমেয়মূলক উক্তি করি। ঈশ্বর এবং জগতের দুঃখযন্ত্রণা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির সার কথাটুকু তার মধ্যে ফুটে ওঠে। যে-জীবন আমি যাপন করেছি, দেখেছি, অনুভব করেছি, ভয়, শঙ্কা, ক্ষুধা, আতঙ্ক এবং একাকীত্বের যে-যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি, সেই জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার ওই উক্তি উৎসারিত হয়। আমি তাকে বলি, আমি যদি আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়েও এই জগতের দুঃখযন্ত্রণা রোধ করতে পারতাম তাহলে আমি তাই করতাম, কিন্তু কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

ও আমার কথা শুনলো কিন্তু কিছু বললো না। ওকে আরো কিছু কথা বলার ইচ্ছা হয় আমার কিন্তু আমি বুঝি তা হতো নিরর্থক। আমার চাইতে বয়সে বড় হলেও সে নিজে নিজে জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে নি, কিছুই অনুভব করে নি। তার মা-বাবা তাকে সযত্নে লালন করেছেন, কি অনুভব করতে হবে তাকে সবটা তা বলে দেয়া হয়েছে।

আমি তাকে বললাম, রাগ ক'রো না।

ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে সে বিদায় নেয়। তারপর নানী শুরু করলেন তাঁর অভিযান পর্ব। কোনো সন্দেহ নেই যে ছেলেটি তাঁকে আমার ঈশ্বর ও ধর্মনিন্দার কথা বলেছিল। কারণ তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আমাকে সাবধান করে দিলেন যে আমি আগুনের সরোবরে চিরদিনের জন্য পুড়ে মরবো। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের দিন যত এগিয়ে আসে আমার উপর চাপ ততো বাড়তে থাকে। সামান্য কোনো কাজে আমি হয়তো খাবার ঘরে গেছি আর আমি সেখানে নানীকে দেখতে পাই, চেয়ারে মাথা ঠেকিয়ে তিনি নতজানু হয়ে তীব্র ফিসফিস স্বরে আমার নাম উচ্চারণ করে প্রার্থনা করছেন। অকস্মাৎ বাড়ির সর্বত্র ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখা যায়, এমনকি অ্যাডি খালার ভ্রূকুটিভরা চিন্তিত মুখেও। আমার মনের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। কখন আমি এখান থেকে চলে যেতে পারবো তার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকি। ওরা আমাকে সারাক্ষণ ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য এমনভাবে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে যে ওদের আহত না করে তা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওরা যেন আমাকে ঘৃণা না করে এমনভাবে না বলার একটা পথ আমি মরীয়া হয়ে খুঁজি। নষ্টি স্বীকার করার আগে আমি বাড়ি থেকে চলে যাবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি। তারপরই আমি একটা ভুল করি আর নানীর আত্মাকে প্রচণ্ড আঘাত দিই। তাঁকে আঘাত দেয়া বা অবমাননা করার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। শ্রেষ্ঠটা ছিল এইখানে যে আমার প্রতি নানীর ব্যর্থ অনুভূতিকে প্রশমিত করার জন্য আমি যে পরিকল্পনা করি তা সে উদ্দেশ্য সাধন করার পরিবর্তে তাঁর জন্য নিয়ে আসে তাঁর মোটা ধর্মীয় জীবনের সব চাইতে বড় লজ্জা ও অবমাননা।

এক সন্ধ্যায় গির্জার এডারের ভাষণ শোনার সময়– তাঁর কথা শোনার জন্য আমি তাঁর স্ত্রীর মুখের উপর থেকে আমার দৃষ্টি একটুক্ষণ সরিয়ে নিয়েছিলাম, যদিও আমার ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে তিনি তখনো তন্দ্রাতুর ভাবে পড়েছিলেন– জেকব কিভাবে দেবদূতকে দেখতে পান তিনি তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন। তৎক্ষণাৎ আমি অনুভব করলাম যে বিশ্বাস করবার আগে আমার যে একটা প্রমাণ দরকার সে কথা নানীকে বলার একটা পথ আমি পেয়ে গেছি। যা আমি দেখতে পাই না কিংবা অনুভব করতে পারি না তেমন কিছুতে আস্থা স্থাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আমি ওঁকে বলবো যে আমি যদি একটি দেবদূতকে দেখি তাহলে সেটা হবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিসংবাদিত প্রমাণ, এবং তখন আমি নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হবো। নানী নিঃসন্দেহে এ ধরনের মনোভাব বুঝতে পারবেন। এই যুক্তি তুলে ধরার সাহস আমাকে যোগায় আমার দৃঢ়

বিশ্বাস যে কখনোই আমি কোনো দেবদূতের সাক্ষাৎ পাবো না, আর পেলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাবার মতো সাধারণ জ্ঞান আমার থাকবে। আমার মনের মধ্যে এই চমৎকার আইডিয়াটি বুদ্বুদের মতো উপরাগ করতে থাকে। আমার মনে হলো এর মাধ্যমে আমি আমার আত্মার জন্য নানীর ভয়কে দূর করতে পারবো, আমি তাঁকে বোঝাতে পারবো যে আমার অন্তর পুরোপুরি তমসাচ্ছন্ন নয়, আমি সত্যি সত্যি তাঁর কাকুতি-মিনতি নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করি। আমি তাঁর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললাম, নানী, আমি যদি জেকবের মতো দেবদূতকে দেখতাম তাহলে আমি বিশ্বাস করতাম।

নানী কাঠ হয়ে যান, অবাক চোখে তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন, তারপরই তাঁর সাদা কুঞ্চি মুখ একটা সানন্দ হাসিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে। তিনি মাথা নেড়ে সস্নেহে আমার হাত চাপড়ে দিলেন। আমি ভাবলাম, এবার তিনি অন্তত কিছুদিনের জন্য শান্ত থাকবেন। ধর্মীয় ভাষণ চলাকালে নানী কয়েকবার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসা করলেন। হাঁ, এখন তিনি বুঝতে পারবেন যে আমি তাঁর অনুরোধ আমার মন থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিই নি।... আমার পরিকল্পনা কার্যকর হচ্ছে অনুভব করে আমি বিশোধিত বিবেক নিয়ে এডারের স্ত্রীর আরাধনায় মগ্ন হই, তাকে চুমু খেলে কেমন লাগবে তা কল্পনা করি, আমার পড়াশোনা আমাকে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অনুভূতিসমূহ সম্পর্কে সচেতন করেছিল তার একটু স্বাদ গ্রহণের জন্য আমি লালায়িত হয়ে উঠি। এক সময় ভাষণ শেষ হয়। নানী সঙ্গে সঙ্গে গির্জার সামনে ছুটে গিয়ে এডারের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কিছু কথা বলেন। এডার বিস্মিত হয়ে আমাকে লক্ষ্য করলেন। ওহ, গড ড্যাম, নানী ওকে বলে দিচ্ছেন। আমার খুব রাগ হয়। কিন্তু আমি তখনো হাজার ভাগের এক ভাগও অনুমান করতে পারি নি।

এডার দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমি উঠে দাঁড়াই। তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে আমি তাঁর করমর্দন করি।

তিনি ভয় ও শ্রদ্ধা মেশানো গলায় বললেন, তোমার নানী আমাকে বলেছেন।

রাগে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। আমি বললাম, আমি চাই নি যে তিনি আপনাকে বলেন।

তিনি বলেছেন তুমি দেবদূতকে দেখেছো! কথাগুলি আক্ষরিকভাবে তাঁর মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসে।

আমি এতো অভিভূত হয়ে যাই যে আমাকে দাঁতে দাঁত টিপে রাখতে হয়। অবশেষে আমি তাঁর বাহু আঁকড়ে ধরে বললাম, না, না, স্যার। আমি তোথলাতে তোথলাতে বললাম, ও কথা আমি বলি নি। তিনি ভুল বুঝেছেন।

এ রকম একটা গোলমাল পাকাবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এডার বিভ্রান্ত হয়ে চোখ পিটপিট করেন। তিনি জিজ্ঞাস করলেন, ওঁকে তুমি কি বলেছো?

আমি ওঁকে বলেছি যে আমি যদি দেবদূতকে দেখতে পাই তাহলে আমি বিশ্বাস

করবো। নিজেকে খুব বোকা-বোকা লাগে আমার। আমি লজ্জা বোধ করি, আমার বিশ্বাস পরায়ণ নানীকে আমি একই সঙ্গে ঘৃণা ও অনুকম্পা করি। এন্ড্রারের মুখ বিবর্ণ ও ব্যথাদীর্ণ হয়ে ওঠে। হতাশায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তুমি... তুমি দেবদূত দেখো নি?

তাঁর প্রশ্নের জবাবে আমি জোর দিয়ে বললাম, না, স্যার। এ ব্যাপারে যেন সম্ভাব্য আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয় সেজন্য আমি সবেগে আমার মাথা নাড়ি।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওহ, আচ্ছা। আকুলভাবে তিনি গির্জার কোণার দিকে তাকালেন। তিনি আশাভরে ইঙ্গিত করলেন, একটা কথা কি জানো? ঈশ্বর ইচ্ছা করলে সবই সম্ভব।

আমি বললাম, সত্যিই আমি কিছু দেখে নি। ব্যাপারটার জন্য আমি দুঃখিত।তিনি বললেন, তুমি যদি প্রার্থনা করো তবে ঈশ্বর তোমার কাছে আসবেন। হঠাৎ গির্জা ভীষণ গরম মনে হয়। আমার ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। আর কোনোদিন আমি এখানে ফিরে আসবো না। কিন্তু এন্ড্রার আমার বাহু ধরে থাকেন, আমাকে নড়তে দেন না।

আমি বললাম, এন্ড্রার, গোটা ব্যাপারটাই একটা ভুল। এ রকম কিছু ঘটুক আমি তা কখনোই চাই নি।

তিনি বললেন, শোনো, রিচার্ড, আমি তোমার চাইতে বয়সে বড়। আমার মনে হয় তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের দান আছে। আমাকে নিশ্চয়ই সন্দিহান দেখিয়েছিল, কারণ তিনি বললেন, সত্যিই আমার তাই বিশ্বাস।

আমি ওঁকে মিনতি করে বললাম, এন্ড্রার, দয়া করে এ বিষয়ে আপনি আর কাউকে কিছু বলবেন না।

তাঁর মুখ আবার একটা অস্পষ্ট আশায় জ্বলজ্বল করে ওঠে। তিনি বললেন, তুমি লজ্জা পাচ্ছো, তাই তুমি কথাটা আমাকে বলতে চাও না, তাই না? শোনো, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তুমি যদি দেবদূতকে দেখে থাকো তাহলে আমাকে বলো সে-কথা।

আমি আর কথা বলে অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি শুধু আমার মাথা নাড়তে থাকি। তাঁর সামনে কোনো কথা বলা মনে হলো অর্থহীন। তিনি বললেন, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে তুমি প্রার্থনা করবে। প্রার্থনা করলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন।

আমি আমার মুখ ঘুরিয়ে নিই, তাঁর জন্য লজ্জা বোধ করি। আমার মনে হয় ওভাবে তাঁর আশাকে বল্গাহীন তুঙ্গে তুলে দিয়ে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা অশ্লীল কাজ করেছি। তাঁর উদগ্র আশার জন্য তাঁর প্রতি আমার দুঃখ জেগে ওঠে। আমি তাঁর সামনে থেকে সরে যেতে চাই। অবশেষে তিনি আমাকে যেতে দেন। যাবার আগে তিনি আমাকে ফিসফিস করে বললেন, আমি কোনো এক সময় তোমার সঙ্গে আবার কথা বলতে চাই।

চার্চের সদস্যরা চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছিলেন। আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। নানীর প্রশান্ত নিষ্পাপ হাসি আমার মুখের উপর জ্বলজ্বল করে আর আমার ভেতরটা পূর্ণ হয়ে যায় একটা হতাশার অনুভূতিতে। তিনি যে ও রকম একটা ভুল করলেন তার কারণ একটাই। তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিবেশ তাঁকে ওই রকম একটা কিছু প্রত্যাশার করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিল। তিনি অন্য সব সদস্যদের ব্যাপারটা বলে দেন। এখন সবাই এটা মানে, এন্ড্রারের স্ত্রীও জানে! ওইখানে তারা দাঁড়িয়ে আছে, চার্চের সদস্যবৃন্দ, তাদের মুখের উপর সানন্দ বিস্ময়ের ছাপ, নিজেদের মধ্যে তারা ফিসফিস করে কথা বলছে। সম্ভবত ওই মুহূর্তে আমি ভাষণ দানের বেদিতে আরোহণ করে সবাইকে আমার অনুগামী করতে পারতাম। সম্ভবত সেটা হতো আমার বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

নানী আমার কাছে ছুটে এসে প্রবল বেগে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর দু'চোখে আনন্দাশ্রু। আর তখন আমি হড়বড় করে আবেগময় ভাষায় তাঁকে বকুনি দিলাম, আমাকে ভুল বোঝার জন্য তাঁকে তিরস্কার করলাম। অন্যরা তৎক্ষণে আমার ও নানীর চারপাশে এসে জড়ো হয়েছিলেন। আমি নিশ্চয়ই অনাবশ্যক রকম উচ্চকণ্ঠ এবং কর্কশভাবে কথা বলেছিলাম, কারণ নানী অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কাছ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে গির্জার এক কোণায় চলে যান। সেখান থেকে তিনি শীতল পাথরের মতো মুখে আমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। আমি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাই। আমি তাঁর কাছে গিয়ে কেমন করে এই ব্যাপারটা ঘটলো তাঁকে তা বলার চেষ্টা করি।

তিনি ভাঙ্গা গলায় আমাকে বললেন, আমার সঙ্গে কথা বলা তোমার উচিত হয় নি। তাঁর মোহমুক্তির গভীরতা তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে।

বাড়ি ফেরার পথে তিনি একটা কথাও বললেন না। আমি উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁর পাশে পাশে চলি, তাঁর ক্লান্ত প্রবীণ সাদা মুখের দিকে আর তাঁর ঘাড় আর কালো গাঢ় অপেক্ষমাণ চোখ আর ক্ষীণ দুর্বল দেহের কুঞ্চনগুলি লক্ষ্য করি। ধর্মের অর্থ, যা নেই এবং যা কখনো হবে না তার জন্য মানুষের হৃদয়ের ক্ষুধা আর মানবজীবনের নিষ্করুণ সীমাবদ্ধতাকে জয় ও অতিক্রম করার জন্য মানবাত্মার তৃষ্ণা সম্পর্কে আমি যা জানতাম বলে তিনি মনে করতেন আসলে আমি তার চাইতে অনেক বেশি জানতাম।

পরে আমি তাঁকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হই যে তাঁকে আঘাত দেয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। তাঁর অনুভূতি সম্পর্কে আমার দুশ্চিন্তা হয়েছে এটা বোঝা মাত্র তিনি আমাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আমার জন্য আরেকটা চেষ্টা করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি শত্রু বিসর্জন করলেন, প্রার্থনা করার জন্য আমাকে মিনতি করলেন, আমাকে সত্যিকার প্রার্থনা করতে হবে, কষ্ট করে প্রার্থনা করতে হবে, চোখে জল না আসা পর্যন্ত করতে হবে...আমি অনুনয় বিনয় করলাম, নানী, আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলো না।

তিনি বললেন, কিন্তু তোমাকে যে প্রতিজ্ঞা করতেই হবে, তোমার আত্মার স্বার্থে।

আমি প্রতিজ্ঞা করি। অনবধানতাবশত তাঁর চার্চের সদস্যদের সামনে তাঁকে আমি যে রকম হাস্যাস্পদ করেছিলাম তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে আমার অবশ্যই কিছু করা উচিত।

প্রতিদিন আমি দোতলায় আমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নতজানু হই, প্রার্থনা করার চেষ্টা করি, কিন্তু যাই আমি বলার চেষ্টা করি, তাই আমার কাছে খুব বোকাটে মনে হয়। একবার তা এমন উদ্ভট মনে হয় যে আমি নতজানু অবস্থাতেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠি। না, কোনো লাভ নেই। আমি কোনোদিন প্রার্থনা করতে পারবো না। কিন্তু আমার ব্যর্থতা আমি লুকিয়ে রাখি। আমার স্থির বিশ্বাস জন্মে যে আমি যদি কখনো প্রার্থনা করতে সক্ষম হই তাহলে আমার কথাগুলি নিঃশব্দে ছাদে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে আবার পালকের মতো আমার উপর ঝরে পড়বে।

আমার প্রার্থনা প্রয়াস একটা উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণে আমার দিনগুলি নষ্ট হয়ে যায়। নানীকে কথা দেয়ার জন্য আমার অনুতাপ হয়। তবে আমার ঘরে সময় কাটাবার একটা পথ আমি পেয়ে যাই। তখন সময় যেন পাখায় ভর করে হাওয়ায় উড়ে যায়। আমি বাইবেল, কাগজ, পেন্সিল আর একটা ছন্দের অভিধান সামনে নিয়ে স্তোত্রসঙ্গীতের জন্য কবিতা লেখার চেষ্টা করি। আমি আমার কাজের একটা যৌক্তিকতা খুঁজে পাই, যদি আমি একটা যথার্থ ভাল স্তোত্রগীতি লিখতে পারি তাহলে নানী হয়তো আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমি ব্যর্থ হই, হোলি গোস্ট আমার ধারে কাছেও আসে না...একদিন আমার প্রার্থনার সময়টা কোনো রকমে পার করাবার চেষ্টা করার সময় গত বছর আমি যে রেড ইন্ডিয়ানদের ইতিহাসের কয়েক খণ্ড পড়েছিলাম তার কথা আমার মনে পড়ে। হ্যাঁ, আমি কী করবো সেটা আমি এখন জানি। আমি ওদের নিয়ে একটা গল্প লিখবো... কিন্তু ওদের কী নিয়ে লিখবো? তো, একটি রেড ইন্ডিয়ান মেয়ে... আমি একটি রেড ইন্ডিয়ান কুমারী কন্যার কথা লিখলাম, সুন্দরী, চাপা স্বভাবের, সে একটা প্রশান্ত স্রোতস্বিনীর তীরে একাকী বসে থাকে, তার চারপাশে অন্তহীন গোধূলি আর প্রাচীন তরুরাজি, মেয়েটি অপেক্ষা করে... সে একটা শপথ পালন করছে, কী তা আমি বর্ণনা করতে পারি না, এবং গল্পটা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবো তা বুঝতে না পেরে আমি স্থির করি যে তাকে মরতে হবে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে কালো স্রোতস্বিনীর দিকে এগিয়ে যায়, তার মুখ রাণীর মতো আর শীতল। সে জলের মধ্যে প্রবেশ করে, হাঁটতে থাকে, জল তার কাঁধ অবধি পৌঁছে যায়, তারপর তার চিবুক পর্যন্ত, অবশেষে তার সবটুকু ঢেকে ফেলে। মৃত্যুর মুহূর্তেও তার মুখ থেকে সামান্যতম গুঞ্জন বা হাঁফানোর শব্দ নির্গত হয় না।

আমি শেষ লাইনটা লিখলাম– এবং অবশেষে রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো আর সলিল সমাধির উপর স্থাপন করলো একটি কোমল চুম্বন, আর একমাত্র শব্দ হলো প্রাচীন নিঃসঙ্গ তরুরাজির মর্মরধ্বনির।

আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করি। সবটা আমি আবার পড়লাম, দেখলাম যে তার মধ্যে বিশাল ফাঁক রয়ে গেছে। কোনো প্লট নেই, অ্যাকশান নেই, পরিবেশ আর অনুভূতি আর মৃত্যু ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু আমি আমার জীবনে এ রকম কিছু আগে আর কখনো করি নি। যতো খারাপই হোক আমি একটা কিছু করেছি, আর জিনিসটা একান্ত আমারই ... এখন, কাকে আমি এটা দেখাতে পারি? আমার আত্মীয়দের মধ্যে কাউকে নয়। ওরা ভাববে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ঠিক করলাম আমাদের পাশের বাড়িতে যে অল্প বয়েসী মহিলা বাস করেন তাকে আমি এটা পড়ে শোনাবো। তিনি বাসন-কোসন ধুচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাজে বাধা দিয়ে, তিনি এটার কথা কাউকে বললেন না সে প্রতিশ্রুতি আদায় করে, জোরে জোরে আমার রচনাটা তাঁকে পড়ে শোনালাম। পড়া শেষ হলে তিনি বিচিত্র একটা ভঙ্গি করে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, তাঁর চোখ দুটি দেখালো বিভ্রান্ত এবং বিস্মিত।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি জন্য এটা?

আমি বললাম, কিছু না, এমনিই।

কিন্তু কেন তুমি এটা লিখলে?

লিখতে ইচ্ছা হলো, তাই।

আইডিয়াটা তুমি কোথায় পেলে?

আমি মাথা নাড়ি, মুখ বানাই, পাণ্ডুলিপিটা আমার কোটের পকেটে ঢোকাই, তারপর তার দিকে এমন ভারিক্কি ভঙ্গিতে তাকাই যেন বলছি ওহ্, এ কিছু না। আমি সারাক্ষণই এ রকম লিখি। কেমন করে লিখতে হয় জানলে ব্যাপারটা খুব সোজা। কিন্তু খুব বিনয়ী ও শান্ত কণ্ঠে আমি শুধু বললাম, ওহ্, আমি জানি না।

এখন এটা নিয়ে কি করবে তুমি?

কিছুই না।

তিনি যে কী ভাবলেন একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। লেখা বা নিজেকে লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছার মতো ভিন্নধর্মী আর কোনো কিছু আমার পরিবেশের মধ্যে ছিল না। কিন্তু আমার রচনা পড়ার পর আমি যখন ওই অল্প বয়েসী মহিলার মুখের দিকে তাকাই তখন তাঁর মুখে ফুটে ওঠা বিভ্রান্তি ও বিস্ময়ের কথা আমি কোনোদিন ভুলি নি। আমি কী করেছি বা কী করার চেষ্টা করেছি সেটা ধরতে পারার তাঁর অক্ষমতা আমাকে কোনো একভাবে তৃপ্তি দেয়। পরবর্তীকালে আমার যখনই তাঁর ওই প্রতিক্রিয়ার কথা মনে পড়েছে আমি ব্যাখ্যাতীত কোনো একটা কারণে সুখী চিত্তে মৃদু হাস্য করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

পাপী গণ্য করে আমাকে আর আলাদা করে না রাখায় আমার মনে হয় এখন আমি যেন আবার নিঃশ্বাস নিতে পারছি, আবার যেন বাঁচতে পারছি, যেন আমি একটা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছি। আতঙ্কের মহাজাগতিক প্রতিচ্ছবিগুলি এখন অপসৃত হয়েছে, বাইরের জগৎ বাস্তবতা লাভ করছে, প্রতিদিন তা আমার সামনে কাঁপছে। বিষণ্ন ভাবনায় ডুবে থাকা এবং বোকার মতো প্রার্থনা করার চেষ্টার পরিবর্তে আমি এখন দৌড়াতে ও ঘুরে বেড়াতে পারি, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারি, লোকজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারি, অন্যদের সঙ্গে জীবনের একটুখানি অংশ নিতে পারি, হয়ে– ওঠা এবং বাঁচার আমার যে-ক্ষুধা তা পূরণ করতে পারি। নানী ও অ্যাডি খালার আমার প্রতি আচরণ বদলে যায়। ওরা আমার আশা ছেড়ে দেন। ওরা আমাকে বলেন যে এই জগতের কাছে তাঁরা মৃত এবং তাঁদের রক্তের কেউ যদি সে-জগতে বাস করে তাহলে তারাও তাঁদের কাছে হবে মৃত। তীব্র ব্যাকুলতার জায়গায় তাঁদের মধ্যে দেখা যায় কঠিন শীতলতা ও বৈরিতা। কেবলমাত্র আমার মা, যিনি ইতিমধ্যে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, আমার সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ অব্যাহত রাখেন, আমাকে মন দিয়ে ভালভাবে পড়াশোনা করতে তাগিদ দেন, নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়টা পুষিয়ে নিতে বলেন।ঃ

মুক্তি কিছু সমস্যাও নিয়ে আসে। পাঠ্য বই-এর দরকার হয় আমার। সেগুলি যোগাড় করার জন্য আমাকে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়। নানী আমাকে জাগতিক কোনো বই পত্র কিনে দেবেন না। আমার জামাকাপড়ের অবস্থা ছিল করুণ। নানী আর খালা আমার প্রতি এতো বৈরি হয়ে ওঠেন যে তাঁরা আমাকে আমার নিজের কাপড় নিজে ধুয়ে ইস্ত্রি করে নেবার নির্দেশ দেন। খাওয়া-দাওয়ার অবস্থা তখনও ছিল খুব অপর্যাপ্ত, তবে আমি মাড়, শুয়োরের চর্বির ঝোল আর বাঁধাকপির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলাম। আমি স্কুলে যাই, আমি অনুভব করি যে আমার জীবন ততোটা পড়ালেখা শেখার উপর নির্ভর করছে না যতটা করছে অন্য একটা জগতের মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হবার মধ্যে।

জিম হিল পাবলিক স্কুলে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আমি কোথাও অব্যাহতভাবে এক বছরও পড়াশোনা করতে পারি নি। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ধর্মীয় স্কুলের এক বছর। তাছাড়া আমি যখনই কোনো স্কুল-টার্ম শুরু করেছি তখনই একটা কিছু তা ব্যাহত করে দেয়। আমার ব্যক্তিত্ব এর মধ্যেই ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিল। বাস্তব তথ্য বা ঘটনার জ্ঞানের চাইতে আমার অনুভূতির জ্ঞান হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি। আমি তখনও জানতাম না,

কিন্তু ওই চার বছরই ছিল আমার জীবনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের একমাত্র সুযোগ।

স্কুলের প্রথম দিনে চিরাচরিত সমস্যাটি দেখা দেয়। আবেগগত দিক থেকে আমি তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কি কি শর্তে আমাকে স্কুলের ময়দানে থাকতে দেয়া হবে? খাতা-পেন্সিল হাতে নিয়ে আমি ভ্রূক্ষেপহীনভাবে স্কুল-প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে যাই। আমার মাথায় একটা শক্ত সদ্য-কেনা শোলার টুপি। আমি ছেলেদের সঙ্গে মিশে যাই, আশা করি কেউ আমাকে লক্ষ্য করবে না, কিন্তু জানতাম যে আগে হোক কিংবা পরে হোক আমি যে নবাগত সেটা ঠিকই ওদের চোখে পড়বে। আর গন্ডগোলটা দ্রুত এসে উপস্থিত হয়। একটা কালো ছেলে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যায়, যাবার সময় হাতের ধাক্কায় আমার শোলার টুপি মাটিতে ফেলে দিয়ে চিঁচিয়ে ওঠে, স্ট্র কেটি!

আমি টুপিটা তুলে নিই। এবার আরেকটা ছেলে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যায়, আরো জোরে ধাক্কা দিয়ে আমার টুপিটা মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর চিৎকার করে বলে, স্ট্র কেটি!

আমি আবার টুপিটা তুলে নিয়ে অপেক্ষা করি। চিৎকার এবার ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেরা আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে গানের সুরে বলতে থাকে, স্ট্র কেটি! স্ট্র কেটি!

আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত ওরা আমাকে যথার্থ চ্যালেঞ্জ করেছে। কোনো বিশেষ একটি ছেলে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করে নি। আমি আশা করছিলাম যে আমাকে খোঁচানো বন্ধ হবে, আর আগামীকাল আমি আমার শোলার টুপি বাড়িতে রেখে আসবো। কিন্তু যে-ছেলেটি খেলাটা শুরু করেছিল সে আমার কাছে এগিয়ে এলো। সে বিদ্রূপের সুরে বললো, বাহ, মা আমাকে শোলার টুপি কিনে দিয়েছেন!

আমি তাকে সাবধান করে দিলাম, কী বলছো খেয়াল করে দেখো!

ছেলেটি বললো, দেখো, দেখো, ও কথা বলে!

ছেলেরা হো হো করে হেসে ওঠে, অপেক্ষা করে, আশা করে থাকে।

ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার বাড়ি কোথায়?

সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

দেখো, ওরকম চালিয়াতি করে কথা বলো না, বললে তোমার গায়ে চাকু বসিয়ে দেবো।

আমি বললাম, আমার যেমন খুশি সেভাবেই আমি কথা বলবো।

ছেলেটি একটা ছোট পাথরের টুকরো তার কাঁধের উপর রেখে আমার কাছে এসে বললো, ধাক্কা দিয়ে এটা ফেলে দাও তো!

আমি একটু ইতস্তত করলাম, তারপর হাত দিয়ে ওর কাঁধের উপর থেকে পাথরের টুকরাটা ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা নিচু করে তার পা জড়িয়ে ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। ছেলেদের মধ্য থেকে প্রচণ্ড হৈ হৈ রব ওঠে। আমি ভূপাতিত

ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গায়ে ঘুসি মারতে থাকি। তারপরই কে একজন ধাক্কা মেরে আমাকে সরিয়ে দেয়। আরেকটি ছেলে আমার সঙ্গে মারামারি করার জন্য এগিয়ে এসেছে। আমার শোলার টুপি ভেঙ্গে-চুরে গেছে, সেটা এখন বিস্মৃত বস্তু।

নতুন ছেলেটি বললো, এই, আমার ভাইকে মারবে না!

আমি চেঁচিয়ে বলি, একজনের সঙ্গে দুজনের লাগা ঠিক নয়!

ওই দুটি ছেলে এবার আমাকে ঘিরে ধরে। আমার মাথার পেছন দিকে আমি একটা আঘাত অনুভব করি। ঘুরে তাকাতেই দেখি যে একটা ইট গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। আমি টের পাই যে আমার পিঠ বেয়ে রক্তের প্রবাহ নেমে যাচ্ছে। আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখি বেশ কয়েকটা ইট এদিক ওদিকে পড়ে আছে। আমি কয়েকটা ইটের টুকরা আমার হাতে তুলে নিই। ছেলে দুটি পেছনে সরে যায়। ওরা আমাকে আবার ঘিরে ধরতেই আমি আমার লক্ষ্য স্থির করে একটা ইট ছুঁড়বার ভঙ্গি করতেই একটি ছেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দেয়। আমি ইটটা ছুঁড়ি, সেটা গিয়ে ছেলেটির পিঠের মাঝখানে লাগতেই সে আর্তনাদ করে ওঠে। আমি অন্য ছেলেটিকে স্কুল-প্রাঙ্গণের অর্ধেকটা পর্যন্ত তাড়িয়ে বেড়াই। অন্য ছেলেরা উল্লাস ভরে হৈ হৈ করে ওঠে, আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়, বলে যে আমি দুর্বলের উপর অত্যাচার করা দুটি ছেলের সঙ্গে লড়েছি। তারপরই হঠাৎ সব শান্ত হয়ে যায়, ছেলেরা সরে দাঁড়ায়। আমি দেখলাম যে একজন শিক্ষিকা আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছেন। আমি আমার ঘাড়ের কাছে রক্তের উপর হাতের চাপ দিই।

শিক্ষিকা জিজ্ঞাস করলেন, তুমি ওই ইটটা ছুড়েছো?

আমি বললাম, দুটি ছেলে আমার সঙ্গে মারামারি করছিল।

তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আমার সঙ্গে আসো।

গ্রেপ্তার হওয়া আমি শিক্ষিকার পেছন পেছন স্কুলে প্রবেশ করি। আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ওই দুই ভাই-এর মুখোমুখি দাঁড় করানো হলো।

শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করলেন, এরাই ওই ছেলে?

আমি বললাম, ওরা দুজন একযোগে আমাকে আক্রমণ করে। আমাকে পাল্টা লড়াই করতেই হয়।

এক ভাই চেঁচিয়ে ওঠে, ও আমাকে প্রথম মেরেছে!

আমি চেঁচিয়ে বলি, তুমি মিছে কথা বলছো!

শিক্ষিকা বললো, শোনো, এখানে ও রকম ভাষা ব্যবহার করবে না।

আমি বললাম, কিন্তু ওরা সত্য বলছে না। আমি এখানে নতুন এসেছি আর ওরা আমার টুপি দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে।

ছেলেটি আবার বললো, ও আমাকে প্রথম মেরেছে।শিক্ষিকা আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে ছেলেটার গালে একটা চড় কষিয়ে দিই। ছেলেটা একটা আর্তনাদ করে আমাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে।

শিক্ষিকা আমাদের দুজনকেই আঁকড়ে ধরে আমাকে উদ্দেশ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, কী কাণ্ড! তুমি এই স্কুলের মধ্যে মারামারি করার চেষ্টা করেছো! তোমার ধারণাটা কি?

আমি আবারো বললাম, ও সত্য কথা বলছে না।

তিনি আমাকে বসতে আদেশ করলেন। আমি বসি কিন্তু স্থির চোখে তাকিয়ে থাকি ওই দুই ভাই-এর দিকে। শিক্ষিকা ওদের দুজনকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যান। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি বসে থাকি।

তিনি ফিরে এসে বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না।

আমি বললাম, আমি কোনো দোষ করি নি।

তিনি বললেন, আমি জানি। কিন্তু তুমি একটা ছেলেকে, এইখানে, আমার সামনে মেরেছো।

আমি দুঃখিত।

তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আমাকে একটা ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। কি কারণে আমি বুঝলাম না, কিন্তু আমাকে পঞ্চম গ্রেডে পড়তে দেয়া হলো। ওরা কি ধরে ফেলবে যে আমি ওই গ্রেডের ছাত্র নই? আমি বসে বসে অপেক্ষা করি। আমাকে যখন আমার বয়স জিজ্ঞাসা করা হলো তখন আমি উত্তর দিই। আমি পুরীত হই।

আমি দিন-রাত পড়াশোনা করি। দু'ত্মাহের মধ্যে আমি ষষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত হই। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি দৌড়ে বাড়িতে এসে হড়বড় করে সবাইকে খবরটা দিই। এটা যে সম্ভব হতে পারে পরিবারের কেউ তা ভাবে নি। একটা খারাপ, অতি খারাপ ছেলে কিভাবে এ কাজটা করতে পারলো? আমি ওদের সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরে বললাম যে আমি ডাক্তারি পড়বো, গবেষণা করবো, নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করবো। সাফল্যের উত্তেজনায় আমি এক মুহূর্তও ভাবলাম না কোথা থেকে আমি মেডিক্যাল স্কুলে পড়া শেষ করার টাকা পাবো। কিন্তু যেহেতু আমি দু'সপ্তাহ সময়ের মধ্যে একটা গ্রেড লাফিয়ে পার হয়ে গেছি তাই সব কিছুই মনে হলো সম্ভব, সরল ও সহজ।

এখন আমার সহপাঠী ও সঙ্গী ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, মারামারি করছে, কথাবার্তা বলছে। এসব আমার সত্তায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করে, আমার গ্রহণ-ক্ষমতাকে একটা উচ্চ তীক্ষ্ণ স্তরে তুলে দেয়। আমি উপলব্ধি করি যে আমার জীবন পৃথিবীর এমন একটা বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে আমাকে বড় হবার পর যার মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে আমাকে লড়াই করতে হবে। মিসিসিপিতে একটি কৃষ্ণাঙ্গ বালকের সামনে ভবিষ্যৎ যতটুকু বাস্তবতা নিয়ে দেখা দিতে পারে হঠাৎ আমার সামনে ভবিষ্যৎ ততটুকু বাস্তবতা নিয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

স্কুলে আমার সহপাঠীদের বেশির ভাগ সকালে, রাতে ও শনিবার কাজ করতো। তারা যা রোজগার করতো তা দিয়ে তারা নিজেদের জামাকাপড় ও বইপত্র কিনতো, আর

স্কুলে তাদের পকেটে টাকা-পয়সা থাকতো। দুপুরে বিরতির সময় একটা ছেলে মুদি দোকানে যাচ্ছে, তাকভর্তি জিনিসপত্রের উপর চোখ বুলাচ্ছে, তার পছন্দ অনুযায়ী একটা জিনিস বেছে নিচ্ছে- হয়তো দশ পয়সা দামেরই একটা কিছু- এই দৃশ্য আমার কাছে অলৌকিক বলে মনে হতো। কিন্তু আমি যখন নানীর কাছে কাজ করার কথা তুললাম তিনি তা কানেই নিলেন না। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে তাঁর বাড়িতে বাস করে আমি শনিবার কোনো কাজ করতে পারবো না। আমি যখন বললাম যে একমাত্র শনিবারই অর্থপূর্ণ কোনো কিছু রোজগার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে তখন তিনি সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলেন- 'কিন্তু শনিবার হলো ঈশ্বরোপাসনা ও বিশ্রামের দিবস। সেদিন তুমি কোনো কাজ করবে না, তুমি না, তোমার ছেলে না, তোমার মেয়েও না, তোমার পুরুষ ভৃত্য নয়, তোমার মেয়ে ভৃত্য নয়, তোমার ষাঁড় নয়, তোমার গাধা নয়, তোমার কোনো গরু-বাছুরও নয়, তোমার বাড়িতে থাকা কোনো অপরিচিত ব্যক্তিও নয়... তোমার পুরুষভৃত্য ও তোমার মেয়েভৃত্যও সেদিন তোমার মতো বিশ্রাম গ্রহণ করবে...'

আর ওটাই ছিল শেষ কথা। আমাদের অবস্থা তখন ছিল প্রায় উপোস করার মতো, তথাপি, আমার রোজগারের অর্ধেক, এমনকি দুই তৃতীয়াংশ, নানীর হাতে তুলে দেবার কথা বলেও আমি তাঁকে আমার প্রস্তাবে রাজি করাতে পারি নি। তাঁর উত্তর ছিল, না, কখনো না। তাঁর অসম্মতি আমাকে ভীষণ অস্থির করে তোলে। একটা পাগলামির জীবন যাপনে আমাকে বাধ্য করার জন্য আমি নিজেকে শাপ-শাপান্ত করি। আমি নানীকে বলি যে আমার আত্মার জন্য তিনি দায়ী নন। তিনি উত্তরে জানালেন যে আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক, আমার আত্মার নিয়তি তাঁর হাতে, আর এ ব্যাপারে আমার কথা বলার কিছু নেই।আমার বাড়ি এবং জীবন সম্পর্কে সহপাঠীদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নাবলী থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং আমি যখন গ্রহণ করতে পারছোই না তখন তাদের আমন্ত্রণ এড়াবার লক্ষ্যে আমি স্কুলে ছেলেমেয়েদের সামনে খুব চাপা ও অতিরিক্ত সংযমী হয়ে থাকতাম, তাদের সঙ্গ চাইতাম কিন্তু তাদের ভুবন থেকে আমাকে যে কতোটা দূরে রাখা হচ্ছে তা তাদের অনুমান করতে দিতাম না, তাদের অসতর্ক বন্ধুত্বের মূল্য দিতাম কিন্তু তা গোপন রাখতাম, প্রচণ্ড আত্মসচেতন থাকতাম কিন্তু একটা দ্রুত মৃদু হাসি ও বাক্য দিয়ে তা আড়াল করতাম। প্রতিদিন দুপুরে আমি ছেলেমেয়েদের পেছন পেছন কোণার মুদি দোকানে গিয়ে ঢুকতাম, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ওদেরকে স্যান্ডউইচ কিনতে দেখতাম, আমি কেন লাঞ্চ খাই না জিজ্ঞাসা করলে একটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলতাম, 'ওহ, দুপুর বেলায় আমার কখনোই ক্ষিদা পায় না।' আর আমি যখন ওদেরকে তাদের রুটি দু'ভাগ করে তার মধ্যে সরস সার্ডিন মাছ সাজাতে দেখতাম তখন নিজের থুথু গলার ভেতর টেনে নিতাম। আমি বারবার, বারবার প্রতিজ্ঞা করতাম যে একদিন আমি এই ক্ষুধার অবসান ঘটাবো, এই দূরত্ব এবং সীমাহীন পার্থক্য ঘুচাবো। আমি একটুও সন্দেহ করি নি যে আমি কখনোই

তাদের জীবনের ভেতর অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশ করতে পারবো না, আমার নিয়তি হচ্ছে তাদের সঙ্গে বাস করা কিন্তু আমি কখনোই তাদের একজন হতে পারবো না, আমার পথ হবে বিচিত্র এবং আলাদা, আর পরবর্তী সময়ে যে জন্য তারা অবাক হয়ে ভাববে কেমন করে ওই পথে পদচারণা করতে আমি সক্ষম হই।

এমন আমি আমার চোখের সামনে একটা জগৎকে লাফ দিয়ে দাঁড়াতে দেখি, কারণ এখন সে-জগতটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। স্কুল ছুটি হলে আমি আর তখনই বাড়ি ফিরে যাই না। আমি ঘুরে বেড়াই, চারদিকে তাকাই, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, কথা বলি। সত্তি খাবার জন্য বাড়ি ফিরে গেলে নানী আর আমাকে বেরুতে দেবেন না, তাই ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতার মূল্য আমি দিতাম বারো ঘন্টা অভুক্ত থেকে। সকালে আটটার সময় আমি জাউ খেতাম, তারপর রাত সাতটা কিংবা তার পরে খেতাম এক প্লেট বাঁধাকপি। আমার পরিবেশে উপোস করে থাকাটা ছিল অযৌক্তিক, কিন্তু আমার ক্ষুধাও ছিল তাই। পিঠের উপর আমার বই-এর ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি কোনো একটা দলের সঙ্গে চলে যেতাম বনে, নদীতে, খালে, ব্যবসা-বাণিজ্য এলাকায়, বিলিয়ার্ড খেলার ঘরের দোরগোড়ায়, পয়সা না দিয়ে সুড়ৎ করে ঢুকে পড়তাম কোনো ছায়াছবির প্রেক্ষাগৃহে, কাছের কোনো ফুটবল খেলার গ্রাঙ্গণে, ইটের ভাটায়, করাত কলের আঙ্গিনায়, তুলাবীজের কারখানায়, সেখানে লক্ষ্য করতাম শ্রমিকদের কাজকর্ম। কখনো কখনো ক্ষুধা আমাকে খুব দুর্বল করে ফেলতো, হাঁটার সময় আমি টলে উঠতাম, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হঠাৎ ভীষণ বেড়ে যেতো, সারা শরীর কাঁপতো, মনে হতো এখনই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু মুক্তির আনন্দ আমাকে ক্ষুধার ঊর্ধে নিয়ে যায়, আমার দেহের অনুভূতিগুলিকে এমন একটা নিয়মানুবর্তিতা শেখায় যে আমি সাময়িকভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে যাই।আমাদের ক্লাসে একটি লম্বা, কালো, দুর্দমনীয় ছেলে ছিল, লেখাপড়ায় খুব মেধাবী, আর নিজের অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শঙ্কাহীন। যে কোনো মুহূর্তে সে তার ভাঁড়ামি দ্বারা ক্লাসের মনোবেগ ভেঙে দিতে পারতো, তাকে আয়ত্তে রাখার মতো কোনো পথ শিক্ষিকা খুঁজে পেতেন না। সে-ই আমার ক্ষুধার যন্ত্রণা লক্ষ্য করে এবং কিভাবে আমি কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি তার ইঙ্গিত দেয়। সে আমাকে একদিন বললো, তুমি সারাদিন স্কুলে কাটাবে অথচ কিছুই খাবে না, সেটা হয় না।

কেমন করে খাবো?

আমার মতো করো না কেন?

তুমি কি করো?

আমি খবরের কাগজ বেচি।

আমি বললাম, আমি কাগজ বিক্রির জন্য একটা এলাকা বেছে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোনো অঞ্চলই খালি নেই। কাগজ বিক্রির কাজ আমার ভাল লাগতো কারণ আমি

তাহলে কাগজ পড়তেও পারতাম। এখন আমি পড়ার জিনিস পাই না।

হাসতে হাসতে ছেলেটি বললো, তুমিও?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে?

ছেলেটি তখন বিশদ করে বললো, আমিও সেজন্যই কাগজ বিক্রি করি, আমি এখন কাগজ পড়তে পাই, এছাড়া আমার হাতে কাগজ পাওয়ার আর কোনো পথ নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাবা-মা কি তোমার কাগজ পড়ায় আপত্তি করেন?

হ্যাঁ, আমার বাবা একটা পাগলা প্রকৃতির মানুষ।কি কাগজ বিক্রি করো তুমি? শিকাগো থেকে প্রকাশিত একটা পত্রিকা। প্রতি সপ্তাহে একবার বের হয়, পত্রিকাটির একটি ম্যাগাজিন ক্রোড়পত্র আছে।

কি রকম কাগজ ওটা?

ইয়ে, আমি কখনো খবরের অংশ পড়ি না। সেখানে বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু, ওহোঃ, ক্রোড়পত্র! কী সব গল্প! আমি এখন জেইন গ্রের 'রাইডার্স অব দি পার্পল সেইজ' পড়ছি।

আমি অবিশ্বাস ভরে চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকাই, অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করি, রাইডার্স অব দি পার্পল সেইজ? আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার কি মনে হয় আমি ওই পত্রিকা বিক্রি করতে পারবো?

অবশ্যই পারবে। আমি প্রতি সপ্তাহে পঞ্চাশ সেন্ট কামাই, তাছাড়া পড়ার জিনিস পাই।

আমি ওর সঙ্গে ওর বাড়িতে যাই। ও আমাকে খবরের কাগজটার একটা সংখ্যা দিলো, সঙ্গে ম্যাগাজিনের ক্রোড়পত্র।

খবরের কাগজটা পাতলা, বাজেভাবে সম্পাদিত, শ্বেতাঙ্গ গ্রামীণ প্রোটেসট্যান্ট পাঠকদের দিকে নজর রেখে মুদ্রিত।

ছেলেটি বললো, তাড়াতাড়ি করে এই কাগজ বেচতে শুরু করে দাও। গল্পগুলি নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।আমি ওকে কথা দিই যে আজ রাতেই আমি পত্রিকাটির অর্ডার দেবো। আমি পত্রিকাটি হাতে নিয়ে ঘনায়মান গোধূলির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পথ ধরি, পথেই পড়তে থাকি। কারো সঙ্গে যেন ধাক্কা না খাই সেজন্য থেকে থেকে কাগজের উপর থেকে চোখ তুলি আমি এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর গল্পের মধ্যে ডুবে যাই। ওই বিজ্ঞানী আর প্রাসাদোপম ভবনে পাথরের একটি ভূগর্ভস্থ রহস্য-কক্ষ নির্মাণ করেছে। কোনো একটা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে তার শিকারকে ওই ঘরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসে, তারপর একটা বৈদ্যুতিক সুইচ চালিয়ে দেয়। তখন ধীরে ধীরে ওই পাথরের ঘর বায়ুশূন্য হয়ে যায় আর বিজ্ঞানীর শিকাররা জ্বাল, নীল ও কালো হতে হতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই তো আমি চাই, এই রকম গল্প। কোনো রকম রুচি গড়ে তুলবার মতো পাঠের সুযোগ আমি পাই নি।

তেমন কিছু আমি কখনো পড়ি নি। যা কিছু আমার কৌতূহল জাগাতো তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম।

অবশেষে, এতোদিনে, আমি বাড়িতে বসে নানীর অনুমোদনক্রমে কিছু পড়ার সুযোগ পাই। কাগজ বিক্রি করার অনুমতি তিনি আগেই দিয়েছিলেন। কী কৌতুক যে নানী পড়তে পারেন না! এ পর্যন্ত আমি যেসব বই বাড়িতে এনেছি তাকে তাত্ত্বিক আখ্যা দিয়ে তিনি পুড়িয়ে ফেলেন, কিন্তু এবার তাঁকে তাঁর কথা রাখতে হলে এই পত্রিকাকে সহ্য করতে হবে। অ্যাভি বালার মতামতের কোনো মূল্য ছিল না, তাছাড়া আমার কোনো কিছুর প্রতি তিনি আর নজর দিতেন না। তাঁর চোখে আমি ছিলাম মৃত। আমি নানীকে বলেছিলাম যে কাগজ বিক্রি করে আমি কিছু অর্থ উপার্জনের কথা ভাবছি, আর তিনি রাজি হয়ে যান, মনে করেন যে এতোদিনে আমি একটি অচল ও সচিব ভাবনার ছেলে হয়ে উঠছি। ওই রাতেই আমি পত্রিকার অর্ডার দিই এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকি।

কাগজ এসে পৌঁছায়, আমি নিম্নো এলাকা চষে ফেলি, ধীরে ধীরে বড় একটা খদ্দেরের দল গড়ে তুলি। তারা কাগজ কিনতো পড়ার আগ্রহ থেকে যতোটা তার চাইতে বেশি এই কারণে যে তারা আমাকে চিনতো। রাতে বাড়ি ফেরার পর আমি আমার ঘরে গিয়ে, দরজায় তালা লাগিয়ে, দূরের কোনো দেশের বিচিত্র মানুষদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার গল্প পড়তাম আনন্দে শিহরিত হয়ে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো আমি আধুনিক জগতের জীবন ও বড় বড় নগরী সম্পর্কে সচেতন হলাম। তারা আমার মর্মমূল ধরে টান দেয়। আমি তাদের প্রেমে পড়ে যাই। নিছক গল্প হলেও আমি সেগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করি, কারণ আমি সেগুলি বিশ্বাস করতে চাই, কারণ আমি ভিন্ন একটা জীবনের জন্য, নতুন কিছুর জন্য, বুভুক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। এ যাবৎ আমি যা কিছুর সাক্ষাৎ পেয়েছি তার চাইতে অনেক বেশি পরিমানে জগৎ সম্পর্কে আমার জানের পরিধি বাড়িয়ে এই সস্তা জনপ্রিয় গল্পগুলি। গোলবাড়ি, মদের দোকানের দোরগোড়া আর নদী তীরের পটভূমিতে বেড়ে ওঠা আমার কাছে ওই সব গল্প ছিল দস্তুরমতো বৈপ্লবিক, পৃথিবীতে ঢুকবার প্রবেশ পথ।

আমি বেশ সুখে থাকি। আর আমি খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিন-ক্রোড়পত্র অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিক্রি করতে থাকতাম, যদি না পরিবারের একজনের বর্ষবাদী অহঙ্কার একটা বাধা হয়ে না উঠতো। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী, শান্ত, সংযমী, মৃদুভাষী একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, পেশায় কাঠমিস্ত্রী। এক বিকালে আমি কাগজ নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি আমাকে দশ সেন্টের একটা মুদ্রা দিলেন, তারপর কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করলেন।

তিনি আমাকে উদ্দেশ করলেন, জানো, বাবা, আমি অবশ্যই চাই যে তুমি প্রতি সপ্তাহে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করো। আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো, তোমাকে কে এই পত্রিকা বিক্রি করতে বলেছে? কেউ না।

কোথা থেকে তুমি পত্রিকাগুলি পাও?

শিকাগো থেকে।

তুমি কি কখনো এই পত্রিকা পড়ে দেখেছো?

নিশ্চয়। আমি ম্যাগাজিন অংশের গল্পগুলি পড়ি, খবরের কাগজ কখনো পড়ি না।

তিনি একটু চুপ করে থেকে জানতে চাইলেন, তোমাকে কি শ্বেতাঙ্গ একজন এই কাগজ বিক্রি করতে বলেছেন?

আমি উত্তর দিলাম, না।

আমি বেশ বিভ্রান্ত বোধ করি। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, এই পত্রিকার জন্য কোথায় লিখতে হয় সে কথা তুমি কেমন করে জানলে?

আমার এক বন্ধু এই কাগজ বিক্রি করে। সে আমাকে ঠিকানা দেয়।

তোমার এই বন্ধু কি শ্বেতাঙ্গ?

না, স্যার। ও কৃষ্ণাঙ্গ। কিন্তু আপনি কেন আমাকে এসব জিজ্ঞাসা করছেন?তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর বাড়ির সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসেছিলেন তিনি। তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এক মিনিট বসো, বাবা। আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

কি ব্যাপার? কোথায় কি গোলমাল হলো? পত্রিকা তো ঠিকই আছে, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। আমি অপেক্ষা করি, বিরক্ত হই, পত্রিকা নিয়ে নির্ধারিত জায়গায় জায়গায় যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠি। তাহলে আমি বাড়ি ফিরে, বিছানায় শুয়ে, রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক গল্পটার পরবর্তী কিস্তি পড়তে পারবো। ভদ্রলোক সযত্নে ভাঁজ করা খবরের কাগজের একটি সংখ্যা নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি আমার হাতে পত্রিকাটি দিয়ে, একটা গনগনে কার্টুনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এটা দেখেছো?

আমি জানালাম, না, স্যার। আমি খবরের কাগজ পড়ি না, আমি শুধু গল্পগুলি পড়ি।

নাও, এটা দেখো। তাড়াহুড়া নেই। পড়ে দেখে। তোমার কি মনে হয় আমাকে বলো।

পত্রিকাটি গত সপ্তাহের। আমি ছবিটা দেখলাম। একটি বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, তেল চিটচিটে ঘর্মাক্ত মুখ, পুরু ঠোঁট, চাপা নাক, সোনা বাঁধানো দাঁত, একটা উজ্জ্বল চওড়া টেবিলে সহজে ঘোরানো যায় ওই রকম একটা চেয়ারে বসে আছে। তার পায়ে চকচকে হলুদ রঙের জুতো, সে তার দুটি পা তুলে দিয়েছে টেবিলের উপর। তার ভারি

পুরুষ্ট ঠোঁটে সে ধরে আছে একটা মস্ত বড় কালো চুরুট, চুরুটের মাথায় জমে আছে এক ইঞ্চি লম্বা সাদা ছাই। লোকটির লাল বুটিদার টাই আটকানো রয়েছে একটা সোনার নালের আকারের ঝলমলে পিন দিয়ে, তীব্রভাবে সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পেটকে ঘিরে আছে একটা সোনার চেইন, আর তার ঘড়ির পকেট থেকে ঝুলছে একটা খরগোসের পা। মেঝেতে টেবিলের পাশে ধরা রয়েছে একটা পিকদানি, সেখান থেকে উপচে পড়ছে শ্লেষ্মা। লোকটি যে ঘরে বসে আছে তার দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে ঃ

দি হোয়াইট হাউস।

ছবির নিচে দেখা যায় আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতিকৃতি, তার মুখের আদল এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে দেখলে মনে হয় একটা গুন্ডা। আমার চোখ পড়লো কার্টুনের উপরের অংশে। আমি পড়লাম :'একটা নিগারের একমাত্র স্বপ্ন হলো প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং শ্বেতাঙ্গ মার্কিনী রমণীর সঙ্গে শোয়া। মার্কিনীগণ, আমাদের এই সুন্দর দেশে আমরা কি তা চাই? সংঘবদ্ধ হোন এবং মার্কিন নারীত্বকে বাঁচান।'

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, ছবি এবং লেখার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি, অবাক হয়ে ভাবি কেন আমার কাছে সব ব্যাপারটা এতো অদ্ভুত অথচ এতো পরিচিত মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর অর্থ তুমি বুঝতে পারো? আমি স্বীকার করলাম যে, না, আমি জানি না।

নিচু গলায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কখনো কু ক্লুস ক্লান-এর কথা শুনেছো?

আমার ভেতরে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। আমি অস্পষ্টভাবে বললাম, আমি ম্যাগাজিনটা পড়ি, আর কিছু কখনো পড়ি না।

তিনি বললেন, শোনো ছেলে। শোনো। তুমি এক কৃষ্ণাঙ্গ বালক, কয়েক পয়সা রোজগার করার চেষ্টা করছো, তো, সেটা ঠিক আছে। তুমি যদি এই কাগজ বিক্রি করতে চাও তাহলে বিক্রি করবে, আমি বাধা দিতে চাই না। তবে আমি দু'মাস ধরে এই কাগজ পড়েছি, আর ওরা কি করার চেষ্টা করছে তা আমি জানি। তুমি যদি এ কাগজ বিক্রি করো তাহলে তুমি শুধু শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করার কাজে সাহায্য করবে।

আমি নির্বোধ সারল্যের সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, কিন্তু এই পত্রিকা তো শিকাগো থেকে আসে!

সমস্ত দুনিয়া এখন আমার সামনে অনিশ্চিত হয়ে দেখা দেয়। আমার মনে হয় যে-শহরে হাজার হাজার নিগ্রো পালিয়ে যাচ্ছে সে-শহর থেকে, সেই শিকাগো থেকে, কিছুতেই এরকম তীব্র বর্ণবাদী প্রচারনামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে না।

তিনি বললেন, কোথা থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তাতে আমার কিছু এসে যায় না। তুমি শুধু এ জায়গাটা শোনো।

তিনি জোরে জোরে আমাকে একটা দীর্ঘ রচনা পড়ে শোনালেন। সেখানে নিগ্রো সমস্যা সমাধানের জন্য লিনচিং তথা তাদের বিনা বিচারে ফাঁসি প্রদানের পক্ষে তীব্র আবেগ ভরে বক্তব্য দেয়া হয়েছে।

তিনি পড়ে গেলেন, আমি শুনলাম, কিন্তু তখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি বললাম, আমাকে একটু দেখতে দিন তো।

তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে আমি সিঁড়ির কোণায় বসি। ক্ষীয়মান আলোয় আমি পাতা উল্টে যাই। এমন তীব্র বর্বরতার সঙ্গে নিগ্রো-বিরোধী প্রচারণা চালানো হয়েছে যে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি, ভাল লাগলো?

আমি কোনো রকমে বললাম, না, স্যার।

তুমি কি করছো দেখতে পাচ্ছো?

আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমি জানতাম না।

এখন ওই কাগজ আর বিক্রি করবে?

না, স্যার। আর কোনোদিন নয়।

আমি শুনেছি যে, স্কুলে তুমি পড়াশোনায় বেশ ভাল। তারপর, তুমি যে কাগজ বিক্রি করছো আমি সেটা পড়ি। তখন আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। তখন আমি মনে মনে বললাম, ওই ছেলে কী বিক্রি করছে তা ও জানে না। অনেকেই এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু সাহস পায় নি। ওদের মনে হয়েছে তুমি বোধ হয় কিছু শ্বেতাঙ্গ কু ক্লুস ক্যান-এর লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছো, আর ওরা যদি তোমাকে এই পত্রিকা বিক্রি করতে নিষেধ করে তাহলে তুমি ওদের উপর কু ক্লুস ক্লান-এর লোকদের লেলিয়ে দেবে। কিন্তু আমি ওদের বলি, বাজে কথা বলো না, ওই ছেলে কী করছে তা ও জানে না।

আমি তাঁকে দশ পয়সার মুদ্রাটি ফিরিয়ে দিই কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তিনি বললেন, ওটা তুমি রাখো, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, বিক্রি করার জন্য অন্য কিছু খুঁজে নাও।

সে-রাতে আমি আর ওই কাগজ বিক্রির কোনো চেষ্টা করি নি। বাহুর নিচে কাগজগুলি চেপে ধরে আমি বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করি। আমার মনে হতে থাকে যে-কোনো মুহূর্তে একটা ঝোপ বা দেয়ালের আড়াল থেকে এক নিগ্রো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার যা আছে সব ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আমি কেমন করে এতো বড় একটা ভুল করতে পারলাম? যেভাবে ভুলটা হয় তা খুব সরল কিন্তু সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। পত্রিকাটির ম্যাগাজিন ক্রোড়পত্রে ধারাবাহিক গল্পগুলি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, খবরের কাগজের একটা লাইনও আমি কখনো পড়ি নি। আমার এই দুর্ভাগ্যজনক কীর্তির কথা আমি গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিই।

আমি যে নিজের অজান্তে কু ক্লুস ক্লান-এর সাহিত্যের প্রচার কর্মের একজন কর্মী হয়ে উঠেছিলাম সে কথা কাউকে বললো না। আমি কাগজগুলি একটা গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিই। বাড়ি ফিরে আমি ঠাণ্ডা উদাসীন ভঙ্গিতে নানীকে বলি যে কোম্পানি আর আমাকে কাগজ পাঠাবে না, জ্যাকসনে তাদের বড় বেশি এজেন্ট হয়ে গেছে। কথাটা ছিল মিথ্যা কিন্তু আমার মনে হয় যে আসল ঘটনার তুলনায় এর মাধ্যমে খুব কমই বলা হয়েছে। কাগজ বেচে আমার রোজগার এতো কম হতো যে সংসার খরচে আমার সাহায্য খুবই তুচ্ছ ছিল, তাই কথাটা শুনে নানীর মনে পক্ষে-বিপক্ষে কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না।

যে ছেলেটি আমাকে এই কাগজ বিক্রি করার তাগিদ দিয়েছিল তার বাবাও কাগজটির প্রচারধর্মী পরিচয় জানার পর তাকে ওই কাগজ বিক্রি করতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু ওই ছেলে আর আমি কখনো বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা করি নি। নিজেদের কাজের জন্য আমরা সাতিশয় লজ্জা অনুভব করি। একদিন সে আমাকে সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করলো, এই, তুমি কি এখনো ওই পত্রিকা বিক্রি করছো?

আমি বললাম, না, আমার সময় নেই। আমি ওর চোখের দিকে তাকাই না।

ছেলেটি মুখের একটা বিরস ভঙ্গি করে বললো, আমিও আর ও-কাজ করি না। ভীষণ ব্যস্ত থাকি আমি।

আমি পাগলের মতো পড়াশোনা করি। স্কুল টার্মের শুরুতেই আমি আমার পৌরনীতি, ইংরেজী আর ভূগোলের বইগুলি আগাগোড়া পড়ে ফেলি, শুধু ক্লাসের সময় সেদিকে একটু দৃষ্টি দিই। আমি বহু পূর্বাহ্নেই আমার সব গাণিতিক সমস্যাগুলির সমাধান করে ফেলি। তারপর স্কুলের সময় কোনো কিছু আবৃত্তি করার জন্য আমার যখন ডাক পড়ে না তখন আমি 'ফ্লিনের ডিটেকটিভ ইউকলি' কিংবা 'আর্গসি অল-স্টোরি' ম্যাগাজিন'-এর পুরানো ছেড়া-খোড়া কপি যোগাড় করে সেগুলি পড়ি অথবা যেসব শহর আমি কোনোদিন দেখি নি কিংবা যে সব মানুষের সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় নি তার স্বপ্ন দেখি, তাদের নিয়ে অলীক কল্পনার জাল বুনি।

স্কুলের টার্ম শেষ হয়। নানীর পবিত্র শনিবারে বিশ্রাম নিতে পারবো এমন কোনো কাজ আমি পেলাম না। দীর্ঘ অলস তপ্ত গ্রীষ্মের দিনগুলি আমাকে ক্লান্ত করে তোলে। আমি বাড়িতে বসে বসে নিরানন্দ ভাবনায় ডুবে থাকি, দৈহিক ও আত্মিক ক্ষুধাকে লালন করি। বিকালে, সূর্যের তাপ কমলে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমি বল খেলি। রাতে সামনের সিঁড়িতে বসে আমি শূন্য দৃষ্টিতে চলমান লোকজন, মালবাহী গাড়ি, মোটর গাড়ি প্রভৃতি দেখি।

ওই রকম একটি অলস উষ্ণ গ্রীষ্মের রাতে নানী, আমার মা আর আন্টি খালা সামনের বারান্দায় বসে ধর্মের একটা দুরূহ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। আমি গুটিগুটি মেরে সিঁড়িতে বসেছিলাম, গোমড়ামুখে আমার করতলের উপর চেপে ধরে রেখেছিলাম আমার দু'গাল। বড়রা যেসব কথা বলছিলেন তার অর্ধেক আমি

শুনছিলাম আর আমার মনের অর্ধেক হারিয়ে যাচ্ছিল দিবা স্বপ্নে। হঠাৎ ওদের তর্ক-বিতর্ক আমার মধ্যে একটা ধারণার জন্ম দেয় এবং, অনুমতি ছাড়া যে সেখানে কথা বলার আমার কোনো অধিকার নেই সে কথা ভুলে গিয়ে, আমি মুখ খুলে আমার মন্তব্য দিয়ে বসি। আমার মন্তব্যে নিঃসন্দেহে ধর্মবিরোধী কিছু ছিল, কারণ নানী আমাকে একদম মুখ বন্ধ করে থাকতে বলে, আমাকে শাস্তি দেবার জন্য, তাঁর বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে অভদ্র ভঙ্গিতে আমার মুখের উপর চপেটাঘাত করার জন্য আমার দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু ততদিনে আমি ওই জাতীয় মার এড়াবার ব্যাপারে পটু হয়ে গিয়েছিলাম। আমি শুধু আমার মাথা সরিয়ে নিই। নানী আমাকে আঘাত করতে পারলেন না, আর তাঁর হাতের ধাক্কা এতো জোরে ছিল যে তিনি তাল সামলাতে না পেরে সোজা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন, আর তাঁর বুড়ো শরীর বেড়া আর শেষ সিঁড়ির মাঝখানের একটা জায়গায় ঢুকে গিয়ে আটকে থাকলো। আমি লাফিয়ে উঠি। অ্যাডি খালা আর আমার মা চিৎকার করে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে আসেন, নানীর শরীরকে টেনে বের করে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওরা তাকে নড়াতে পারলেন না। নানাকে ডাকা হলো। তিনি এসে বেড়াটা কেটে ফেলে নানীকে উদ্ধার করলেন, তিনি তখন প্রায় অচৈতন্য। ওঁরা তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার ডাকলেন।

আমি খুব ভয় পাই। আমার ঘরে ছুটে গিয়ে আমি দরজায় তালা লাগিয়ে দিই। আমার ভয় হয় যে নানা এবার আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবেন। কাজটা আমি কি ঠিক করেছি, না ভুল করেছি? আমি যদি স্থির থেকে নানীকে আমাকে চপেটাঘাত করতে দিতাম তাহলে তিনি পড়ে যেতেন না। কিন্তু আঘাত এড়াবার জন্য এক পাশে সরে যাওয়া কি খুব স্বাভাবিক ছিল না? আমি কাঁপতে কাঁপতে অপেক্ষা করি, কিন্তু কেউ আমার ঘরে এলো না। বাড়ি নিস্তব্ধ। নানী কি মারে গেছেন? বেশ কয়েক ঘন্টা পরে আমি দরজার তালা খুলে নিঃশব্দে নিচে নেমে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, নানী মরে গেলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। আমার আর কিছু করার থাকবে না। এমন সময় আমি হলঘরে অ্যাডি খালার মুখোমুখি হলাম। তাঁর কালো দু'চোখ অগ্নি বর্ষণ করছে।

তিনি বললেন, দেখতে পাচ্ছো, তুমি তোমার নানীর কি অবস্থা করেছো?

আমি বললাম, আমি ওকে স্পর্শ করি নি। নানী কেমন আছেন আমার সেকথা জানতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই।

খালা বললেন, তুমি তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে।

আমি ওঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করি নি, আর আপনি সেটা জানেন!

তুমি একটা শয়তান। গণ্ডগোল সৃষ্টি করা ছাড়া তোমার আর কোনো কাজ নেই।

আমি শুধু তাঁর চড়টা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। তিনি আমাকে মারতে চেষ্টা করছিলেন। আমি কোনো অন্যায় করি নি।

নিঃশব্দে তিনি তাঁর ঠোঁট নাড়েন, আমাকে অপকারীর আয়নায় চুপসে করার জন্য মনে মনে তিনি শব্দ খোঁজেন। অবশেষে তাঁর অস্ত্র তিনি পেয়ে যান। আমাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, বড়দের কথার মধ্যে কেন তুমি নাক গলাও?

আমি বিরস কণ্ঠে বললাম, আমি শুধু কথা বলতে চেয়েছিলাম। সারাদিন আমি বাড়িতে বসে থাকি, ঘন্টার পর ঘন্টা, একটা কথাও আমি বলতে পাই না।

তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, এখন থেকে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা না হলে তুমি চুপ করে থাকবে।

যতটা কোমলভাবে বলা যায় আমি বললাম, কিন্তু আমাকে সারাক্ষণ ওভাবে মারা নানীর উচিত নয়।

খালার চোখ আগুনের মতো জ্বলে উঠলো। এবার আমাকে দোষারোপ করার জায়গা তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, শোনো ছেলে, এখানে দাঁড়িয়ে তোমার নানীর কি করা উচিত আর কি উচিত নয় সেকথা তুমি উচ্চারণ করবে না। তুমি যদি মুখ বন্ধ করে না থাকো তাহলে আমি তোমাকে মারবো। আমি শুধু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি।

চুপ করো। একদম চুপ। নইলে আমি তোমার ঘাড় মটকে দেবো। বেকুব কোথাকার!

ততক্ষণে আমারও রাগ চড়ে গেছে। আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনিও অরেকটা বেকুব।

খালা রাগে কাঁপতে থাকেন। আমার দিকে ছুটে আসতে আসতে তিনি বললেন, দাঁড়াও, আজ আমি তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবো।

আমি সুকৌশলে তাঁর পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ছুটে যাই, তারপর সেখান থেকে রুটি কাটার লম্বা ছুরিটা আঁকড়ে ধরি। খালা আমার পেছন পেছন আসেন। আমি তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াই। আমি ততক্ষণে স্নায়বিক চাপে এতো বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার চোখে জল এসে যায়। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, শুনুন, আপনি যদি আমার গায়ে হাত দেন তাহলে আমি ঠিক আপনাকে এই ছুরি দিয়ে আঘাত করবো।

আমি কোনো একটা কাজ যোগাড় করে নিজের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা মাত্র এখান থেকে চলে যাবো, কিন্তু যতদিন আছি ততদিন আমার গায়ে আপনি হাত দেবেন না, এই আপনাকে বলে দিলাম আমি।

আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ঘৃণার আগুনে আমাদের উভয়ের শরীর কাঁপতে থাকে।

তিনি গম্ভীর নিচু গলায় বললেন, আমি তোমাকে দেখে নেবো। যখন তোমার হাতে ছুরি থাকবে না তখন আমি তোমার ব্যবস্থা করবো।

আমি বললাম, আপনার জন্য একটা ছুরি আমি সব সময় সঙ্গে রাখবো।বোঝা

কাঁপতে কাঁপতে স্খলিত গলায় তিনি বললেন, রাতে তো তোমাকে ঘুমাতে হবে। তখন আমি তোমাকে দেখে নেবো।

আমি বললাম, আপনি যদি আমাকে ঘুমের মধ্যে স্পর্শ করেন তাহলে আমি আপনাকে খুন করে ফেলবো।

তিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় পায়ের ধাক্কায় দরজাটা খুললেন। পায়ের ধাক্কায় দরজা খোলা ছিল অ্যাডি খালার একটা স্বভাব। তিনি সব সময় আধা-খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ের ধাক্কায় সেটা পুরো খুলতেন, দরজাটা যদি ঘুরে ভেতর দিকে আসতো তাহলে তিনি আবার তাঁর পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওটা খুলতেন। দরজা বন্ধ থাকলে তিনি হাত দিয়ে এক কি দু'ইঞ্চি খুলে তারপর পায়ের ধাক্কায় সেটা পুরো খুলে দিতেন। তাঁর ও-রকম কাজ দেখে মনে হতো ঘরে ঢুকবার আগে ঘরের মধ্যে কি আছে তিনি তা একনজর দেখে নিতে চান, সম্ভবত সেখানে যে ভয়ঙ্কর বা অপবিত্র কিছু নেই সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান।

এই ঘটনার পর থেকে আমি পুরো এক মাস রাতে শোবার সময় রান্নাঘরের একটা ছুরি আমার সঙ্গে রাখতাম সেটা লুকিয়ে রাখতাম আমার বালিশের নিচে, যেন অ্যাডি খালার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি। কিন্তু তিনি কখনো আসেন নি। বোধ হয় প্রার্থনা করতেন।

নানী ছয় সপ্তাহ শয্যাশায়ী ছিলেন। আমার মাথায় যখন তাঁর চড়টা ফসকে যায় তখন তাঁর পিঠ মচকে গিয়েছিল।

আমাদের অতিশয় ধর্মপ্রাণ বাড়িতে যেরকম প্রচণ্ড হিংস্র ঝগড়াঝাটি হতো তেমন ঝগড়াঝাটি কোনো গুণ্ডা-বদমাশ, চোর-ডাকাত কিংবা বেশ্যার বাড়িতেও হতো না। আমি একদিন খুব বিনীতভাবে নানীকে একথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু এর ফলে আমার পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় নি। নানী সব সময় ঈশ্বরের পতাকা বহন করতেন, তিনি সব সময়ই ছিলেন লড়াইরত। আমাদের মধ্যে শান্তি ছিল না। আমিও লড়তাম, কারণ আমি বুঝতে পারি যে পিষ্টদলিত হতে না চাইলে, প্রতিমুহূর্তের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে, আমাকে লড়তে হবে। কিন্তু নানী আর অ্যাডি খালা যে শুধু আমার সঙ্গে লড়তেন তা নয়, ধর্মীয় তত্ত্বের কোনো একটা ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে কিংবা তাঁরা যাকে নৈতিক বিধিমালা বলতেন তার সামান্য কোনো বিচ্যুতি নিয়ে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে তীব্র বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেন। আমার জীবনে আমি যেখানেই ধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছি সেখানেই দেখেছি দ্বন্দ্ব, ঈশ্বরের নামে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির একে অপরকে শাসন করার চেষ্টা। মনে হয় ক্ষমতা অর্জনের নগ্ন আকাঙ্ক্ষা সর্বদা ধর্মগীতির পদানুসরণ করে চলে।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসে। আমি একটা বিচিত্র কাজ পাই। আমাদের এক প্রতিবেশী, তার দারোয়ানের পেশা পরিবর্তন করে, বীমার দালাল হবার সিদ্ধান্ত নেন। তার একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল, তিনি ছিলেন নিরক্ষর। আমাকে তিনি তার সঙ্গী হবার কাজ দিলেন।

তিনি যখন বস্তীপের তুলার খামারগুলিতে যাবেন তখন আমাকে তার সঙ্গে যেতে হবে, প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করতে হবে, হিসাবপত্র রাখতে হবে। আমি সপ্তাহে পাঁচ ডলার বেতন পাবো। ওর নাম ছিল ব্রাদার মান্স। আমি তার সঙ্গে কয়েক দফা খামারবাড়ি ঝুপড়িগুলিতে যাই, মাদুরে ঘুমাই, সকাল-দুপুর-রাতে তপ্ত লবণ দেয়া শুয়োরের মাংস আর মটরশুটি খাই। তবে দুধ খেতে পাই প্রাণভরে, এই প্রথম বারের মতো।

আমার নিজের জন্য যে তুলার খামারে হয়েছিল সেকথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানকার ছেলেমেয়েদের অজ্ঞানতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। পড়ার জন্য বই পাই না দেখে আমি নিজেকে কতো অনুকম্পা করেছি, আর এখানে আমি যে সব ছেলেমেয়েদের দেখলাম তারা কেউ কখনো একটা বইও পড়ে নি। তাদের চিত্তরঞ্জন লাজুক ভাবভঙ্গির পাশে আমাকে মনে হয় সপ্রতিভ, শহুরে-জানী। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ মা তার বাচ্চাদের আমার ঘরে টেনে আনার জন্য তাদের প্রলুব্ধ করেন, তারা এসে আমার সঙ্গে হাত মেলাবে, বাচ্চারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে আমাকে এক চোখে দেখে, বাঁধনহারা খিকখিক্ হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। রাতের বেলা আমি একটা অমসৃণ টেবিলে বসি, আমার কনুইর কাছে একটা কেরোসিনের বাতি টিমটিম করে জ্বলে, আমি বীমার দরখাস্তগুলি পূরণ করি, আর একটি ভাগচাষী পরিবার, সন্ধ্যা মাঠের কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে, একপাশে হা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্রাদার মান্স মেঝেতে পায়চারি করেন, কাগজ-কলমের ব্যাপারে আমার দক্ষতার উচ্চ প্রশংসা করেন। নিরেট সরল অনেক কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার আমাদের কাছ থেকে তাদের বীমা ক্রয় করে, তারা মনে করে যে এর মাধ্যমে তারা এমন একটা কিছুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে যার ফলে তাদের সন্তানরা 'জ্যাকসনের এই চমৎকার ছেলেটির মতো লিখতে আর কথা বলতে পারবে।'

আমাদের ওই ভ্রমণগুলি ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। রেল, মোটরগাড়ি, কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পথ চলা, এক ঝুপড়ি থেকে আরেক ঝুপড়িতে যাওয়া, এক খামার থেকে আরেক খামারে। আমি ভীষণ ক্লান্তি নিয়ে দরখাস্তগুলি পূরণ করে চলি। আমি দেখতে পাই কৃষ্ণাঙ্গ জীবনের এক শূন্য নিরানন্দ শীতল সমুদ্র, আর আমি তাকে ঘৃণা করি। মানুষগুলি সব এক রকম, তাদের বাড়িগুলি এক রকম, তাদের খামারগুলি এক রকম। রবিবার ব্রাদার মান্স সব চাইতে কাছের গ্রামীণ গির্জায় যান, সেখানে তার প্রচারকার্য চালান, বক্তৃতা দেন ধর্মীয় ভাষণের ঢং-এ, কথা বলার সময় হাত তালি দেন, অনুচ্ছেদের শেষ বোঝাবার জন্য মেঝেতে থুতু ফেলেন, বাক্যের বিরতি নির্দেশ করার জন্য থুতুর উপর পা ঠোকেন। আর এই সব কিছুই কৃষ্ণাঙ্গ ভাগচাষীকুলকে মোহিত করে। তার প্রদর্শনী দেখে সাদাসিধা গ্রাম্য মানুষগুলির চোখ টেরচা হয়ে যায়, তারা ব্রাদার মান্সের চারপাশে এসে জড়ো হয়, আর আমার আঙুল টন টন করে না ওঠা পর্যন্ত আমি দরখাস্তের পর দরখাস্ত পূরণ করতে থাকি।

আমি পকেটভর্তি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরি কিন্তু আমাদের সংসারের তলাবিহীন ফুথার

মধ্যে তা মিলিয়ে যায়। মা আমার জন্য গর্ববোধ করেন, এমনকি অ্যাডি খালার বৈরিতাও সাময়িকভাবে উবে যায়। নানীর চোখে আমি একটা অলৌকিক কাজ করেছি আর আমার কিছু কিছু পাপী গুণ শূন্যে মিলিয়ে গেছে, কারণ তাঁর মতে সাফল্য হলো নীতিনিষ্ঠার পুরস্কার আর ব্যর্থতা হচ্ছে পাপের ফল। কিন্তু ওই শীতকালে ঈশ্বর দয়া করে ব্রান্দার মাল্‌কে স্বর্গে তুলে নেন। কোম্পানি একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে এজেন্ট করতে রাজি হলো না এবং আমার অবস্থান আবার জাগতিক পর্যায়ে ফিরে যায়। পবিত্র সংসার আবার ভারাক্রান্ত হলো একটি স্বেচ্ছাচারী বালক দ্বারা, সব কিছু সত্ত্বেও পাপ যেন তার গায়ে লেপ্টে থাকতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

ভুল খুললো। আমি সপ্তম গ্রেডে পড়তে শুরু করি। আমার প্রাচীন ক্ষুধা তখনও আমার সঙ্গে থাকে। আমি যা খেতাম না, তার উপরে বেঁচে থাকি। সম্ভবত সূর্যালোক, তাজা হাওয়া আর বাঁধাকপির ঝোলই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। কোনো সন্ধ্যায় আমি যখন আমার ঘরে বসে পড়ছি তখন হঠাৎ পাশের বাড়ির রান্নাঘর থেকে আমার নাকে এসে লাগে ভাজা মাংসের গন্ধ, আমি মনে মনে ভাবি একজন যদি প্রাণভরে যত খুশি মাংস খেতে পারতো তখন তার কেমন লাগতো। আমার মনে উধাও হয়ে যায় এক অলীক স্বপ্নের রাজ্যে। আমি নিজেকে কল্পনা করি এমন এক পরিবারের ছেলে রূপে যাদের টেবিলে প্রত্যেক খাবারের সময় মাংস পরিবেশিত হয়। তারপর আমার এই অর্থহীন দিবাস্বপ্নের জন্য আমি নিজেই নিজের উপর প্রচণ্ড বিরক্ত হই। যন্ত্রণাদায়ক মাংসের গন্ধটা প্রতিহত করার জন্য আমি উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিই।

একদিন সকালে নিচে নেমে আমার জুতা আর গুয়োরের চর্বির ঝোলের জন্য খাবার ঘরের দিকে যাবার সময় আমি হঠাৎ অনুভব করলাম যে আমাদের পরিবারে গুরুতর কিছু একটা ঘটছে। নানা, চিরকালের মতো, খাবার ঘরে অনুপস্থিত। তিনি সব সময়ই নিজের ঘরে খাওয়া-দাওয়া করতেন। নানী মাথা হেলিয়ে আমাকে আমার আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমি বসে আমার মাথা নত করি। চোখ ঈষৎ উঁচু করে আমি আমার মায়ের টানটান মুখ দেখি। অ্যাডি খালার দু'চোখ বন্ধ, কপালে ভাঁজ, তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। নানী দু'হাত দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকেন। কী ঘটেছে আমার তা জানতে ইচ্ছা করে কিন্তু আমি জানতাম যে প্রশ্ন করলে আমি কোনো উত্তর পাবো না।

নানী প্রার্থনা করলেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইলেন, তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তা হলে তিনি যেন আমাদের পথ নির্দেশ করেন, তারপর তিনি ঈশ্বরকে বললেন যে, 'আমার বৃদ্ধ স্বামী এই সুন্দর প্রভাতে অসুস্থ হয়ে শয্যায় পড়ে আছে।' আর ঈশ্বরের কাছে তিনি আবেদন জানালেন, তাঁর যদি তাই ইচ্ছা হয় তাহলে তিনি যেন তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। এভাবেই আমি নানার শেষ অসুখের কথা জানতে পারি। এভাবেই, প্রাতঃরাশ কিংবা রাতের খাবার টেবিলে, নানীর তথ্যবহুল প্রার্থনার মাধ্যমেই আমি নানা খবর পাই, কারো মৃত্যুর, কারো জন্মের, আমাদের বাড়িতে কারো আসন্ন

আগমনের, পাড়ার কোনো ঘটনা, তাঁর গির্জার কোনো ঘটনা কিংবা কোনো আত্মীয়ের বাড়ির কোনো ঘটনা সব এভাবেই আমি প্রথম অবগত হই।

নানা ছিলেন দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণ একজন মানুষ, লম্বাটে মুখ, তুষারধবল দন্তপাতি, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো সাদা চুল। রেগে গেলে তিনি দাঁত খিঁচাতেন নানী বলতেন যে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ট্রেঞ্চের মধ্যে লড়াই করার সময় তাঁর এই অভ্যাস হয়। তাছাড়া তিনি মুখ দিয়ে হিস হিস শব্দ করতেন, তাঁর দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যেতো, হাতের গায়ে শিরা ফুলে উঠতো। তাঁর বিরল হাসির সময়েও তিনি একইভাবে দাঁত বের করতেন, কিন্তু ইদানিং তাঁর দাঁত আর আগের মতো ঝকঝক করতো না, তাঁর শরীর হয়ে পড়েছিল অনেক শিথিল ও শান্ত। তাঁর একটা ঘুরধার পকেট-ছুরি ছিল। সেটা স্পর্শ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। নানা ঘন্টার পর ঘন্টা রোদের মধ্যে বসে ওই ছুরি দিয়ে একটা কাঠের টুকরা চাঁছতেন, তাকে ছোট ও মসৃণ করতেন, প্রশান্ত চিত্তে শিস দিতেন, আর খুব ভাল বোধ করলে হয়তো বিচিত্র কোনো সুর ভাঁজতেন গুণগুণ করে।

আমি গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে প্রায়ই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করি, কেমনভাবে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁর মনের অনুভূতি কি রকম ছিল, তিনি কি সৈন্যদের দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিতেন না। সব সময় শুধু বলতেন, এই ছোকরা, ভাগ আমার কাছ থেকে।

কয়েক বছরে, একটু একটু করে, আমি নানীর কাছ থেকে শুনি যে সিভিল ওয়ারে তিনি আহত হয়েছিলেন কিন্তু কখনোই অক্ষম হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রাপ্য পেনশন পান নি। এ নিয়ে সর্বদা তাঁর মনে একটা তিক্ততা পোষণ করতেন তিনি। শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে আমি তাঁকে কখনো কোনো কথা বলতে শুনি নি। আমার মনে হয় তিনি ওদের এতো বেশি ঘৃণা করতেন যে ওদের সম্পর্কে কোনো কথা বলতে তাঁর প্রবৃত্তি হতো না। ইউনিয়ন আর্মি থেকে অব্যাহতি লাভের সময় তাঁর কাগজপত্র পূরণ করার ব্যাপারে তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসারের কাছে সাহায্যের জন্য যান। সেই অফিসার নানার কাগজপত্রে তাঁর নামের বানান ভুল করে লেখেন, রিচার্ড উইলসনের জায়গায় তিনি লেখেন রিচার্ড ভিনসন। সম্ভবত তাঁর উচ্চারণে দক্ষিণী ঝোঁক এবং তাঁর নিরক্ষতার জন্য তিনি নিজেই নিজের নাম ভুল উচ্চারণে বলেছিলেন। শোনা যায় যে ওই শ্বেতাঙ্গ অফিসার ছিলেন সুইডেনের লোক এবং তার ইংরেজীর জ্ঞান ছিল অতিশয় সীমিত। আরেকটি জনশ্রুতি অনুযায়ী ওই শ্বেতাঙ্গ অফিসার ছিলেন দক্ষিণের মানুষ এবং তিনি সচেতনভাবে নানার ভুল নাম লিপিবদ্ধ করেন। যাই হোক, বহু বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আগে নানা জানতেই পারেন নি যে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি লাভের সময় কাগজপত্রে তাঁর নাম লেখা হয়েছিল রিচার্ড ভিনসন। আর তিনি যখন পেনশনের জন্য যুদ্ধ দপ্তরে দরখাস্ত করেন তখন কোনো কাগজপত্রে রিচার্ড উইলসন নামে ইউনিয়ন আর্মিতে কারো যুদ্ধ করার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

নানার পেনশন সম্পর্কে আমি অন্তহীন প্রশ্ন করে চলি কিন্তু আমাকে কোনো তথ্য দেয়া হয় না, বলা হয় যে আমার বয়স খুব কম, এর মধ্যে অনেক জিনিস জড়িয়ে আছে। দশকের পর দশক ধরে নানা আর যুদ্ধ দপ্তরের মধ্যে দীর্ঘ চিঠি চালাচালি চলে। চিঠির পর চিঠিতে নানা অসংখ্য নানা ঘটনা ও কথাবার্তার বর্ণনা দেন (সব সময় তিনি মুখে মুখে বলতেন আর অন্যরা লিখে নিতো); অনেকদিন আগে গত হয়েছে এমন সব লোকের নাম উল্লেখ করতেন তিনি, তাদের বয়স ও চেহারার বর্ণনা দিতেন, যে সব যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন তা পুনর্নির্মাণ করতেন, নামোল্লেখ করতেন সংশ্লিষ্ট শহর, নদী, খাল, সড়ক, নগর ও গ্রামের, যে সব রেজিমেন্ট ও কোম্পানিতে থেকে তিনি যুদ্ধ করেছেন তাদের নাম ও সংখ্যার কথা জানতেন, বিশেষ বিশেষ ঘটনার নির্ভুল তারিখ ও সময়ের উল্লেখ করতেন, তারপর ওই সব কিছু পাঠাতেন ওয়াশিংটনে যুদ্ধ দপ্তরে।

রোজ সকালে আমি ডাকের চিঠিপত্র হাতে নিতাম। তার মধ্যে কোনো লম্বা কেজো গোছের খাম দেখলেই আমি বুঝতাম যে যুদ্ধ দপ্তর থেকে নানা একটা উত্তর পেয়েছেন। আমি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে তাঁর ঘরে যেতাম। তিনি বালিশ থেকে মাথা তুলে চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিজেই সেটা খুলতেন। কালো কালো মুদ্রিত লেখার দিকে তিনি অনেকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতেন, তারপর অনিচ্ছা ও অনাস্থার সঙ্গে চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বলতেন, তো?

আর আমি তখন চিঠিটা পড়তাম, ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সর্কতার সঙ্গে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে করে আমি পড়তাম, নানাকে জানাতাম যে পেনশনের জন্য তাঁর দাবী প্রমাণিত হয় নি এবং তাঁর দরখাস্ত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নানার চোখের পলক পড়তো না, তিনি নিচু চাপা গলায় শাপ দিয়ে হিস হিস করে শুধু বলতেন, সব ওই বদমাশ বিদ্রোহীগুলির কাণ্ড!

আমি যা পড়েছি সে সম্পর্কে তাঁর যেন সন্দেহ হয়। তিনি জামাকাপড় পরে পাড়ায় তাঁর অন্তত এক ডজন বন্ধুর কাছে চিঠিটা নিয়ে যান, তাঁকে পড়ে শোনাতে বলেন ওদের, শেষ পর্যন্ত সেটা তার মুখস্ত হয়ে যায়। অবশেষে তিনি ওই চিঠি সযত্নে তুলে রাখেন, তারপর আবার তাঁর বিষণ্ন ভাবনায় ডুবে যান, অতীতের গহ্বর থেকে এমন একটা কার্যকর ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করেন যা তাঁর পেনশন লাভে তাঁকে সাহায্য করবে। কাফকার উপন্যাস 'দি কাসল্'-এর "কে"-র মতো তিনিও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মরীয়া হয়ে কর্তৃপক্ষকে তাঁর সঠিক পরিচয় জানাতে চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। বাড়িতে যখন কোনো খাবার থাকতো না তখন আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম যে সরকার একটা চিঠি দিয়েছে, তাতে এই রকম কিছু লেখা আছে :

'প্রিয় মহোদয়,

আপনার পেনশনের দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে। আপনার নামের ব্যাপারে সন্তোষজনক সমাধান ঘটেছে। সরকারি বিধান অনুযায়ী আমরা সেক্রেটারি অব স্টেটকে

নির্দেশ দিচ্ছি তারা যত শীঘ্র সম্ভব, সব হিসাব করে, আপনার সর্বশেষ প্রাপ্য টাকা, সুদসহ, বিগত... বছরগুলির জন্য, মোট... ডলার আপনাকে প্রেরণ করবে।

এ ব্যাপারে যে এতো দীর্ঘ সময় লাগলো সেজন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনার ত্যাগ আপনার দেশের জন্য একটি অবিস্মরণীয় ও সান্ত্বনা হিসাবে কাজ করেছে।'

কিন্তু ওরকম চিঠি কখনো আসে নি। বেশির ভাগ সময় নানা এমন বিষণ্ন ও গোমড়ামুখো হয়ে থাকতেন যে আমি তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর আশা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দিই। তিনি আমার সামনে এলেই আমি চুপ করে যেতাম, তাঁর কথার জন্য অপেক্ষা করতাম, মনে মনে ভাবতাম তিনি কি কোনো কিছুর জন্য আমাকে বকুনি দেবেন? তিনি প্রস্থান করলে পর আমার উদ্বেগ প্রশমিত হতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছা মরে যায়।

বছরের পর বছর ধরে নানীর কথাবার্তা থেকে নানার জীবনের সামান্য কিছু তথ্য আমার গোচরে আসে। সিভিল ওয়ার শুরু হলে তিনি তাঁর মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে উত্তরে কনফেডাটে সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। ইউনিয়ন সেনাদলে নাম লেখাবার জন্য যাবার পরে, তিনি সগর্বে বলতেন, অনেকজন হারামজাদা বিদ্রোহীদের তিনি খতম করেছেন, আমার ভাগে যতজন পড়ার কথা তার চাইতে বেশি। তিনি ছিলেন দাসপ্রথার উগ্র ভঙ্গি বিরোধী, দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ নিধনের লক্ষ্য নিয়ে তিনি ইউনিয়ন আর্মিতে যোগ দেন। তিনি বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোতস্বিনী হেঁটে পার হয়েছেন, কাদার মধ্যে ঘুমিয়েছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন, লড়েছেন... যুদ্ধ শেষে তাঁকে অব্যাহতি দান করা হলে তিনি দক্ষিণে ফিরে আসেন, তাঁর আর্মি রাইফেল হাতে নিয়ে ভোটের বাক্স পাহারা দিয়েছেন যেন নিগ্রোরা ভোট দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন নিগ্রোদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়া হলো তখন তাঁর প্রাণশক্তি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে যুদ্ধ এখনো সত্যিকারভাবে সমাপ্ত হয় নি, আবার শুরু হবে।

এখন প্রাতঃরাশের টিবিলে আমরা চুপচাপ খাই, কখনো কোনো কথাবার্তা হয় না। নানী বলে দিয়েছেন যে খাওয়ার সময় কথাবার্তা বললে পাপ হয়, ঈশ্বর তোমার গলায় খাবার আটকে দিয়ে তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলতে পারেন। আমরা নানা পেনশন নিয়ে ভাবি। পরের কয়েক দিনে অনেক চিঠিপত্র লেখা হলো, অ্যাফিডেভিট করা হলো, হলফনামা নেয়া হলো, আলোচনা সভা বসলো, কিন্তু কোনো ফয়দা পাওয়া গেল না ও সব করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে নানা বিরোধিতার জন্যই তাঁকে তাঁর পেনশন থেকে বঞ্চিত করা হয়, যদিও শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে আমার আবেগ-অনুভূতিজাত ভয় ছাড়া আমার ওই ধারণার পক্ষে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণই ছিল না।

একদিন বিকালে আমি স্কুল থেকে ফিরতেই অ্যাডি খালা হলঘরে আমাকে থামিয়ে বললেন, উপরে যাও, তোমার নানাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে এসো।

তাঁর মুখ থরথর করে কাঁপছিল, দু'চোখ লাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমি দৌড়ে উপরে যাই। সেখান ক্লার্ক মামার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি গ্রিনউড থেকে এসেছেন। নানী আমার হাত ধরে বললেন, এসো, তোমার নানাকে বিদায় জানাও।

তিনি আমাকে নানার ঘরে নিয়ে গেলেন। নানা তাঁর পুরো ধরাচূড়া পরে শুয়ে ছিলেন, সব সময় তাঁকে যেমন দেখাতো সেরকমই দেখাচ্ছিল। দু'চোখ খোলা কিন্তু এতো স্থির যে তিনি বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন, আমি বুঝতে পারি না।

নানী ফিসফিস করে বললেন, এই যে রিচার্ড।

নানা আমার দিকে তাকালেন, এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের জন্য তাঁর সাদা দাঁতগুলি ঝকঝক করে উঠলো।

আমি ফিসফিস করে বললাম, গুডবাই, গ্র্যাণ্ডপা।

তিনি ভাঙ্গা গলায় বললেন, গুডবাই, সান। তারপর বললেন, আনন্দ করো, কারণ ঈশ্বর স্ব-স্বর্গে আমার জন্য আমার আ...সন ঠিক করে রেখে...

তাঁর কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে যায়। তিনি কী বললেন আমি বুঝতে পারি নি। আমি মনে মনে ভাবি আমি কি তাঁকে কথাটা আবার বলতে বলবো? কিন্তু নানী আমার হাত ধরে আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যান।

বাড়ি এখন ভীষণ চুপচাপ। কোনো কান্নাকাটি নেই। আমার মা নীরবে তাঁর দোল-চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে অপলক চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, মাঝে মাঝে তাঁর দু'হাতের উপর তাঁর মুখ নামিয়ে আনছেন। নানী আর অ্যাডি খালা নিঃশব্দে বাড়িতে চলাফেরা করছেন। আমি চুপ করে বসে থাকি, নানার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি। তিনি আমাকে কী বলতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে তখনো আমি ধন্দে থাকি। আমার মনে হয় তাঁর শেষ কথাগুলি জানা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি নানীর পেছন পেছন রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকি।

আমি ফিসফিস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, নানী, নানা কি বলেছিলেন? আমি ঠিক মতো শুনতে পাই নি।

তিনি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আমার মুখে একটা খাপ্পড় মারলেন, তারপর বললেন, চুপ করো। বাড়িতে মৃত্যুর দেবদূত আছেন।

আমি আমার আহত মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, আমি তো শুধু জানতে চেয়েছি!

নানী আমার দিকে তাকান। তার দয়া হয়। তিনি বলেছিলেন যে, ঈশ্বর স্বর্গে তার জন্য আসন ঠিক করে রেখেছেন। এবার জানলে তো, এখন চুপচাপ বসে থাকো আর বোকার মতো আজেবাজে প্রশ্ন করো না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মা আমাকে বললেন যে নানা মারা গেছেন। নানী আমাকে টুপি আর কোট পরে নিতে বললেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কি করতে হবে?

তিনি বললেন, প্রশ্ন করাটা বাদ দাও। তোমাকে যা বলা হচ্ছে তাই করো।

আমি বাইরে যাবার কাপড় পরে তৈরি হই। নানী বললেন, টমের গুখানে যাও, গিয়ে ওকে বলো যে নানা বাড়ি গেছেন। সে যেন এখানে এসে সব কিছুর ভার নেয়। আর সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, টম, অল্প কিছুদিন আগে হেজেলহার্স্ট থেকে জ্যাকসনে এসে শহরের প্রান্তদেশের কাছে বাস করছিলেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর বহন করছি বুঝতে পেরে আমি দু' মাইল পথের প্রতিটি ইঞ্চি দৌড়ে পার হই। আমার মনে হয় যে মৃত্যুর খবর সঙ্গে সঙ্গে দেয়া উচিত। মামার বাড়ি যখন আমার চোখে পড়ে তখন আমার বুক ধড়ফড় করছিল। আমি লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় ধাক্কা দিই। আমার ক্লাসে কাজিন ম্যাগি দরজা খুলে দিলেই আমি জিজ্ঞাসা করি, টম মামা কোথায়?

ম্যাগি বললো, ঘুমাচ্ছেন।

আমি দৌড়ে তার ঘরে ঢুকি, তার বিছানার পাশে দাঁড়াই, তার গা ধরে ঝাঁকুনি দিই, তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলি, টম মামা, নানী আপনাকে এক্ষুণি যেতে বলেছেন। নানা মারা গেছেন। মামা অনেকক্ষণ স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি সত্যিই বুদ্ধুর রাজা! একটা মানুষের বাবার মৃত্যুর খবর যে এভাবে দিতে হয় না তাও জানো না। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি, কি হয়েছে বুঝতে পারি না। আমি বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললাম, আমি সারাটা পথ দৌড়ে এসেছি, আমার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি দুঃখিত।

তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন, আমার দিকে কোনো নজর না দিয়ে নিজের জামাকাপড় পরলেন, পুরো পাঁচ মিনিট একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি অপেক্ষা করছো কি জন্য?

এমনিই।

আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে আসি, নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমার ব্যাপারটা কি? কেন লোকের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমি কোনো কাজ করতে পারি না আমি বুঝতে পারি না। আমি যাই বলি, দেহের যে ভঙ্গিই করি, তাই যেন লোকের বৈরিতা জাগিয়ে তোলে। আমি কখনই অন্যের সঙ্গে ঠিক মতো কথা বলতে পারি নি, তাদের কথার অর্থ, কথার উদ্দেশ্য, সব আমাকে অনুমান করতে হয়। আমি টম মামার মনে ইচ্ছা করে কোনো আঘাত দিতে চাই নি, তবু তার বাবার জন্য দুঃখের চাইতে আমার প্রতি তার রাগই যেন বেশি হয়ে ওঠে। কেন এমন হয়? কোনো উত্তর না পেয়ে আমি মনে মনে ভাবি যে এ নিয়ে চিন্তা করা বোকামি, আমি যাই করি না কেন আমার পরিবারের লোকদের কাছে সেটা অন্যায় বলে মনে হবেই। আমাকে নানার শেষকৃত্যে

যোগ দেবার অনুমতি দেয়া হয় না। আমাকে আদেশ দেয়া হলো আমি বাড়ি থাকবো, বাড়ির দিকে চোখ রাখবো। সমাধিক্ষেত্র থেকে ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি বসে বসে ডিটেকটিভ গল্প পড়ি। ওরা আমাকে কিছু বললোন না, আমিও কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলাম না? বাড়ির রুটিন আগের মতো যথারীতি চলতে থাকে। আমার কাজ ছিল ঘুমানো, জাউ আর বাঁধা রুপি খাওয়া, স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা করা, একাকীত্বের যন্ত্রণা ভোগ করা, ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন কাটানো, তারপর আবার ঘুমানো। আমার জামাকাপড় এতো জরাজীর্ণ হয়ে যায় যে সে-সব পরে স্কুল যেতে আমার লজ্জা করে। আমার স্কুলের অনেক ছেলে এখন তাদের প্রথম লম্বা প্যান্ট আর তার সঙ্গে মানানসই জামা পরতে শুরু করেছে। আমার মন এতোটা তিক্ততায় ভরে যায় যে নানীর সঙ্গে ব্যাপারটা একটা ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি তাকে বলবো যে তিনি যদি আমাকে শনিবার কাজ করতে না দেন তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু কথাটা তুলতেই তিনি তাতে কান দিলেন না। আমি বাড়িময় তার পেছন পেছন ঘুরি, শনিবারে কাজ করার আমার অধিকার দাবি করি, কিন্তু তার সেই একই উত্তর– না, না, আর না।

আমি তখন ঘোষণা দিই– তাহলে আমি স্কুল ছেড়ে দেবো।

দাও, দেখবো তাতে আমার কতটুকু এসে যায়।

আমি এখান থেকে চলে যাবো। জীবনের আর কখনো তুমি আমার খোঁজ পাবে না।

নানী ব্যঙ্গভরা গলায় বললেন, না, তুমি যাবে না।

আমি আমার কৌশল পাল্টে বললাম, শনিবার কাজ না করলে কোনো চাকুরি পাবার যোগ্যতা আমি কেমন করে অর্জন করবো? আমি তাকে আমার শতছিন্ন মোজা আর তালিমারা প্যান্ট দেখিয়ে বলি, এই দেখো? এসব পরে আমি কিছুতেই স্কুলে যাবো না। আমি তোমার কাছে টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু চাইছি না। আমি শুধু কাজ করতে চাই।

নানী বললেন, তোমার স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়ার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি গির্জা থেকে বেরিয়ে এসেছো, এখন তোমার ভার তোমার নিজের ওপর। তুমি দুনিয়াদারির পথ বেছে নিয়েছো। আমার কাছে তুমি মৃত। যিশুর কাছে তুমি মৃত।

আমি বললাম, তোমার ওই গির্জাই আমার জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছে।

এই বাড়িতে তুমি কক্ষনো ও কথা বলবে না।

কিন্তু কথাটা সত্য এবং তুমি নিজে তা জানো।

ঈশ্বর তোমাকে সাজা দিচ্ছেন। আর তুমি এতো অহঙ্কারী যে তুমি তার সাহায্য প্রার্থনা করো না।

দেখো, একটা কাজ আমি ঠিক জুটিয়ে নেবো।

তাহলে তুমি এখানে থাকতে পারবে না।

আমার শরীর ভয়ানকভাবে কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে আমি বললাম, তাহলে আমি চলে যাবো।

তিনি আবার একই কথা বললেন, না, তুমি যাবে না।

আমার মনের অবস্থা তাকে বোঝাতে আমি এখন বদ্ধপরিকর। আমি তাঁকে বললাম, তুমি ভাবছো আমি ঠাট্টা করছি, তাই না? এই মুহূর্তেই আমি চলে যাবো। আমি ছুটে আমার ঘরে যাই, একটা ভাঙ্গাচোরা স্যুটকেস খুঁজে নিয়ে তার মধ্যে আমার জীর্ণ জামাকাপড় প্যাক করতে শুরু করি।

নানী দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, এই হতচ্ছাড়া বেকুব কোথাকার? স্যুটকেস নামিয়ে রাখ! যেখানে কাজ করতে পারবো আমি সেখানে চলে যাবো!

তিনি আমার হাত থেকে স্যুটকেস ছিনিয়ে নিলেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ঠিক আছে। তুমি যদি জাহান্নামে যেতে চাও তো যাবে। ঈশ্বর জানবেন যে এর মধ্যে আমার কোনো দোষ নেই। তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু তোমাকে করবেন না।

কাঁদতে কাঁদতে তিনি দরজার কাছ থেকে দ্রুত বেগে চলে গেলেন। তার ভয়ের সামনের জয়ী হয় তার মানবিকতা। আমি স্যুটকেস খালি করি। আমার নিজেকে মনে হয় নিঃশেষিত। এই সব আবেগপূর্ণ বিস্ফোরণ আমি ঘৃণা করতাম, এই সব তীব্র অনুভূতি, কারণ আমি এর ফলে তীব্র স্নায়ুবিক চাপ অনুভব করতাম, আমার নিজেকে খুব দুর্বল লাগতো।

এখন নানী আর অ্যাডি খালার কাছে যথার্থই মৃত আমি, কিন্তু আমি যখন আমার মাকে বললাম যে, আমি প্রকাশ্যে ওদের অগ্রাহ্য করেছি, তখন তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি আমার কাছে এসে আমাকে চুমু খান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরদিন স্কুলে কোথায় কাজ পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আমি ছাত্রদের কাছে খোঁজ করি। আমাকে একটি শ্বেতাঙ্গ পরিবারের নাম দেয়া হলো, বাড়ির কাজ করার জন্য ওদের একজন কাজের ছেলে দরকার। স্কুল ছুটি হওয়ার মাত্র সে অপরাহ্নেই আমি ওই ঠিকানাই গিয়ে উপস্থিত হই। একজন লম্বা, কঠোর চেহারার শ্বেতাঙ্গ রমণী আমার সঙ্গে কথা বললেন। হ্যাঁ, তার একটি ছোকরা চাকর দরকার, একটি সৎ ছেলে। সপ্তাহে দু' ডলার। সকালে-বিকালে, আর শনিবার সারাদিন। বাসন-কোসন ধোয়া, কাঠ চেরা। মেঝে ঘষামাজা, আঙ্গিনা সাফ করা। সকালের নাশতা আর রাতের খাবার পাবে। আমি ভীরু গলায় দু-একটা জিনিস জানতে চাই। আমার দৃষ্টি দ্রুত এদিক-ওদিক ফেরে। এখানে কি রকম খাবার পাবো আমি? রান্নাঘরের অবস্থা যে রকম মলিন দেখতে গোটা বাড়িই কি সে রকম?

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, কি, চাকরিটা চাই তোমার?

আমার নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা রাখতে হয়, তবু বলি, হ্যাঁ, ম্যাম।

তো শোনো ছোকরা, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আর আমি তোমার কাছে তার সত্য উত্তর চাই।

আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে উত্তর দিই, ইয়েস, ম্যাম।

তিনি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চুরি করো?

আমি হো হো করে হেসে উঠি, তারপর নিজেকে সামলে নিই।

তিনি বললেন, এর মধ্যে হাসির এতো কি দেখলে?

আমি বললাম, ভদ্রে, আমি যদি চোর হই তাহলে সে কথা কখনো কাউকে বলবো না।

কি বলতে চাও তুমি? রমণীর মুখ রাগে লাল হয়ে যায়।

শ্বেতাঙ্গ জগতে আমার প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি একটা ভুল করে ফেলি। আমি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকি, তারপর অস্ফুট গলায় বললাম, না ম্যাম, আমি চুরি করি না।

তিনি আমার দিকে স্থির চোখে তাকান, মনস্থির করার চেষ্টা করেন, তারপর বলেন, শোনো ছেলে, আমার এখানে কোনো চনমনে কেতাদুরস্ত নিগার চাই না।

আমি তাকে নিশ্চয়তা দিই– না, ম্যাম, আমি কেতাদুরস্ত নই।

আমি তাকে কথা দিই যে পরদিন সকাল ছটায় আমি কাজে যোগ দেবো। আমি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরি, মনে মনে ভাবি, ভদ্রমহিলার মনে কি ছিল যার জন্য তিনি আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন আমি চুরি করি কিনা। তারপর ওদের একটা কথা আমি শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে– শ্বেতাঙ্গরা সব নিগ্রোদেরই এক বরনের বিশ্বাস করে। শুধু এই আলোকেই তার প্রশ্নের একটা অর্থ হয়। আমার যদি তাকে যুন করার মতলব থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে সে কথা বলতাম না এবং যুক্তিতর্কের তিনি নিঃসন্দেহে তা বুঝেছিলেন, কিন্তু অভ্যাসের কাছে যৌক্তিকতা পরাজিত হয়, আর তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি চুরি করো? একমাত্র একটা মহা হাদারামই উত্তর দিতো, হ্যাঁ ম্যাম, আমি চুরি করি।

এখন যে আমি শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে একটানা কয়েক ঘণ্টা থাকবো, এখন কি ঘটবে? ওরা কি আমার গায়ে হাত দেবে? শাপ-শাপান্ত করবে? করলে আমি ওই মুহূর্তেই চলে যাবো। চাকরির জন্য আমার তীব্র ব্যাকুলতার সময় সেখানে আমি কী রকম আচরণ পাবো তার কথা আমি ভাবি নি, কিন্তু এখন আর সব কিছু ছাড়িয়ে সে প্রশ্নই আমার সামনে বড় হয়ে ওঠে, চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। আমি খুবই বিনীত ও ভদ্র থাকবো, সারাক্ষণ বলবো ইয়েস স্যার, নো স্যার, ইয়েস ম্যাম, নো ম্যাম, কিন্তু একটা জায়গায় আমি সীমারেখা টেনে দেবো, সেটা তারা পেরোতে পারবে না। ওহ, আমি হয়তো অনর্থক দুশ্চিন্তা করছি। ওরা হয়তো আমাকে পছন্দই করবে।

পরদিন সকালে আমি রান্নার উনুনের জন্য কাঠ চিরি, শীতনিবারক উনুনের ঝাঁঝরির জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লা আনি, সামনের বারান্দা ধুই, পেছনের বারান্দা ধুই, রান্নাঘর ঝাঁট দিই, খাবার টেবিলে জিনিসপত্র সাজাতে ও পরিবেশন করতে সাহায্য করি। প্লেট-ডিশ ধুয়ে রাখি। তখন আমি ঘামছি। আমি সামনের পথটা ঝাঁট দিয়ে বাজার করার জন্য ছুটে দোকানে যাই। আমি ফেরার পর মহিলা বললেন, তোমার নাশতা রান্নাঘরে দেয়া আছে।

থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম।

আমি টেবিলের ওপর দেখতে পেলাম এক প্লেট ঘন কালো ঝোলা গুড় আর বড় এক টুকরা সাদা রুটি। শুধু এই? আমি আর কিছু পাবো না? ওরা খেলো ডিম, শুয়োরের মাংস, কফি... আমি রুটিটা হাতে নিয়ে ছিঁড়তে চেষ্টা করলাম। শক্ত, বাসি রুটি। ঠিক আছে, গুড় দিয়েই নাশতা শেষ করবো। আমি প্লেটটা মুখের কাছে তুলে আনতেই তরল কালো ঝোলা গুড়ের ওপর এখানে ওখানে সবুজ আর সাদা ছাতা পড়ে আছে দেখতে পেলাম। গড ড্যাম... এ আমি খেতে পারবো না, মনে মনে বললাম আমি। বাথরুম পরিষ্কার পর্যন্ত না। আমি আমার কোট পরে নিই, আর তখনই মহিলা ঘরে এসে ঢোকেন।

তুমি খাওনি।

না, ম্যাম, আমার ক্ষুধা নেই।

বাড়িতে গিয়ে খাবে বুঝি?

আমি মিথ্যা কথা বলি, না ম্যাম, আজ সকালে আমার ক্ষুধা নেই।

নাটকীয় একটা ভঙ্গি করে মহিলা বললেন, গুড় আর রুটি বুঝি তুমি পছন্দ করো না?

পাছে তিনি ভাবেন যে তার দেয়া খাবারের আমি সমালোচনা করছি তাই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, না ম্যাম, খুব পছন্দ করি।

তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আজকাল তোমাদের নিগারদের যে কী হচ্ছে! তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গুড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ রকম গুড় ফেলে দেয়া পাপ। আমি এটা তোমার জন্য তুলে রাখছি, রাতে এটা খাবে।

আমি সাগ্রহে বলি, ইয়েস, ম্যাম।

তিনি গুড়ের প্লেটটা আরেকটা প্লেট দিয়ে সুন্দরভাবে ঢেকে দিয়ে রুটির টুকরাটা টিপে দেখলেন, তারপর সেটা ময়লার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি এবার আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, তার মুখ চকচক করছে, তার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখন স্কুলে কোন গ্রেডে পড়ছো?

সপ্তম, ম্যাম।

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আর পড়ছো কেন?

নিজের সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত বোধ করি না। আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলি, আমি লেখক হতে চাই।

ওকে এ কথা বলার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না, কিন্তু উনি আমাকে এমন একটা ভুল অবস্থানে ফেলে দেন যে আমি নিজেকে উজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তিনি বেশ কড়াভাবে জানতে চাইলেন, কি বললে? কি হতে চাও?

লেখক।

কেন?

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে আমি বললাম, গল্প লেখার জন্য।

তুমি কোনোদিন লেখক হবে না। তোমার ওই নিগার মাথায় কে এসব ধারণা ঢুকিয়েছে?

কেউ না।

ক্রুদ্ধ গলায় তিনি বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

আমি তার বাড়ি ঘুরে রাস্তায় নেমে আসি। আমি জানি যে আর ও বাড়িতে আমি ফিরে যাবো না। মহিলা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন যে জীবনে আমার অবস্থান কোথায়? আমি কী অনুভব করি, আমার কী হওয়া উচিত সব তিনি জানেন, আর এটা আমাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তোলে। হয়তো তার ধারণাই ঠিক;

হয়তো আমি কোনোদিনই লেখক হবো না; কিন্তু আমি তা তার কাছ থেকে শুনতে চাই নি।

আমি যদি ওই চাকরিতে লেগে থাকতাম তাহলে শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের প্রতি কেমন আচরণ করে তা আমি খুব তাড়াতাড়ি জেনে ফেলতাম, কিন্তু আমার নির্বোধ সারলো আমার মনে হয় যে সব শ্বেতাঙ্গ ও রকম নয়, আমার মনে হয় ভাল শ্বেতাঙ্গ মানুষ আছে, বিত্তশালী মানুষ, যাদের স্পর্শকাতর অনুভূতি আছে। সামগ্রিকভাবে তারা খারাপ, কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমি হয়তো ব্যতিক্রমী কাউকে পেয়ে যাবো।

আমার ভয় হয় আমার পরিবারের লোকরা হয়তো ভাববে যে আমি বেশি খুতখুতে, তাই আমি মিথ্যা করে বলি যে ওই শ্বেতাঙ্গ মহিলা আগেই একজন কাজের ছেলে নিয়ে নিয়েছিলেন। স্কুলে আমি কাজের খোঁজ অব্যাহত রাখি। ওরা আমাকে আরেকটা ঠিকানা দেয়। স্কুল ছুটি হতেই আমি ওই বাড়িতে যাই। হ্যাঁ, মহিলা বললেন, তাদের একটি কাজের ছেলে চাই যে গরুর দুধ দোহাতে পারবে, মোরগ-মুরগির খাবার দিতে পারবে, সব্জি ওঠাতে পারবে, সকালের নাশতা তাদের রাতের খাবার পরিবেশন করতে পারবে। আমি বললাম, ম্যাম আমি দুধ দোহাতে জানি না। অবিশ্বাস ভরে তিনি বলেন, তোমার বাড়ি কোথায়।

এই খানেই, এই জ্যাকসনেই।

তিনি অবাক হয়ে বলেন, বলো কী! তুমি কি আমাকে বলতে চাও নিগার যে তুমি জ্যাকসনে বাস করো অথচ গরুর দুধ দোহাতেই জানো না?

আমি কোনো কথা বলি না কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের জগৎ সম্পর্কে বাস্তবতা, একজন নিগ্রোর বাস্তবতা, আমি খুব দ্রুত উপলব্ধি করতে শুরু করি। এক মহিলা ধরে নিয়েছিলেন, আমার যদি চুরি করার স্বভাব থাকে তাহলে আমি তাকে তা জানিয়ে দেবো, আর এখন এই মহিলা অবাক হয়ে গেছেন এই দেখে যে আমি একটা নিগার, জ্যাকসনে বাস করার মতো সাহস রাখি অথচ একটা গরুর দুধ দোহাতে জানি না। আমার কাছে ওরা সবাই একই রকম হয়ে উঠতে থাকে, যা কিছু পার্থক্য তা শুধু আনুপাত্রিক বিষয়ে। আমি এই মহিলার মনের ক্ষেত্রে একটা দেয়ালের মুখোমুখি হই, ওই রকম যে একটা দেয়া আছে মহিলা তা জানেনও না।

অবশেষে আমি বললাম, কোনোদিন শিখি নি আমি।

তিনি বললেন, কেমন করে গরুর দুধ দোহাতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো। খুব সোজা।

একটা নিগারের জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করার মতো সহৃদয়তা তার আছে সেটা দেখাতে পেরে তিনি যেন খুশি হন।

জায়গাটা বেশ বড়। একটা গরু, মুরগির পাল আর একটা বাগান আছে। সব কিছুই বলে দিচ্ছে যে খাদ্য আছে এখানে আর তাই আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।

আমি মহিলাকে জানালাম যে কাজটা আমি নেবো এবং কাল সকালে কাজের জন্য হাজির হবো। আমার কাজ ছিল সহজ কিন্তু সংখ্যায় অনেকগুলি। ওর তত্ত্বাবধানে আমি দুধ দোহাই, ডিম তুলে নিই, ঝাড় দিই। এসব কাজ শেষ করে আমি যথাসময়ে সকালের নাশতা পরিবেশন করি। খাবার টেবিলে পাঁচজনের বসার জায়গা। টেবিলে সাজানো আছে ডিম, শুয়োরের মাংস, টোস্ট করা রুটি, জ্যাম, মাখন, দুধ, আপেল... সমাবেশটা খুব উজ্জ্বল মনে হলো। ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন যে, তিনি এক একটা খাবারের ডাক দেবেন আর আমাকে তা টেবিলে দিয়ে আসতে হবে। আমি রান্নাঘরটা ভাল করে চিনে নিই যেন নির্দেশ দিলেই তা তাড়াতাড়ি পালন করতে পারি। অবশেষে মহিলা খাবার ঘরে এসে খাদ্যের দিকে তাকালেন। তার পেছন পেছন এলো একটি ফাকাশে চেহারার যুবক। সে টেবিলের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো, কী ব্যাপার! রোজ রোজ নাশতায় ওই জঘন্য ডিম!

মহিলা বসলেন, তারপর বললেন, শোন কুত্তার বাচ্চা, খেতে ইচ্ছা না করলে তোকে ওটা খেতে হবে না।

যুবক বললো, এর চাইতে কিছু কাদামাটি পরিবেশন করলেই পারো। সে কাটা চামচ দিয়ে কিছু শুয়োরের মাংস তুলে মুখে দিলো।

আমার মনে হয় আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। ওরা কি সারাক্ষণ এই রকম করে? তাহলে আমি এখানে থাকছি না। এমন সময় একটি তরুণী এসে থপ করে তার চেয়ারে বসলো।

যুবক বললো, বাহ্, কুত্তি, আমার গড ড্যাম মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে নিচ্ছিস!

মেয়েটি বললো, তুই কি করতে পারিস তা তো জানিস।

আমি এতো একাগ্রতা নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি যে যুবকটি যে আমাকে লক্ষ্য করছে তা টের পাই না। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই, আমার দিকে ওভাবে চোখ পাকিয়ে কি দেখছিস, হারামজাদা নিগার? ওই বিস্কুটগুলি স্টোভের ওপর থেকে নামিয়ে টেবিলে দে।

ইয়েস, স্যার।

দুজন মাঝবয়েসি লোক এসে টেবিলে বসে। কারা পরিবারের সদস্য, একে অন্যের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, এটা একটা পরিবার কিনা এর কিছুই আমি কখনো জানতে পারি নি। ওরা বিস্ময়কর রকম নির্বিকারভাবে পরস্পরকে শাপ-শাপান্ত করে, কেউ কিছু মনে করে বলে মনে হয় না। একে অন্যের বিরুদ্ধে কটূক্তি ছুঁড়ে মারার সময় তারা চোখ তুলে তাকিয়েও প্রায় দেখে না। প্রতি মুহূর্ত আমি টানটান হয়ে থাকি, তারা কি চায় আগে থেকে বুঝতে চেষ্টা করি, ওদের শাপ-শাপান্ত এড়াতে চাই। আমি সন্দেহ করতে পারি নি যে সেদিন সকালে আমি যে টানটান উত্তেজনা অনুভব করি তা আমাকে সারা জীবনের জন্য একটা তীব্র আবেগ-অনুভূতির স্তরে তুলে নিয়ে রাখবে। হয়তো আমি শ্বেতাঙ্গদের জন্য কাজ করতে বড় বেশিদিন অপেক্ষা করেছি। হয়তো আমার বয়স যখন আরো কম

ছিল তখন এ কাজ শুরু করতে হতো। অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ বালক তাই করে। সেটা করলে এতোদিনে আমার ওই টানটান উত্তেজনা হয়তো একটা অভ্যস্ত অবস্থায় পরিণত হতো, একটা স্বয়ংক্রিয়া ইচ্ছা-নিরপেক্ষ শক্তি দ্বারা তা দৃঢ় এবং নির্দিষ্ট হতো। নিয়তি ছিল অন্যরকম। সব সময় আমি এ বিষয়ে সচেতন থাকতো। কিন্তু আমার গভীরভাবে চিন্তা করবো, হৃদয়ের মধ্যে বহন করবো এটা, এটা সঙ্গে নিয়ে বাঁচবো, সঙ্গে নিয়ে ঘুমাবো, এর সঙ্গে লড়াই করবো।

সকাল বেলা ছিল শারীরিকভাবে ক্লান্তিকর কিন্তু স্নায়ুর চাপ, আমার কোনো কাজ হয়তো আমার ওপর শাপ-শাপান্তের ঝড় নিয়ে আসবে, এটা ছিল আরো বেশি হাস্যকর। যখন স্কুলে যাবার সময় হতো তখন আমার নিজেকে মনে হতো নিঃশেষিত। চাকরিটা আঁকড়ে থাকি কারণ আমি যথেষ্ট খেতে পেতাম, কেউ আমার ওপর কড়া নজর রাখতো না, আমার খাবার মেপে দিতো না। আমি এর আগে কদাচিৎ ডিমের স্বাদ লাভ করেছি। এখন আমি একটা বড় রুটির টুকরা ফাঁক করে, তার মধ্যে হলুদ মাখন কিছিয়ে উনুনে গরম করে, তাড়াতাড়ি তিন চারটা ডিম ফাটিয়ে ভাজা করে গপগপ করে মুখে পুরে দিই, বড় বড় গ্রাস নিয়ে তা খেয়ে ফেলি, যেন ওই মহিলা কিছু দেখতে না পান। আর দুধের বোতল নিয়ে কোনো একটা সুবিধাজনক দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি ঢোঁ ঢোঁ করে এক চুমুকে সব দুধ খেয়ে ফেলি, যেন দুধ নয় জল পান করছি।

যে খাদ্য আমি গ্রহণ করি তা আমার শরীরে বল দেয়। কিন্তু এর সঙ্গে একটা সমস্যা যুক্ত হয়। লেখাপড়ায় আমি পিছিয়ে পড়ি। আমি যদি শারীরিকভাবে আরেকটু শক্তিশালী হতাম, আমার নতুন স্নায়ুবিক চাপ যদি আমার সীমিত প্রাণশক্তি ক্ষয় করে না দিতো তাহলে আমি হয়তো সকালে-বিকালে কাজ করেও সাফল্যের সঙ্গে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন দুপুরের দিকে আমার মাথা ঝিমঝিম করে। ক্লাস রুমে আমার মনে হয় শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীরা যেন আমার সামনে থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি যে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি। আমি বারান্দায় জলের কলের কাছে গিয়ে আমার কব্জির ওপর ঠাণ্ডা জলের স্রোত ছেড়ে দিই, আমার রক্ত বরফ শীতল হয়ে ওঠে, হয়তো এভাবে আমি জেগে থাকতে সক্ষম হবো।

কিন্তু আমার চাকরির একটা সুখের দিকও ছিল। এখন দুপুরের বিরতির সময় আমি সানন্দে ভিড় করে কোণার দোকানে যাই, অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিলে স্যান্ডউইচ কিনি, আমার নিজের টাকা সজোরে কাউন্টারে ফেলে পছন্দ মতো জিনিস কিনি, শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে কাজ করা অন্য ছেলেদের সঙ্গে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করি। আমি কথা দিয়ে আমার শাপ-শাপান্ত করা শ্বেতাঙ্গ পরিবারের একটা জীবন্ত ছবি এঁকে ওদের আনন্দ দিই। আমি বর্ণনা করি ওদের গভীর চিন্তামগ্ন নীরবতা আর পরস্পরের প্রতি তাদের চরম ঔদাসীন্যের কথা। আমার গৃহকর্ত্রী চোখের আড়ালে গেলেই আমি যে নানা রকম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলি ওদেরকে সে কথা বলি, আর ওদের চিত্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ঈর্ষায় ভরে যায়।

এখন আমি কোনো নতুন কাপড় কিনলেই ছেলেরা কাছে এসে সেটা পরীক্ষা করে দেখে। আমরা কেউই নতুন কিছু না কিনে গোটা এক সপ্তাহ পেরোতে দিই না। আমরা নগদ পঞ্চাশ সেন্ট দিই, পরের সপ্তাহে দিই আর পঞ্চাশ সেন্ট। আমরা জানি যে এভাবে আমরা ঠকছি, কিন্তু একবারে কেনার মতো নগদ টাকা আমাদের হাতে কখনো থাকতো না।

মা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, শিগগিরই একদিন আমাদের নিজেদের একটা বাড়ি হবে। শুনে আমি ভীষণ খুশি হই। নানী ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হলেও মা পাড়ার এক মেথোডিস্ট চার্চে যাতায়াত শুরু করেন। আমিও রবিবাসরীয় স্কুলে যাই, মায়ের অনুনয়-বিনয়ের জন্য নয়, আমি যাই আমার ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা করা ও আলাপ করার জন্য।

কৃষ্ণাঙ্গ প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চে আমি একটা নতুন জগতে প্রবেশ করি। সেখানে আমার দেখা হয় ছিমছাম, বাদামি রঙ-কঠোর নীতিপরায়ণ মেয়েদের সঙ্গে, যারা তাদের তুলা-খামারের উৎস গোপন রাখার প্রয়াস পায়; দেখা হয় কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যারা আত্মসচেতনভাবে বেরিয়ে আসছে তাদের বয়ঃসন্ধিকাল থেকে; দেখা হয় থলথলে বক্ষের কালো ও পীত বর্ণের প্রাচীন বয়স্কা চার্চ-মহিলাদের সঙ্গে; কৃষ্ণাঙ্গ দারোয়ান ও কুলিদের সঙ্গে, যারা গির্জার ধর্ম সঙ্গীতের গায়ক দলের হয়ে গর্বের সঙ্গে গান গায়; চাপা স্বভাবের অবদমিত কাঠমিস্ত্রীদের সঙ্গে যারা গির্জার উপ-পুরোহিতদের দায়িত্ব পালন করে; নম্র, শূন্য দৃষ্টির কালো ও পীত বর্ণের ধোবানীদের সঙ্গে যারা ধর্মগীতি পরিবেশিত হওয়ার সময় চিৎকার ও চাপা আর্তনাদ করে ওঠে আর নাচে; হাসিখুশি নেয়াপাতি ভুঁড়িওলা কৃষ্ণাঙ্গ বিশপদের সঙ্গে; শীর্ণদেহী অবিবাহিতা বৃদ্ধাদের সঙ্গে যারা টাকা তোলার উদ্দেশ্যে সারাক্ষণই একটা না একটা সমাবেশের আয়োজন করছে। আমার দেখা হয় উন্নাসিকতা, গোষ্ঠীপ্রীতি, গুজব, ষড়যন্ত্র, তুচ্ছ শ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শস্তা পোশাকের দৃষ্টি আকর্ষক প্রদর্শনীর সঙ্গে। আমার এইসব পছন্দ হয়, আবার পছন্দ হয়ও না। ওদের সঙ্গে থাকার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠি কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকে আমি যখন ওদের দিকে তাকাই তখন আমার মনে হয় আমি যেন ওদের কাছ থেকে লক্ষ যোজন দূরে কোথাও আছি। ওদের জগৎ থেকে আমাকে এতো দীর্ঘকাল দূরে রাখা হয় যে ওদের সত্যিকার একটা অংশ হওয়া আমার পক্ষে আর কখনই সম্ভব হয় না। এ সত্ত্বেও মানুষ সঙ্গের জন্য আমি এতো বুভুক্ষ হয়ে উঠেছিলাম যে, আমি নিজেকে এই সব কিছু দ্বারা প্রলুব্ধ হতে দিই এবং কয়েক মাসের জন্য আমি এক আশাবাদীর জীবন যাপন করি। গির্জায় একটা পুনরুভ্যদয়ের অনুষ্ঠান শুরু হলে আমার স্কুলের সহপাঠীরা আমাকে সেখানে যোগ দিতে তাড়া দেয়। ধর্মে উৎসাহের কারণে নয়; বরং আমি ওদের পছন্দ করতাম বলেই আমি সম্মত হই। রাতের পর রাত ধর্মীয় ভাষণ চলতে থাকে। অবশেষে আমার আত্মাকে বাঁচার জন্য আমার মা এই ধর্মযজ্ঞে আমাকে যোগদানের জন্য চাপ দেন, একটা

দায়িত্বশীল সামাজিক গির্জার একজন সদস্য হতে বলেন। আমি ছেলেদের বলি যে আমি কখনই আমার মধ্যে কোনো ধর্মভাব অনুভব করি না, তবু আমার দলের ছেলেরা আমাকে ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য মিনতি জানায়। তারা জিজ্ঞাসা করে তুমি তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, করো না? আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই।

তারা তাদের ঠোঁটের কোণা নিচের দিকে টেনে নামিয়ে বলে, কিন্তু এ একটা নতুন দিন। আমরা গির্জায় এখন আর চিৎকার করি না; আর্ত কাতর ধ্বনি তুলি না। এসো, চার্চে এসো, সমাজের একজন সদস্য হও।

আমি বললাম, দেখি।

ওরা খুব শোভনভাবে বললো, আমরা তোমাকে চাপ দিতে চাই না।

আসলে ওরা বুঝিয়ে দেয় যে আমি যদি ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাই তাহলে আমাকে যোগ দিতে হবে।

পুনরুভ্যদয় অনুষ্ঠানের শেষ রজনীতে যাজক উপস্থিত সব চার্চ-সদস্যদের উঠে দাঁড়াতে বলেন। উপস্থিত মানুষদের বেশির ভাগই উঠে দাঁড়ায়। যাজক এর পর উপস্থিত খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা চার্চ-সদস্য নন তাদের উঠে দাঁড়াতে বললেন। আরো কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়। এখন অবশিষ্ট থাকলো অল্প কয়েকজন যুবক। তারা কোনো চার্চের সদস্য নয় তারা কোনো ধর্মের সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত করে নি, তারা নিরীহ মুখ করে গির্জার কয়েকটি বেঞ্চে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। এভাবে পাপীদের আলাদা করার পর তিনি উপ-পুরাহিতদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন অন্ধকারে বাস করা ওই যুবকদের নিজেদের আত্মার অবস্থা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি করায়। উপ-পুরোহিতরা দ্রুত কাজে লেগে পড়ে। তারা আমাদের একটা ঘরে গিয়ে ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত এবং তৈলস্নাত একজনের সঙ্গে কথা বলতে বললো। উপ-পুরোহিতরা আমাদের বাহু ধরে, ঝুঁকে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে, আমাদের সঙ্গে কথা বলে। আমার চেনা-জানা এবং পছন্দের মানুষদের দ্বারা পরিবৃত হই, আমার মায়ের মিনতিভরা দৃষ্টি আমার চোখের ওপর অনুভব করে আমার পক্ষে অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদের অনুসরণ করে আমি একটা ঘরে যাই। যাজক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হাসলেন, আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

তিনি চটপটে কাটাকাটা সুরে বলতে শুরু করেন, এই যে যুববৃন্দ, আমি চাই যে তোমরা সবাই ঈশ্বরকে জানো। আমি তোমাদের চার্চে যোগ দিতে বলছি না, কিন্তু ঈশ্বরের লোক হিসেবে এটা তোমাদের বলা আমার কর্তব্য যে তোমরা বিপদের মধ্যে আছো। খুব বড় বিপদ তোমাদের। তোমাদের প্রার্থনা খুব প্রয়োজন। একটা ব্যক্তিগত অনুগ্রহ হিসেবে আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা জিনিস চাইবো। আমি চাই যে, তোমরা এই চার্চের সদস্যদের তোমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে একটা প্রার্থনা করার অনুমতি দেবে। এখন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো আত্মা আছে যে এতো শীতল,

এতো কঠিন, এতো পথহারা যে এই প্রস্তাব না বলতে পারে। এই সমাজের ভাল মানুষদের তোমাদের জন্য প্রার্থনা করতে দিতে তোমরা কেউ কি অস্বীকৃতি জানাতে পারো?

নাটকীয়ভাবে তিনি বিরতি দিলেন। কেউ কোনো উত্তর করলো না। তার আবেদনের সকল কলাকৌশলের সঙ্গে আমি সুপরিচিত ছিলাম। আমি ওখানে চুপ করে বসে থাকি, খুব বোকা-বোকা লাগে আমার, আমার ইচ্ছা করে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বাড়ি চলে যাই, এই সব কিছু বিস্মৃত হই। কিন্তু আমি স্থির হয়ে বসে থাকি, এতোটা পাপ বোধের কারণে নয় যতটা নিদারুণ বিরক্তিতে।

যাজক জানতে চাইলেন, এই ঘরে কি এমন কেউ আছে যে ঈশ্বরের মুখের ওপর না ছুঁড়ে মারার সাহস রাখে?

নীরবতা।

যাজক বললেন, এখন আমি তোমাদের সবাইকে গির্জায় যেতে বলছি। তোমরা সামনের বেঞ্চে বসবে।

তিনি ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের দিকে এগিয়ে যান। তিনি তাঁর দু'হাত তুলে, করতল ঊর্ধ্বমুখী করে আমাদের দাঁড়াতে বলেন, যেন যাদুমন্ত্র বলে আমাদের দাঁড় করাবার মতো শক্তি তিনি রাখেন। প্রথম যে ছেলেটি উঠে দাঁড়ায় তাকে উৎসাহ দিয়ে তিনি বললেন, এই তো যুবক।

আমি ওদের অনুসরণ করি। গির্জার নিয়মিত উপাসকবৃন্দের দিকে মুখ করে আমরা একটা বেঞ্চে জলে ভেজা পাতিহাঁসের মতো বসে থাকি। আমার একটা অংশ মনে মনে শাপ-শাপান্ত করতে থাকে। নিচু গলায় একটা কোমল ধর্মগীতি শুরু হয় :

এই হয়তো শেষ সময়, জানি না আমি

ওরা গান গায়, গুনগুন করে গায়, বিলাপ করে গায়, আর্ত ধ্বনি তুলে গায়, মধুর আতঙ্ক জাগানিয়া সুরে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে আমরা যদি চার্চে যোগ না দিই তাহলে আমরা হয়তো আজ রাতেই ঘুমের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবো এবং সোজা নরকে যাবো।

চার্চ-সদস্যরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা অনুভব করে, গান ফুলে উঠে। ওরা কি আমাদের যোগ দিতে বাধ্য করার মতো, কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো, নতজানু হবার মতো ভয়ঙ্কর মধুর স্বরে গাইতে পারবে? কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়, যাজকের হাতে তাদের হাত স্থাপন করে। কয়েকজন নারী চিৎকার করে ওঠে, আনন্দে নাচতে শুরু করে।

আরেকটি ধর্মগীতি শুরু হয় :

এটা আমার ভাই নয়, এটা আমিই,
হে প্রভু,
তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি,
আমার দরকার প্রার্থনার...

গান চলাকালীনে যাজক আরেকটা কৌশল প্রয়োগ করলেন। তিনি তার কণ্ঠস্বর গানের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েও; তার কথা তারও ঊর্ধ্বে তুলে, বিষণ্ন সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যুবকদের ক'জন মা আজ রাতে এই সমাবেশে হাজির আছেন? তাদের সঙ্গে আমার এখানে চলে আসুন আপনারা। আমার মায়ের আশা হয় আমার দীর্ঘকাল স্থগিত প্রাণলাভের রাত বুঝি আজ সমাগত, তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে, এগিয়ে আসেন। মায়েরা তাদের ছেলেদের ঘিরে দাঁড়ান, ফিসফিস করে তাদের মিনতি করেন।

যাজক গানের সুরে বললেন, লক্ষী মিষ্টি মা-জননীগণ সমাধিস্থলে মেরী মাতার প্রতীকরা, নতজানু হয়ে আপনাদের ছেলেদের জন্য প্রার্থনা করুন, আপনাদের একমাত্র ছেলেদের জন্য।

মায়েরা নতজানু হয়। আমার মা আমার দু'হাত আঁকড়ে ধরেন, তার তপ্ত অশ্রু যেন আমার আঙুলগুলি পুড়িয়ে দেয়। আমি আমার নিদারুণ বিরক্তি দমন করার চেষ্টা করি। আমরা, এই তরুণরা যে সমাজ ও দলে বাস করি, আমরা যার একটা অংশ, সেই সমাজ ও দল দ্বারা আমরা ফাঁদে ধরা পড়েছি। আমাদের মায়েরা জনসমক্ষে নতজানু হয়ে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন, মিনতি করছেন আমরা যেন আনুগত্যের নিদর্শন দেখাই। ধর্মগীতি শেষ হয়। যাজক তখন একটি অতিশয় আবেগঘন প্রতীকী ভাষণ প্রদান করলেন। তিনি বর্ণনা করলেন কিভাবে আমাদের মায়েরা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, কিভাবে শিশুকাল থেকে আমাদের লালন-পালন করেছেন, আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে কিভাবে আমাদের সেবা শুশ্রূষা করেছেন, কিভাবে আমাদের বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন, আমাদের ওপর নজর রেখেছেন, আমাদের জন্য সর্বোত্তম কী কিভাবে তা তারা সর্বদা জেনে এসেছেন। এরপর তিনি আবার আরেকটা ধর্মগীতির আহ্বান জানালেন। গুনগুন সুরে তা গাওয়া হয়। তার উপরে গলা তুলে যাজক বিষণ্ন সুরেলা কণ্ঠে বললেন, এবার, যে মা তার পুত্রকে যথার্থই ভালবাসেন আমি সেই মাকে আহ্বান করছি, পবিত্র বারি দ্বারা অভিসিঞ্চিত হয়ে দীক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি যেন তার পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে আসেন।

আমি মনে মনে বলি, গড ড্যাম! আমি যে রকম ভেবেছিলাম তার চাইতে বেশি দ্রুত গতিতে ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে। আমার মা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি মিনতি করে বললেন, এসো বাবা। তোমার বুড়ি মাকে তোমাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে দাও। আমি তোমাকে এই পৃথিবীতে এনেছি, এখন তোমাকে রক্ষা করতে তুমি আমাকে সাহায্য করো।

তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চোখের জলের ভেতর দিয়ে তিনি ফিসফিস করে বললেন, আমি আমার সাধ্যমতো একজন ভাল মা হতে চেষ্টা করেছি, বাবা।

যাজক আমার মায়ের মিনতিকে আরো জোরদার করে বললেন, ঈশ্বর প্রতিটি কথা শুনছেন।

আত্মাকে বাঁচাবার এই ব্যবসায়ে নৈতিকতার নামগন্ধ ছিল না। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এখানে প্রতিটি মানবিক সম্পর্ককে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হয়। আসলে দল বা গোষ্ঠী আমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে, আমরা কি তাদের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি? আমরা যদি চার্চে যোগ না দিই তার অর্থ হবে না বলা, আর সে ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে নৈতিক দানবের জায়গায় স্থাপন করবো। জনৈক মাতা তার ভীত পরাজিত পুত্রকে আমেন, আমেন চিৎকার ও ঈশ্বরের স্তবকীর্তনের মধ্য দিয়ে যাজকের কাছে নিয়ে যায়।

আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার পঙ্গু বুড়ি মাকে ভালবাসো না, রিচার্ড?

তার ভয় হয় আমি হয়তো তাকে প্রকাশ্যে লজ্জা দেবো, অপমানিত করবো। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে এখানে এভাবে শূন্য হাতে দাঁড় করিয়ে রেখো না, রিচার্ড।

এটা এখন আর আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না করার কথা নয়। এটা এখন আর আমি চুরি করবো, কিংবা মিথ্যা কথা বলবো, কিংবা খুন করবো কিনা তার কথা নয়। এটা এখন সর্বসাধারণের অহঙ্কারের একটা সরল ও জরুরি বিষয়। অন্য লোকদের সঙ্গে আমার কতটুকু মিল আছে এটা তার বিষয়। আমি যদি এখন রাজি না হই তার অর্থ হবে এই যে আমি আমার মাকে ভালবাসি না। আর আমাদের এই দৃঢ়বদ্ধ, ছোট, কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কোনো উন্মাদ নেই যে নিজেকে ওই অবস্থায় ফেলবে। আমার মা বাহু ধরে আমাকে আকর্ষণ করেন, আমি তার সঙ্গে হেঁটে যাকজের কাছে যাই, যাককের সঙ্গে করমর্দন করি, যার অর্থ হলো আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য একজন প্রার্থী।

এরপর আরো গান গাওয়া হয়, আরো প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। দুপুর রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে এটা চলে। আমি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরি। নিজেকে মনে হয় একটা ত্যানার মতো শিথিল। চাপা ক্রোধ এবং লজ্জার একটা বিধ্বংসী বোধ ছাড়া আমি আর কিছুই অনুভব করি নি। তবু সব কিছু যে চুকে গেছে তার জন্য আমি এক ধরনের আনন্দও অনুভব করি। আমার আর সমাজের মধ্যে এখন কোনো বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে নেই। মাকে আমি সত্য কথা বলি, মা, আমি মনের মধ্যে কিছুই অনুভব করছি না।

মা আমাকে আশ্বস্ত করেন, ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। যথার্থ অনুভূতি ধীরে ধীরে তোমার মধ্যে ঠিকই জেগে উঠবে।

আমি যখন অন্য ছেলেদের কাছে স্বীকার করলাম যে আমি কিছুই অনুভব করি নি, তখন তারাও বললো যে তারাও কিছু অনুভব করে নি। তবে তারা বললো, আসল কথা হল চার্চের একজন সদস্য হওয়া।

দীক্ষা গ্রহণের রবিবার এসে উপস্থিত হয়। আমি আমার সব চাইতে ভাল জামাকাপড় পড়ে, ঘামতে ঘামতে গির্জায় যাই। দীক্ষার্থীরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে স্থান পায়। তারপর আমাদের গির্জার সম্মুখভাগে নিয়ে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। সাদা পোশাক পরিহিত যাজক জলের এক বিশাল গামলায় একটি ছোট তরু শাখা ডুবিয়ে প্রথম প্রার্থীর মাথার ওপর স্থিরভাবে ধরে রাখেন। তারপর তেজা তরু-শাখাটি নাড়াতে নাড়াতে তিনি সুললিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন– দি ফাদার, দি সান এন্ড দি হোলি গোস্টের নামে আমি তোমাকে ব্যাপটাইজ করছি। ছেলেটির মুখের ওপর টিপ টিপ করে জলের ফোঁটা পড়ে।

যাজক এক ছেলে থেকে আরেক ছেলের কাছে যান, প্রতিবারই তরু-শাখাটি জলে ডুবিয়ে নেন। আমার খুব বোকা-বোকা লাগে। আমার শরীর টানটান হয়ে যায়। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, থামান এই সব আগডুম-বাগডুম। কিন্তু আমি কিছুই বলি না। তেজা তরু-শাখাটি আমার মাথার ওপর নাড়ানো হয়, জলের ফোঁটা ফোঁটা বিন্দু আমার মুখ ও মাথার চাঁদি ভিজিয়ে দেয়, কয়েক ফোঁটা আমার কাঁধ দিয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে আমার পিঠ সিক্ত করে তোলে, আমার মনে হয় কয়েকটা পোকামাকড় যেন সেখানে হাঁটছে। আমার শরীর মোচড়াতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমি নিশ্চল হয়ে থাকি। তারপরই কাজটা শেষ হয়ে যায়, আমার উদ্বেগ অস্থিরতা অন্তর্হিত হয়। যাজক এখন অন্য একটি ছেলের মাথার ওপর তরু-শাখা নাড়ছেন। আমি নিঃশ্বাস ফেলি। আমি এখন দীক্ষাপ্রাপ্ত।

কিন্তু সম্প্রীতির দক্ষিণ হস্তের প্রসাদ লাভের পরও রবিবাসরীয় স্কুল আমার কাছে একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিদায়ক মনে হয়। শস্তা কাহিনীগুলির রঙচঙে বহুধ্বনি তুলনায় বাইবেলের গল্পগুলি মনে হয় মন্থর ও অর্থহীন। আর এ অনুভূতি শুধু আমার একার ছিল না, অন্য ছেলেরাও রবিবাসরীয় স্কুলে ঘুমিয়ে পড়তো। অবশেষে আমাদের মধ্যে যে সব চাইতে সাহসী সে স্বীকার করলো যে সমস্ত ব্যাপারটা একটা ধোঁকাবাজি। আমরা প্রায়ই চার্চ থেকে পালাতে শুরু করি।

গ্রীষ্মকাল এগিয়ে আসে। আমার মা আরেকটা পক্ষাঘাত আক্রমণের শিকার হন। আমাকে অসহায়ভাবে তার যন্ত্রণা দেখতে হয়, তার গোঙানি শুনতে হয়। রাতে আমি না ঘুমিয়ে জেগে থাকি, আরকানসাসের প্রথম দিনগুলির কথা স্মরণ করার চেষ্টা করি, আমার মায়ের জীবনের রূপরেখা তৈরি করি, ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে নতুন করে পার হই, মনে মনে ভাবি কেন আমার মাকেই বেছে নেয়া হলো এই ধরনের যন্ত্রণা, অর্থহীন যন্ত্রণা, ভোগ করার জন্য। আমার মন একটা সন্ত্রম জাগানিয়া ভয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। এ রকম ভয় আমি গির্জাতেও কখনো অনুভব করি নি। আমার মন কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। সমগ্র জীবনের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠি। কিন্তু আমি নিজেকে কখনো তুচ্ছ

বা অতিবিনীত বলে অনুভব করি না।

আমাদের সংসারে আরেকটা পরিবর্তন দেখা দেয়। আমাদের টাকার খুব দরকার পড়ে। নানী আর অ্যাভি খালা ঠিক করলেন যে আমরা এতো বড় বাড়ি রাখতে পারবো না। টম মামা আর তার পরিবারকে আমাদের দোতলায় থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হলো, নাম-মাত্র ভাড়া দেবেন তারা। খাবার ঘর আর বসার ঘরকে শোবার ঘরে রূপান্তরিত করা হলো। এই প্রথমবারের মতো আমাদের থাকার জায়গায় টানাটানি ঘটে। আমরা গাদাগাদি করে বাস করি। আমাদের স্নায়ুর ওপর চাপ পড়তে শুরু করে। টম মামা মফস্বলের স্কুলে ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন, আর আমাদের এখানে এক বাড়িতে বাস করতে শুরু করা মাত্রই আমার জীবনে কোথায় কি ভুল হয়েছে আমাকে তা বলতে আরম্ভ করলেন তিনি। আমি তাকে উপেক্ষা করি আর এ জন্য তার মধ্যে আমার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভ জন্মে।

এখন রান্নাঘরে বাসন-কোসনের ঝনঝনানিতে সকাল বেলা আমার ঘুম ভাঙে। আমি বুঝতে পারি যে মামা আর তার পরিবার নাশতা খাচ্ছে।

একদিন সকালে আমি আমার মামার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তিনি শান্ত কিন্তু অব্যাহতভাবে আমাকে ডেকে চলেছেন। আমি চোখ খুলে রান্নাঘরের দরজার পাশে তার আবছা মুখকে উঁকি দিতে দেখি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে এখন?

আমি নিদ্রাতুর গলায় বিড়বিড় করে বললাম, কি?

তিনি আবার বললেন, কটা বাজে এখন?

আমি কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে খাটের পাশের টেবিলে রাখা আমার এক ডলার দামের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, পাঁচটা বেজে আঠারো মিনিট।

পাঁচটা বেজে আঠারো?

হ্যাঁ।

তিনি আবার জিজ্ঞাস করলেন, ঠিক পাঁচটা বেজে আঠারো?

আমি ছিলাম ক্লান্ত, নিদ্রালু। আবার ঘড়ির দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু আমি জানতাম যে মোটামুটি ঠিক সময়ই আমি তাকে দিয়েছি। আমার বালিশে মুখ গুঁজে আমি বললাম, হ্যাঁ, একটু কম বেশি হতে পারে, কিন্তু খুব বেশি ভুল হবে না।

ছোট একটা নীরবতা নেমে আসে। আমি মনে করি যে তিনি চলে গেছেন। কিন্তু না, তিনি ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলতে চাও তুমি, ছোকরা? আমি উঠে বসি, চোখ পিটপিট করি, ছায়াছন্ন ঘরে তার মুখের অভিব্যক্তি দেখার চেষ্টা করি। বিমূঢ় হয়ে আমি বলি, কি বলতে চাই আমি! যা বলেছি তাই তো বলতে চেয়েছি আমি।

আমি কি তাহলে তাকে ভুল সময় দিয়েছি? আমি আবার আমার ঘড়ির দিকে তাকাই, তারপর বলি, এখন আটটা বিশ।

তিনি গর্জে উঠলেন, বেয়াদব, কালো বদমাশ!

আমি আমার শয্যার চাকনি ঠেলে ফেলে দিই, বুঝতে পারি যে, একটা গণ্ডগোল ঘনিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাগ করছেন কেন?

তিনি উত্তেজনায় অস্পষ্টভাবে হড়বড় করে বললেন, আমি আমার সারা জীবনে তোমার মতো এতো অতি চালাক কালো ফুদে শয়তান দেখি নি।

আমি মেঝেতে আমার পা নামিয়ে দিই যেন তাকে ভালভাবে দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কী যা তা বলছেন। আপনি সময় জানতে চেয়েছিলেন আমি আপনাকে সময়টা জানিয়ে দিয়েছি।

তিনি ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক সুরে আমাকে অনুকরণ করে বললেন, একটু কমবেশি হতে পারে, কিন্তু খুব বেশি ভুল হবে না! শোনো, আমি ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছি, কিন্তু আমি দিব্যি কেটে বলছি, কোনো ছেলেকে আমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে কখনো শুনি নি।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু অন্যায় কি বলেছি?

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, একদম চুপ! নইলে তোমার ওই অতি-চালাক গলার মধ্যে আমি আমার এই হাতের মুঠি ঠেসে ঢুকিয়ে দেবো। আর একটা কথা বললে আমি বেতিয়ে তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবো।

আমি বললাম, আপনার কি হয়েছে, টম মামা? আমি যা বলেছি তার মধ্যে অন্যায়টা কি হয়েছে?

তার গলা থেকে হিসহিস করে নিঃশ্বাস নির্গত হবার শব্দ শুনলাম আমি। আমি টের পাই যে তিনি অসম্ভব ক্ষেপে গেছেন। তিনি বললেন, আজ আমি তোমাকে এমন চাবুক মারবো যা অনেক আগেই একজন কারো মারা উচিত ছিল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার জামাকাপড় হাতে তুলে নিই। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়। এতো অকস্মাৎ আমি লড়াইতে জড়িয়ে পড়ি যে পরিস্থিতির সবগুলি সুতা আমি সঙ্গে সঙ্গে একত্রিত করতে পারি না। আমার মনে হয় না আমাকে অতি-চালাক বলার কোনো কারণ আমি তাকে দিয়েছি। সবার সঙ্গে আমি যেভাবে কথা বলি তার সঙ্গেও সেভাবে কথা বলেছি। অন্যরা যদি আমার কথায় ক্ষুব্ধ না হন তাহলে তিনি হবেন কেন? আমি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে তার বাইরে যাবার শব্দ শুনি। আমি বুঝতে পারি যে তিনি পেছনের আঙিনায় যাচ্ছেন। আমি আমার পোশাক পরে ছুটে জানালার কাছে যাই, দেখি যে তিনি এলম গাছ থেকে একটা লম্বা, কচি, সবুজ কঞ্চি ছিঁড়ে নিচ্ছেন। আমার শরীর শক্ত হয়ে যায়। ওই বেত দিয়ে তিনি আমাকে মারবেন আমি তা কিছুতেই হতে দেবো না। ক'দিন আগেও তিনি আমার কাছে ধারে ছিলেন না, আমার বেড়ে ওঠা বা না বেড়ে ওঠার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি কাজ করি, বাইরে খাওয়া-দাওয়া করি, নিজের কাপড় নিজে কিনি, যে সামান্য কিছু টাকা-পয়সা পারি সংসারের সাহায্যকল্পে তা থালার হাতে তুলে দিই। আর এখন এই অচেনা

মামার মনে হয় যে আমি দুর্বিনীত, আর এখন তিনি আমাকে এমন শিক্ষা দিতে চান যেন আমি তুলা খামারগুলির পশ্চাদপদ কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের মতো আচরণ করি। তিনি আমাকে শেখাবেন কেমন করে দাঁত বের করে হাসতে হয়, মাথা নিচু করে রাখতে হয়, আর আমাকে উদ্দেশ্য করে কেউ কিছু বললে কেমন করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বিড়বিড় করতে হয়।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রতিবাদে চঞ্চল হয়ে ওঠে। না, ওটা হবে না। তিনি আমাকে পিটাবেন না। শুধু ভয় দেখাচ্ছেন। তার রাগ অপসৃত হবে। তিনি বিষয়টা ভেবে দেখবেন এবং বুঝবেন যে এটা নিয়ে এরকম হইচই করার কোনো মানে হয় না। আমি আমার জামাকাপড় পরে বিছানার একধারে বসে অপেক্ষা করি। পেছনের বারান্দায় আমি তাঁর পায়ের আওয়াজ পাই। আমার সমস্ত শরীর কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটা কতকাল চলবে? তুচ্ছ কারণে, তুচ্ছের চাইতেও কম কারণে, কতকাল আমি মার খাবো? আমার আত্মীয়স্বজনরা ইতিমধ্যে আমার এমন একটা অবস্থা করেছিল যে আমি যখন ওদের পাশ দিয়ে যেতাম তখন সত্যি সত্যি আমার মাংসপেশীতে খিচুনি জাগতো। আর এখন আমার কথার সুর ও ভঙ্গি পছন্দ না হওয়ার কারণে একজন আমাকে পিটাবেন। আমি ঘরের ওপাশে ছুটে গিয়ে ড্রয়ার টেনে তার মধ্য থেকে আমার রেজার ব্লেডের প্যাকেটটা হাতে তুলে নিই। আমি প্যাকেট খুলে আমার দুই হাতে নীল ইস্পাতের দুই সরু ব্লেড আঁকড়ে ধরে, তৈরি হয়ে তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। দরজা খোলে। আমি মরীয়া হয়ে আশা করি যে, এটা সত্য নয়, এটা একটা স্বপ্ন এবং অচিরেই এর ইতি ঘটবে।

তিনি অচঞ্চল, শীতল গলায় ডাকলেন, রিচার্ড।

আমি আমার কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা চাপবার চেষ্টা করে জবাব দিলাম, ইয়েস স্যার।

এখানে এসো।

আমি রান্নাঘরে প্রবেশ করি, আমার চোখ দুটি স্থির হয়ে থাকে তার ওপর, আমি আমার পিঠের পেছনে হাতে ধরে রাখি রেজার দুটি। আমি তাকে জিজ্ঞাস করি, তো, টম মামা, আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার?

লোকজনের সঙ্গে কিভাবে বাস করতে হয় সে ব্যাপারে তোমার একটা শিক্ষা দরকার।

দরকার যদি হয়ও তাহলেও সে শিক্ষা আপনি আমাকে দেবেন না।

তোমার সঙ্গে আমার হিসাব-নিকাশ শেষ হবার আগেই তোমাকে এই কথা গিলে খেতে হবে।

দেখুন টম মামা, আপনি আমাকে চাবুক মারতে পারেন না। আমার কাছে আপনি একজন অপরিচিত মানুষ। আমি আপনার খাই না, পরি না। আপনার বাড়িতে আমি থাকি না।

তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, তোমার ওই নোংরা মুখ বন্ধ করে পেছনের আঙ্গিনায়

চলো। আমার হাতের খুর তখনো তিনি দেখেন নি। আমি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাই, তারপর বারান্দা থেকে নিচু মাটিতে লাফিয়ে পড়ি। তিনি ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেড উঁচিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসেন।

আমি নিচু তীব্র আবেগাক্রান্ত গলায় তাকে সতর্ক করে দিই- আমার দু'হাতে দুটো খুর আছে। আপনি যদি আমাকে স্পর্শ করেন তাহলে বিশ্বাস করুন আমি খুর চালাবো। হয়তো আমার গায়েও খুরের আঘাত লাগবে, কিন্তু এই আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আপনাকে আমি ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়বো।

তিনি থেমে যান। প্রভাতের স্ফুটনোন্মুখ আলোয় আমার উত্তেজিত দু'হাতের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকান। আমি আমার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝে শক্ত করে ধরে রাখি ক্ষুরধার ইস্পাতের নীল প্রান্তদেশ।

রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে তিনি বললেন, মাই গড।

আমি তাকে বললাম, আজ সকালে আমি আপনার অনুভূতিতে কোনো আঘাত দিতে চাই নি, অথচ আপনি জোর করে বলছেন যে আমি চেয়েছি। এখন শুনুন আপনার আহত অনুভূতির জন্য আমি মার খাবো, সেটা আমি হতে দেবো না।

তিনি সবিস্ময়ে চাপা গলায় বললেন, তোমার মতো এতো বড় অপরাধী আমি জীবনে দেখি নি।

আমি তাকে বললাম, আপনি যদি লড়তে চান তাহলে আমি লড়বো। এখন থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে এই ব্যবস্থাই চালু থাকবে।

তিনি তার মাথা নাড়েন, অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করেন, তারপর বলেন, তোমার জীবনে কিছু হবে না।

সে জন্য আমি চিন্তিত নই। আমি শুধু চাই যে আপনি আমার কাছ থেকে দূরে থাকবেন, এখন এবং সর্বদা...।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তোমার পরিণতি ফাঁসির মঞ্চ।

তাই যদি হয় তাহলে সে ব্যাপারে আপনার কোনো ভূমিকা থাকবে না।

তিনি নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। স্পষ্টতই তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি, কারণ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি আমার দিকে এক পা এগিয়ে আসেন। তিনি হুকুম করলেন, তোমার ওই খুর দুটো ফেলে দাও।

আমার কণ্ঠস্বরে হিস্টিরিয়া লাফিয়ে উঠে। আমি পিছিয়ে যেতে যেতে, আমার হাতের রেজার দিয়ে ফালি ফালি করে বাতাস কাটতে কাটতে, চিৎকার করে বলি, আমি আপনাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবো।

তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। এ রকম একজন দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানুষের মুখোমুখি তিনি তার জীবনে আগে কখনো হন নি। মাঝে মাঝেই তিনি চোখ পিটপিট করেন, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়েন। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, বেকুব কোথাকার!

আমি তাকে আবার সতর্ক করে দিই, আপনি যদি আমাকে আঘাত করেন তাহলে আমি আপনাকে রক্তে লাল করে ফেলবো।

তার বুক ফুলে ওঠে, তারপরই তার শরীর শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। তিনি বললেন, একদিন কেউ একজন তোমার তেজ ভেঙ্গে দেবে।

সে মানুষ আপনি হবেন না।

তোমার উচিত সাজা তুমি একদিন ঠিকই পাবে।

আমাকে সে সাজা আপনি দিতে পারবেন না।

তিনি ভারি গলায় বললেন, তুমি সদ্য দীক্ষা গ্রহণ করেছো!

জাহান্নামে থাক ওই সব।

প্রভাতের আলোয় আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। দিগন্তে সূর্য উঁকি দেয়। মোরগ ডেকে ওঠে। কাছে কোথাও একটা পাখি কিচির-মিচির করে। হয়তো প্রতিবেশীরা কান পেতে শুনছে। টম মামার মুখে কাঁপুনি দেখা দেয়। তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তার ঠোঁট কাঁপে।

অবশেষে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। আপনি বরং আপনার নিজের জন্য দুঃখিত হন।

তিনি তার দু'হাত নিচে ঝুলিয়ে দিলেন। কঞ্চিটার প্রান্তদেশ ধুলায় লুটিয়ে পড়ে। তিনি বললেন, তুমি ভাবছো তুমি খুব বড় হয়ে গেছো কিন্তু তোমার শিক্ষা হবে, আর সে শিক্ষা হবে কঠিন পথে। তোমার জন্য আমি যদি দৃষ্টান্ত হতে পারতাম তাহলে খুব ভাল হতো....

আমি বুঝতে পারি যে আমি বিজয়ী হয়েছি, তার কাছ থেকে মানসিক ও আবেগগতভাবে মুক্ত হয়েছি, তবু আমি নিশ্চিত হতে চাইলাম। তাচ্ছিল্যের স্বরে আমি তাকে লক্ষ্য করে তীব্র কণ্ঠে বললাম, আপনি আমার জন্য কোনো দৃষ্টান্ত নন, কোনোদিন আপনি তা হতেও পারবেন না। আপনি একটি সতর্কসঙ্কেত। আপনার জীবন এমন উজ্জ্বল কিছু নয় যে আপনি আমাকে কী করতে হবে তা বলতে পারেন।

শিক্ষকতা থেকে অবসর নেয়ার পর জীবিকার জন্য তিনি এখন চেয়ার মেরামতির কাজ করেন। আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম, আপনি কি মনে করেন বড় হবার পর আমি চেয়ারের পাছা বোনার কাজে ব্যস্ত থাকবো যেন মানুষ এসে তার ওপর বসতে পারে?

তার শরীর ভীষণভাবে কেঁপে উঠে। তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। বিড়বিড় করে তিনি বললেন, এ কথা বলার জন্য একদিন তুমি পস্তাবে। তিনি তার দীর্ঘ শীর্ণ কুব্জ দেহ গুলিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন। আমি অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে থাকি, আমার আবেগকে প্রশমিত হতে দিই। তারপর আমি সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকি, আমার টুপি, কোট, বইগুলি হাতে তুলে নিয়ে কাজ করতে যাই, শ্বেতাঙ্গদের খামখেয়ালিপনার মুখোমুখি হবার জন্য যাত্রা করি আমি।

সপ্তম অধ্যায়

গ্রীষ্ম। উজ্জ্বল উষ্ণ দিনগুলি। ক্ষুধা এখনও আমার চেতনার একটা আতঙ্কিত অংশ। জনাকীর্ণ বাড়ির হলঘরে আত্মীয়দের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করা এবং কথা না বলা। খাবার টেবিলে নীরবে আহার করা, যেখানে উচ্চারিত হয় প্রার্থনাবলী। মায়ের কাছে ফিরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কিন্তু এখন নিশ্চিতভাবে পঙ্গু হয়ে পড়া। আমি কি সেপ্টেম্বরে স্কুলে যেতে পারবো? একাকীত্ব। বই পড়া। চাকরি খোঁজা। উত্তরে যাবার ভাসাভাসা আশা। কিন্তু এই উদ্ভট বাড়িতে আমি যদি আমার মাকে ফেলে রেখে যাই তাহলে তার কি হবে? আর একটা অচেনা শহরে আমার অবস্থাই বা কি রকম হবে? সন্দেহ। ভয়। আমার বন্ধুরা লম্বা-প্যান্ট স্যুট কিনছে। সতেরো থেকে বিশ ডলার দামের, আমার কাছে সে ছিল আল্পস পর্বতের মতো উঁচু। ১৯২৪ সালে এই ছিল আমার বাস্তবতা।

খবর আসে যে কাছের একটি ইটখোলায় লোক নিচ্ছে। আমি খোঁজ নিতে যাই। আমি রোগা পলকা, ওজন একশো পাউন্ডও নয়। দুপুরে আমি চুপিচুপি ইটখোলায় ঢুকে পড়ি, ভেজা, পরিচ্ছন্ন গন্ধের এঁটেল মাটির সারির মধ্য দিয়ে ইটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই। আমি একটা ছোট দু'চাকার হাতে ঠেলা গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াই, গাড়ি ভর্তি ভেজা ইট, সদ্য মেশিন থেকে বের করা হয়েছে, যে মেশিন ওদের আকার দিয়েছে। আমি গাড়ির হাতল দুটি ধরি কিন্তু উঁচু করে তুলতে প্রায় পারি না। আমার ওজনের চাইতে বোধহয় চারগুণ বেশি ওজন হবে। আমি যদি আরো শক্তিশালী হতাম, আরো ভারি হতাম। পরে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি যে জল সরবরাহ করার ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমি ছুটে অফিসে যাই এবং তখুনি নিয়োগ পাই। কড়া রোদের মধ্যে আমি একটা বড় দস্তার বালতিতে জল নিয়ে একদল কৃষ্ণাঙ্গ কর্মরত মজুরের কাছ থেকে অন্য এক দলের কাছে যাই। বেতন পূর্ণ দিনে এক ডলার। এক একজন মজুর পেয়ালা আকৃতির লম্বা হাতলযুক্ত টিনের পাত্রটি ঠোঁটের কাছে তুলে দেয়, এক চুমুক জল টেনে নিয়ে আলতোভাবে তার মুখ প্রক্ষালন করে, থুতু ফেলে, তরপর চকচক করে জল খায়, অনেকক্ষণ ধরে, আর পাত্রের মধ্যে টিপটিপ করে তার ঘাম ঝরে পড়ে। তারপর আমি অন্য দলের দিকে ছুটে যাই, গানের সুরে বলি, জল! জল!

একজন চেঁচিয়ে ওঠে, এই ছেলে, এদিকে!

জলের পাত্র নিয়ে আমি হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ঢুকে যাই ভেজা এঁটেল মাটির গর্তের গভীরে, চিটচিটে খানায়, উঠে যাই পিচ্ছিল চড়াই দিয়ে। মাঝে মাঝে ঘুরায় আমার মাথা ঝিমঝিম করে, একটা টিলার উপরে উঠার আগে একটু থেমে আমি দম

নিই, কিন্তু তবু আমি ওই কাজে লেগে থাকি। সপ্তাহান্তে আমি যে টাকা পাই তা আমাদের সংসারের অনিঃশেষ খরচের মধ্যে মিলিয়ে যায়। পরে আমি ইটখোলায় আরেকটা কাজ পাই, বাট বয়-এর, এবার মজুরি হলো দিনে দেড় ডলার। আমি এঁটেল মাটির দেয়ালগুলির মধ্য দিয়ে ঘুরি, যে ইটগুলি ফেটে গেছে সেগুলি আমার ঠেলাগাড়িতে কুড়িয়ে নিই, তারপর গাড়ি ভর্তি হলে সেটা ঠেলতে ঠেলতে একটা মাঠের ভারার কাছে নিয়ে যাই, তারপর একটা পুকুরের মধ্যে সব ফেলে দিই।

এখানে শুধু একটা জিনিসকেই আমি ভয় পেতাম। একটা কুকুর। কুকুরটা ছিল ইটখোলার মালিকের। সে এঁটেল মাটির গলিপথগুলিতে ঘুরে বেড়াতো, হঠাৎ দাঁত দিয়ে কিছু একটা কামড়ে ধরতো, ক্রুদ্ধ গর্জন করতো। বহুবার কুকুরটা আহত হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ মজুররা সারাক্ষণই ওটাকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়ে মারতো। জন্তুটাকে দেখা মাত্র আমিও আমার গাড়ি থেকে একটা ইটের টুকরা তুলে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারতাম। কুকুরটা চোরের মতো সটকে পড়তো কিন্তু একটু আবার তার দাঁত দেখিয়ে উদয় হতো। বেশ কয়েক জন নিগ্রো ওই কুকুরের কামড় খেয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কর্তাকে বলা হয়েছে ওটাকে বেঁধে রাখতে কিন্তু তিনি রাজি হন নি। একদিন বিকালে আমি আমার ছোট গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে পুকুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ টের পেলাম আমার উরুতে তীক্ষ্ণ কিছু একটা যেন বসে গেল। আমি দ্রুত দাঁড়াতেই দেখলাম ওই কুকুরটা কয়েক ফুট দূরে গুঁড়ি মেরে বসে আছে আর দাঁত বের করে ক্রুদ্ধ গর্জন করছে। ওটা আমাকে কামড় দিয়েছে। আমি কুকুরটা তাড়িয়ে দিয়ে আমার প্যান্ট খুলে দাঁতের দাগ দেখতে পাই। বেশ গভীর হয়ে দাঁত বসেছে। জায়গাটা লাল হয়ে গেছে।

যন্ত্রণাকে আমি বেশি আমল দিই না কিন্তু আমার ভয় হয় রোগ সংক্রমণের। কর্তার কুকুর আমাকে কামড়ে দিয়েছে এটা জানাবার জন্য আমি আপিসে যাই। একটি দীর্ঘাঙ্গী উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ মেয়ে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাই?

আমি কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, ম্যাম।

কি জন্য?

ওর কুকুর আমাকে কামড়েছে, ম্যাম। কোনো রকম সংক্রমণ হয় কিনা সে জন্য আমার ভয় করছে।

তোমাকে কামড়েছে? কোথায়?

আমি মিথ্যা কথা বলি, পায়ে। ওকে কামড়ের জায়গাটা দেখাতে আমার লজ্জা করে।

মেয়েটি বললো, দেখি।

আমি বললাম, না ম্যাম।

কর্তার সঙ্গে কি আমি দেখা করতে পারবো না?

তিনি এখন এখানে নেই। মেয়েটি তার টাইপ করার কাজে ফিরে যায়।

আমিও আমার কাজে ফিরে যাই, মাঝে মাঝে দাঁতের দাগগুলি দেখি। ফুলে উঠতে শুরু করেছে। শেষ বিকালের দিকে একজন দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসেন। তার পরনে সাদা স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট, পায়ে সাদা জুতা। তিনি আমার দিক আঙুল দেখিয়ে একটি কালো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ওই নিগারটা নাকি?

কালো ছেলেটি বললো, হ্যাঁ, স্যার।

তিনি আমাকে ডাকলেন, এদিকে আয়, নিগার।

আমি তার কাছে যাই।

ওরা বলছে আমার কুকুর নাকি তোকে কামড়েছে।

হ্যাঁ, স্যার।

তিনি ঘোঁতঘোঁত করলেন, হুম, তারপর হেসে উঠে বললেন, কুকুরের কামড়ে কোনো নিগারের কিছু হয় না।

আমি বললাম, জায়গাটা ফুলে উঠছে, আর আমার ব্যথা করছে।

যদি বেশি ব্যথা করে তবে আমাকে জানাস, তবে কোনো নিগারকে কামড়ে সত্যিকার আহত করতে পারে এমন কোনো কুকুর আমি কখনো দেখি নি।

তিনি ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যান। কৃষ্ণাঙ্গ বালকগুলি ভেজা ইটের সারির মধ্য দিয়ে তার অপসৃয়মান দীর্ঘ দেহটি দেখার জন্য জড়ো হয়।

কুত্তার বাচ্চা।

একদিন ওই কুকুর ওকেই মজা দেখাবে।

উহু, ওদের হৃদয় কী পাষাণের মতো রে!

সাদা চামড়ার মানুষগুলো করতে পারে না এমন কিছুই নেই।

শোলার টুপি মাথায় সাদা কর্তা চেঁচিয়ে উঠেন, এই ছোড়ারা, জটলা ভেঙ্গে কাজে লেগে যা।

আবার ঠেলাগাড়ির চলা শুরু হয়। একটা কালো ছেলে আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বললো, তুমি ডাক্তার দেখাও।

আমি বললাম, আমার টাকা নেই।

দু'দিন কেটে যায়। সৌভাগ্যবশত লাল রঙ আর ফোলা মিলিয়ে যায়।

গ্রীষ্ম শেষ হলে ইটখোলা বন্ধ হয়। আমি আবার বেকার হয়ে পড়ি। একদিন শুনলাম যে গল্ফের মাঠে কাজের ছেলে দরকার। আমি পাঁচ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গল্ফ খেলার মাঠে গিয়ে হাজির হই। একজন লালমুখো শ্বেতাঙ্গ আমাকে কাজে বহাল করে। নয়টা গর্ত খেলার জন্য আমি পঞ্চাশ সেন্ট করে পাবো। গল্ফ খেলার কিছুই আমি জানতাম না। তিন মিনিটের মধ্যে আমি তিনটি বল খোয়াই। আমার চোখ বলের উড়ে যাওয়া গতিপথ অনুসরণ করতে পারে না। লোকটি আমাকে বরখাস্ত করে। আমি মনোযোগ দিয়ে অন্য ছেলেগুলির কাজ লক্ষ্য করি। আধ ঘন্টার মধ্যেই আরেকটা গল্ফ

ব্যাগ হাতে নিয়ে আমি একটা বলের অনুসরণ করি। এক ডলার রোজগার করি আমি। নিদারুণ বিরক্তি নিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত গম্ভ মাঠের চেহারা আমার মধ্যে ঘৃণা জাগিয়ে তোলে।

স্কুল খোলে। আমি নিজেকে প্রস্তুত করি নি, তবু আমি ভর্তি হই। স্কুলটা ছিল শহরের অপর প্রান্তে। হেঁটে যাওয়া-আসা করতেই আমার জাঙ আর ভয়োরের চর্বির ঝোলের সকালের নাশতা হজম হয়ে যেতো। কোনো বইপত্র ছাড়াই আমি এক মাস ক্লাস করি তারপর সপ্তাহে তিন ডলার মজুরিতে সকালে-বিকালে একটা কাজ পাই। যে জগতে আমি বাস করি তার প্রকৃতি স্পষ্ট এবং অকাট্য হয়ে ওঠার পর আমি চুপচাপ এবং ঢাপা স্বভাবের হয়ে যাই। ভবিষ্যতের হতাশাব্যঞ্জক রূপ আমার লেখাপড়ার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। নানী ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার সময় হয়েছে। কিন্তু জীবিকা অর্জনে আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কি আমি শিখেছি? কিছুই না।

আমার আগে আমার বাবা যা ছিলেন আমি সে রকম একটা কুলি হতে পারি, তাছাড়া আর কি? নিগ্রো হিসাবে বেঁচে থাকার সমস্যা কঠিন এবং শীতল হয়ে দেখা দেয়। কোন জিনিসটা কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণাকে সব কিছু সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছে, তাকে এতো অনড় অটল করেছে? ও রকম ঘৃণার মধ্যে কি ধরনের জীবন সম্ভব? কেমন করে এই ঘৃণার জন্ম হয়? স্কুলের শ্রেণী কক্ষে নিগ্রোদের সমস্যা সম্পর্কে কিছুই শেখানো হতো না, আর যখনই ছেলেদের সঙ্গে আমি এসব প্রশ্ন তুলতাম তখনই হয় তারা চুপ করে যেতো, নয়তো বিষয়টাকে হাসিঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতো। তারা যে সব ছোটখাটো বক্তিগত অন্যায়ের শিকার হতো তা নিয়ে তারা খুব সোচ্চার ছিল, কিন্তু সামগ্রিক চিত্রটি জানার কোনো উৎসাহ তাদের মধ্যে ছিল না। তাহলে এ নিয়ে আমার কেন এতো দুশ্চিন্তা হয়?

তাহলে আমার মামারা, খালারা আর নানী বারবার আমাকে যেমন খারাপ বলেন, আমি কি সত্যিই তেমন খারাপ? প্রশ্ন করাটাকে কেন খারাপ বিবেচনা করা হয়? আমি যখন শান্তি প্রতিহত করি তখন কি আমি ঠিক করি? একটা জিনিসকে অন্যায় মনে করেও কেউ তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এ আমি ভাবতেও পারি না। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে অথরিটি ভুল করছে তাহলেও কি তার কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত? এর উত্তর যদি হয় হ্যাঁ, তাহলে আমি জানি যে আমি সর্বদাই অন্যায় করবো, কারণ কাজটি আমি কখনই করতে পারবো না। কিন্তু তাহলে যে জগতে একটা মানুষের মন এবং উপলব্ধি অর্থহীন, শুধু অথরিটি এবং ট্র্যাডিশনই সব কিছু, সেখানে সে বাঁচবে কেমন করে? কোনো উত্তর নেই এর।

অষ্টম গ্রেডের দিনগুলি তাদের ক্ষুধার্থ পথ বেয়ে প্রবাহিত হয় আর আমি আরো বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠি। আমি ক্লাসে বসে থাকি, বিরক্ত হই, নানা কথা ভাবি, স্বপ্ন

দেখি। এক দীর্ঘ নীরস অপরাহ্নে আমি আমার রচনার খাতা বের করে মনে মনে বলি, আমি একটা গল্প লিখবো। নিছক অলসতা আমাকে এই কাজে প্ররোচিত করে। যে গল্পটা কি নিয়ে হবে? কাহিনীটা হবে এ রকম– এক খলনায়ক জীবন বিপন্ন করে মালিক হতে চায়। আমি গল্পের নাম দিই নরকের আধ বিঘার অতঃ কুরুক্ষ। গল্পটি ছিল স্কুল রকমের পরিবেশভিত্তিক, আবেগাক্রান্ত, স্বপ্ন প্রণোদিত মনস্তাত্ত্বিক এবং নির্ভেজাল অনুভূতি উৎসারিত। আমি তিনদিনে গল্পটি শেষ করি। এখন এটা নিয়ে কি করবো আমি?

স্থানীয় নিগ্রো সংবাদপত্র! হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি ওদের দফতরে ছুটে গিয়ে জমার ছেঁড়াখোড়া রচনার খাতা এক ভদ্রলোকের নাকের নিচে ঠেলে দিয়ে, যিনি নিজেকে অভিহিত করেন সম্পাদক বলে।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কি এটা?

একটা গল্প।

সংবাদ-কাহিনী?

না, বানানো গল্প।

ঠিক আছে, আমি পড়ে দেখবো। তিনি তার দেরাজে আমার রচনার খাতা ঢুকিয়ে দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তার পাইপ টানতে থাকেন। আমি বললাম, কিন্তু আমি চাই যে, আপনি গল্পটি এখনই পড় ন। তাঁর চোখ পিটপিট করে। খবরের কাগজ কিভাবে চলে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি মনে করতাম, একজন একটা গল্প নিয়ে সম্পাদকের কাছে যায়, সম্পাদক তখনই তার আসনে বসে গল্পটা পড়ে হ্যাঁ কিংবা না বলে দেন।

তিনি আমাকে বললেন, আমি এটা পড়বো, আর আগামীকাল তোমাকে জানাবো।

আমি নিরাশ হই। আমি এটা লেখার জন্য সময় ব্যয় করেছি। আর তাকে মনে হয় সুদূর এবং নিরাসক্ত।

আমি আমার হাত বাড়িয়ে বলি, আমার গল্পটা আমাকে দিন।

তিনি আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে খাতাটা তুলে নিয়ে দশ-বারো পৃষ্ঠা পড়লেন, তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, কাল একবার আসতে পারবে না? এর মধ্যে আমি পড়ে শেষ করে ফেলবো। আমি আন্তরিকভাবেই নরম হয়ে বলি, ঠিক আছে, কাল একবার আমি আসবো। তিনি পড়বেন না এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে আমি উঠে পড়ি। এবার, তিনি গল্পটা ফিরিয়ে দেবার পর কি করবো আমি? পরদিন বিকালে আমি আমার কাজে যাবার পথে সংবাদপত্রটির দফতরে যাই, গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আমার গল্পটা কোথায়?

তিনি বললেন, গ্যালিতে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা কি? কাকে গ্যালি বলে আমার জানা ছিল না।

তিনি বললেন, টাইপে বসানো হচ্ছে। আমরা ওটা প্রকাশ করছি।

আমি উত্তেজনা বোধ করি, জিজ্ঞাসা করি, কতো টাকা পাবো আমি এর জন্য?

তিনি বললেন, পাণ্ডুলিপির জন্য আমরা কোনো পয়সা দিতে পারি না।

আমি যুক্তি দেখাই, কিন্তু আপনারা তো কাগজ বিক্রি করে পয়সা পাবেন।

তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন, কিন্তু তুমি তো এ কাজে নতুন।

আপনি আমাকে আমার গল্পটা বিনি পয়সায় দিয়ে দিতে বলছেন কিন্তু আপনারা তো আপনাদের কাগজ বিনি পয়সায় দেন না।

তিনি হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, দেখো, তুমি সবে শুরু করছো। এই গল্পের মাধ্যমে আমাদের পাঠকদের সামনে তোমার নাম উঠে আসবে। এর একটা দাম আছে।

আমি তবু জোর দিয়ে বলি, আমার গল্প যদি আপনার পাঠকদের কাছে বিক্রি করার মতো লাভ হয়, তাহলে তাদের কাছ থেকে আপনি যে অর্থ পাবেন তার একটা অংশ তো আপনার আমাকে দেয়া উচিত।

তিনি আবারো হেসে উঠলেন। আমি বুঝলাম যে আমার আচরণে তিনি মজা পাচ্ছেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে অর্থের চাইতে বেশি মূল্যবান একটা জিনিস দেবো। কিভাবে লিখতে হয় সেটা শেখাবো একটা শেখার সুযোগ আমি তোমাকে দেবো।

আমি খুশি হই, কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে তিনি আমার কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা নিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কখন আমার গল্প ছাপছেন?

তিনি বললেন, আমি ওই গল্প তিন পর্বে ভাগ করছি। প্রথম অংশ এই সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে, কিন্তু শোনো, আসল কথা হলো, তুমি কি আমাকে খবর সংগ্রহ করে দেবে? কাগজে কতটুকু জায়গা নেবে তার ভিত্তিতে তুমি একটা মজুরি পাবে।

আমি তাঁকে জানালাম, আমি সকালে-বিকালে একটা কাজ করি, সপ্তাহে তিন ডলার পাই।

ওহ্। তাহলে তুমি ওই কাজেই লেগে থাকো। কিন্তু গরমের ছুটির সময় তুমি কি করছো?

কিছুই না।

তাহলে অন্য কোনো কাজ নেবার আগে তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা কর। আর আরো কয়েকটা গল্প লিখে ফেলো।

কয়েকদিন পর আমার সহপাঠীরা তাদের হাতে সাদার্ণ রেজিস্টার পত্রিকার কয়েকটা কপি নিয়ে আমার কাছে এলো। তাদের চোখে বিভ্রান্তি। আমাকে তারা জিজ্ঞাসা করলো, ওই গল্পটা কি সত্যিই তুমি লিখেছো?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি লিখতে চেয়েছি, তাই।

ওটা তুমি পেলে কোথায়?

আমি নিজে বানিয়েছি।

না, তুমি বানাও নি। তুমি কোনো বই থেকে ওটা নকল করেছো।

যদি করতাম তাহলে কেউ ওটা প্রকাশ করতো না।

কিন্তু ওটা ওরা প্রকাশ করলো কেন?

যেন লোকে পড়তে পারে।

কে তোমাকে এ কাজটা করতে বলেছে?

কেউ না।

তাহলে তুমি করলে কেন? আমি আবারো বলি, কারণ আমি করতে চেয়েছি, তাই। ওদের স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, আমি ওদেরকে সত্য কথা বলি নি। আমাদের স্কুলে সাহিত্য বিষয়ক কোনো শিক্ষা কখনো দেয়া হতো না, জাতীয় সাহিত্য বিষয়ে নয়, নিগ্রো সাহিত্য বিষয়েও নয়। আমার স্কুলের সঙ্গীরা বুঝতেই পারে না কেন একটা মানুষ গল্প লিখতে চাইবে, সর্বোপরি কেন, আমি গল্পটার নাম নরকের আধ বিঘার অন্তত কুইক সেটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না। যে মেজাজ থেকে একটা গল্প লিখিত হয় তা ছিল তাদের কাছে একটা সম্পূর্ণ অচেতনা ও অচিন্তনীয় জিনিস। তারা এখন আমাকে একটা নতুন দৃষ্টিতে দেখে, আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব ও একটা সন্দিগ্ধতার ভাব জেগে ওঠে। গল্প লেখার ক্ষেত্রে আমি ভেবেছিলাম, যদি আদৌ কিছু ভেবে থাকি, আমি ভেবেছিলাম যে এর মধ্য দিয়ে হয়তো ওদের কাছে আমার গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা বাড়বে, কিন্তু বাস্তবে তা আমাকে ওদের কাছ থেকে আগের চাইতেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

বাড়িতেও এটা তার চাইতে কম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দিলো না। একদিন সকালে নানী আমার ঘরে এসে আমার খাটের এক ধারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, রিচার্ড, কাগজে তুমি এসব কি লেখালেখি করছো?

আমি বললাম, একটা গল্প।

কি নিয়ে?

নিছক একটা গল্প, নানী।

কিন্তু ওরা বলছে যে তিন সংখ্যায় ওটা প্রকাশিত হয়েছে।

একই গল্প, নানী। তিন পর্বে।

তিনি তবু দৃঢ়তার সঙ্গে জানতে চান, কী নিয়ে গল্পটা?

একটা ধর্মীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে আমি পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। আমি বললাম, নিছক একটা গল্প। আমি বানিয়েছি।

তিনি বললেন, তাহলে তো এটা একটা মিথ্যা।

আমি বলে উঠি, ওহ্ ক্রাইস্ট!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি যদি অনর্থক প্রভুর নাম নাও তাহলে তোমাকে এ

বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আমি মিনতি করি, নানী প্লীজ... গল্পটা তোমাকে বলা খুব শক্ত। দ্যাখো, সবাই জানে যে গল্পটা সত্য নয়, কিন্তু...

তাহলে ওটা লেখা কেন?

কারণ মানুষ হয়তো ওটা পড়তে চাইবে।

এটা তো শয়তানের কাজ। বলেই তিনি চলে গেলেন।

আমার মাকেও দেখা গেল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি বললেন, বাবা তোমার আরেকটু অচপল ও নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। এখন তুমি বড় হচ্ছো। লোকজন যদি তোমাকে দুর্বল ও লঘুচিত্ত ভাবে তাহলে তুমি কোনো কাজ পাবে না। ধরো, বিদ্যালয়গুলির সুপারিন্টেন্ডেন্ট যদি তোমাকে জ্যাকসনে শিক্ষকতার কাজ দিতে চান, আর তারপর যদি আবিষ্কৃত হয় যে তুমি গল্প লেখো, তখন কি হবে?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারি নি।

টম মামা অবাক হলেও তার মধ্যে দেখা দেয় তীব্র সমালোচনা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। তিনি বললেন, এ গল্পে কোনো বক্তব্য নেই। আর নরকের আধ বিঘার অশুভ কুহক, গল্পের এ রকম নামের কথা কেউ কি কখনো শুনেছে?

অ্যাডি খালা বললেন, নরক শব্দটি ব্যবহার করাই একটা পাপ। তাঁর মতে আমার ক্ষেত্রে সব গণ্ডগোলের মূলে ছিল একটা জিনিস, আমাকে পথ দেখাবার জন্য কেউ ছিল না। তিনি সব কিছুর জন্য দায়ী করলেন আমার ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষাকে।

পরিণামে আমি এতো রেগে যাই যে গল্পটা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে আমি অস্বীকার করি। নিগ্রো সংবাদপত্রটির সম্পাদক ছাড়া কোনো মহল থেকে একটি উৎসাহ ব্যঞ্জক শব্দও উচ্চারিত হলো না। একটা গুঞ্জন উঠলো, অধ্যক্ষ নাকি জানতে চেয়েছেন কেন আমি নরক শব্দটি ব্যবহার করেছি। আমার মনে হয়, আমি যেন একটা অপরাধ করেছি। আমার পরিবেশের স্রোতের কতখানি বিপরীতে যে আমি চলেছিলাম সে সম্পর্কে যদি পুরোপুরি সচেতন হতাম তাহলে লেখালেখির সব প্রয়াসই বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়া আমার চারপাশের লোকজনের মনোভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর আমি কোনো রকম অনুমান বা ধারণা করি না, অথবা সাধারণীকরণও করি না।

আমি উত্তরে যাবার স্বপ্ন দেখি, বই লেখার স্বপ্ন দেখি। উপন্যাস। আমি যে সব জিনিস অনুভব করি নি. দেখি নি, উত্তর হয়ে উঠেছিল তার প্রতীক, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তথাপি একটা জায়গা আছে। যেখানে সব সম্ভব, এই কল্পনার মাধ্যমে আমি আশাকে আমার ভেতর বাঁচিয়ে রাখি। কিন্তু এই যে ভবিষ্যতে একটা কিছু করবো, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো, এমন কিছু করবো অন্যরা যাকে স্বীকৃতি দেবে, এই ধারণা আমি কোথা থেকে পেলাম? অবশ্যই হোরোশিও আলজারের গল্পগুলি আমার পড়া ছিল, সস্তা বিনোদনমূলক পত্রিকার গল্পগুলি আমি পড়েছি, ওয়ালিংফোর্ড সিরিজের

চটজলদি ধনী হওয়ার কাহিনী আমার আদ্যোপান্ত জানা ছিল, যদিও ধনী হবার আশা করা যে বাস্তবসম্মত নয় এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও আমার ছিল, আমার নির্বোধ সরল কল্পনায় ও তার সুদূর সম্ভাবনা যে অবাস্তব তা আমি বুঝি। আমি জানতাম যে আমি এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের আকাঙ্ক্ষা খুব সীমিত, খুব সীমাবদ্ধ, সুচিহ্নিত। তবু আমি অনুভব করি যে আমাকে কোথাও যেতে হবে এবং কিছু একটা করতে হবে, আমি যে বেঁচে আছি সেই দায় পরিশোধ করার জন্য আমি আমার মধ্যে এমন একটা স্বপ্ন গড়ে তুলছিলাম যাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই ছলচাতুরি সহকারে তৈরি করা হয় দক্ষিণের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা। আমি সে জিনিসটাই অনুভব করি যা আমি যেন কখনো অনুভব না করি তা সুনিশ্চিত করার জন্য দক্ষিণি স্টেট কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। আমি সে জিনিসটা সম্পর্কেই সচেতন হয়ে উঠতে থাকি যা আমার চেতনার বাইরে রাখার জন্য জিম ক্রো আইনগুলি প্রণীত ও আইনানুমোদিত হয়। দেশে রাজধানীতে দক্ষিণের সেনেটরেরা যে-সব জিনিসকে নিম্নো জীবন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন সে-সব দ্বারাই আমার কাজকর্ম প্রণোদিত হতে থাকে। আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করি যে, রাষ্ট্র যে-সব কথা বলছে সেগুলি ভুল, বিদ্যালয়গুলি যে, সব কথা বলেছে তা অনুচ্চার্য। আমার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাবলী সম্পর্কে আমি যদি সোচ্চার হতাম তাহলে নিঃসন্দেহে কেউ না কেউ আমি কী আশা করছি এবং কী পাবো তা আমাকে বলে দিতো। কিন্তু কেউ তো জানতো বলে মনে হয় না। এবং সব চাইতে কম জানতাম আমি নিজে। আমার সহপাঠীদের মনে হতো আমি যা করছি তা অস্পষ্টভাবে অন্যায় বা ভুল, কিন্তু তা প্রকাশ করার উপায় তাদের জানা ছিল না। বাইরের জগৎ যত অর্থবহ হয়ে ওঠে আমি ততো উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠি। আমরা সহপাঠীবৃন্দ ও শিক্ষকরা বলেন, এতো প্রশ্ন করো কেন তুমি? কিংবা বলেন, চুপ করে থাকো।

তখন আমি পনেরো বছরে পা দিয়েছি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি দেশের গড়পড়তা যুবকের চাইতে অনেক পেছনে পড়েছিলাম কিন্তু আমি তা জানতাম না। আমার মধ্যে এমন একটা চেতনার জন্য আকুতি রূপ লাভ করছিল, অস্তিত্বের এমন একটা ধরন, যা আমার চারপাশের জীবন বলে দিচ্ছিল যে এটা হবে না, এটা কিছুতেই হবার নয়, যা করতে চাইলে আমার ওপর মৃত্যুদণ্ড নেমে আসবে। আমার জীবনের দক্ষিণী রাতে কোনো এক জায়গায় আমার পথ ভুল লাইনে চালিত হয়েছে এবং আমার অজান্তেই আমার হৃদয়ের গাড়ি একটা বিপজ্জনক তীব্র ঢালু পথে ছুটে চলেছে। আমার চারপাশে যে সতর্ক-আলো জ্বলছে আর নিভছে, যে সাইরেন, ঘণ্টা আর চিৎকার ধ্বনি চারপাশের বাতাস পূর্ণ করে তুলেছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন না হয়ে সেটা ছুটে চলেছে একটা সংঘর্ষের অভিমুখে।

অষ্টম অধ্যায়

আবার গ্রীষ্ম। কাজ খোঁজার পুরানো সমস্যা। আমি যে মহিলার ওখানে কাজ করছিলাম, জনৈক মিসেস বিবস, তাঁকে আমি বললাম যে, আমার সারাদিনের জন্য একটা কাজ দরকার, যে-কাজের রোজগার থেকে আমি আমার আগামী স্কুল টার্মের জন্য জামাকাপড় ও বইপত্র কিনতে পারবো। মহিলার স্বামী ছিলেন একটি করাতকলের প্রধান কর্মী। তিনি তার স্বামীর কাছে আমার কথা বললেন। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তো, তুমি কারখানায় কাজ করতে চাও?

হ্যাঁ, স্যার।

উনি আমার কাছে এসে আমার বাহুর নিচে দু'হাত দিয়ে আমাকে মেঝে থেকে উঁচু করে উপরে তুলে ফেললেন, আমি যেন এক বস্তা পাখির পালক। তারপর বললেন, আমাদের কাজের জন্য তুমি বড় বেশি হালকা-পলকা।

আমি বললাম, আমি হয়তো কিছু একটা কাজ ওখানে করতে পারবো।

গম্ভীর মুখে উনি বললেন, সেটাই তো সমস্যা। কাজটা ভারি এবং বিপজ্জনক। উনি চুপ করে থাকেন। আমি বুঝলাম যে তিনি বিষয়টা চুকিয়ে দিয়েছেন বলে মনে করছেন। দক্ষিণে সাদা আর কালোদের মধ্যে সব কিছু ছিল এই রকম। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বেশির ভাগ বিষয়ই কখনো খোলামেলাভাবে আলোচিত হয় না। তাদেরকে চাপা দিয়ে, অন্যের কাছে ধীরে ধীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। আমিও কিছু বলি না, কিন্তু আমি ঘর ছেড়ে যাই না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে আমি ওঁকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে বলি, ওঁকে জানিয়ে দিই যে আমি খুবই চাই ওর কারখানায় কাজ করতে। অবশেষে উনি বললেন, ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় এসো। আমি কী করতে পারি দেখবো, তবে আমার মনে হয় না যে তোমার পছন্দ হবে।

পরদিন খুব সকালে আমি কারখানায় গিয়ে হাজির হই। আমি লোকদের বিশাল বিশাল গাছের গুড়িকে চওড়া পাথরের ব্লকের ওপর উঠাতে দেখলাম। অনেকগুলি ইস্পাতের করাত উচ্চ প্রলম্বিত ধ্বনি তুলে বনানীর সবুজ কাঠের বুকে দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে।

কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠলো, সাবধান!

আমি ঘুরে তাকাতেই একজন কৃষ্ণাঙ্গ লোককে ওপর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে দেখলাম। একটা কাঠের গুড়ি ঘুরতে ঘুরতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি হুড়াহুড়ি করে ওটার পথ থেকে সরে যাই। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, এখানে তুমি কি করছো, ছোকরা?

আমি জানালাম, আপনাদের ফোরম্যান মিস্টার বিবস আমাকে ঘুরে দেখতে বলেছেন। আমি একটা কাজ খুঁজছি।

তিনি মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখলেন, তারপর বললেন, আমি হলে তোমাকে এই কাজের জন্য চেষ্টা করতে বলতাম না। কাজটা জানা থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু নতুন কারো জন্য এটা বেশ বিপজ্জনক। তিনি তার ডান হাতটা তুলে আমাকে দেখালেন, তিনটি আঙুল নেই। তারপর বললেন, দেখছো তো?

আমি মাথা হেলাই, তারপর ওখান থেকে সরে যাই। শূন্য দিনগুলি কেটে যায়। দীর্ঘদিন। উজ্জ্বল উষ্ণ দিন। ফুটপাথ এতো গরম হয়ে যায় যে তাকে মনে হয় উনুনের উপরভাগ। আমি প্রতিদিন সকালে কাজ খুঁজে বেড়াই, বিকালে পড়ি। এক সকালে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে হেঁটে যাবার সময় আমার এক সহপাঠীর বাড়ির সামনে দিয়ে যাই। নেড গ্রিনলি। ও বিবস মুখে তার বাড়ির দাওয়ায় বসেছিল। আমি বললাম, হ্যালো নেড, কি খবর?

ও বললো, তুমি শুনেছো? শোনো নি?

কি?

আমার ভাই ববের কথা?

না তো! কি হয়েছে?

নেড নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে, তারপর কোনো রকমে বললো, ওরা ওকে মেরে ফেলেছে।

আমি অনুমান করি, ফিসফিস করে বলি, সাদারা?

অশ্রুজল তার উত্তর দেয়। বব মরে গেছে। ওর সঙ্গে আমার অল্প কয়েকবার মাত্র দেখা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওর ভাই-এর মধ্য দিয়ে আমি ওকে ভালভাবেই জানতাম।

কি হয়েছিল?

ও...ওরা... ওকে একটা গা...গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়... বাইরে... গাঁয়ের পথে... ওরা ওকে গু... গুলি করে মেরে ফেলেছে। নেড ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো।

আমি শুনেছিলাম যে বব শহরের একটা হোটেলে কাজ করছিল। কেন মারলো?

ও...ওরা বলেছে সে নাকি হোটেলে একটা সাদা বেশ্যার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেছিল।

আমার সমস্ত দুনিয়া যেন আমার ভেতরে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, আমার শরীর ভীষণ ভারি লাগে। শান্ত, সূর্যালোকে পূর্ণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। দক্ষিণের সকল কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের ওপর যে হুমকি সব সময় বিরাজ করে সেই শ্বেতমৃত্যুর জালে বব ধরা পড়েছে। শহরের হোটেলে সাদা বারাঙ্গনাদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের যৌন সম্পর্কের কথা আমার শোনাছিল, কিন্তু আমি কখনো ও সব কেচ্ছায় ভাল করে মনোযোগ দিই নি, আর এখন আমার একজন পরিচিত মানুষের মধ্য দিয়ে এই

কোচ্চাগুলির একটা আমার অতি কাছে চলে এলো।

সেদিন আমি আর কোনো কাজের খোঁজ করি নি। আমি বাড়ি ফিরে আসি। আমিও আমার দাওয়ায় বসে রাস্তার পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকি। আমি যা শুনলাম তা পৃথিবীর চেহারাটা বদলে দিয়েছে। আমার সমস্ত ইচ্ছা ও প্রণোদনা যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। একটা ভুল চাল দিলেই আমার ওপর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা নেমে আসবে, আর আমি ভাবতে থাকি, কোনো চাল দেয়ারই কি কোনো অর্থ আছে। যে সব জিনিস নিগ্রো হিসেবে আমার আচরণকে প্রভাবিত করে তাদের তো আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হবার প্রয়োজন নেই। সে সব জিনিসের কথা শোনামাত্র আমার চেতনার গভীরতম স্তরে আমি তার প্রভাব অনুভব করি। বস্তুতপক্ষে, শ্বেতাঙ্গদের যেসব বর্বরতার কথা আমি জানতাম না কিন্তু শুনেছি তাই আমার আচরণকে অধিকতর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যা সত্যি সত্যি ঘটছে তার প্রকৃত অভিজ্ঞতা ঘটনাগুলির বাস্তব রূপরেখা আমার চোখের সামনে তুলে ধরতে পারতো, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সব ছিল ভয়ঙ্কর অথচ সুদূর, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে হতো যে তাদের আতঙ্ক এবং রক্তের স্রোত যে কোনো মুহূর্তে আমার ওপর নেমে আসতে পারে, ততক্ষণ আমার সমস্ত কল্পনা তার দিকে নিয়োজিত করতে আমি বাধ্য হই, আর এর ফলে আমার চিন্তা ও অনুভূতির উৎসগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, আমি এবং যে জাতে আমি বাস করি তার মধ্যে একটা দূরত্বের বোধ সৃষ্টি হয়।

কয়েকদিন পর আমি স্থানীয় নিগ্রো খবরের কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করি। আমাকে তিনি কাজ দিতে পারবেন না। ওই শরৎকালে আমি স্কুলে যোগ দিতে পারবো কিনা সে সম্পর্কে আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। গ্রীষ্মের শূন্য দিনগুলি গড়িয়ে যায়। সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হলেই তারা যে সব কাজ পেয়েছে আমাকে তার কথা বলে। কেউ কেউ উত্তরের গ্রীষ্মকালীন অবসর কেন্দ্রগুলিতে কাজ করার জন্য শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমি জানতে চাই, ও সব কাজের কথা ওরা আমাকে বলে নি কেন? ওরা বললো কথাটা ওদের মাথাতেই আসে নি, আর ওদের ওই কথা ওদের মুখ থেকে পড়ামাত্র আমার বিচ্ছিন্নতার বোধ আমার মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে উঠে। কিন্তু আসলে, বছরের পর বছর ধরে ক্লাসের সহপাঠী হিসেবে ওদের সঙ্গে তো আমার শুধু নৈমিত্তিক দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, সে অবস্থায় চাকরির সম্পর্কে কেন আমার কথা ওদের মনে পড়বে? ওদের সঙ্গে তো আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা গড়ে উঠে নি। যে ধর্মনিষ্ঠ বাড়িতে আমি বাস করতাম, দারিদ্রের মধ্যে যে জাউ ও শুয়োরের চর্বির ঝোল আমি গ্রহণ করতাম তা আমার বয়েসী কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের স্বাভাবিক জীবন ধারা থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

একদিন বিকেলে আমি বাড়িতে এমন একটি জিনিস আবিষ্কার করলাম যা আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়। আমি আমার কাজিন ম্যাগির সঙ্গে কথা বলছিলাম। ও ছিল আমার চাইতে কয়েক মাসের ছোট। এমন সময় টম মামা ঘরে ঢুকলেন। তিনি একটু থামলেন, আমার দিকে নীরব বৈরি দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর তাঁর মেয়েকে ডাক দিলেন। আমি

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুই ভাবি নি। কিছুক্ষণ পর আমি যে চেয়ারে বসে পড়েছিলাম সেখান থেকে উঠে হলঘরের মধ্য দিয়ে আমার নিজের ঘরে যাবার সময় টম মামার গলা শুনলাম, তিনি তার মেয়েকে বকছিলেন। কয়েকটা কথা আমার কানে আসে :

তুমি কি চাও যে আমি তোমার ঘাড় মটকে দিই? ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে তোমাকে আমি বলি নি? ওই ছেলে একটা বিপজ্জনক বেকুব, বুঝলে? তাহলে কেন তুমি ওর কাছ থেকে দূরে থাকো না? আর সব বাচ্চাদেরও তুমি ওর কাছ থেকে দূরে রাখবে। আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না, যা বলছি তাই করো! ওর কাছে ঘেঁষো না, নয়তো আমি চাবকে তোমার ছাল তুলে ফেলবো।

আমার কাজিনের কান্নাভরা জবাব আমি শুনতে পাই। রাগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আমার ইচ্ছা করে ছুটে ওই ঘরে গিয়ে এর একটা ব্যাখ্যা চাই, কিন্তু আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কতদিন ধরে এটা চলছে? আমি পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি। আমি লক্ষ্য করি যে টম মামা তার পরিবার নিয়ে এ বাড়িতে উঠে আসার পর থেকে তার কোনো ছেলেমেয়েই আমার সঙ্গে প্রায় কখনই একা থাকে নি। আমার সমস্ত মন বিষাদে ভরে যায়। আমি নিজেকে বলি, সাবধান, যেখানে কিছুই নেই সেখানে কোনো জিনিস দেখতে যেও না। কিন্তু আমি যতো সতর্কতার সঙ্গেই আমার স্মৃতি খতিয়ে দেখি না কেন, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এক বাড়িতে থাকলে তাদের মধ্যে যে নির্দোষ অন্তরঙ্গতা, খেলাধূলা এবং সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে সে রকম কিছু গড়ে ওঠার কথা আমি মনে করতে পারি না। তারপরই হঠাৎ আমার সেই সকালের কথা মনে পড়ে, যেদিন আমি আমার ক্ষুর দেখিয়ে টম মামাকে কাছে ঘেঁষতে দিই নি। আমি যদিও নিজেকে কখনো বর্বর বা মরীয়া স্বভাবের বলে মনে করি নি তবু সেদিন নিশ্চয়ই আমাকে তার কাছে সে রকম মনে হয়েছিল। সে কথা মনে করে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি। একটা অন্তর্দৃষ্টির বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যথার্থ প্রকৃতি আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ওই অন্তর্দৃষ্টি এবার আমার জীবনের সমগ্র ধারাকে বদলে দেয়। এবার আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই। তবে নবম গ্রেডের টার্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো। এমন অনেকদিন কেটে যায় যখন আমার মা ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমি একটি কথাও বলি না। আমি খুব ভালভাবে বুঝতে পারি যে আমার জীবনটা খানখান হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি উড়াল দেবার জন্য তৈরি থাকি, কিন্তু আমি অপেক্ষা করি কোনো একটা ঘটনা, কোনো একটা কথা, কোনো একটা কাজ, কোনো একটা পরিস্থিতির জন্য যা আমাকে প্রণোদিত করবে।

আমি মিসেস বিবসের ওখানে আমার কাজে ফিরে যাই, আমার স্কুলের বইপত্র কিনি। আমার জামাকাপড়ের অবস্থা ছেঁড়াখোড়া ত্যানার মতো। সৌভাগ্যবশত নবম গ্রেডে, স্কুলে আমার শেষ বছরে পড়াশোনার চাপ ছিল হালকা, তার ওপর টার্মের একটা অংশে শিক্ষক ক্লাসের তত্ত্বাবধানের ভার আমাকে দেন। এ সম্মান আবেগগত দিক থেকে

আমাকে খুব সাহায্য করে, আমার মধ্যে ক্ষীণ আশা জাগিয়ে তোলে। আমাকে এমন আভাসও দেয়া হয় যে আমার ভাল উচ্চ গ্রেডগুলি ধরে রাখতে পারলে আমি হয়তো নগরীর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকতা করার সুযোগও পেতে পারি। শীতের সময় শিকাগো থেকে আমার ভাই বাড়ি আসে। আমরা পরস্পরকে না জানলেও তাকে দেখে আমি খুশি হই। কিন্তু পরিবার যে আমার ভাইকে আমার চাইতে অনেক বেশি স্নেহ-ভালবাসা দিচ্ছে, আমাকে যে কখনই এ রকম দেয় নি, সেটা বুঝতে আমার বেশি সময় লাগলো না। ধীরে ধীরে অন্যদের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে আমার ভাই আমার প্রতি সমালোচনামুখর হয়ে উঠে, আর এটা আমাকে কষ্ট দেয়। আমার নিঃসঙ্গতা শারীরিক অসুখের মতো হয়ে উঠে। আমার মনে হয় আমি যেন চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি। আমি খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়ি। আমার সহপাঠীরা টার্ম শেষ হলে কে কোথায় পড়বে সারাক্ষণ তা নিয়ে কথা বলে, তাদের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা কমে আসতে থাকে। শীতল দিনগুলো যান্ত্রিকভাবে টেনে টেনে এগিয়ে চলে। ভোরে ওঠা, কাজে যাওয়া, কাঠ চেরা, কয়লা বয়ে আনা, ঘর ঝাঁড় দেয়া, আর তারপর স্কুল এবং একঘেঁয়েমি জনিত ক্লান্তি।

স্কুল টার্ম শেষ হয়। আমার ক্লাসের বিদায়কালীন ভাষণ দেবার জন্য আমি নির্বাচিত হই। একটা সর্বজনীন প্রেক্ষাগৃহে ভাষণ দেবার জন্য আমার ওপর একটি লেখা তৈরির দায়িত্ব দেয়া হলো। একদিন সকালে অধ্যক্ষ আমাকে তাঁর আপিসে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর টেবিলের ওপাশ থেকে কয়েকটা স্টেপল করা কাগজ আমার দিকে ঠেলে দিয়ে মসৃণ চাঁচাছোলা গলায় বললেন, এই যে রিচার্ড, তোমার বক্তৃতা।

আমি কাগজগুলি হাতে তুলে নিতে নিতে বললাম, কিসের বক্তৃতা?

তিনি বললেন, গ্র্যাজুয়েশনের রাতে তোমাকে যে বক্তৃতা দিতে হবে সেটা।

কিন্তু প্রফেসর, আমার বক্তৃতা তো আমি ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছি।

তিনি আস্থার সঙ্গে প্রশ্রয় দানের সুরে, হেসে উঠে বললেন, শোনো ছেলে, সেদিন রাতে তুমি ভাষণ দেবে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সামনে। তুমি নিজে নিজে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবে? তোমার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই...।

আমার ভেতরে আগুন ধরে যায়। আমি বললাম, প্রফেসর, আমি যে শিক্ষিত নই, সেটা আমি জানি, কিন্তু লোকজন তো আসছে ছাত্রদের কথা শুনতে। আপনার লিখে দেয়া ভাষণ আমি পড়বো না।

তিনি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জানো, তোমার মতো কোনো ছেলেকে এই স্কুলে আগে কোনোদিন দেখা যায় নি। এখানে তুমি তোমার মতানুযায়ী চলেছো, কেমন করে তুমি তা সম্ভব করলে আমি জানি না। কিন্তু শোনো, ভাষণটা নাও, এটাই পড়ো। তোমার জন্য সর্বোত্তম কী তা আমিই জানি। সেদিন রাতে ওইসব শ্বেতাঙ্গদের সামনে তোমার যা খুশি তাই তুমি বলতে পারো না।

তিনি একটু থেমে অর্থপূর্ণভাবে যোগ করলেন, ওখানে স্কুল সুপারিন্টেন্ডেন্ট থাকবেন। তার ওপর একটা ভাল প্রতিক্রিয়া জাগাবার একটা সুযোগ আছে তোমার। তোমার যা বয়স তার চাইতে বেশি বছর ধরে আমি এই স্কুলের অধ্যক্ষতা করছি। আমি বহু ছেলেমেয়েকে এই স্কুলে থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোতে দেখেছি। আমি যে বক্তৃতা লিখে দিয়েছি সেটা না পড়ার মতো অহঙ্কারী ওদের মতো কেউ ছিল না।

আমাকে দ্রুত মনস্থির করতে হবে। আমি এমন একটা সিদ্ধির সম্মুখীন হয়েছি। আমি গ্র্যাজুয়েট হতে চাই কিন্তু আমার নিজের লেখা নয় এমন একটা প্রকাশ্য বক্তৃতা আমি দিতে চাই না। আমি বললাম, প্রফেসর সেদিন রাতে আমি আমার নিজের বক্তৃতাই দেবো।

তিনি রেগে যান। তিনি বলেন, তুমি একটা অল্পবয়সি মাথা গরম বুদ্ধু। তিনি একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, ধরো, তোমাকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি দেয়া হলো না।

আমি বললাম, কিন্তু আমি তো আমার সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।

তিনি তীব্র কণ্ঠে বললেন, দ্যাখো, মিস্টার, এই স্কুলে কে পাশ করেছে আর কে করে নি, সেটা আমি বলবো।

আমি এতো অবাক হই যে, আমার শরীরে একটা ধাক্কা লাগে। দু'বছর ধরে আমি এই স্কুলে পড়ছি, আর অধ্যক্ষ যে কী রকম মানুষ তা আমি কোনোদিন একটুও সন্দেহ করি নি। ওকে নিয়ে ভাবার কোনো কারণই আমার কখনো ঘটে নি।

আমি নিরুত্তাপ গলায় বললাম, তাহলে আমার গ্র্যাজুয়েট হওয়া আর হলো না। আমি যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াই।

তিনি বললেন, এসো, এদিকে এসো।

আমি ঘুরে তাঁর মুখোমুখি হই। তিনি এতোটা সুদূর মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তোমার সঙ্গে এই কথাটা বলে খুব ভাল হলো। আমি তোমাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক হিসাবে কাজে লাগাবার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোমাকে এখানে মোটেই মানাবে না।

তিনি আমাকে লোভ দেখাচ্ছিলেন, আমার সামনে টোপ ফেলছিলেন। এই কৌশলটা ছিল একটা ফাঁদ। এর মাধ্যমেই তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ মনগুলি দক্ষিণের জীবনধারা বহাল রাখতে সাহায্য করতো।

আমি বললাম, দেখুন, প্রফেসর আমি হয়তো আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাবো না, কিন্তু আমি ঠিকমতো সব কিছু করতে চাই।

তার মানে?

আমার টাকা নেই। আমি কাজ করবো। এখন এই নবম গ্রেডের ডিপ্লোমা আমাকে

জীবনে বিশেষ কিছু সাহায্য করবে না। এ নিয়ে আমার মধ্যে কোনো তিক্ততা নেই। এতে আপনার দোষ নেই। কিন্তু আমি এভাবে কোনো কিছু করবো না।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ বিষয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করেছো?

না, কেন?

তুমি নিশ্চিত?

আমি আবার অবাক হই, তাঁকে বলি, এ কথা আমি এই প্রথম শুনলাম প্রফেসর।

এ বিষয়ে তুমি কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে কথা বলো নি?

না, স্যার।

আমার বিস্ময় বাড়ে। লোকটা এখন তার চাকরি নিয়ে ভীত।

আমি মৃদু হেসে বললাম, প্রফেসর, আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন না।

তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে বললেন, তুমি একটা মাথা গরম ছোকরা। জেগে ওঠো, ছোকরা। যে পৃথিবীতে তুমি বাস করছো সেটাকে জানো। তুমি বুদ্ধিমান, তুমি কী চাও আমি তা জানি। আমি তোমার খোঁজখবর রেখেছি। তুমি যা ভাবো তার চাইতে বেশি করে। আমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের চিনি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, চোখ টিপলেন, তারপর বললেন, তুমি যদি হঠকারিতা না করো তাহলে আমি তোমার পড়াশোনার সাহায্য করবো, কলেজে যাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

আমি তাঁকে বললাম, আমি লিখতে জানি, প্রফেসর, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যা আমি জানতে চাই না।

তিনি বললেন, গুড বাই।

আমি বাড়ি ফিরে আসি, আহত, কিন্তু সংকল্পবদ্ধ। আমি একজন কেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, আর তিনি আমাকে কেনার চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয়, আমি নোংরা একটা জিনিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি।

ওই রাতেই গ্রিগস নামের একটি ছেলে, যার সঙ্গে অনেকটা বছর আমি অনেকগুলি ক্লাস করেছি, আমার বাড়ি আসে। সে আমাকে বললো, দ্যাখো ডিক, তুমি জ্যাকসনে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করছো। অধ্যক্ষের কাছে যাও, তাঁর সঙ্গে কথা বলো, তার ভাষণটা নিয়ে এসে সেটা পড়ে দাও। তিনি যেটা লিখে দিয়েছেন আমি সেটাই পড়ছি। তাহলে তুমি পারবে না কেন? ব্যাপারটা কি? তোমার কী ক্ষতি হবে?

আমি বললাম, না।

কেন না?

আমি বললাম, আমার জ্ঞান খুবই সামান্য কিন্তু সেটা আমার ভাষণে প্রতিফলিত হবে।

তাহলে শিক্ষকতার চাকরির জন্য তুমি কালো তালিকাভুক্ত হবে।

আমি শিক্ষকতা করবো সে কথা তোমাকে কে বললো?

ওহ, তোমার জেদ আছে বটে।

এটা জেদের কথা নয়। আমি ওভাবে কিছু করতে চাই না, ব্যস।

ও চলে যায়। দুদিন পর টম মামা আমার কাছে আসেন। আমি বুঝতে পারি যে অধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি শুনলাম অধ্যক্ষ তোমাকে একটা ভাষণ পড়তে বলেছেন কিন্তু তুমি রাজি হও নি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।

তিনি বললেন, আমি কি তোমার বক্তৃতাটা দেখতে পারি?

আমি তাঁর হাতে আমার পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে বলি, অবশ্যই।

অধ্যক্ষ যেটা লিখেছেন সেটাও দেখতে পারি কি?

আমি অধ্যক্ষের ভাষণটাও তাঁকে দিই। তিনি তার ঘরে গিয়ে ও দুটো পড়লেন। আমি চুপচাপ বসে থাকি, অপেক্ষা করি। তিনি ফিরে এসে বললেন, অধ্যক্ষেরটাই বেশি ভাল।

আমি জবাব দিলাম, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি যে বক্তৃতা দিতে না-ই পারবো তাহলে আমাকে লিখতে বলা কেন?

তিনি বললেন, আমি কি তোমার বক্তৃতাটা একটু ঠিকঠাক করে দিতে পারি?

না।

দেখো রিচার্ড, তোমার ভবিষ্যৎ...

আমি বললাম, টম মামা, এ বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন, তারপর চলে গেলেন। অধ্যক্ষের বক্তৃতা ছিল আমারটার চাইতে এবং অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু ওখানে কোনো বক্তব্যই ছিল না। আমার বক্তৃতা ছিল মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু আমি যা বলতে চেয়েছি সেখানে তা বলা হয়েছে। এখন কি করতে পারি আমি? একবার আমার মনে হয় আমি গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে উপস্থিতই হবো না। প্রতিদিনই আমার পারিপার্শ্বের ওপর আমার ঘৃণা বাড়ছিল। স্কুল শেষ হলেই আমি একটা চাকরি নেবো, টাকা বাঁচাবো, তারপর এখান থেকে চলে যাবো।

গ্রিগস প্রিন্সিপালের লেখা একটা ভাষণ মেনে নিয়েছে। সে রোজ আমার বাড়ি আসে, আমরা দুজন বনের মধ্যে গিয়ে আমাদের বক্তৃতার মহড়া দিই। দিনের পর দিন আমরা কথা বলি গাছ-গাছালি ও খাল-নালাকে উদ্দেশ্য করে, পাখ-পাখালিকে ভয় পাইয়ে দিয়ে, চারণরত গরুগুলি ভয় পেয়ে আমাদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। আমার বক্তৃতা আমি এতো ভারভাবে মুখস্ত করি যে আমি আমার ঘুমের মধ্যেও তা আবৃত্তি করতে পারতাম।

প্রিন্সিপালের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বের কথা সারা ক্লাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাত্ররা খোলাখুলি আমার সমালোচনা করলো। তারা বললো, রিচার্ড, তুমি একটা মহা বোকা।

তোমার সব সুযোগ তুমি নষ্ট করছো। তুমি যে কি ধরনের বোকা আগে বুঝতে পারলে ওরা তোমাকে কখনো বিদায়ী ভাষণ দেবার জন্য ঠিক করতো না। আমি দাঁতে দাঁত টিপে মুখ বন্ধ করে রাখি, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার রাগ চড়তে থাকে। আমার সহপাঠীরা আমাকে বাঁচাবার ইচ্ছা থেকে সারাক্ষণ আমাকে উত্যক্ত করে, শেষে আমি প্রায় ভেঙ্গে পড়ার পর্যায়ে পৌছে যাই। শেষে প্রিন্সিপাল ছেলেদের সাবধান করে দেন, আমাকে যেন আর পীড়াপীড়ি না করে, তাঁর ভয় হয় হয়তো সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে আমি সরে পড়বো।

আমার বক্তৃতা প্রদানের আগে আমাকে আরেকটা সমস্যার সমাধান করতে হয়। আমাদের ক্লাসে আমিই ছিলাম হাফ-প্যান্ট পরা একমাত্র ছাত্র। আমি মনে মনে কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি স্কুল ছাড়বো ফুলপ্যান্ট পরে। আমি তো চাকরি করবো, তাই না? আমি তো নিজের পায়ে দাঁড়াবো। যখন বাড়িতে আমার ফুলপ্যান্ট পরার ইচ্ছাটা চাউর হয় তখন আরেকটা ঝড়ে সারা বাড়ি কেঁপে ওঠে।

মা বললেন, তুমি বড় বেশি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছো।

টম মামা বললেন, তুমি একটা বাচ্চা ছেলে ছাড়া অন্য কিছু নও।

নানী বললেন, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আমি সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে এখন থেকে আমি নিজে আমার সব সিদ্ধান্ত নেবো। আমার মনিব মিসেস বিবসের কাছ থেকে টাকা ধার করে আমি নগদ অর্থে একটা রূপালি সাদা স্যুট কিনলাম। যদি ধার শোধের জন্য টাকা যোগাড় করতে না পারি তাহলে গ্র্যাজুয়েশনের পর ওই নচ্ছার জিনিসটা ফেরত দিয়ে আসবো। গ্র্যাজুয়েশনের রাতে আমি নার্ভাস ও উত্তেজনায় টানটান হয়ে যাই। আমি উঠে দাঁড়িয়ে শ্রোতৃবর্গের দিকে তাকাই। আমার বক্তৃতা গড়গড় করে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। আমার কণ্ঠস্বর বন্ধ হলে কিছু হাততালি পড়ে। ওদের পছন্দ হলো কিংবা না হলো তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই না। আমি সব চুকিয়ে দিয়েছি। এক্ষুণি, মঞ্চ থেকে নামার আগেই, আমি আমার মন থেকে এই ঘটনার স্মৃতি পুরোপুরি মুছে ফেলার চেষ্টা করি। আমি ঠেলাঠেলি করে দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়তে চাই। এরই মধ্যে কয়েকজন সহপাঠী এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করে। আমি হেঁটে বাড়ি ফিরি, আপন মনে বলি, গোল্লায় যাক এসব! প্রায় সতেরো বছরের বিভ্রান্ত জীবন পেছনে ফেলে ১৯২৫ সালে আমি পৃথিবীর মুখোমুখি হই।

নবম অধ্যায়

আমার জীবন এখন নির্ভর করছে কাজ পাওয়ার ওপর। আমি তার জন্য এতো ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলাম যখন যে সুযোগ পাই তাই আমি গ্রহণ করি। একটা কাপড়ের দোকানে কুলির কাজ। দোকানটা নিগ্রোদের কাছে সস্তায় বাকীতে জামাকাপড় বিক্রি করে। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে-পুরুষে ওই দোকান সব সময় জনাকীর্ণ থাকতো, ওরা সারাক্ষণই সস্তায় স্যুট ও মেয়েদের পোশাক হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতো। আর শ্বেতাঙ্গ মানুষটা যা দাম হাঁকতো তাই দিতো। কর্তা, তার ছেলে, আর কেরানি নিগ্রোদের সঙ্গে ব্যবহার করতো চরম অবজ্ঞার সঙ্গে, তাদের ধাক্কা দিতো, গায়ে লাথি মারতো, গালে চড় কষাতো। এ সব আমি যতবারই দেখি না কেন আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি না। ওরা কেমন করে এ সব মেনে নেয়? আমি টানটান হয়ে থাকি। আমি আমার অনুভূতি গোপন রাখার প্রয়াস পাই যদিও পুরোপুরি সফল হই না। আমার মধ্যে একটা ভীতি ও অপরাধবোধ জন্ম নেয়, কারণ আমার মনে হয় এ সব ব্যাপারে যে আমি ক্ষুব্ধ হচ্ছি কর্তা তা সন্দেহ করছেন।

একদিন সকালে আমি সামনের দরজার পেতলগুলি পালিশ করেছিলাম, এমন সময় কর্তা আর তার ছেলে তাদের মোটর গাড়িতে করে এসে পৌছলেন। একটি ভয়ার্ত কৃষ্ণাঙ্গ রমণী তাদের দুজনের মাঝখানে বসেছিল। কর্তা আর তার ছেলে গাড়ি থেকে নেমে মেয়েলোকটিকে আধা টেনে হিঁচড়ে, আধা লাথি মেরে, দোকানের ভেতরে নিয়ে গেল। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পাশ দিয়ে যাবার সময় অভিব্যক্তিহীন মুখে দৃশ্যটি দেখলো। রাস্তার মোড় থেকে একটি শ্বেতাঙ্গ পুলিশও ব্যাপারটা দেখতে পায়।

সে তার হাতের লাঠিটা ঘোরালো কিন্তু কিছুই করলো না। আমি আমার চোখের কোণা দিয়ে সব লক্ষ্য করি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও শ্যামময় চামড়া দিয়ে আমার পালিশ করার কাজ শিথিল করি না। দু'এক মুহূর্ত পর দোকানের পেছনের ঘর থেকে আমি তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দ শুনি। একটু পরে রমণীটি হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে আসে, রক্তাক্ত, অশ্রুসিক্ত, হাত দিয়ে পেট চেপে রেখেছে, তার কাপড় ছেঁড়া। সে যখন ফুটপাথে পৌছায় তখন পুলিশটি তার কাছে আসে, তাকে পাকড়াও করে, অভিযুক্ত করে মাতলামির অপরাধে এবং একটি ভ্রাম্যমান পুলিশের গাড়ি ডেকে তাকে তার মধ্যে তুলে দেয়। গাড়ি রমণীটিকে নিয়ে চলে যায়।

আমি যখন দোকানের পেছনের ঘরটাতে গেলাম তখন দেখি যে কর্তা আর তার ছেলে সিঙ্কে হাত ধুচ্ছেন। তারা আমার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে মৃদু হাসলেন।

ঘরের মেঝেতে রক্ত দেখা যায়, সেখানে পড়ে রয়েছে চুলের গুচ্ছ আর ছেঁড়া পোশাক। আমি যে কি রকম ধাক্কা খেয়েছি সেটা নিশ্চয়ই আমার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল, কারণ আমার পিঠে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা চাপড় দিয়ে কর্তা বললেন, শোনো, ছেলে, যে সব নিগার বিল পরিশোধ করে না তাদের সঙ্গে আমরা এ রকমটাই করি।

তার ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসলো, তারপর বললো, এই যে সিগারেট নাও।

কি করবো বুঝতে না পেরে আমি সিগারেটটা গ্রহণ করি। ও তার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ম্যাচের কাঠি আমার দিকে এগিয়ে ধরে। এটা একটা সহৃদয়তার ভঙ্গি, এর অর্থ ওরা ওই কৃষ্ণাঙ্গ রমণীকে প্রহার করলেও আমাকে করবে না। আমার যদি মুখ বন্ধ করে রাখার মতো বুদ্ধি থাকে তাহলে ওরা আমাকে মার দেবে না। আমি বললাম, ইয়েস স্যার।

ওরা চলে যাবার পর আমি একটা প্যাকিং বক্সের কিনারায় চুপ করে বসে থাকি, শূন্য চোখে রক্তাক্ত মেঝেটা দেখি, আর এক সময় আমার সিগারেট নিভে যায়। দোকানে একটা বাইসাইকেল ছিল। তার সাহায্যে আমি ক্রেতাদের বাড়ি বাড়ি জিনিস পৌঁছে দিতাম।

একদিন উপশহরাঞ্চল থেকে ফেরার সময় আমার সাইকেলের চাকা ফুটো হয়ে যায়। আমি গরম ধূলিধূসরিত রাস্তা দিয়ে সাইকেলের হাতল ধরে হাঁটতে থাকি।

একটা মোটর গাড়ি আমার পাশে এসে থামলো। একজন শ্বেতাঙ্গ জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে ছোকরা?

আমি আমার সাইকেল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বললাম, জানালাম যে আমি শহরে ফিরে যাচ্ছি হেঁটে।

খুব খারাপ কথা। তো, আমার গাড়ির রানিং বোর্ডের উপর উঠে পড়ো।

তিনি গাড়িটা থামালেন। আমি এক হাতে শক্ত করে আমার সাইকেল ধরে রাখি, অন্য হাত দিয়ে গাড়ির কিনারা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাকি।

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ, স্যার।

গাড়ি চলতে শুরু করে। গাড়ি ভর্তি কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ তরুণ। মদ খাচ্ছিল তারা। আমি ফ্ল্যাস্কটিকে এক মুখ থেকে আরেক মুখে চালাচালি হতে দেখি। ওদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এক চুমুক খাবে নাকি, ছোকরা? আমার ছয় বছর বয়সের সুরাপানের স্মৃতি আমার মনে জেগে ওঠে। আমি সাবধান হয়ে যাই। আমার মুখের ওপর এখন প্রবল বাতাসের ঝাপ্টা। আমি তার মধ্যেই জবাব দিই, ওহ, না!

কথাটা আমার মুখ থেকে ভাল করে বেরোবার আগেই আমি অনুভব করলাম যে একটা কঠিন ও ঠাণ্ডা কিছু আমার দু'চোখের মাঝখানে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করেছে।

একটা খালি হুইস্কির বোতল। আমি দু'চোখে অন্ধকার দেখি, দ্রুত ধাবমান গাড়ি থেকে রাস্তার ধুলার মধ্যে পড়ে যাই, আমার পা সাইকেলের ইস্পাতের স্পোকের মধ্যে জড়িয়ে যায়। গাড়িটা থামে। শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলি জড়ো হয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়, আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে।

যে লোকটি আমাকে আঘাত করেছিল সে বললো, নিগার, তোমার মাথায় কি কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নাই? একজন শ্বেতাঙ্গের সাথে কথা বলতে হলে যে সার বলতে হয় এটাও এতোদিনে শেখো নি?

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াই। আমার কনুই আর হাঁটু থেকে রক্ত ঝরছে। শ্বেতাঙ্গ লোকগুলি তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সাইকেলটা পাশের ধাক্কায় পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে।

ওদের মধ্য থেকে একজন বললো, ছেড়ে দাও হারামিকে। যথেষ্ট হয়েছে।

ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে। আমি আমার পা ঘষি, রক্তপ্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করি। নিঃসন্দেহে আমার প্রতি ওদের একটা অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণার ভাব জেগেছিল, কারণ একজন জিজ্ঞাসা করলো, গাড়িতে করে শহরে যেতে চাও, নিগার? তার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে কি?

আমি সহজভাবে জানাই, আমি হেঁটেই যেতে চাই।

আমার ভঙ্গির মধ্যে হয়তো হাস্যকর কিছু ছিল। ওরা হেসে উঠলো। একজন বললো, তাহলে হেঁটেই যা, কুত্তার বাচ্চা!

গাড়িতে উঠে বসার আগে ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, নিগার, তুমি যে আমাদের সঙ্গে ও রকম করে কথা বলেছো সে জন্য তোমার খুশি হওয়া উচিত। তোমার ভাগ্য ভাল, হারামি, কারণ অন্য কোনো শ্বেতাঙ্গ হলে এতোক্ষণে তুমি একটা মরা নিগারে পরিণত হতে।

সাদা মানুষদের কিভাবে দেখতে হয়, তাদের প্রতিটি আবরণ কিভাবে লক্ষ্য করতে হয়, তাদের মুখে প্রতিটি ক্ষণিক অভিব্যক্তির অর্থ কি, তারা যা বলছে আর যা অনুচ্চারিত রাখছে আমি দ্রুত এ সবের মর্মোদ্ধার করতে শিখে উঠতে থাকি।

এক শনিবার বেশ রাতে একটা শ্বেতাঙ্গ মহল্লায় জিনিসপত্র ডেলিভারি দিয়ে আমি দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দোকানে ফিরছিলাম। এমন সময় একটা পুলিশের গাড়ি আমার দিকে ছুটে এসে আমাকে একেবারে রাস্তার পাশে চেপে ধরে।

ওরা আদেশ করলো, নেমে দাঁড়াও, নিগার, তারপর উপর দিকে হাত তোলো। আমি তাই করি। ওরা গাড়ি থেকে নেমে আসে, হাতে পিস্তল তাক করা, মুখ পাথরের মতো কঠিন। ওরা ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসে।

একদম স্থির হয়ে থাকো। আমি আমার হাত আরো উঁচু করে ধরি। ওরা আমার পকেট আর প্যাকেটগুলি তল্লাশি করে। অপরাধমূলক কিছু না পাওয়ায় ওদের অসন্তুষ্ট মনে হয়। শেষে ওদের একজন বললো, ছোকরা, তোমার কর্তাকে বলে দিও শ্বেতাঙ্গ

মহল্লায় রাতের এ সময়ে তোমাকে যেন আর না পাঠায়।

আমি বললাম, ইয়েস, স্যার।

আমি সাইকেল চালাতে শুরু করি। আমার মনে হতে থাকে ওরা যে কোনো মুহূর্তে আমাকে গুলি করতে পারে। আমার মনে হতে থাকে যে-কোনো মুহূর্তে ফুটপাথটা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে আছি, যার বাস্তবতা যে কোনো মুহূর্তে বদলে যেতে পারে।

প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান ঘৃণার সঙ্গে আমি দোকানে নানা বর্বরতা লক্ষ্য করি, অথচ সচেষ্ট থাকি যেন আমার মুখে তার কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ না পায়। কর্তা যখন আমার দিকে তাকান তখন আমি আমার চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিই। অবশেষে একদিন সকালে কর্তার ছেলে তার কক্ষে আমাকে চেপে ধরলো। সে শুরু করলো এভাবে :

তো, ব্যাপারটা কি, নিগার?

ইয়েস, স্যার।

তোমার কি হয়েছে?

আমার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে। আমি ওকে কিছু বুঝতে দিতে চাই না। আমি বললাম, কিছুই হয় নি, স্যার।

তাহলে তুমি অন্য নিগারদের মতো হাসো না কেন? ওদের মতো কথা বলো না কেন?

আমি মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলি, তো স্যার, বলার মতো কিংবা হাসার মতো খুব বেশি কিছু তো নেই।

ওর মুখ কঠোর হয়ে ওঠে। ওকে কেমন বিভ্রান্ত দেখায়। আমি বুঝতে পারি যে আমি ওকে বিশ্বাস করাতে পারি নি। ও দ্রুতবেগে দাঁড়িয়ে দোকানের সামনের দিকে চলে যায়। এক মুহূর্ত পরেই সে ফিরে আসে। তার মুখ লাল। আমার দিকে কয়েকটা সবুজ নোট ছুঁড়ে দিয়ে ও খেঁকিয়ে উঠলো, নিগার, তোমার চেহারা সুরত আমার ভাল লাগে না। এবার বিদায় হও।

আমি টাকাটা তুলে নেই, গুণেও দেখি না। আমার টুপিটা হাতে নিয়ে আমি একটা কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও কোনো কাজের করি। কখনো কখনো আমার মনোভাব, আমার কথাবার্তা, আমার চোখের দৃষ্টির কারণে আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়। এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার জন্য যথেষ্ট টাকা জমাবার আমার লক্ষ্য একটুও অগ্রসর হয় না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমার সে লক্ষ্য বোধ হয় কখনো অর্জিত হবে না।

একদিন সকালে আমার হাতে তখন কোনো কাজ নেই, আমি আমার পুরানো সহপাঠী গ্রিগসের কাছে যাই। সে তখন ক্যাপিটল স্ট্রিটে এক স্বর্ণকারের দোকানে কাজ করছিল। তার ওখানে গিয়ে দেখি সে দোকানের জানালাগুলি ধুচ্ছে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কি তুমি একটা কাজের খোঁজ দিতে পারো?

সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো, তারপর সহাস্যে বললো, হ্যাঁ, তুমি কোথায় একটা কাজ পেতে পারো আমি জানি।

কোথায়?

কিন্তু কাজটা তুমি ধরে রাখতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ হয়।

তার মানে? কোথায় কাজ করতে হবে?

ও বললো, একটু ধীরে ডিক। আমি তোমাকে চিনি। গোটা গ্রীষ্মকাল তুমি একটা চাকরিতে টিকে থাকতে চেয়েছো, কিন্তু পারো নি। কেন? কারণ তুমি খুব আবেগ। এটাই তোমার বড় দোষ।

আমি কিছু বলি না। ঠিক এভাবে সে আমাকে অনেকবার বলেছে। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে অলসভাবে ধোঁয়া ছাড়ে।

আমি ওকে উস্কে দিই। আমি চাই ও আরো কিছু বলুক। আমি বললাম, তো?

ও বললো, কেমন করে যে আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলবো...

ও আমার কাঁধে একটা চাপড় দিলো। আমি ওর মুখে দেখলাম আমার জন্য ভয়, ঘৃণা ও দুশ্চিন্তা। সে বললো, তুমি কি খুন হতে চাও?

না, না!

তাহলে, ঈশ্বরের দোহাই, দক্ষিণাঞ্চলে কেমন করে জীবন ধারণ করতে হয় সেটা শেখো!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলতে চাও তুমি? সে কথা সাদারা আমাকে বলবে, তুমি কেন?

আমার দিকে আঙ্গুল তুলে সে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো, দেখলে তো! ব্যাপারটা পরিষ্কার। তুমি চাও না যে তোমাকে কেউ কিছু বলুক। তুমি বড় বেশি তাড়াহুড়া করো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি আমাকে সাহায্য করতে দেবে না। সে একটু থেমে চারিদিকে তাকালো। রাস্তাঘাটে সাদা মানুষগুলি ভিড় করে আছে। সে গলা নামিয়ে ভরাট সুরে বললো, ডিক, তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, বুঝলে? এ কথাটা কি তোমার মাথায় ঢোকে না?

আমি বললাম, অবশ্যই ঢোকে।

সে তীব্র কণ্ঠে জবাব দিলো, কিন্তু তোমার আচার-আচরণ দেখে তো তা মনে মনে হয় না।

তারপর ওই গ্রীষ্মে আমি যতগুলি কাজ করেছি এবং সেখানে কী কী ঘটনা ঘটিয়েছি সব গড়গড় করে বলে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এতো সব কেমন করে জানলে?

সে বিশদ করলো। সাদারা নিগারদের সব কিছু লক্ষ্য করে, আর তারপর তাদের কাণ্ডকীর্তির কথা সবাইকে জানিয়ে দেয়। এখন শোনো, আমার মনিব আমেরিকার

উত্তরাঞ্চলের মানুষ, আমাকে অনেক কথা বলেন। তুমি ইতিমধ্যে মার্কামারা হয়ে গেছো।

আমি কি ওর কথা বিশ্বাস করতে পারি? ও যা বলছে তা কি সত্য?

সাদাদের বিচিত্র জগতের কথা আমি কেমন করে জানবো?

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমি শুধু এ অঞ্চল থেকে চলে যাবার মতো টাকা জমাতে চাই, আর কিছু না।

ও বললো, একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে বলবো।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অলঙ্কারের দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। আমি তাদের পথ করে দেবার জন্য একটু পাশে সরে যাই। হঠাৎ গ্রিগস আমার বাহু ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দেয়, আমি ফুটপাথের ওপর তিনচার ফুট দূরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। আমি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হলো?

গ্রিগস আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকালো, তারপর হেসে উঠে বললো, শ্বেতাঙ্গদের পথ থেকে কি করে সরে দাঁড়াতে হয় সেটা তোমাকে একটু শেখালাম আর কি।

যেসব লোক দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিল আমি তাদের দিকে তাকালাম, তাই তো, ওরা যে শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু আমি সেটা লক্ষ্য করি নি।

গ্রিগস বললো, আমি কি বলতে চাই বুঝলে তো? সাদারা চায় যে তুমি ওদের পথের সামনে থেকে সরে যাও। সে কথাগুলি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো যেন তা আমার মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, তুমি কী বলতে চাইছো আমি বুঝতে পারছি।

ও বললো, দ্যাখো, ডিক, আমি তোমার সঙ্গে ভাই-এর মতো ব্যবহার করছি। সাদাদের সামনে তুমি এমন আচরণ করো যে তারা যে সাদা তা তুমি বুঝতেই পারো না, আর তারা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে।

আমি হতাশ গলায় বললাম, ওহ্, ঈশ্বর, আমি তো ক্রীতদাস হতে পারি না।

কিন্তু তোমাকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।

হ্যাঁ, তা হবে।

সে আমাকে চেপে ধরলো। তার হাতের তালুতে ঘুসি মারতে মারতে সে বললো, তাহলে সে রকম আচরণ করো। শ্বেতাঙ্গ মানুষদের সামনে থাকলে কিছু করার আগে চিন্তা করবে, কিছু বলার আগে চিন্তা করবে। আমাদের লোকদের মধ্যে তোমার আচার-আচরণ ঠিক আছে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নয়। ওরা তা সহ্য করবে না।

আমি শূন্য চোখে সকালের সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার সতেরোতম জন্মদিন এগিয়ে আসছে, আমি মনে মনে ভাবি এই দুঃসহ নির্যাতন থেকে আমি কি কোনোদিন অব্যাহতি পাবো? গ্রিগস যা বলছে তা যথার্থ, কিন্তু আমার পক্ষে সব সময় হিসাব করে চলা, মেপে মেপে কথা বলা, সারাক্ষণ কূট চাল চালা একেবারে অসম্ভব। কিছু সময়ের জন্য আমি অভিনয় করতে পারি, তারপরই আমি ভুলে যাই, আবার

সরলভাবে সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করি, কারো কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা থেকে নয়, আমি শুধু বর্ণ ও শ্রেণীর কৃত্রিম পদমর্যাদার কথাটা ভুলে যাই শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে যেমন হয় কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রেও তেমনি। সবার সঙ্গেই আমি একই রকম আচরণ করি। আমি নিঃশ্বাস ফেলে দোকানের জানালায় সাজানো ঝলমলে হীরা আর আংটি আর সুন্দর সারিবদ্ধ সোনার ঘড়িগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি।

অবশেষে আমি বললাম, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছো। নিজের ওপর আমার নজর রাখতে হবে, আমাকে ছোট হতে হবে...

ও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, না। এখন তার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। একজন লোক, শ্বেতাঙ্গ দোকানে ঢুকলো। আমরা কথা থামাই। তারপর গ্রিগস বললো, ডিক, তুমি মনে করো যে আমি একটা আঙ্কল টম, কিন্তু আমি তা নই। আমি ওই শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করি, আমার সারা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি, কিন্তু আমি সেটা দেখাতে পারি না, দেখালে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

ও একটু চুপ করে থেকে চারিদিকে তাকায়, কোনো শ্বেতাঙ্গ কাছেপিঠে আছে কিনা দেখে নেয়, তারপর বলে, আমি একবার একটু বুড়ো মাতাল নিগ্রোকে বলতে শুনেছি, 'এই সব সাদা লোকগুলি পরনে পোশাক চমৎকার, ঠিক আমারই মতো গন্ধ ছড়ায় তাদের মলদ্বার।'

আমি অস্বস্তিভরে আমার পাশ দিয়ে যাওয়া সাদা মুখগুলির দিকে তাকিয়ে হাসি, কিন্তু গ্রিগস হাসার সময় তার মুখে হাত চাপা দিয়ে হাঁটু বাঁকিয়ে কুঁকড়ে যায়, যেন শ্বেতাঙ্গদের সামনে তার অতিরিক্ত উল্লাস গোপন করার একটা অসচেতন প্রয়াস পাচ্ছে সে। তার উল্লাসের দমক শেষ হলে সে সগর্বে বললো, ওদের সম্পর্কে এই হলো আমার অনুভূতি। তারপরই সে গম্ভীর হয়ে বললো, দোতলায় চশমার কাচ বানাবার একটা কোম্পানি আছে, মালিক ইলিনয়ের এক ইয়াঙ্কি। ওর একটা ছেলে দরকার, গ্রীষ্মে সারাদিন কাজ করার, শীতকালে সকাল-সন্ধ্যা। তিনি একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেকে চশমা পেশার জন্য তৈরি করতে চান। তুমি পাটিগণিত জানো, এ কাজের জন্য তুমি খুবই উপযুক্ত হবে। আমি মিস্টার ক্রেনকে তোমার কথা বলবো। তারপর আমি তোমাকে জানাবো কি হলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন ওর সঙ্গে দেখা করা যায় না?

সে গর্জে উঠলো, দোহাই ঈশ্বরের, একটু সময় নাও!

আমি হেসে উঠি কিন্তু ওকে বিচলিত দেখায়। গ্রিগসকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি চলে আসি। এক সপ্তাহ কেটে যায়, ওর কাছ থেকে কোনো খবর পাই না। আমি আশা ছেড়ে দিই। তারপর এক অপরাহ্নে গ্রিগস আমার বাড়ি এসে হাজির হলো। ও বললো, মনে হয় চাকরিটা তুমি পাচ্ছো। একটা পেশা শেখার সুযোগ পাবে তুমি। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখার কথাটা মনে রেখো। তুমি কৃষ্ণাঙ্গ সেটা মনে রেখো। কাল থেকে কাজ শুরু করবে।

কত পাবো?

শুরুতে সপ্তাহে পাঁচ ডলার। ওদের যদি তোমাকে পছন্দ হয় তাহলে বাড়িয়ে দেবে। আমার আশার পালে হাওয়া লাগে। অবস্থা তাহলে অত খারাপ নয়। আমি একটা পেশা শেখার সুযোগ পাবো। আর আমাকে পড়াশোনাও ছাড়তে হবে না। আমি ওকে বললাম যে, কাজটা আমি নেবো, আর খুব বিনীত হয়ে থাকবো।

ও বললো, তুমি একজন ইয়াঙ্কির প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে, তোমার কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

পরদিন সকালে চশমার কোম্পানির আপিস খোলার অনেক আগেই আমি ওদের দফতরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি নিজেকে বারবার বলি যে আমাকে খুব ভদ্র হতে হবে, কথা বলার আগে চিন্তা করতে হবে, কিছু করার আগে চিন্তা করতে হবে, বলতে হবে হ্যাঁ স্যার, না স্যার, আমার আচরণ এমন হতে হবে যেন শ্বেতাঙ্গরা কখনই না ভাবেন যে আমি আমার নিজেকে ওদের মতোই উত্তম মনে করি। হঠাৎ একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি চাই তোমার?

আমি বললাম আমি একটা কাজের জন্য রিপোর্ট করতে এসেছি, স্যার।

ও-কে। ভেতরে আসো।

আমি কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে তাকে অনুসরণ করি। তিনি আপিসের তালা খুললেন। আমি ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে থাকি, কিন্তু তরুণ শ্বেতাঙ্গটির ব্যবহার আমাকে সহজ করে তোলে। আমি আসন গ্রহণ করি, আমার টুপিটা ধরে রাখি আমার হাতে। একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে ঘরে ঢোকে, টাইপ করতে শুরু করে দেয়। একটু পরেই অনেকজন শ্বেতাঙ্গ আসে, শীর্ণদেহ ছাই-রঙা, সে পেছনের ঘরে চলে যায়। অবশেষে একজন লম্বা, লালমুখের শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মানুষ এসে উপস্থিত হয়। আমার দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টিপাত করে তিনি তার টেবিলে গিয়ে বসেন। তার চটপটে চালচলন বলে দেয় যে তিনি একজন উত্তরাঞ্চলের মানুষ, ইয়াঙ্কি।

তুমিই নতুন ছেলে, তাই না?

হ্যাঁ, স্যার।

তিনি মিষ্টি ভঙ্গিতে বললেন, দাঁড়াও, আগে ডাকটা দেখে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

হ্যাঁ, স্যার।

আমি আমার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত নিচু পর্দায় নামিয়ে আনি, তার মধ্যে যেন কোনোরকম ঔদ্ধত্যের ইঙ্গিত বা চড়া সুর ধরা না পড়ে।

আধ ঘন্টা পর মিস্টার ব্রেন আমাকে তাঁর টেবিলে ডেকে নিয়ে আমার পড়াশোনা সম্পর্কে, আমি গণিতের পাঠ নিয়েছি কতটুকু, এসব বিষয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যখন বললাম যে আমি দু'বছর পাটিগণিত পড়েছি তখন তাকে বেশ খুশি মনে

হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পেশায় প্রশিক্ষিত হয়ে পরলে তোমার কেমন লাগবে?

খুব ভাল লাগবে, স্যার। এর চাইতে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

তিনি বললেন যে তিনি একটি নিগ্রো ছেলেকে চশমা প্রস্তুতের পেশায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে চান, তিনি তাকে সহায়তা করবেন, তাকে পর্যবেক্ষণ করবেন। আমি এমনভাবে তার কথার জবাব দিতে চেষ্টা করি যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে আমার জন্য তিনি যা করছেন আমি তার যোগ্য হবার চেষ্টা করবো। তিনি আমাকে চৌকোআকারের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, এ হলো রিচার্ড, আমাদের এখানে কাজ করবে।

তারপর তিনি আমাকে আপিসের পেছনের ঘরে নিয়ে গেলেন। ওটা ছিল একটা ছোট্ট কারখানা, নানা রকম বিচিত্র মেশিনে ভর্তি, লাল ধুলিধূসরিত।

তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ যুবককে লক্ষ্য করে বললেন, রিনল্ডস, এ হলো রিচার্ড।

রিনল্ডস দাঁত বের করে হাসলো, তারপর গুরুগম্ভীর গর্জন করে উঠলো, কি বলছে ছোকরা?

মিস্টার ব্রেন আমাকে বয়স্ক মানুষটির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, পীস, এ হলো রিচার্ড, আমাদের সঙ্গে কাজ করবে।

পীস আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। মিস্টার ব্রেন শ্বেতাঙ্গ দুজনকে আমার কাজের কথা বুঝিয়ে বললেন। দোকানে কিভাবে কাজ হয়, কাচ গুঁড়া করার এবং পালিশ করার বলবিদ্যা কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, ক্রমে ক্রমে আমাকে এসব শিখিয়ে দেবার কথা বললেন। ওরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। মিস্টার ব্রেন বললেন, তাহলে, ছেলে, এ জায়গাটা তুমি কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারো দেখা যাক।

হ্যাঁ, স্যার।

আমি ঝাড় দিলাম, ভেজা কাপড় দিয়ে মুছলাম, ধুলা ঝাড়লাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অপিস এবং দোকানঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেললাম। আমার এ কাজ শেষ হবার পর আমি ফাইফরমাশ খাটলাম। অবসর সময়ে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গ দুজনকে মেশিনের মধ্যে চশমার কাচ চূর্ণ করতে দেখি। ওরা আমাকে কিছু বলে না, আমিও ওদের কিছু বলি না। প্রথমদিন কেটে যায়, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়, আমি পাঁচ ডলার হাতে পাই। এক মাস পার হয় কিন্তু আমি কিছুই শিখি না, কেউ আমাকে কিচ্ছু শেখাবার জন্য এগিয়েও আসে না। একদিন অপরাহ্নে আমি রিনল্ডসের কাছে গিয়ে এখানকার কাজ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে বলি। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার মতলবটা কি নিগার? খুব চালিয়াৎ হতে চাইছো?

আমি বললাম, না স্যার।

আমি খুব বিভ্রান্ত হই। কি জানি, আমাকে শেখাতে হয়তো তার ইচ্ছা করছে না। আমি পীসের কাছে যাই, তাকে বলি কর্তা আমাকে বলেছেন যে আমাকে এখানে এই পেশা শেখার একটা সুযোগ দেয়া হবে।

নিগার, তুমি মনে করো তুমি একজন শ্বেতাঙ্গ, তাই না?

না, স্যার।

তোমার চালচলন তো সে রকমই।

আমি বললাম, কর্তা আমাকে যা করতে বলেছেন আমি তো তাই করছি।

পীস ঘুসি পাকিয়ে আমার সামনে তার হাত নাড়ে। তারপর বলে, এখানে এটা শুধু শ্বেতাঙ্গদের কাজ, বুঝলে?

এরপর থেকে আমার প্রতি ওদের আচরণ বদলে যায়, ওরা আর আমাকে সুপ্রভাত জানায় না, কাজে কখনো সামান্য একটু ঢিলেমি দেখলে অলস কুত্তার বাচ্চা, কালা বলে গাল দেয়। পরিস্থিতি আরো খারাপ হবার ভয়ে আমি চুপ করে থাকি, কিন্তু একদিন রিনল্ডস আমাকে তার মেশিনের কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলো, রিচার্ড, তোমার জিনিসটা কতো বড়, অ্যাঁ?

কি জিনিস?

তুমি ঠিকই বুঝতে পারছো, যে জিনিস ষাড় গাভীর উপর চাপায়। আমি ওর সামনে থেকে সরে যাই। আমি শুনেছিলাম যে সাদাদের ধারণা যৌন ব্যাপারে নিগ্রোরা জানোয়ারের মতো। ওর কথা আমাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। সে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো, আমি শুনেছি নিগ্রোরা নাকি মাটিতে লিঙ্গ চেপে ধরে তার ওপর ভর দিয়ে লাটিমের মতো বনবন করে ঘুরতে পারে? তুমি একবার ওটা করে আমাদের দেখাও না? তোমাকে দশ পয়সা দেবো আমি।

আমি ওকে উপেক্ষা করি। মিস্টার পীস আমাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছেন। আমি ওদের দুজনকে দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখলাম।

মিস্টার ক্রেন আমার এই চাকরি আমাকে যেদিকে নিয়ে যাবে বলে বলেছিলেন তার কিছুই হচ্ছিল না। আমি খুব নম্র ও বিনীত হয়ে চলছিলাম, আর এখন আমি তার মূল্য দিচ্ছি।

পীস বললো, এদিকে এসো, ছোকরা।

আমি তার বেঞ্চের কাছে এগিয়ে যাই।

রিনল্ডস এই মাত্র তোমাকে যা বলেছে তা তোমার পছন্দ হয় নি, তাই না?

আমি মৃদু হেসে বললাম, ইয়ে, তো ঠিক আছে।

ওই হু, তোমার পছন্দ হয় নি। আমি তোমার মুখে তা দেখতে পাচ্ছি।

আমি স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাই, পেছনে সরে আসি।

পীস জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কখনো কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো নি?

না, স্যার।

পড়লে পরে কি করতে? ঠিক আছে। সাবধানে থেকো, কখনো কোনো গোলমাল পাকিও না।

এই সব ঘন্দের কথা মিস্টার ক্রেনকে জানাতে ইচ্ছা হয় আমার, কিন্তু আমি ওদের নামে কিছু লাগিয়েছি এ কথা শুনলে পীস কিংবা রিনল্ডস আমার কী করবে তা ভেবে আমি বিরত থাকি। আমি দিনভর আমার কাজ করি আর একটা অসন্তুষ্টির মুখোশ হাসির আড়ালে আমার ক্ষোভ গোপন করে রাখার চেষ্টা করি।

তারপর গ্রীষ্মের এক দুপুরে চরম পরিণতির মুহূর্ত এসে হাজির হয়। পীস আমাকে তার কাজের বেঞ্চের কাছে যেতে বলে। ওখানে যেতে হলে আমাকে দুটো সরু বেঞ্চের মাঝখানে দিয়ে যেতে হবে, আর আমার পিঠ লেগে যাবে দেয়ালের গায়ে। পীস তার কাজ থেকে মুখ না তুলে বেশ মিষ্টি গলায় বললো, রিচার্ড, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বলুন, স্যার।

রিনল্ডস এগিয়ে এসে দু' বেঞ্চের মাঝখানে পথটা আটকে দাঁড়ায়। দু' হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে সে গম্ভীর মুখে আমাকে লক্ষ্য করে। আমি বুঝি যে একটা গোলমাল ঘনিয়ে আসছে। আমি এবার রিনল্ডসের মুখের দিকে, একবার পীসের মুখের দিকে তাকাই। পীস খুব ধীরে ধীরে বলে, যেন ভুল বোঝার কোনো অবকাশ না থাকে। পীস বললো, রিচার্ড, রিনল্ডস বলছে যে তুমি আমাকে পীস বলে সম্বোধন করেছো।

আমি কাঠ হয়ে যাই। আমি আমার সামনে একটা বিশাল খাদ দেখি। আমি বুঝতে পারি যে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সময় এসেছে।

ও বলতে চায় যে আমি ওকে মিস্টার পীস বলে সম্বোধন করি নি। আমি রিনল্ডসের দিকে তাকাই। ওর হাতে একটা ইস্পাতের ডান্ডা। আমি প্রতিবাদ করবার জন্য মুখ খুলি, পীসকে আমি নিশ্চয়তা দিতে চেষ্টা করি যে আমি তাকে কখনই শুধু পীস বলে সম্বোধন করি নি, সে রকম ইচ্ছাই আমার কখনো হয় নি। এ পর্যায়ে রিনল্ডস আমার ঘাড় ধরে আমার মাথা দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরে।

হিংস্র দাঁত বার করে রিনল্ডস খেঁকিয়ে উঠলো, সাবধান, নিগার। তুমি ওকে পীস বলে সম্বোধন করেছো। আমি নিজে শুনেছি। এখন যদি তুমি না বলো তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বানাবে, তাই না?

সে ভীতিকরভাবে ইস্পাতের ডাণ্ডাকে ঘোরায়।

এখন আমি যদি বলি না, স্যার, মিস্টার পীস, আমি আপনাকে কখনো শুধু পীস বলে ডাকি নি, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে যে রিনল্ডসকে আমি মিথ্যুক বলছি। আর আমি যদি বলি হ্যাঁ, স্যার, মিস্টার পীস, আমি আপনাকে পীস বলে ডেকেছিলাম, তাহলে সেটা হবে দক্ষিণের একজন শ্বেতাঙ্গের প্রতি কোনো নিগ্রোর জঘন্যতম অপমানের স্বীকৃতি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা নিরপেক্ষ পথের কথা ভাবি যা এই দ্রুত উত্থিত দুঃস্বপ্নের সমাধান ঘটাবে, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না। পীস বললো, রিচার্ড আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি। তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ জমে উঠতে থাকে।

আমি সতর্কতার সঙ্গে বলি, মিস্টার পীস, আমি আপনাকে পীস বলে সম্বোধন করার কথা মনে করতে পারছি না। আর করে থাকলেও আমি নিশ্চিতভাবেই কিছু ভেবে করি নি...

কুত্তার বাচ্চা, কালা! তাহলে তুই আমাকে পীস বলেছিস, তাই না? সে ঘুষ্টু ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে আমার গালে এতো জোরে একটা চড় কষায় যে আমি বেঞ্চের ওপর বাঁকা হয়ে পড়ে যাই।

রিনল্ডস আমার ওপর চেপে বসে জিজ্ঞাসা করলো, তুই ওকে পীস বলে ডাকিস নি? যদি বলিস না, তাহলে আমি এক্ষুণি এই ডাণ্ডা দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে তোর নাড়িভুড়ি বার করে ফেলবো। হারামজাদা কালা নচ্ছাড়, বদমাশ! একজন শ্বেতাঙ্গকে মিথ্যুক বলে পার পাবার তোর কোনো উপায় নেই।

আমি ভেঙ্গে পড়ি। আমি মিনতি করি ওরা যেন আমাকে না মারেন। ওরা কি চায় আমি তা বুঝতে পারি। ওরা চায় যে আমি কাজ ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যাই। আমি কথা দিই।

আমি বললাম, আমি চলে যাবো, আমি এক্ষুণি চলে যাবো।

কারখানা থেকে চলে যাবার জন্য ওরা আমাকে এক মিনিট সময় দিলো। ওরা আমাকে সাবধান করে দিলো আমি যেন আর এখানে মুখ না দেখাই এবং কর্তারে যেন কিছু না বলি। রিনল্ডস আমার ঘাড় ছেড়ে দিলো, আমি নিচু হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আমি আপিসে মিস আর ব্রেন বা স্টেনোগ্রাফারকে দেখি না। তাদের সন্ত্রাসী কাণ্ডের জন্য মিস্টার ব্রেন ও স্টেনোগ্রাফার যখন আপিসে থাকবে না পীস আর রিনল্ডস সেই সময়টা বেছে নিয়েছিল। আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে কর্তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করি। আমি গ্রিগসকে দেখতে পেলাম, স্বর্ণলঙ্কারের দোকানে সে কাচের তাকগুলি মুছে পরিষ্কার করছিল। আমি তাকে হাতের ইশারায় ডাকি। গ্রিগস এলে আমি তাকে সব ঘটনা খুলে বলি। ও বললো, বুদ্ধু, তাহলে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কি জন্য? তুমি কি কোনোদিন কিছু শিখবে না? বাড়ি যাও! ওরা এখানে বেরিয়ে আসতে পারে?

আমি ক্যাপিটল স্ট্রিট ধরে হেঁটে চলি। আমার মনে হয় ফুটপাথটা অবাস্তব, আমি অবাস্তব, লোকজন অবাস্তব, তবু আমার মনে হতে থাকে কেউ একজন হয়তো আমার কাছে এসে জানতে চাইবে, এখন এই রাস্তায় হাঁটার কি অধিকার আছে আমার! ক্ষতটা আমার অনেক গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিল। আমার মনে হয় কেউ যেন আমাকে এক চড়ে মানবজাতির বৃত্ত থেকে হঠিয়ে দিয়েছে। বাড়ি ফেরার পর কি ঘটেছে তা আমি আমার পরিবারের কাউকে বলি না। আমি শুধু বললাম যে আমি ওই কাজ ছেড়ে দিয়েছি। ওখানে ভাল রোজগার হচ্ছিল না, আমি নতুন কাজের খোঁজ করছি।

সেদিন রাতে গ্রিগস আমার বাসায় এসে হাজির হয়। আমরা দুজন হাঁটতে বেরোই। ও বললো, খুব খারাপ কপাল তোমার।

আমি বললাম, দোষটা কি আমার?

ও মাথা নাড়লো।

আমি তিক্ত গলায় বললাম, তোমার ওই নমনীয় আর ধৈর্যশীল হওয়ার দর্শনের কি হলো?

ও কাঁধ কুঁচকে বললো, এসব ঘটে।

আমি বললাম, ওদের কাছে আমার টাকা পাওয়া আছে।

ও বললো, সে ব্যাপারেই আমি এসেছি। মিস্টার ব্রেন সকাল দশটায় তোমাকে ওর আপিসে যেতে বলেছেন। ঠিক দশটায়, বুঝলে? তিনি তখন ওখানে থাকবেন আর ওরা আবার একজোট হয়ে তোমার বিরুদ্ধে তখন লাগতে পারবে না।

পরদিন সকালে আমি সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে উঠে চশমার দোকানের আপিস ঘরে উঁকি দিই, মিস্টার ব্রেন যে সেখানে আছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হই। তিনি তাঁর টেবিলে বসেছিলেন। পীস আর রিনল্ডস ছিল পেছনের ঘরে, তাদের মেশিনের পাশে।

মিস্টার ব্রেন বললেন, এসো, রিচার্ড।

আমি আমার টুপি খুলে আপিস ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে দাঁড়াই।

বসো, তিনি বললেন।

আমি বসি। তিনি আমার দিকে তাকান, তারপর মাথা নাড়েন।

কি হয়েছিল আমাকে বলো।

বলার জন্য একটা প্রণোদনা আমার মধ্যে জেগে উঠে, কিন্তু আমি এমন একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে ফাটল ধরানো অসম্ভব এটা উপলব্ধি করার সঙ্গে আমার সে প্রণোদনা মরে যায়। আমি কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করি কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হয় না। আমি টানটান হয়ে উঠি, অশ্রুধারায় আমার দু'গাল জ্বলে যায়।

মিস্টার ব্রেন বললেন, এই নিজেকে সামলাও!

আমি আমার হাত মুঠি করে ধরি, কোনো রকমে কথা বলতে সমর্থ হই। আমি বললাম, আমি এখানে আমার যথাসাধ্য করার চেষ্টা করেছি।

তিনি বললেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু এখানে কি ঘটেছে আমি জানতে চাই। তোমাকে কে জ্বালাতন করেছে?

দুজনই।

রিনল্ডস দৌড়ে দরজার কাছে আসতেই আমি উঠে দাঁড়াই। মিস্টার ব্রেন লাফ দিয়ে তার চেয়ার থেকে উঠে রিনল্ডসকে বললেন, তুমি পেছনের ঘরে ফিরে যাও!

রিনল্ডস বললো, ওই নিগারটা মিছে কথা বলছে। ও যদি আমার নামে কোনো মিছে কথা লাগায় তাহলে আমি ওকে খুন করে ফেলবো।

মিস্টার ব্রেন বললেন, হয় পেছনের ঘরে ফিরে যাও, না হলে এখান থেকে বিদায় হও।

রিনল্ডস আমার ওপর স্থির দৃষ্টি রাখতে রাখতে পেছনের ঘরে ফিরে যায়। মিস্টার ক্রেন বললেন, এবার কি ঘটেছে আমাকে বলো।

আবার আমি কিছু বলতে পারি না। ওকে বলেইবা আমার কী লাভ হবে? আমি কালো, আমি বাস করি দক্ষিণে। যতদিন ওই শ্বেতাঙ্গ দুজন ওখানে থাকবে ততদিন আমি কিছুতেই ওই মেশিনগুলি ব্যবহার করার শিক্ষা লাভ করতে পারবো না। কী সুযোগ আমি হারাচ্ছি তা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে ক্রোধ এবং ভয় উত্তাল হয়ে জেগে উঠে আমি সামনে ঝুঁকে দু'হাত আমার মুখের ওপর চেপে ধরি।

মিস্টার ক্রেন বললেন, না, না! নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখো। যাই ঘটুক, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিও না।

আমি বললাম, আমি জানি। আমার গলার স্বর আমার নিজের বলে মনে হয় না।

আমি বললাম, আমার কিছু বলা না বলা অর্থহীন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এখানে কাজ করতে চাও?

আমার সামনে ভেসে ওঠে পীস আর রিনল্ডসের সাদা মুখ দুটি। আমি কল্পনার চোখে দেখি ওরা পথের মধ্যে আক্রমণ করে আমাকে মেরে ফেলেছে। নেডের ভাই-এর কী হয়েছিল আমার তা মনে পড়ে।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, না, স্যার।

কেন না?

আমার ভয় করে। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

মিস্টার ক্রেন পীস আর রিনল্ডকে অফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন বলো এদের মধ্যে কে তোমাকে জ্বালাতন করেছে। ভয় পাবার কিছু নেই। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমি সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, কোনো কথা বলি না। তিনি হাতের ইশারায় ওদের দুজনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। শ্বেতাঙ্গিনী স্টেনোগ্রাফার বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখে, আমার মনে হয় আমার আত্মা পর্যন্ত নগ্ন হয়ে গেছে, লজ্জায় আমার সর্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে যায়। আমার সমস্ত সত্তা যেন ধর্ষিত হয়েছে, আর আমি বুঝি যে আমার নিজের ভয়-ভীতি ওই ধর্ষণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে। আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিই, আমার আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য লড়াই করি।

অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আমার টাকাটা পেতে পারি, স্যার?

এক মিনিট বসে নিজেকে সামলে নাও।

আমি অপেক্ষা করি। ধীরে ধীরে আমার উত্তেজিত ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হয়ে আসে।

তিনি বললেন, আমি খুবই দুঃখিত।

আমি বললাম, এই কাজটার ওপর আমি অনেক আশা স্থাপন করেছিলাম। আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কলেজে যেতে চেয়েছিলাম।

আমি জানি, কিন্তু এখন কি করবে?

আমার দৃষ্টি অফিসের চারপাশে ঘুরে যায় কিন্তু আমি কিছুই দেখি না। আমি বললাম, আমি চলে যাচ্ছি।

মানে?

আমি নিচু গলায় বললাম, আমি দক্ষিণ থেকে চলে যাবো।

তিনি বললেন, হয়তো তাই সব চাইতে ভাল হবে। আমি ইউনিয়নের লোক, আমার জন্যও এখানে থাকা খুব কঠিন। আমি খুব সামান্যই করতে পারি।

তিনি আমার হাতে টাকা তুলে দিলেন সপ্তাহের কাজের জন্য আমার যা প্রাপ্য হয়েছিল তার চাইতে বেশিই দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াই। তিনিও উঠলেন। আমি হলঘরে যাই, তিনি আমাকে অনুসরণ করেন তারপর আমার দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন।

তিনি বললেন, তোমাদের জন্য এ অঞ্চল খুবই কঠিন। আমি তাঁর হাত স্পর্শ করি কি করি না, দ্রুত পায়ে হলঘর পেরিয়ে যাই। আবার অশ্রুজলে ভেসে যাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করি। তিনি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন, ধীরে ধীরে তাঁর মাথা নাড়ছেন। আমি সূর্যালোকের মধ্যে নেমে যাই, একজন অন্ধ মানুষের মতো হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি এসে পৌঁছাই।

দশম অধ্যায়

এরপর কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী আমি আর আমার অনুভূতিসমূহের ওপর আস্থা রাখতে পারি না। আমার ব্যক্তিত্ব অসড়া হয়ে পড়ে, পরিণত হয় একটা শিথিল তরল পিণ্ডে। আমি হয়ে উঠি একজন না-মানুষে, যে আচ্ছাভাবে জানে যে সে মানুষ কিন্তু অনুভব করে যে সে তা নয়। সময় যখন আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে তখন যে লোকগুলি আমাকে আমার কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের প্রতি আমি কোনো ঘৃণা অনুভব করতে পারি না। তাদেরকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানুষ বলে আমার মনে হয় না, তারা যেন একটা বিশাল নিষ্করুন প্রাকৃতিক পরিকল্পনার অংশ, যার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছিল নিষ্ফল। আমি যা অনুভব করি তা হলো আক্রমণ করার একটা আকুলতা। কিন্তু কিভাবে? এবং যেহেতু এই জিনিসটার সঙ্গে লড়ার কোনো পথ আমার জানা ছিল না সেই হেতু আমার নিজেকে মনে হলো দু'বার পরিত্যক্ত।

আমি শয্যা গ্রহণ করি ক্লান্ত হয়ে, শয্যা ত্যাগ করি ক্লান্ত হয়ে, যদিও আমি কোনো শারীরিক পরিশ্রম করি না। দিনের বেলায় প্রতিটি ঘটনা আমার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, আমার চাপা দেয়া আবেগসমূহ তার চারপাশে উপচে পড়ে। আমার ব্যাপার নিয়ে আমি অপরের সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানাই, কারণ আমি জানতাম যে, আমি শুধু তাদের কাছ থেকে শ্বেতাঙ্গদের আচার-আচরণের যৌক্তিকতার কথাই শুনবো, আর আমি তা শুনতে চাই নি। আমি একটা বিশাল ক্ষত বহন করে চলি, নাজুক, পচনধরা, আর কেউ তা স্পর্শ করার মতো কাছে আসছে ভাবলেই আমি সিঁটিয়ে যাই।

কিন্তু আমাকে খাওয়ার জন্য কাজ করতে হয়। আমার পরবর্তী চাকরি হলো একটা অষুধের দোকানে, সাহায্যকারীর কাজ। কাজে যোগদানের আগের রাতে আমি আমার নিজের সঙ্গে লড়াই করি, আমি নিজেকে বলি যে আমার এই জিনিসটাকে পরাজিত করতে হবে, তার ওপর নির্ভর করছে আমার জীবন। অন্য কৃষ্ণাঙ্গরা তো কাজ করে, তারা তো চালিয়ে দেয় কোনোমতে, তাহলে আমাকেও পারতে হবে, পারতে হবে, পারতেই হবে মানিয়ে নিতে, যতদিন পর্যন্ত চলে যাবার মতো পর্যাপ্ত অর্থ আমার হাতে না জমে। হ্যাঁ, আমি নিজেকে মানিয়ে নেবো। অন্যরা পেরেছে। আমিও পারবো। আমাকে পারতেই হবে।

আমি ভয়ে ভয়ে কাজে যোগ দিই, দৃঢ় সংকল্প করি যে আমি আমার প্রতিটি

পদক্ষেপের ওপর নজর রাখবো। আমি সামনের ফুটপাথ পানে দিই, কোনো শ্বেতাঙ্গ দিন ফুট দূরে দেখা দিলেই আমি থেমে পড়ি। আমি তেজা ন্যাকড়া দিয়ে দোকানের মোছা-পরিষ্কার করি, সাদা মানুষগুলি তাদের সুবিধা মতো সময়ে আমার পথ ছেড়ে না সরে যাওয়া পর্যন্ত সতর্কভাবে অপেক্ষা করি। আমি মাইলের পর মাইল কাচের তাক পরিষ্কার করি, এখন কাজের গতিবেগ বাড়িয়ে দিই, বাস্তবতার প্রতিটি সূক্ষ্ম তারতম্য আমার চেতনার আলোকের মধ্যে নিয়ে আসি। দুপুর হয়, দোকান এখন জনকীর্ণ, খাবারের কাউন্টারের সামনে ভিড় জমে। কাউন্টারের পেছন থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ ছুটে এসে আমাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলে, এক জগ কোকাকোলা, জেরবা, জলদি!

আমার শরীর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে টানটান হয়ে যায়। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সে-ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, কি হলো? তোমার গোলমালটা কোথায়?

আমি বললাম, কিছু না।

তাহলে যাও, হা করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

আমি চেষ্টা করলে গোলমালটা যে কোথায় তা আমি ওকে বলতে পারতাম না। আমার মধ্যে সহিংসতায় জমে ওঠা প্রত্যাশা আমাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আমার প্রণোদনাসমূহ, আমার কথাবার্তা, আমার চলাফেরা, আমার আচরণ, আমার অভিব্যক্তিগুলি সম্পর্কে আমার সার্বক্ষণিক চিন্তা আমার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়ার ফলে আমি বিস্মৃতিপ্রবণ হয়ে পড়ি। লোকজন আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে শুরু করে। এর ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। একদিন আমি ঘরের মেঝেতে কমালের সিরাপের একটা জগ ফেলে দিই। কর্তা রেগে আগুন হয়ে যান। তিনি আমার বাহু আঁকড়ে ধরে আমাকে এক ঝটকায় দোকানের পেছন দিকে নিয়ে যান। রাগে তাঁর মুখ ধূসর নীল হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম আমাকে মার লাগাবেন বোধ হয়। আত্মরক্ষার জন্য আমি তৈরি থাকি।

কিন্তু তিনি শুধু চিৎকার করে বললেন, এর দাম আমি তোমার বেতন থেকে কেটে নেবো, কালা হারামজাদা!

চড়-ঘুসির পরিবর্তে কথা। আমার টানটান ভাব প্রকাশিত হয়।

আমি তাঁকে শান্ত করার জন্য বলি, ইয়েস, স্যার। দোষটা আমার।

আমার বলার ধরনে তিনি যেন পাগল হয়ে গেলেন, আগের চাইতেও জোরে চিৎকার করে উঠলেন, ইউ আর গড ড্যাম, রাইট!

আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমি এ কাজে নতুন। আমি উপলব্ধি করি যে সঠিক কথাটি বলার চেষ্টা করলেও আমি আবারো ভুল উক্তি করেছি।

তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, আমরা তোমাকে শুধু পরীক্ষা করে

দেখছি।

আমি বললাম, ইয়েস, স্যার। আমি বুঝতে পারছি।

তিনি রাগে বাকাহারা হয়ে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকেন। আচ্ছা, কেন আমি ঠিক সময় মুখ বন্ধ রাখতে পারি না? আমি একটা ছোট্ট বাক্য বেশি বলে ফেলেছি। আমার কথাগুলি ছিল নির্দোষ, কিন্তু, মনে হয়, তার মধ্যে আমার চেতনার এমন একটা অংশ ফুটে ওঠে যা শ্বেতাঙ্গদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

শনিবার রাত এসে উপস্থিত হয়। কর্তা আমার হাতে আমার বেতন তুলে দিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন, আরা এসো না। তোমাকে দিয়ে আমাদের চলবে না।

আমাকে নিয়ে অসুবিধা কোথায় আমি তা বুঝতে পারি, কিন্তু আমি সেটা সংশোধন করতে পারি না। শ্বেতাঙ্গদের কথাবার্তা ও আচরণ আমার কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হয়। আমি একটা সংস্কৃতির মধ্যে বাস করছি, সভ্যতার মধ্যে নয়, এবং ওই সংস্কৃতি কিভাবে কাজ করে আমাকে সেটা তার মধ্যে বাস করেই জানতে হবে। আমার চারপাশের শ্বেতাঙ্গদের কথা ও কাজের ভুল ব্যাখ্যা করার ফলেই আমি ভুল কথা বলি, ভুল কাজগুলি করি। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমার কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সমগ্রতা আমার চেতনায় ধরা পড়ে, আর তারা শুধু সচেতন থাকে একটি বিশেষ মুহূর্তের একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে। অন্যরা যে সব জিনিস স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করে আমাকে সারাক্ষণ সে সব কথা চেষ্টা করে মনে রাখতে হয়। অন্যরা যা অনুভব করে আমাকে তা চিন্তা করে বের করতে হয়।

শ্বেতাঙ্গ জগতের সঙ্গে পেরে ওঠার কাজটা আমি বড় বেশি দেরিতে শুরু করেছি। দাসসুলভ আনুগত্যকে আমি আমার আচরণের একটা স্বয়ংক্রিয় অংশ করে তুলতে পারি না। প্রতিটি ছোটখাটো বর্ণভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্র বর্ণ সমস্যার আলোকে আমাকে অনুভব করতে হয়, ভেবে দেখতে হয়, আর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি নিয়ে আসি আমার সমগ্র জীবনকে। একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে চিন্তা করে ঠিক করতে হয় আমি কী বলবো, কোন কাজটি করবো। প্রতিটি ক্ষেত্রে। এটা না করে আমি পারি না। আমি দাঁত বের করে হাসতে পারি না। অতীতে আমি বড় বেশি কথা বলতাম, এখন কোনো কথা বলতেই আমার কষ্ট হয়। আমার বাস করা জগৎ আমার কাছে যেমন প্রত্যাশা করে তেমন প্রতিক্রিয়া আমি দেখাতে পারি না। ওই জগৎ বড় বেশি বিভ্রান্তিকর, বড় বেশি অনিশ্চয়তায় ভরা।

কয়েক সপ্তাহ আমি অলস কর্মহীন হয়ে পড়ে থাকি। গ্রীষ্ম শেষ হয়ে যায়। পড়াশোনার আশা এখন নিশ্চিতভাবেই অন্তর্হিত। শরৎ আসে। যে সব ছেলে এতোদিন চাকরি করেছে তাদের অনেকে শিক্ষাঙ্গণে ফিরে যায়। এখন প্রচুর কাজ খালি। আমি শুনলাম একটা হোটেলে হলকক্ষের জন্য ছোকরা চাকর দরকার। ওই হোটেলেই নেডের ভাই তার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। আমার কি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে? আমিও কি

কোনো মারাত্মক ভুল করে ফেলবো? কিন্তু আমাকে যে টাকা রোজগার করতে হবে। আমি আবেদন করি এবং কাজ পেয়ে যাই। হোটেল ভবনের অফিসের মেঝেগুলির চারপাশ ঘিরে যে দীর্ঘ সাদা টালির হলপথ প্রসারিত হয়ে গেছে তাকে নাকড়ার বাড় দিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হবে। আমি প্রতি রাত সন্ধ্যায় বালতি নিই, একটা বিশাল জলের বালতি আর এক বস্তা পাতলা সাবানের টুকরা হাতে পাই। আর একখণ্ড ধোয়া-মোছার ছোকরাদের সঙ্গে কাজে লেগে পড়ি। সব নিগ্রো ছেলের দল। আমার ভাল লাগে। আমি অন্তত কথা বলতে, হাসি ঠাট্টা করতে, গান গাইতে পারি। যা শুনি তা বলতে পারি। শ্বেতাঙ্গ জাতি কালোদের জন্য যে জীবনধারা চিহ্নিত করে দিয়েছে তা অনুসরণ করে এই কৃষ্ণাঙ্গ বালকরা কী রকম মসৃণভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে চলে তা দেখে আমি অবাক হই। ওদের বেশির ভাগই যে একটা বিশেষ রকম, বিচ্ছিন্ন এবং অবদমিত জীবন যাপন করছে সে সম্পর্কে আদৌ সচেতন নয়। অথচ আমি জানতাম যে, তাদের বেড়ে ওঠার কোনো এক পর্বে– যে পর্বের কথা তারা নিঃসন্দেহে বিস্মৃত হয়েছে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর, নিয়ন্ত্রণকারী একটা কর্মসাধন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল যা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা নিষিদ্ধ যাবতীয় বিষয়কে তাদের মন ও অনুভূতির সম্পূর্ণ বাইরে রেখে দেয়। যদিও তারা এমন এক আমেরিকায় বাস করে যেখানে তত্ত্বগতভাবে সবার জন্য সমান সুযোগ বিরাজ করে, তারা নির্ভুলভাবে জানে তারা কী আশা করতে পারে আর কী পারে না। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বালক যদি ঘোষণা করতো যে সে একজন লেখক হতে চায় তাহলে তার সঙ্গীরা নির্বুদ্ধিতায় তাকে পাগল আখ্যা দিতো। কিংবা কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বালক যদি বলতো যে সে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে একটা আসন পেতে আগ্রহী তাহলে তার বন্ধুরা, ওই ছেলের নিজের স্বার্থেই, তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুর কাছে তার অদ্ভুত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে দিতো।

আমাদের সঙ্গে একটি ফ্যাকাশে-হলুদ ছেলে কাজ করতো। তার গনোরিয়া হয়েছিল এবং সেজন্য সে গর্ববোধ করতো। এক রাতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কখনো গনোরিয়া হয়েছে?

আমি বললাম, গড, নো। কেন জিজ্ঞাসা করছো?

সে সাদামাটাভাবে জানালো, আমার হয়েছে। আমি ভাবলাম তুমি হয়তো কী ব্যবহার করতে হবে তা বলতে পারবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ডাক্তার দেখাও নি?

নাহ্। ডাক্তাররা কোনো কাজের নয়।

আমি বললাম, ঝোকামি করো না।

কি ব্যাপার? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে গনোরিয়ায় আক্রান্ত হওয়াকে তুমি একটা লজ্জাকর ঘটনা বলে মনে করো?

আমি বললাম, অবশ্যই করি।

আরে, অন্তত তিনবার গনোরিয়া না হলে সে কোনো পুরুষ মানুষই নয়।

দেখো, এ নিয়ে অহঙ্কার করো না।

ও বললো, একটা কঠিন সর্দির অসুখের চাইতে এটা বেশি খারাপ কিছু নয়।

কিন্তু আমি তাকে প্রস্রাব করার সময় দেখেছি। সে একটা ব্যাপ্ত চলাচলের পাইপ, একটা দরজার পাল্লা অথবা একটা জানালার শিক আঁকড়ে ধরে থাকে, প্রস্থিত টানে তার চোখ জলে ভরে যায়, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে, সে যেন হোটেলটাকে তার ভিত্তিভূমি থেকে উপড়ে তুলে ফেলার চেষ্টা করে। এখন তার কথা শুনে আমার বিতৃষ্ণা গোপন রাখার জন্য আমি হেসে উঠি। ধোয়া-মোছার কাজ শেষ হবার পর আমি হোটেলের লকার-ঘরে যে অনিঃশেষ জুয়া খেলা চলতো বসে বসে তা দেখতাম। তাতে অংশ নিতে আমি কখনো উৎসাহ বোধ করি নি। জুয়া আমাকে কোনোদিন আকর্ষণ করে নি। যে জীবন আমি যাপন করছি তার চাইতে বেশি বিপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ কোনো খেলার কথা আমি ভাবতে পারি না। সারা দিনরাত ওখানে শুধু শাপশাপান্ত আর যৌনতার গালগল্প চলতো। নীল ধোঁয়ায় বাতাস শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেতো। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদের কথাবার্তা শুনতাম, তারা কেমন করে ওই রকম সহজ হাসি হাসে অবাক হয়ে সে কথা ভাবতাম, কোনো অলৌকিক বস্তু তাদের অধঃপতিত জীবনে একটা মানবিক অস্তিত্বের সাদৃশ্য দান করছে তা ধরার চেষ্টা করতাম।

বেশ কয়েকটি নিগ্রো মেয়ে ওই হোটেলে পরিচারিকার কাজ করতো। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল আমার চেনা। এক রাতে আমি যখন বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছি তখন আমার ওদিকে বাস করা একটি মেয়েকে আমি দেখতে পাই। এক সঙ্গে কিছু দূর যাওয়ার জন্য আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। রাতের শ্বেতাঙ্গ দারোয়ানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে কৌতুক ভরে মেয়েটির পশ্চাদ্দেশে একটা চাপড় দিলো। আমি অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াই। মেয়েটি এঁকেবেঁকে তার হাতের বাইরে চলে যায়, তারপর প্রগলভতার সঙ্গে তার মাথার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হলপথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

দারোয়ান বললো, কী হলো, নিগার? আমি যা করেছি সেটা তোমার পছন্দ হয় নি বলে মনে হচ্ছে।

আমি নড়তে পারি না। আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না। আমার নিষ্ফলতা ওর কাছে নিশ্চয়ই একটা চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়েছিল। সে তার পিস্তল হাতে তুলে নেয়।

কি হলো, নিগার? কাজটা তোমার পছন্দ হয় নি, তাই না?

আমার গলা শুকিয়ে আসে। আমি ফিসফিস করে বলি, ইয়েস, স্যার, হয়েছে।

গড ড্যাম ইট, তাহলে সেই ভাবে বলো।

আমি আমার গলায় যতটা হৃদ্যতা সম্ভব ফুটিয়ে তুলে বলি, ওহ, ইয়েস স্যার।

আমি হলঘর দিয়ে হেঁটে যাই, অনুভব করি যে, আমার পিঠের দিকে তার পিস্তল

তাক করা আছে, কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে আমার ভয় করে। আমি যখন দরজার বাইরে আসি তখন আমার মনে হয় আমার গলা ভীষণ ফুলে উঠেছে, যেন সবকিছু ফেটে যাবে। মেয়েটি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি তার পাশ দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যাই। সে আমাকে ধরে ফেলে। আমি ফেটে পড়ি, ওহ, তুমি কেমন করে ও রকম করতে দিলে?

সে বললো, এতে কিছু হয় না। ওরা সারাক্ষণই এ রকম করে।

আমার একটা কিছু করতে খুব ইচ্ছা করছিল।

বোকামি করতে তাহলে।

কিন্তু তোমার খুব খারাপ লাগে নি?

সে শুকনো গলায় জবাব দিলো, আমরা না চাইলে ওরা কখনোই এর বেশি এগোয় না।

আমি বললাম হ্যাঁ, তাহলে আমি বোকামিই করতাম, কিন্তু আমার কথার অর্থ ও ধরতে পারে নি।

পরের রাতে কাজে যেতে আমি ভয় পাই। দারোয়ান কি ভাববে? ও কি আমাকে একটা শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে? আমি আস্তে হাঁটতে হাঁটতে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকি। ও হুমকিটা অব্যাহত রাখবে কিনা সে কথা ভাবি। ওর দৃষ্টি আমার ওপর পড়ে, আমাকে ভেদ করে চলে যায়। স্পষ্টতই সে ব্যাপারটা চুকে গেছে বলে মনে করে। কিংবা এ রকম এতো বেশি অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সে পার হয়েছে যে, সে ইতিমধ্যে ব্যাপারটা ভুলেই গেছে।

আমার বেতন থেকে আমি কয়েক ডলার করে বাঁচাতে শুরু করেছিলাম, কারণ এখান থেকে আমার চলে যাবার সংকল্প একটুও হ্রাস পায় নি। কিন্তু আমার সঞ্চয় হচ্ছিল বিরক্তিকর রকম ধীর গতিতে। আমি সারাক্ষণ টাকা বানাবার পন্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি এবং একমাত্র পথ আমি দেখতে পাই তা হলো আইনের পরিপন্থী। না, আমি নিজেকে বললাম, ও পথে আমি যাবো না। দক্ষিণে জেলে যাওয়া মানে সারা জীবনের জন্য শেষ হয়ে যাওয়া। আরেকটা সম্ভাবনা অবশ্য আছে। ধরা পড়লে আমি হয়তো জেল পর্যন্ত পৌঁছাবোই না।

আমার জীবনে আমি এই প্রথম সচেতনভাবে দেশের আইন ভঙ্গ করার কথা চিন্তা করি। আমি অনুভব করেছি যে, আমার বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে আমি যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো, আর এখন পর্যন্ত আমি কারো কাছ থেকে একটি পয়সাও চুরি করি নি। এমন কি ক্ষুধার যন্ত্রণাও আমাকে অন্য কারো জিনিস নিতে বাধ্য করতে পারে নি। চুরি করার চিন্তাই ছিল আমার কাছে ন্যাক্কারজনক। আমি যে কোনো সুচিন্তিত উদ্দেশ্য থেকে সৎ ছিলাম তা নয়, অসৎ হবার কথা আমার মাথাতেই আসে নি।

অথচ আমার চারপাশে নিগ্রোরা সব সময় চুরি করছিল। কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা যখন আবিষ্কার করে যে কোনো শ্বেতাঙ্গ তার সুন্দর কোনো জিনিস অসতর্কভাবে আমার হাতের আওতায় ফেলে রেখে গেলেও আমি ওই সুযোগের সদ্ব্যবহার করি না তখন তারা আমাকে একাধিকবার একটা গাধা নিগার বলে গাল দিয়েছে। আমি যখন বলি যে চুরি করা ঠিক না, তখন ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কেমন করে তোমার উন্নতি হবে? আমি জানতাম যে হোটেলের ছোকরারা যা পারতো তাই হাতিয়ে নিতো। ক্যাপিটল স্ট্রিটের অলঙ্কারের দোকানে কর্মরত আমার বন্ধু গ্রিগস যে নিয়মিতভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে চুরি করতো তাও আমার জানা ছিল। আমি জানতাম যে, আমার এক কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিবেশী, যে একটি পাইকারি দোকানে কাজ করতো, তার কাজের জায়গা থেকে বস্তাভর্তি শসা চুরি করছিল, অথচ সে ছিল তার গির্জার একজন কর্মকর্তা, প্রতি রবিবার সে সেখানে প্রার্থনা করতো ও ধর্মসঙ্গীত গাইতো। আমি জানতাম যে, যে-সব কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে কাজ করতো তারা তাদের সামান্য মজুরির সঙ্গে কিছু যুক্ত করার জন্য প্রতিদিন যাবার চুরি করতো। আর আমি এও জানতাম যে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কের প্রকৃতিই এ ধরনের সার্বক্ষণিক চুরি-চামারির জন্য দিতো।

আমার পরিবেশের কোনো নিগ্রো বেতন বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাদের শ্বেতাঙ্গ নিয়োগ কর্তাদের কাছে আবেদন করার জন্য কখনো সংগঠিত হবার কথা ভাবতো না, তা সেটা যতো সুশৃঙ্খলভাবেই হোক না কেন, ওই চিন্তাই তাদের কাছে ভীতিকর মনে হতো। আর এটাও তারা জানতো যে, শ্বেতাঙ্গরা প্রচণ্ড বর্বরতার সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই দন্তবিকশিত করে হাসতে হাসতে, মাথা নিচু করে অভিবাদন করতে করতে, শ্বেতাঙ্গদের বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ভান করে তারা তাদের আঙ্গুলকে যেটা সম্ভব সেটাই হাতিয়ে নিতে দিতো। আর, মনে হয়, সাদারাও যেন সেটা পছন্দ করতো।

কিন্তু আমি, যে কোনো কিছু চুরি করে না, যে ওদের মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে দেয়, যে একটা মানুষের মতো কথা বলতে ও আচরণ করতে চায়, আমি তাদের মতো ভয় জাগিয়ে তুলি। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের বরং সেই সব নিগ্রোদেরই পছন্দ যারা চুরি করে, তাদের জন্য কাজ করে। যেসব নিগ্রো খুব আচ্ছাভাবে হলেও, নিজেদের মনুষ্যত্বের মূল্য সম্পর্কে সচেতন তাদের ওরা পছন্দ করে না। আর তাই, তারা কালোদের চুরিচামারির প্রতিদান দেয়, তাদের দায়িত্বহীনতাকে উৎসাহিত করে, এবং আমরা কালোদের ওপর তাদের পুরস্কার সেই অনুপাতে বর্ষণ করে যে অনুপাতে আমরা তাদের নিরাপদ এবং আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ রূপে অধিষ্ঠিত করতে পারি।

চুরির বিরুদ্ধে আমার আপত্তি নৈতিকতার কারণে ছিল না। আমি তা অনুমোদন করি নি কারণ আমরা জানতাম যে শেষ পর্যন্ত তা হবে নিষ্ফল। একজনের পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে দেবার ক্ষেত্রে সেটা কোনো কার্যকর পদ্ধতি ছিল না। তাহলে, কিভাবে

আমি আমার পরিবেশের সঙ্গে আমার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাবো? আমার বেতনের প্রায় সবটুকু আমার গৃহের অন্তহীন ক্ষুধার্ত উদরগুলি পূর্ণ করার কাজে ব্যয় হয়ে যেত। যদি আমি সপ্তাহে এক ডলার করে জমাই তাহলে একশো ডলার জমাতে আমার এক বছর লাগবে। কোনো একটা বিচিত্র কারণে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এখান থেকে একটা অচেনা শহরে চলে যাবার জন্য আমার অন্তত একশো ডলার দরকার হবে। আর, ঈশ্বর জানেন, দু' বছরের মধ্যে আমার জীবনে কতো কী ঘটা যেতে পারে...।

আমি জানতাম না কখন আমি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়বো যেখানে আমি একটি ভুল শ্বেতাঙ্গ লোককে একটা ভুল কথা বলে ফেলবো আর ভীষণ ঝামেলায় পড়ে যাবো। আর, সব কিছুর চাইতে আমি বেশি চাইতাম ঝামেলা এড়াতে, কারণ আমার ভয় হতো সাদাদের সঙ্গে যদি আমার সংঘর্ষ বাঁধে তাহলে আমার আবেগের ওপর আমি আমার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবো এবং তখন আমার মুখ থেকে এমন সব কথা নির্গত হবে যা নিশ্চিতভাবে আমার জন্য মৃত্যুদণ্ড ডেকে আনবে। সময় আমার পক্ষে নেই, আর আমাকে কোনো একটা পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রায়ই, আমার বিভ্রান্তিকর মুহূর্তগুলিতে, আমার খুব ইচ্ছা হতো হোটেলের কোলাহলমুখর লকার-ঘরগুলির হাস্যরত, অলস, বিষ্মৃতিপরায়ণ কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেগুলির মতো হয়ে যেতে, যাদের কোনো প্রবল দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার দায় নেই। অনেক সময় আমার গোপন বোঝার ভার বহন করতে করতে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আমার ওই বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করতো। হয় যে কোনো একটা কাজে কিংবা হাল ছেড়ে দিয়ে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করতো আমার। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার মতো মানুষ রূপে আমি নির্মিত হই নি, আর কাজের ক্ষেত্রে আমার সামনে খোলা ছিল অত্যন্ত সীমিত কয়েকটি জিনিস। তার সবগুলি সম্পর্কেই আমি ছিলাম অত্যন্ত ভীত।

এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবার ইচ্ছা আমার মধ্যে একটা নতুন দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। যে সব উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ মানুষরা আইন প্রণয়ন করেছে আমি এখন তাদের বেশ কাছে থেকে দেখেছি। তারা কি রকম আচরণ করে, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের কী চোখে দেখে, তারা কিভাবে আমাকে দেখে আমি তা দেখেছি। এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গরা সমভাবে এই আইন মানবে, আমি আর এখন নিজের মধ্যে সে রকম বাধ্যবাধকতা অনুভব করি না। আমি ওই সব আইনের আওতার বাইরে। শ্বেতাঙ্গরাই আমাকে সে কথা বলেছে। এখন আমার পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাবার উপরের কথা যখন আমি ভাবি তখন ভেতরের যে-বাধা আমার পক্ষে চুরি করা অসম্ভব করেছিল সে-বাধা আর অনুভব করি না, আর এই নতুন মুক্তি আমাকে নিঃসঙ্গ ও ভীত করে তোলে।

আমার অনুভূতিগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। আমার অজান্তে, কাছের প্রতিবেশীর বাড়িতে তার দেরাজে তালাবন্ধ করা পিস্তলটির স্বপ্ন দেখি আমি। আমি যদি ওটা চুরি করি তাহলে কতো টাকা পাবো? চলে যাবার আকুলতা আমার মধ্যে খুব প্রবল হয়ে

উঠলে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিকটবর্তী একটা নিগ্রো কলেজের গুদামঘরের ছবি, সেখানে ধরা ছিল সংরক্ষিত ফলের গাদাগাদা টিন। তবু ভয় আমাকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেয় না। অথচ চুরির চিন্তা আমার ভেতরে সারাক্ষণ নড়াচড়া করে। শ্বেতাঙ্গদের জগতের সঙ্গে মানিয়ে নেবার অক্ষমতা ইতিমধ্যে আমার ব্যক্তিত্বের কাঠামোর একটা অংশ গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিল এবং অপরাধের ক্ষেত্রে আমার নিজের ভেতরে যে বাধা ছিল তা ভেঙ্গে ফেলেছিল। এখন একমাত্র যে জিনিস আমার পথে দাঁড়িয়ে আছে তা হলো তাৎক্ষণিক সুযোগের অভাব, শেষ একটা ধাক্কা। এবং সেটা এসে পড়ে।

আমি হোটেলের বেল বয়-এর পদে উন্নীত হলাম, এর ফলে আমার আয় সামান্য একটু বাড়ে। তবে আমি শিগগিরই জেনে ফেলি যে, মোটা টাকাটা আসে হোটেলের শ্বেতাঙ্গ বারবণিতাদের কাছে চোরাই মদ সরবরাহ করার মাধ্যমে। অন্য বেল বয়রা সে-ঝুঁকি নেয়, আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিই। কোমরের তলায় বেআইনি জিনিস লুকিয়ে রেখে আমি শ্বেতাঙ্গ পুলিশের পাশ দিয়ে অলস পায়ে হেঁটে যাই, একটা নিরপরাধ নিগ্রো বালক যেভাবে শিস দেয় সেভাবে শিস দিই। বাড়তি ডলার আসতে থাকে, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। সামান্য কোনো অন্যায় আচরণের জন্য ধরা পড়ে জেলে যাবার আগে আমি কেমন করে, কেমন করে, বেশ কিছু টাকা যোগাড় করতে পারবো? আইন যদি আমি ভঙ্গ করিই তাহলে এমন কিছুর জন্য উচিত যা আমাকে বিশেষ ফায়দা দেবে। আমার চুরির লক্ষ্য ছিল খুব ছোটখাটো। একশো ডলার হাতে পেলে আমার চলাফেরার ক্ষেত্রে আমি এমন একটা স্বাধীনতা পাবো যা আমি আমার জীবনে কখনো লাভ করি নি। আমি ওই চিন্তা বুকে ধরে চারিদিকে নজর রাখি, অপেক্ষা করি।

সুযোগ মতো কোনো একটা কিছু হাতিয়ে নিয়ে ছুটে পালাবার জন্য অপেক্ষা করার সময়টুকুতে আমি শ্বেতাঙ্গ বারবণিতাদের তাদের শয্যায় নগ্ন দেহে শুয়ে থাকতে কিংবা নগ্ন শরীরে তাদের ঘরে বসে থাকতে কিংবা নগ্ন শরীরে তাদের ঘরে বসে থাকতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। আর আমি শিখে নিই আচরণের নতুন বিধিমালা, জিম ক্রো জীবন যাপনের নতুন আইন-কানুন। ধরে নেয়া হতো যে আমরা কৃষ্ণাঙ্গ বালকরা ওদের নগ্নতাকে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করতাম, একটা নীল ফুলদানি কিংবা একটা লাল কার্পেট দেখলে আমরা যতখানি চমকে উঠতাম না। আমাদের উপস্থিতি তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র লজ্জার ভাব জাগাতো না, কারণ আমরা কালোরা ওদের চোখে মানুষ বলে গণ্য হতাম না। ওরা একা থাকলে আমি কখনো কখনো চোরা চোখে ওদের দেখতাম কিন্তু খদ্দের থাকলে আমি ওদের দিকে এক পলকও তাকাতাম না।

এক বিশালদেহী, বরফের মতো সাদা চামড়ার বারাঙ্গনা, হোটেলে আমার তলায় একটা ঘর নেয়।

এক রাতে কিছু জিনিসের জন্য ঘন্টা বাজালে আমি তার ঘরে যাই। একজন বলিষ্ঠ

মোটাসোটা লোকের সঙ্গে সে বিছানায় শুয়েছিল, উচ্ছল্লে উলঙ্গ এবং অনাচ্ছাদিত। মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করে বললো যে তার কিছু সুরা চাই। টাকা নেবার জন্য সে বিছানা থেকে নেমে হেলতে দুলতে টেবিলের ড্রয়ারের দিকে হেঁটে যায়। আমি অসচেতনভাবেই তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

শ্বেতাঙ্গ লোকটি তার কনুই-এর ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এই নিগার, কি দেখছো তুমি?

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের ফাঁকা দেয়ালের শত শত মাইল গভীরে দৃষ্টিপাত করে বললাম, কিছু না, স্যার।

যদি সুস্থ থাকতে চাও তাহলে তোমার চোখ যেখানে রাখার সেখানে রেখো, বুঝলে?

ইয়েস, স্যার।

হঠাৎ একটা সুযোগ এসে উপস্থিত না হলে চলে যাবার আগে পর্যন্ত আমাকে ওই হোটেলেই কাজ করতে হতো।

এক রাতে হোটেলের একটি ছোকরা ফিসফিস করে আমাকে জানালো যে স্থানীয় একমাত্র নিগ্রো চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহের জন্য একজন ছেলে দরকার, সে দরজায় দাঁড়িয়ে টিকেট নেবে। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি তো কখনো জেল খাটো নি, তাই না?

আমি বললাম, না, এখনো খাটি নি।

তাহলে কাজটা তুমি পাবে। আমিই নিতাম, কিন্তু আমি একবার ছ'মাস কারাবাস করেছি, আর ওরা আমাকে চেনে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, চালাকিটা কোথায়?

সে বুঝিয়ে বললো, যে মেয়েটি টিকেট বিক্রি করে সে একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে। তুমি যদি চাকরিটা নাও তাহলে ভাল মাল-কড়ি পাবে।

আমি যদি চুরি করি তাহলে দ্রুত উত্তরাঞ্চলে চলে যাবার একটা সুযোগ পাবো; যদি একটু-আধটু সৎ হয়ে থাকি, দু'এক বোতল চোরাই মদ সরবরাহ করি, তাহলে এখানে আমার অবস্থানকে শুধু দীর্ঘায়িত করবো, ধরা পড়ার সম্ভাবনাকে বাড়াবো, ভুল কথাটি বলার বা ভুল কাজটি করার সম্ভাবনার সামনে নিজেকে তুলে ধরবো, আর তখন তার জন্য যে শাস্তি পাবো তার কথা চিন্তা করার সাহস পর্যন্ত আমার হয় না। অপরাধ করার প্রলোভন খুব জোরালো হয়ে ওঠে। আমি দ্রুত কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই, যা চোখের সামনে পড়ে তাই হাতিয়ে নেবো? বেশ কিছু টাকা জমাবো, তারপর পিটান দেবো। আমি জানতাম যে আমার আগে অন্যরা এ চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থকাম হয়েছে, কিন্তু আমার আশা হয় ভাগ্য হয়তো আমার প্রতি প্রসন্ন হবে।

ওই কাজটা পাওয়ার আমার সম্ভাবনা ছিল ভাল। চুরি কিংবা আইন ভঙ্গ করার আমার কোনো পূর্বতন রেকর্ড নাই। প্রেক্ষাগৃহের ইহুদি মালিকের কাছে গিয়ে আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিযুক্ত হয়ে যাই। পরদিন আমি কাজে হাজিরা দিই এবং টিকেট

নিতে শুরু করি। কর্তা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, দ্যাখো, তুমি আমার প্রতি সৎ থাকবে, আমিও তোমার প্রতি সৎ থাকবো। এই আস্তানায় এখন কে যে সৎ আর কে অসৎ তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু তুমি, তুমি যদি সৎ থাকো, তাহলে বাকি সবাইকে সৎ থাকতেই হবে। সব টিকেট তোমার হাতে দিয়ে যাবে। তুমি চুরি না করলে কেউ চুরি করতে পারবে না।

আমি তাকে আমার সততার প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমি কি করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে আমি আমার নিজের মধ্যে কোনো বিবেক-দংশন অনুভব করি না। ও সাদা, ও এবং ওর মতো মানুষরা আমার যে অবস্থা করেছে আমি কখনই ওর সে অবস্থা করতে পারবো না। কাজেই, আমি যুক্তি দাঁড় করাই, চুরি করে আমি আমার নীতিমালা ভঙ্গ করছি না, ভঙ্গ করছি ওর নীতিমালা। আমি অনুভব করি যে, সব কিছু তার অনুকূলে সাজানো হয়েছে এবং তার যে কোনো পরিকল্পনাই আমি বানচাল করি না কেন তা হবে যুক্তিসঙ্গত।

প্রথম দিন বিকাল বেলা নিগ্রো মেয়েটি তার টিকেট-ঘর থেকে আমাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করে। আমি বুঝতে পারি যে, ও আমার সব কিছু খুটিয়ে দেখে নিচ্ছে, স্থির করতে চেষ্টা করছে আমাকে তার দুর্নীতির কারবারে অংশীদার করাটা নিরাপদ হবে কিনা। প্রথম পদক্ষেপটা তার দিক থেকেই নেয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করি।

আমার কাজ ছিল খদ্দেরদের কাছ থেকে টিকেট নিয়ে প্রতিটি টিকেট একটা ধাতব পাত্রের মধ্যে ফেলে দেয়া। মাঝে-মাঝে কর্তা টিকেট-ঘরের জানালায় গিয়ে অবিক্রিত টিকেটের তাড়ার মধ্যে ক্রমিক নম্বর দেখে নিয়ে আমি পাত্রের মধ্যে শেষ যে টিকেটটা ফেলেছি তার নম্বরের সঙ্গে ওই নম্বরটা মিলিয়ে নিতেন। কর্তা কয়েকদিন এই সতর্ক পাহারাদারি চালিয়ে যান, তারপর রাস্তার ওপার থেকে আমার কাজের ওপর চোখ রাখতে শুরু করেন। এবং শেষে দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকতে লাগলেন।

শ্বেতাঙ্গ লোক দুটি আমাকে চশমার কারখানা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সময় আমার মধ্যে যে টানটান উত্তেজনা জেগে উঠেছিল এখন তা আবার আমার মধ্যে ফিরে আসে। আমি ইতিমধ্যে উত্তেজনা আত্মস্থ করতে শিখে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে এবং যন্ত্রণাদায়কভাবে যাবতীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা অন্যের সামনে প্রকাশ না করে, নিজের ভেতর ধারণ করার ক্ষমতা আমি অর্জন করি। এটা সত্য না হলে চুরির ধারণা এবং তার মধ্যে যে ঝুঁকি আছে, যে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা বোধ আছে, তার চিন্তাতেই আমি এতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়তাম যে ঠাণ্ডা মাথায় কোনো পরিকল্পনা করাই আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, আমি এতো ভয় পেতাম যে, আদৌ কোনো রকম চুরি করাই আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু আমার ভেতরকার প্রতিরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমি অনুভব করি যে আবেগগত দিক থেকে এই পৃথিবী আমাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আমাকে জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলির বাইরে বাঁচতে বাধ্য করছে, আমার মধ্যে প্রতিদিন একটা কিছুর বিরুদ্ধে স্বভাব বহির্ভূত প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে এবং এখন

আমি তাদের মতো বাঁচতে, তাদের মতো সব দিকে নজর রাখতে এবং অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

একদিন রাতে আমি কাজের একটা ক্যাফেতে বাসের অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় একজন অচেনা নিগ্রো ভেতরে ঢুকে আমার পাশে এসে বসলো। সে বললো, হ্যালো, রিচার্ড।

আমি বললাম, হ্যালো। আমার মনে হচ্ছে আমি আপনাকে চিনি না।

লোকটি সহাস্যে বললো, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।

ও কি কর্তার কোনো গুপ্তচর? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন করে চেনেন?

যে মেয়েটি ছবিঘরে টিকেট বিক্রি করে তার নাম উল্লেখ করে ও বললো, আমি টেল-এর বন্ধু।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। ও কি সত্য কথা বলছে? নাকি ও কর্তার পক্ষ হয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে? আমি এর মধ্যেই একজন অপরাধীর মতো চিন্তা ও আচরণ করতে শুরু করেছি, সবাইকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি।

ও বললো, আজ রাত থেকে আমরা শুরু করবো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি? তখনো ও কী বিষয়ে কথা বলছে তা আমি বুঝতে পারছি বলে স্বীকার করি না।

ও বললো, ভয় পেও না। কর্তা তোমাকে বিশ্বাস করেন। উনি ওর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। একজন ওর ওপর নজর রাখছে, তিনি ছবিঘরের দিকে রওয়ানা হবার সঙ্গে সঙ্গে সে ফোন করে আমাদের জানিয়ে দেবে।

আমি আর খেতে পারি না। প্লেটের ওপর আমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকে। আমার বগলের নিচ থেকে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়তে শুরু করে। ও নিচু গলায় সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করে– কাজটা হবে এভাবে। একটা লোক তোমার কাছে এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনার কাছে কি দেশলাই হবে? তখন তুমি বাক্স থেকে তুলে পাঁচটা টিকেট ওর হাতে দেবে, বুঝলে? কখন তুলে ধরতে হবে আমরা তোমাকে তার ইশারা দেবো। লোকটি টিকেটগুলি টেলকে দেবে, তখন সে গুলি আবার দ্বিতীয় বারের মতো বিক্রি করবে। যখন ভিড়ের সময় অনেক লোক টিকেট কিনবে তখন ও এ কাজটা করবে। বুঝতে পারছো?

আমি কোনো উত্তর দিই না। কিন্তু আমি এটা বুঝি যে ধরা পড়লে আমি শেকল-বাঁধা কয়েদি হয়ে যাবো। কিন্তু আমার জীবন কি ইতিমধ্যে একজন শেকল-বাঁধা কয়েদির জীবনে পরিণত হয় নি? সত্যিকার অর্থে, আমার কী হারাবার আছে?

লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, কি, তুমি আছো আমাদের সঙ্গে?

তখনো আমি কোনো উত্তর দিই না। সে উঠে দাঁড়ায়, আমার পিঠে একটা চাপড় দেয়, তারপর চলে যায়। প্রেক্ষাগৃহে ফিরে যাবার সময় আমি কাঁপতে থাকি। যে কোনো

কিছু ঘটে যেতে পারে, কিন্তু আমি তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন মাটিতে পড়েছিলাম আর ওই শ্বেতাঙ্গ লোকগুলি আমার ওপর ভিড় থেকে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল যে আমি খুব ভাগ্যবান একটা নিগার তখন কি আমার অনুরূপ অনুভূতি হয় নি? সেদিন সকালে চশমার কোম্পানি আমার চাকরি খুইয়ে আমি যখন হাঁটতে বাড়ি ফিরি তখন কি আমার অনুরূপ অনুভূতি হয় নি? সেদিন আমি যখন হোটেলের হলপথ দিয়ে হেঁটে যাই আর নৈশ-প্রহরী আমার পিঠের ওপর তার পিস্তল তাক করে ধরে রাখে তখন কি আমার অনুরূপ অনুভূতি হয় নি? ইতিপূর্বে লক্ষবার কি আমি এটা অনুভব করি নি? আমি ভেজা চিটচিটে আঙুলে টিকেটগুলি তুলে নিই। আমি অপেক্ষা করি। আমি জুয়া খেলছিলাম, একদিকে মুক্তি অন্যদিকে শেকল-বাঁধা কয়েদির দল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমি রাস্তার এদিক-ওদিক দু'দিক দেখি, কর্তাকে কোথাও দেখা যায় না। এটা কি একটা ফাঁদ? সে-ক্ষেত্রে আমি পরিবারের মুখে চুনকালি মেখে দেবো। সবাই কি তখন বলবে না যে, তারা জানতো যে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে এই পথেই টেনে আনবে? আমার এই অবশ্যম্ভাবী নিয়তি সম্পর্কে তারা কি অতীত ঘেঁটে নানা তথ্যসূত্র টেনে বের করবে না?

ক্যাফেতে দেখা হওয়া লোকটি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে আমার হাতে একটা টিকেট দিয়ে ফিসফিস করে বললো, এখন বক্স-অফিসে অনেক লোকের ভিড়।

পাঁচটা না, দশটা টিকেট বাঁচিয়ে রাখো। এই যে, এটা দিয়ে শুরু করো।

আমি মনে মনে বললাম, তাহলে শুরু হয়ে গেল। ও আমার হাতে টিকেটটা দিয়ে বসে পড়ে। পর্দার গায়ে চলন্ত ছায়াগুলি দেখতে থাকে। আমি টিকেটটা হাতে ধরে থাকি। আমার শরীর টানটান হয়ে ওঠে, যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে আমার সমস্ত শরীর, কিন্তু এতেও আমি অভ্যস্ত ছিলাম। আমার মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্য দিয়ে সময় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়। আমার মাংসপেশিগুলি টনটন করে ওঠে। আমি আবিষ্কার করি যে, অপরাধ করা একটা তীব্র যন্ত্রণা। লোকজন ভিড় করে এগিয়ে আসে, আমাকে আরো টিকেট দেয়। আমি তার মধ্য থেকে দশটা টিকিট আমার আর্দ্র করতলে চেপে ধরে রাখি। ভিড় কমতেই একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে তার মুখের পাশ দিয়ে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, দেশলাই হবে?

আমি আস্তে আস্তে টিকেটগুলি ওর হাতে দিই। সে বেরিয়ে যায়। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে ওর ওপর চোখ রাখি। ও টিকেট-ঘরে গিয়ে পয়সা রাখে। আমি ওকে মেয়েটির হাতে আলগোছে টিকেটগুলি হস্তান্তর করতে দেখি। হ্যাঁ, ছেলেটি সৎ। মেয়েটি আমাকে একটা দ্রুত হাসি উপহার দিয়ে ভেতরে ফিরে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে অন্য খদ্দেররা আমার হাতে ওই টিকেটগুলি আবার দেয়।

আমরা এক সপ্তাহ ধরে এটা চালিয়ে যাই। টাকাটা চার ভাগে ভাগ করার পর আমি পঞ্চাশ ডলার পাই। মুক্তি এখন প্রায় আমার হাতের মুঠোয়। আর ঝুঁকি নেয়া কি আমার

উচিত হবে? আমি টেল-এর বন্ধুর কাছে হালকাভাবে একটি ইঙ্গিত দিই, আমার পক্ষে বোধ হয় এখন এটা বাদ দেয়াই ঠিক হবে। ও ভীষণ রেগে যায়। আমি তাড়াতাড়ি কাজটা চালিয়ে যেতে রাজি হই। আমার ভয় হয় কেউ হয়তো প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাকে ধরিয়ে দেবে, কিংবা অন্য কোনোভাবে আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে আমার জায়গায় অধিকতর নমনীয় একটি ছেলেকে কাজে লাগাবে। আমি এখন কাজ করছি অতি সতর্ক ও চাপা মানুষদের সঙ্গে। আমাকেও ওই রকম হতে হবে।

আরো এক সপ্তাহ কেটে যায়। একদিন গভীর রাতে আমি স্থির করি যে, এটাই শেষ সপ্তাহ। প্রতিবেশীর বাড়ির পিস্তল আর কলেজের গুদামঘরে রাখা ফলের টিনগুলির কথা আমার মনে জেগে ওঠে। ওই সব চুরি করে যদি বিক্রি করি তাহলে আমি মেক্সিকো গিয়ে ওই টাকা দিয়ে কিছুদিন চলতে পারবো। তারপর চাকরি যোগাড় করে, কাজ করে, টাকা জমিয়ে আমি সেখান থেকে উত্তরে চলে যাবো। আমি চুপিচুপি আমার বিছানা থেকে উঠে পড়ি। প্রতিবেশীর বাড়িতে কেউ নেই। আমি চারিদিকে তাকাই। সব শান্ত ও নীরব। আমার বুক ধকধক করে। এতো জোরে যে ব্যথা করে। আমি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে একটা জানালা খুলে ভেতরে ঢুকে পিস্তলটা তুলে নিই। আমি সেটা আমার জামার নিচে ঢুকিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। ওটা দেখার জন্য যখন বের করি তখন দেখি যে ওটা ঘামে ভিজে গেছে। আমি একটা ছদ্ম নাম ব্যবহার করে পিস্তলটা বন্ধক রাখি।

পরের রাতে আমি দুটি সঙ্গী ছেলে যোগাড় করি। আমি জানতাম যে তারা উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। আমরা দরজা ভেঙে কলেজের গুদামঘরে ঢুকি, টিনের পর টিন সংরক্ষিত ফলের সিরাপ সরিয়ে ফেলি, তারপর রেস্তোরাঁগুলিতে সে সব বিক্রি করি।

ইতিমধ্যে আমি জামাকাপড়, জুতা, আর একটা স্যুটকেস কিনি। এই সব আমি বাড়িতে লুকিয়ে রাখি। শনিবার রাত আসে। আমি কর্তাকে খবর দিই যে আমি অসুস্থ। টম মামা উপরে, নানী আর অ্যাডি খালা গির্জায়। আমার ভাই ঘুমাচ্ছে। মা লেলচেয়ারে বসে আপন মনে গুনগুন করে গান গাইছেন। আমি আমার স্যুটকেস গুছিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে অস্ফুট গলায় বলি, মা, আমি চলে যাচ্ছি।

মা বাধা দিয়ে ওঠেন, ওহ্, না।

আমাকে যেতেই হবে, মা। এভাবে আমি বাঁচবো না।

কোনো খারাপ কাজ করে পালিয়ে যাচ্ছো না তো তুমি?

আমি বললাম, আমি তোমার জন্য লোক পাঠাবো, মা। তুমি ভেবো না, আমি ঠিক থাকবো।

নিজের দিকে খেয়াল রাখিস, বাবা। আর তাড়াতাড়ি লোক পাঠাস। আমি এখানে সুখে নেই।

মা, এই এতোগুলি বছরের জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমার কিছু করার

উপায় ছিল না।

আমি ওঁকে চুমু খাই আর মা কাঁদেন।

শান্ত হও, মা। আমি ঠিক থাকবো। আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই, সিকি মাইল পথ হেঁটে রেল-লাইনের কাছে যাই। এতক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমি রেল-লাইন পেরিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যাই। স্টেশনে যখন পৌঁছি তখন আমি ভিজে চুপচুপ। আমি আমার টিকেট কিনে ব্লকের যে কোণায় ছবিঘরটা অবস্থিত সেদিকে ছুটে যাই। হ্যাঁ, কর্তাকে দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজেই টিকেট দিচ্ছিলেন। আমি স্টেশনে ফিরে গিয়ে আমার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করি। আমি ভিড়ের উপর সাবধানী চোখ রাখি।

এক ঘন্টা কেটে গেছে। আমি এখন একটা জিম ক্রো কামরায় বসে আছি, গাড়ি ছুটে চলেছে উত্তরের পানে। যেখানে আমি একটু কম আতঙ্কের মধ্যে বাস করতে পারবো। আমার ভ্রমণ যাত্রার প্রথম পর্বে গাড়ি তখন সেই দিকে ছুটে চলেছে। মাসের পর মাস আমি এতোদিন যে বোঝা বহন করেছি এখন তা কিছুটা অন্তর্হিত হয়। আমার গাল খুসখুস করে, আমি চুলকে দিই, সেখানে দেখি অশ্রু জল। ওই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করি যে, অপরাধের সঙ্গী হলো যন্ত্রণা। আমার আশা, ওই যন্ত্রণা আমি আর কখনো যেন অনুভব না করি। আর যে কাজ আমাকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে, আমার জন্য তা হলো এই সত্য যে, অপরাধ তার নিজের মধ্যেই বহন করে তার শাস্তি।

তো, আমি আপন মনে বলি, জীবনটা তো আমার, এখন দেখা যাক সে-জীবন নিয়ে আমি কি করি...।

একাদশ অধ্যায়

আমি মেক্সিকো এসে পৌঁছাই ১৯২৫ সালের নভেম্বরের এক ঠান্ডা সকালে। শীতের রোদের মধ্য দিয়ে আমার স্যুটকেস টানতে টানতে আমি শস্তু জনশূন্য ফুটপাত ধরে হেঁটে চলি। আমি বিল স্ট্রিটে গিয়ে পড়ি। আমি শুনেছিলাম যে এটা ছিল বিপজ্জনক রাস্তা, পকেটমার, বেশ্যা, খুনে ডাকাত আর কৃষ্ণাঙ্গ জুয়াচোরে পূর্ণ। কয়েক ব্লক হাঁটার পর আমি একটা বড় কাঠের বাড়ির জানালায় লেখা দেখতে পাই : ঘর। আমি এবার আস্তে আস্তে হাঁটি, মনে মনে ভাবি, এখানে কি থাকার জন্য ঘর ভাড়া নেয়া হয়, নাকি এটা বারবণিতাদের আস্তানা। ছোট শহরের ছেলেরা প্রথম বড় শহরে এসে যে সব নির্বোধ ভুল করে আমি তার কথা শুনেছিলাম, আর আমি তাই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে চাই। আমি বাড়িটার সামনে দিয়ে ব্লকের শেষ পর্যন্ত যাই, ঘুরি, তারপর আবার ধীরে ধীরে তার সামনে দিয়ে হাঁটতে থাকি। তো, বাড়িটা যাই হোক না কেন, নিশ্চিতভাবে ভাল একটা জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত দু'একটা দিন আমি এখানেই থাকবো। আমার স্যুটকেসে দামি কিছুই নেই। আমার টাকা আমি আমার গায়ের সঙ্গে বেঁধে রেখেছি। কেউ সে টাকা হাতিয়ে নিতে চাইলে আগে আমাকে খুন করতে হবে।

আমি ছোট সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঠিক যখন ঘন্টা বাজাতে যাবো তখন দেখি যে একজন বড়-সড় বর্ণসঙ্কর রমণী জানালা দিয়ে স্থির চোখে আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি মনে মনে বললাম, ওহ, ঈশ্বর, এ যে দেখছি বেশ্যালয়। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। রমণী মৃদু হাস্য করে। আমি ঘুরে নিচে নেমে যাই। রাস্তার কাছে আসতেই আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে জানালার কাছ থেকে রমণীর মুখ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত পরেই তাকে দেখা গেল দরজার মুখে।

ও আমাকে ডাকলো, এদিকে আসো, ছেলে!

আমি ইতস্ততঃ করি। গড ড্যাম, শুরুতেই এক বারবণিতার সামনে পড়ে গেলাম!

ও উচ্চ কণ্ঠে হুকুম করলো, এদিকে আসো ছেলে, আমি তোমাকে মার লাগাবো না।

আমি ঘুরে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে যাই।

ও বললো, ভেতরে আসো।

আমি এক মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করে একটা ঈষদুষ্ণ হলঘরে পা দিই। রমণী মৃদু হেসে একটা আলো জ্বেলে দিয়ে আমাকে আপাদমস্তক দেখে বললো, কি ব্যাপার তুমি এই বাড়ির সামনে দিয়ে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করছিলে কেন?

আমি বললাম, আমি একটা ঘরের খোঁজ করছিলাম।

সাইনবোর্ডটা দেখো নি তুমি?

দেখেছিলাম, ম্যাম।

তাহলে ভেতরে ঢোকো নি কেন?

ইয়ে... জানি না। আমি এখানে নতুন এসেছি...

লর্ড, সেটা কি আমি বুঝতে পারি না? রমণী ধপ করে একটা চেয়ারে বসে বাধভাঙা হাসিতে ফেটে পড়ে, ওই হাসির তোড়ে মনে হয় তার বিশালবক্ষ যেন স্থানচ্যুত হয়ে উড়ে চলে যাবে। ও হাঁফাতে হাঁফাতে নিঃশ্বাস নেয়, খিকখিক করে হাসে, তারপর শান্ত হয়ে বলে, আমি হলাম মিসেস মস।

আমি নিজের নাম বললাম।

একটুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে ও বললো, বেশ সুন্দর নাম।

আমি চোখ পিটপিট করি। এ কোন জায়গায় এসে পড়লাম আমি? এই রমণীই বা কে? আমি আমার স্যুটকেস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াই, চলে যাবার জন্য তৈরি হই।

রমণী শেষে বললো, শোনো, বাছা, এটা বেশ্যা বাড়ি নয়। বিল স্ট্রিট সম্পর্কে মানুষের বহু আজগুবি ধারণা আছে। আমি এই বাড়িটার মালিক। এটা আমার বাড়ি। আমি চার্চ-সদস্য। আমার একটি সুতেরো বছর বয়সের মেয়ে আছে, আর ও যেন সৎ পথে চলে আমি সে বিষয়ে রীতিমতো কড়া নজর রাখি। বসো, বাছা, এখানে তুমি ভাল থাকবে, কোনো বিপদে পড়বে না তুমি।

আমি সশব্দে হেসে উঠে আসন গ্রহণ করি।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলো, তোমার বাড়ি কোথায়?

জ্যাকসন, মিসিসিপি।

ওখানকার ছেলে হিসেবে তো তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, জ্যাকসনে বুদ্ধিমান ছেলে আছে।

যদি থাকে তাহলে আমার এখনো দেখার বাকি আছে। ওদের বেশির ভাগই কথা বলতে পারে না। তারা শুধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে দেয়, কী যে বলতে চায় সেটা অনুমান করে নিতে হয়।

এতক্ষণে আমার অস্বস্তি কেটে যায়। আমার ওকে ভাল লাগে।

মহিলা সহজ খোলামেলা মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বকবক করে চলে, যেন আমি তার বহুদিনের পরিচিত কেউ। মহিলা বললো, আমরা কিছু সাহায্য হওয়ার জন্য ভাড়াটে নিই। আমরা সহজ সাধারণ মানুষ। ইচ্ছা করলে তুমি এটাকে নিজের বাড়ি ভাবতে পারো। ভাড়া তিন ডলার।

আমি বললাম, একটু বেশি মনে হয়।

তো, তুমি কোনো একটা কাজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আড়াই ডলার দিও।

আমি রাজি হই। তিনি আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দেন। আমি আমার সুটকেস মাটিতে নামিয়ে রাখি। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসো নি তো?

আমি চমকে উঠি। কেমন করে বুঝলেন আপনি?

শোনো ছেলে, তোমার মন একটা খোলা বই-এর মতো। আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। আশপাশের ছোট শহরগুলি থেকে বহু ছেলে পালিয়ে মেম্ফিসে এসে হাজির হয়। তারা ভাবে এখানে বুঝি বেশ সহজে চালিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু তা হয় না।

তিনি তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি মদ খাও?

ওহ, না, ম্যাম।

আমি কোনো খারাপ কিছু বলতে চাই নি, বাছা। শুধু জানতে চেয়েছি। ইচ্ছা করলে তুমি এখানে মদ্য পান করতে পারো, শুধু বেহাল হয়ে যেও না। তোমার বান্ধবীকেও ঘরে নিয়ে আসতে পারবে। যা মন চায় তাই করতে পারবে, শুধু ভদ্রতা ও সুরুচি বজায় করতে হবে।

আমি খাটের এক প্রান্তে বসে অবাক হয়ে বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। মেম্ফিসের কুখ্যাত বিল স্ট্রিটে আমি দেখা পেলাম আমার জীবনে আমি যতো মানুষ দেখেছি তাদের মধ্যে সব চাইতে উষ্ণ-হৃদয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষটির। আমি অবিশ্বার করলাম যে, সব মানুষই ক্ষুদ্রমনা নয়, সবাই অন্যকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায় না, সবাই আমার পরিবারের সদস্যদের মতো গোঁড়া ধর্মান্ধ নয়।

মহিলা বললেন, চার্চ থেকে ফেরার পর তুমি আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে পারো।

থ্যাঙ্ক ইউ, তাই খাবো আমি, সানন্দে।

আমাদের সঙ্গে চার্চে যাবে নাকি?

আমি ইতস্ততঃ করি, তো...

ওহ, তুমি তো হয়রান হয়ে গেছো। ও দরজা বন্ধ করে দেয়।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্নের বাস্তব সুখানুভূতিতে আপ্লুত হই। একটা অচেনা শহরের সম্ভাব্য নিঃসঙ্গতার ভয়ে আমি সব সময় মনে মনে সিটিয়ে থাকতাম, আর এখন সেখানে আমি এমন একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম যেখানে বাস করে সহৃদয় মানুষ। আমি পুরোপুরি প্রশমিত হয়ে তন্দ্রার কোলে ঢুলে পড়ি। অনেক অনেক রাত আমি ভাল করে ঘুমাই নি।

পরে হঠাৎ চমকে উঠে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অপরাধ জগতে হানা দেবার সময় আমার মধ্যে যে ভয় আর টানটান উত্তেজনা জেগে উঠেছিল তা আমি আবার অনুভব করি। তো, সে সব এখন অতীতের কথা। আবার আমি নতুন করে শুরু করতে চাই না।

আমি অন্য কিছু চাই, আমি মানবিক হতে চাই, অর্থপূর্ণ কোনো একটা কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে চাই। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কাজ যোগাড় করতে হবে।

সেদিন শেষ বিকালের দিকে মিসেস মস আমাকে তাদের সঙ্গে খেতে ডাকলেন এবং তার মেয়ে বেস-এর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। মেয়েটিকে আমার হাথকফিকভারে পছন্দ হয়। অন্তরঙ্গতা, সাদাসিধে, মিষ্টি, আর বাদামি চুল। মিসেস মস তাঁর স্বামীর হয়ে ক্ষমা চাইলেন, উনি তখনো তাঁর কর্মস্থলে। কিন্তু মহিলা কেন আমার সঙ্গে এতো সদয় ব্যবহার করছেন? ব্যাপারটা আমাকে আড়ষ্টতায় করে ফেলে। আমরা যখন খাওয়া শেষে পিঠি থাচ্ছিলাম তখন বেস বলে উঠলো, মা তোমার কথা আমাকে সব বলেছে।

আমি বললাম, বলার মতো বিশেষ কিছু তো নেই।

বেস খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, মা বলেছেন তুমি বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলে, ভেতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছিলে না। এ জায়গাটাকে তুমি কি ভেবেছিলে?

আমি মাথা নিচু করে হাসি। মিসেস মস প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়েন, তারপর ঘর ছেড়ে চলে যান।

বেস বললো, মা আমাকে বলেছেন যে, রাস্তার ওপর সুটকেস হাতে তোমাকে দেখেই তিনি বুঝেছেন যে ছেলেটা থাকার জন্য একটা ভাল পরিচ্ছন্ন জায়গা খুঁজছে। মা মানুষের মনোভাব খুব ভাল বুঝতে পারেন।

আমি বেসকে থালা-বাসন ধুতে সাহায্য করতে করতে বললাম, তাই তো মনে হয়।

বেস বললো, তোমার যখন ইচ্ছা তখনই তুমি আমাদের সাথে খেতে পারো।

থ্যাঙ্কস, কিন্তু তা তো হয় না।

কিন্তু কেন হয় না? আমাদের যথেষ্ট খাবার থাকে।

আমি তা জানি, কিন্তু একটা মানুষের উচিত তার নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থ করা।

বেস আত্মসন্তুষ্টির সুরে বললো, মা বলেছিলেন তুমি ওই রকমই হবে।

মিসেস মস রান্না ঘরে ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, বেস শিগগিরই বিয়ে করছে।

আমি বললাম, কনগ্র্যাচুলেশনস। ভাগ্যবান পুরুষটি কে?

বেস বললো, ওহ্, তেমন কাউকে আমি এখনো পাই নি।

আমি বিভ্রান্ত বোধ করি। মিসেস মস হাসতে হাসতে কনুই দিয়ে আমার গায়ে আলতোভাবে ঠেলা দিয়ে বললেন, আমি মনে করি মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে করা উচিত। আর, বেস যদি তোমার মতো একটি ভাল ছেলেকে পায়, রিচার্ড, তাহলে...।

বেস বাসন মোছার কাপড়ে মুখ লুকিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, মা!

মিসেস মস বললেন, আমি ঠিকই বলছি। তুমি কুলে বেসের মুখ ঢুকা শাড়া দিলার ছেলেরাদের পেছনে ঘোরো, রিচার্ড তাদের চাইতে অনেক ভাল।

আমি হা করে একবার তাঁর দিকে একবার বেসের দিকে তাকাই। এদের হয়েছে কি? আমাকে ওরা ভাল করে চেনেনই না। আমি এ বাড়িতে পা দিয়েছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

মিসেস মস বললেন, আজ সকালে এই ছেলেকে রাস্তার উপরে দেখার সাথে সাথে আমি মনে মনে বলেছি, বেসের জন্য ঠিক এই রকম ছেলেই চাই।

বেস আমার কাছে এসে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধের ওপর তার মাথা ন্যস্ত করে। আমি হতভম্ব হয়ে যাই। কেমন করে ও এ রকম আচরণ করতে পারছে।

বেস বিব্রত হবার মতো ভঙ্গি করে তার মাকে লক্ষ্য করে বললো, মা, এ রকম করো না।

মিসেস মস বললেন, আমি ভাবনা চিন্তা করেই বলছি। রিচার্ড, এ বাড়িটা কার হাতে গিয়ে পড়বে তা নিয়ে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় আছি। আমি আর এ পৃথিবীতে খুব বেশিদিন নেই।

আমি আন্তরিক সঙ্গে বললাম, তাকে ভালবাসবে সে রকম একটি ছেলেকে বেস পাবে।

মিসেস মস মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, সে ব্যাপারে আমি এতেমন নিশ্চিত নই।

বেস খিলখিল করে হেসে ওঠে, তারপর নিজের দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মিসেস মস আমার কাছে এসে প্রত্যয়ী কণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েরা খুব মজার জিনিস। ওদের পোষ মানাতে হয়। ঠিক বন্য প্রাণীর মতো।

আমি কাপড় নিয়ে টেবিলটা মুছি। মরীয়া হয়ে ভাবতে থাকি, এই পরিবারের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে চাই না আমি।

মিসেস মস হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেসকে তোমার ভাল লাগে, রিচার্ড?

আমি চোখ বড় করে তাঁর দিকে তাকাই। নিজের কানকে আমার বিশ্বাস হয় না। আমি ইতস্ততঃ করে বললাম, মাত্র ঘণ্টা দুই হলো আমি এ বাড়িতে এসেছি। বেস তো চমৎকার মেয়ে।

তিনি জোর দিয়ে বললেন, আমি জিজ্ঞাস করছি তুমি ওকে পছন্দ করো কিনা, তুমি ওকে ভালবাসতে পারবে কিনা।

আমি স্থির দৃষ্টিতে মিসেস মসকে লক্ষ্য করি। বেস-এর মধ্যে কি কোনো গোলমাল আছে? কেমন লোক এরা?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আপনারা আমাকে চেনেন না। তারপরই আমি তাঁর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই, আমি তো একটা চোর-জোচ্চোর বা ডাকাত হতে পারি, পারি না?

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি তোমাকে চিনি, বাবা।

আমি মনে মনে বলি, ওহ, ঈশ্বর! না, আমি চলে যাবো এখানে থেকে।

মিসেস মস বললেন, তুমি বেসের সঙ্গে সামনের দিকে গিয়ে বসো।

আমি বললাম, দেখুন, আমি একটা গরিব হাভাতে। আমার কিছু নেই।

মিসেস মস বললেন, তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। টাকাই সব কিছু নয়। তোমার মধ্যে একটা সুন্দর ধর্মপ্রাণ ক্রিশ্চিয়ান হৃদয় আছে, সবার এ জিনিস থাকে না।

আমার সর্বাঙ্গ কুঁচকে ওঠে। আমি আমার মাথা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিই। তাঁর ছলাকলাহীন সারল্য আমাকে অভিভূত করে। আমার মনে হয় আমাকে যেন কোনো কিছুর দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

মিসেস মস বললেন, আমি বিশ বছর কাজ করে নিজের টাকায় এই বাড়িটা কিনেছি। আমি যদি জেনে যাই যে বেস তোমার মতো একজন স্বামী পেয়েছে আমি তা হলে মৃত্যুর সময় শান্তি পাবো।

সামনের ঘর থেকে বেসের প্রতিবাদ করা হাসির শব্দ ভেসে আসে, ওহ মা!

আমি ঈর্ষাদুঃখ, ঘরোয়া, আরামদায়ক সামনের ঘরে গিয়ে একটা সোফায় বসি। বেস একটা বেঞ্চে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। এ মেয়ের সঙ্গে কেমন আচরণ করবো আমি? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনো কিছুর মধ্যে জড়াতে চাই না, আবার কারো অনুভূতিতে আঘাত দিতেও আমার ইচ্ছা করে না।

বেস বললো, তুমি কি এখানে আমার পাশে এসে বসতে চাও না?

আমি উঠে তার পাশে গিয়ে বসি। আমাদের কেউ অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা বলি না। তারপর বেস বললো, তুমি আর আমি সমবয়সী। আমার বয়স সতেরো বছর।

সংলাপ চালাবার উদ্দেশ্যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি স্কুলে পড়ো?

হ্যাঁ, আমার বই দেখবে?

সে উঠে গিয়ে তার স্কুলের বই এনে আমাকে দেখায়। আমি দেখি যে ও পঞ্চম গ্রেড-এ পড়ে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বেস বললো, আমি লেখাপড়ায় ভাল না, কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই।

আমি সাবধানে বললাম, কিন্তু পড়ালেখাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ও জোর দিয়ে বললো, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ভালবাসা।

আমি মনে মনে ভাবি, ওর কি মাথা খারাপ? আমি এতো কাল যা দেখেছি ও শুনেছি এখানে মা আর মেয়ের ব্যবহার দেখলাম তার উল্টো।

মিসেস মস ঘরে এসে ঢুকলেন। আমি ওদের হাত থেকে পালাবার জন্য বললাম, আমি একটু বাইরে যাই, কোনো কাজ পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখি।

মিসেস মস বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, রোববারে! সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

আমি বললাম, আজ রাতে আমি অন্তত পথঘাটগুলির সঙ্গে যে পরিচিত হতে পারি।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মিসেস মস বললেন, সেটা অবশ্য ঠিক। দেখো তো, বেস? এই ছেলে মাথা খাটায়।

আমি অপ্রস্তুত বোধ করি, বিব্রত বোধ করি, আমার মনে হয় আমার কিছু বলা উচিত। আমি বললাম, বেস, তুমি যদি চাও আমি সানন্দে তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

বেস সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললো, পারবে?

আমি বললাম, গত বছর স্কুলে আমি ক্লাসগুলি দেখাশোনা করেছি।

মিসেস মস মধুঝরা কণ্ঠে বললেন, কী চমৎকার, তাই না?

আমি আমার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি। আমি কি রকম পুরে এসে পড়েছি তার রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হই। ওরা যে ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্তরিক সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। ওরা যখন জানতে পারবে যে আমার জীবন ওদের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে তখন কি ভীষণ রেগে যাবে? ওই পরিস্থিতি আমি কেমন করে এড়াবো? সতেরো বছরের একটি মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে পরম ব্যগ্র। এ অবস্থায় আমার পক্ষে এখানে থাকা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আমার মধ্যে কি দেখে ওরা আমার প্রতি এই রকম আচরণ করছে? আমার জামা-কাপড় ভাল না। সত্য বটে যে আমার আচার-ব্যবহার ভাল। এই আচার-ব্যবহার আমার মজ্জার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়িতে, স্কুলে, আমার কর্মস্থলে চড়-লাথি সহযোগে। কিন্তু ভাল আচার-ব্যবহার যে কেউ আয়ত্ব করতে পারে! আমি পাঁচ বছরে আমার পরিবারের লোকজনকে যতখানি চিনেছি পাঁচ ঘন্টায় এ বাড়ির মানুষগুলিকে তার চাইতে বেশি চিনেছি।

পরে, আমি যখন বেস ও তার মায়ের চাষীসুলভ মনোবৃত্তি বুঝতে আরম্ভ করি, তখন আমি আমার জীবন আমার বাড়িতে শুধু যে শ্বেতাঙ্গদের জীবন নয়, নিগ্রোদের জীবন থেকেও আমাকে কতখানি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তা উপলব্ধি করি। বেস এবং তার মায়ের কাছে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তা উপার্জনের জন্য তারা মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা করতো না। তাদের মধ্যে কোনো উত্তেজনা ছিল না, প্রশমিত করা যায় না এমন কোনো ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল না, একটা কিছু পুনরুদ্ধার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো অস্থিরতা ছিল না। তাদের জীবনের প্রধান মূল্য ছিল সরল, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর জীবন যাপন করা এবং তাদের জাতির অন্য কারো মধ্যে ওই গুণাবলী লক্ষ্য করলে তারা তাকে সহজাতভাবে পছন্দ করতো, কাছে টেনে নিতো, কোনো প্রশ্ন করতো না। কিন্তু ও রকম সরল অকৃত্রিম আস্থা আমাকে হতবুদ্ধি করে ফেলে। এ অসম্ভব!

আমি বিল স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে মেফিসের প্রাণকেন্দ্রে এসে পৌছি। আমার দেহ ছিল শীর্ণ, ওভারকোটটা মলিন, আর বাতাসের প্রতিটি ঝাপ্টায় আমার রক্ত ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল। মেইন স্ট্রিটে একটা ক্যাফের জানালায় আমি একটা লেখা দেখলাম– থালা-বাসন ধোয়া মোছার জন্য লোক চাই। আমি ভেতরে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি এবং কাজে নিযুক্তি পেয়ে যাই। আগামীকাল রাতে আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে। বেতন প্রথম সপ্তাহে দশ ডলার, তারপর বারো ডলার।

আমি ওঁকে বললাম, আর কাউকে নেবেন না, আমি এসে যাবো।

ক্যাফেতে আমি দু'বার খাবার পাবো। কিন্তু দিনের বেলায় কি খাবো? আমি একটা দোকানে গিয়ে শুয়োরের মাংস আর সীমের একটা ছোট টিন এবং টিন খোলার একটা যন্ত্র কিনি। তো, ওই সমস্যার সমাধান হলো। ঘরভাড়া হিসাবে আমি দেবো সপ্তাহে আড়াই ডলার, বাকিটা শিকাগো যাবার টিকেটের জন্য আমি জমাবো। আমার সকল চিন্তা ও গতিবিধি দূরাগত আশাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

মিসেস মসকে আমি যখন আমার কাজ পাওয়ার কথা বললাম তখন তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি বললেন, দেখেছো, বেস! এই ছেলে এখানে তার প্রথম দিনেই একটা কাজ যোগাড় করে ফেলেছে। দেখো, এ জীবনে উন্নতি করবেই। এ অলসভাবে বসে বসে শুধু কথা বলে না। এ উদ্যমী।

বেস আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তাকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করছে। মিসেস মস উপরে শুতে চলে যান। আমার অস্বস্তি বোধ হতে থাকে।

বেস বললো, তোমার কোট দাও, তুলে রাখি।

ও আমার কোট হাতে নিতেই পকেটে টিনের অস্তিত্ব অনুভব করে। বেস জিজ্ঞাসা করলো, ওখানে কী?

আমি কোটটা ওর হাত থেকে নিতে নিতে অস্ফুট গলায় বললাম, ও কিছু না।

ও সীম আর টিন খোলার জিনিসটা বের করে আনে। মমতায় ওর দু'চোখ বিস্ফারিত হয়। ও প্রশ্ন করলো, তোমার ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খেয়ে নেবো আমরা।

আমি বললাম, ঠিক আছে, চলো।

বেস সিঁড়ির কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলো, মা!

আমি বুঝতে পারি আমি যে টিনের জিনিস দিয়ে আমার আহার-পর্ব শেষ করতে যাচ্ছিলাম ও তার মাকে সে কথা বলবে। আমি তাকে লক্ষ্য করে বলি, শোনো, ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিও না।

আমার মস্ত অন্তর লজ্জায় ভরে যায়। আমার মাংসপেশিগুলি টানটান হয়ে ওঠে। আমার ইচ্ছা হয় বেসকে এক ঘা লাগিয়ে দিই।

মিসেস মস তাঁর ঢোলা গাউন পরে নেমে আসেন।

বেস তাঁকে টিনটা দেখিয়ে বললো, দেখেছো, মা? বিছার্ড এটা তার ঘরে নিয়ে গিয়ে এটা দিয়েই তার খাওয়া শেষ করতে যাচ্ছিল।

মিসেস মস বললেন, হা, ঈশ্বর এ রকম করার তো কোনো দরকার নেই, বাবা। আমার বাড়িতে আমি তোমাকে টিনের খাবার খেতে দেবো না। খাওয়ার জন্য তোমার আমাকে কোনো টাকা দিতে হবে না। রান্নাঘরে যাবে আর খেয়ে নেবে। বাস।

আমি বললাম, আমি আমার টিনের খাবার ছড়িয়ে ফেলে আপনার ঘর নোংরা করবো না।

মিসেস মস বললেন, কথা সেটা নয়, বাবা। তুমি যখন আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসে এক সঙ্গে খেতে পারো তখন কেন একা একা টিনের খাবার খাবে?

আমি বললাম, আমি কারো ওপর কোনো বোঝা হতে চাই না।

মিসেস মস স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন, তারপর মাথা নিচু করে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি হতভম্ব হয়ে যাই। আমি কি করি কিংবা কেমনভাবে বেঁচে থাকি তা যে কারোর অশ্রুর উদ্রেক করতে পারে তা ছিল আমার কাছে অবিশ্বাস্য। তারপরই আমার লজ্জার অনুভূতি আমাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে।

মিসেস মস বললেন, তুমি কখনো বাড়ির জীবন উপভোগ করো নি। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়, বাছা।

আমি টানটান হয়ে যাই। ও কথা আমার ভাল লাগে নি। তিনি আমার ছেলেবেলার জীবনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, যে জায়গাটা ছিল ক্ষতযুক্ত। আমি চাই না যে কেউ তা দেখুক কিংবা সেখানে হাত দিক। আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমি ঠিকই আছি।

মিসেস মস মাথা নেড়ে তাঁর উপরের ঘরে উঠে গেলেন। আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার মনে হয়, পরিবারটি আমার ওপর বড় বেশি আধিপত্য বিস্তার করে ফেলছে। বেস আর আমি মুরগির মাংস খেলাম, কিন্তু আমার তেমন ক্ষুধা হচ্ছিল না। বেস আমার দিকে বিগলিত চোখে তাকিয়ে থাকে। আমরা দুজন সামনের ঘরে গিয়ে বসি।

ও আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলে, আমি বিয়ে করতে চাই।

আমি টানটান হয়ে অস্বস্তির সঙ্গে বলি, তার জন্য তুমি অনেক সময় পাবে, বেস।

আমি এখনই বিয়ে করতে চাই।

এ রকম কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে দেখা হয় নি, নিজের অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এতো সহজ, এতো সোজাসুজি ও প্রত্যক্ষ। সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা টেবিলের কাছে গিয়ে একটা চিরুনি হাতে তুলে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমি বড় বড় চোখ করে প্রথমে চিরুনির দিকে, তারপর তার দিকে তাকাই।

ও কোনো উত্তর দেয় না, মৃদু হেসে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, তারপর চিরুনিটা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করে। আমি দ্রুত মাথা সরিয়ে নিয়ে বলি, এ কি করছো তুমি?

ও হেসে ওঠে, তারপর আমার চুলে চিরুনি চালাতে থাকে। আমি পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

আমি বললাম, আমার চুল আঁচড়ানোর তো দরকার নেই কোনো।

আমি জানি।

কিন্তু তবুও সে আমার চুল সে আঁচড়াতে থাকে। আমি বললাম, দরকার না থাকলে তুমি আমার চুল আঁচড়াচ্ছো কেন?

কারণ, আমার ইচ্ছা করছে।

এর মানেটা কি?

ও আবার হাসে। আমি ওঠার চেষ্টা করি কিন্তু ও আমার বাহু আঁকড়ে ধরে আমাকে চেপে চেয়ারে বসিয়ে রাখে। তারপর বলে, সুন্দর চুল তোমার।

আমি বললাম, সাধারণ স্বাভাবিক নিগার চুল।

ও আবার বললো, সুন্দর চুল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তুমি আমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছো কেন?

ও বললো, তুমি জানো।

না, আমি জানি না।

ও আদুরে গলায় বললো, কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি।

সে কথা বলার এটাই তোমার পদ্ধতি নাকি?

ও বললো, এটা একটা প্রথা। তুমি জানো। তুমি শুধু শুধু আমায় বোকা বানাচ্ছো। সবাই এটা জানে কোনো মেয়ের কোনো ছেলেকে ভাল লাগলে সে তার চুল আঁচড়ে দেয়।

অশোনো, তোমার বয়স এখনও কম। নিজেকে একটা সুযোগ তো দাও।

ও প্রশ্ন করলো, তোমার কি আমাকে ভাল লাগে না?

আমি বললাম, অবশ্যই লাগে। আমরা বন্ধু।

ও নিঃশ্বাস ফেলে বললো, কিন্তু আমি বন্ধুত্বের চাইতে বেশি কিছু চাই।

তার সারল্যে আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার চেনা মেয়েরা ছিল কঠিন হৃদয়ের হিসাবী, যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। হোটেলে কিংবা স্কুলে। আমরা দুজনই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি।

এক সময় বেস জিজ্ঞাসা করলো, তোমার ঘরে ওগুলি কিসের বই?

আমি কোমল কিন্তু তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আমার ঘরে গিয়েছিলে নাকি?

চোখের পলক না ফেলে ও বললো, হ্যাঁ, গেছি। আমি তোমার স্যুটকেসের ভেতরটাও দেখেছি।

এ রকম মেয়েকে নিয়ে আমি কি করবো?

আমি কি হাবা, না ও হাবা? আমার মনে হয় ওর সঙ্গে রোম-মিলনে খুব সহজেই মিলিত হওয়া যায়। আমার ভেতরে আলোড়ন জেগে ওঠে। কিন্তু তারপর কি হবে? ভালবাসা আমার কাছে এতো দ্রুত এবং এতো সহজে ধরা দেয় না। আর ওই মেয়ে তো বিয়ের কথা বলছে। আমার অনুভূতি, আমার আশা, এসব সম্পর্কে কি আমি কখনো ওর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবো? ও কি আমার জীবনকে কখনো বুঝতে পারবে? দৈহিক মিলন ছাড়া ওর সঙ্গে আমি আর কিসে অংশ নিতে পারবো? ওই বা আমার সঙ্গে আর কিসে অংশ নিতে পারবে? কিন্তু আমি জানি যে এ সব নিয়ে সে একটুও ভাবে না। আমি ওকে ভালবাসি না। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না। পুরস্কার হিসাবে বাড়ি পাওয়াটা আমাকে একটুও আকর্ষণ করে না। তবু আমি তার পাশে গিয়ে বসি, আমার মাথা তার দেহের জন্য আকর্ষণ বাড়তে থাকে, গভীর হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি যদি ওকে গর্ভবতী করে তুলি? আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সে ওই আশঙ্কায় একটুও বিচলিত ছিল না। হয়তো সেটা তার পছন্দই হতো। আমি এমন একটা বাড়ি থেকে এসেছি যেখানে রাগের বসে কিংবা ধর্মীয় ভীতি ছাড়া কেউ তার আবেগ-অনুভূতির কথা কখনো প্রকাশ করতো না, যেখানে প্রতিটি সদস্য তার নিজের অন্ধকার জগতে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতো, আর এখন এই শিশুর হৃদয় থেকে বিচ্ছুরিত আলো– সত্যিই শিশু ছাড়া ও আর কিছুই ছিল না, আমার চোখ ধাঁধিয়ে ছিল।

ও আমার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমাকে চুমু খেলো। আমি মনে মনে বললাম, কী যন্ত্রণা। তো, ঠিক আছে যা হবার হবে, আমার কি? আমি ওকে চুমু খাই, আদর করি। ও ছিল উষ্ণ, আগ্রহী, শিশুসুলভ, নমনীয়। আমার গলা জড়িয়ে ধরে, আমার গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, ও প্রবল আবেগের সঙ্গে আলিঙ্গন করলো। আমি মনে মনে ভাবি, ওর বয়স কতো?

আমি ফিসফিস করে বললাম, তোমার মা কি বলবেন?

মা ও ঘরে ঘুমাচ্ছেন।

কিন্তু যদি আমাদের দেখে ফেলেন?

আমি তার পরোয়া করি না।

সত্যিই ওর মাথা খারাপ। আমার সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে তার ভিত্তিতেই যে ও এই মুহূর্তেই আমাকে বিয়ে করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি বললাম, চলো, আমার ঘরে যাই।

না, মা সেটা ভাল চোখে দেখবেন না।

বাহ, ও তাদের বাড়ির এই সামনের ঘরে আমি যা চাই তাই আমাকে করতে দেবে, কিন্তু আমি যদি আমার নিজের ঘরে কিছু করতে চাই তাহলে সেটা করতে দেবে না। এ তো পাগলামি, বদ্ধ পাগলামি!

আমার সন্দেহ হয়ে থাকে পাড়ায় সব ছেলেদের সঙ্গে ও শুয়েছে। ও ফিসফিস কণ্ঠে বললো, তুমি আমাকে ভালবাসো না?

আমি ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। প্রতি মুহূর্তে আমি ওর জীবনের ভয়ঙ্কর সারল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। তার কাছে তাই ছিল জীবনের অর্থ সরল এবং সরাসরি। শব্দের ওপর আমি যে অর্থ আরোপ করি ও সে অর্থে আরোপ করে না। ও বজ্রমুষ্ঠিতে আমার হাত আঁকড়ে ধরে। আমি ওর দিকে তাকাই। ওর অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না।

আমি তোমাকে ভালবাসি, ও বললো।

আমি বললাম, ও কথা বলো না। তারপরই কথাটা বলার জন্য আমি দুঃখবোধ করি।

ও আবার বললো, কিন্তু আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।

ওর কণ্ঠস্বর এতো স্পষ্ট বেজে ওঠে যে আমার আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দোহাই যিশুর, আমি মনে মনে বলি, এই মেয়ে অবিশ্বাস্য রকম সরল, অথচ এমন এক ধরনের প্রাণে ভরপুর যার সাক্ষাৎ আমি ইতিপূর্বে কখনো পাই নি। আমি কি ধরনের জীবন যাপন করেছি যার কারণে এই মেয়ের বাস্তবতা আমার কাছে এতো অদ্ভুত মনে হয়? আমি বসে বসে অ্যাডি খালার কথা ভাবি। তাঁর কঠোর মুখ, তাঁর কড়া প্রকৃতি, তাঁর সাবধানতা, তাঁর সংযম, ভাল এবং পবিত্র থাকার জন্য তার লড়াই-এর কথা আমার মনে জেগে ওঠে।

ও বললো, আমি খুব ভাল বউ হবো তোমার।

আমি ওর হাতের বন্ধন থেকে আমার হাত মুক্ত করে আনি। আমার ইচ্ছা হয় হেসে উঠতে, কিংবা ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে। আমার ওকে আঘাত করার কথা মনে হয় অথচ করতে ইচ্ছা করে না। আমি ওঠে দাঁড়াই। ওহ্, ঈশ্বর।... মেয়েটার তো মাথা খারাপ। আমি ওর কান্নার শব্দ শুনতে পাই। আমি মৃদু কণ্ঠে বললাম, শোনো, তুমি আমাকে চেনো না। আমরা পরস্পরকে আরেকটু ভাল করে চিনে নিই আগে।

তার চোখে বিভ্রান্তি চিহ্ন? পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। ভালবাসা ছিল তার কাছে এতটাই সরল। যেন মুহূর্তের মধ্যেই শুরু করা যায়, তেমনি মুহূর্তের মধ্যেই শেষ করে দেয়া যায়।

ও ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, তুমি আমাকে অপদার্থ মনে করো?

আমি ওকে স্পর্শ করার জন্য ওর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিই। আমি ওকে আমার জীবনের কথা, আমার অনুভূতির কথা, আমার দ্বিধা ও সন্দেহের কথা বলতে চাই,

কিন্তু ও এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র আবেগময় কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তারপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। কেউ যে আমাকে এতো সহজ ও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ হতে পারে, কোনো প্রশ্ন না করে, কোনো রকম ব্যক্তিগত লাভের কথা একটুও চিন্তা না করে, এরকম আমি কোনোদিন ঘটতেও ভাবি নি। সত্য কথা হলো, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও আমার পুরানো পরিবেশ নিজের মূল্য সম্পর্কে আমার মধ্যে যে ধারণা জন্ম দিয়েছিল আমি ধীরে ধীরে সে ধারণাই গ্রহণ করে নিই, কিন্তু এরকম পরিবেশ যে সম্ভব সে কথা আমি কখনো ভাবি নি। আমার জীবন হঠাৎ করে বদলে গিয়েছিল। মিসিসিপির কোনো খামারে যদি আমার বেসের সঙ্গে দেখা হতো তাহলে আমি তার আচরণ প্রত্যাশিত বলে মেনে নিতাম। কিন্তু মেমফিসে, বিল স্ট্রিটে, আলোর মধ্যে কেমন করে এ জাতীয় আশা, আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে পারে? আমার ইচ্ছা হয় বেসের কাছে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু কি বলবো বুঝে উঠতে পারি না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বেসের সরল নিষ্পাপ আশার কথা আমার স্মরণ হলে আমার কাছে যে শুয়োরের মাংস ও সীমের টিন আছে সে কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি খুশি হই। প্রাতঃরাশের টেবিলে তার মুখোমুখি হতে আমি চাই না। আমি বাইরে যাবার জন্য জামাকাপড় পরে নিই, গায়ে ওভারকোট ও মাথায় হ্যাটটি চাপাই, তারপর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে বিছানো প্রান্তে বসে থাকি। আমি মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিই, আর টিনের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে সীম তুলে এনে মুখে পুরি। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদী তীরের দিকে যাই, হিমেল হাওয়া তার রোদের মধ্যে একটা মাটির টিবির ওপর বসে মিসিসিপি নদীর বুকে চলমান জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। আজ রাতে আমি আমার নতুন চাকরি শুরু করবো। মিসিসিপিতে আসার দীর্ঘদিনের উপবাসের কল্যাণে কিভাবে টাকা জমাতে হয় তা আমার জানা ছিল। আমার অন্তর এখন শান্তিতে পূর্ণ। এতো মুক্ত ও স্বাধীন আমি কখনো অনুভব করি নি।

একটি কালো ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, হাই!

আমি হাই বললাম।

ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি করছো এখানে?

আমি জবাব দিলাম, কিছু না। রাতের জন্য অপেক্ষা করছি। একটা ক্যাফেতে কাজ পেয়েছি।

ও বললো, যাচ্ছলে! আমি একজন সাথী খুঁজছি।

ও দেখাতে চেষ্টা করছিল যে ও খুব শক্ত, কিন্তু আমার মনে হলো ও খুব নিঃসঙ্গ। ও বললো, আমি একটা মালগাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ে উত্তরে চলে যেতে চাই।

আমি বললাম, তো, একাই যাও না কেন?

ও অস্বস্তির সঙ্গে দাঁত বার করে হাসলো।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো?

হ্যাঁ, চার বছর আগে।

কি করেছো এতোদিন?

কিছু না।

এ কথা শুনেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জগৎ কিংবা পথের হালচাল সম্পর্কে তখনো আমি কোনো জ্ঞান অর্জন করি নি।

আমরা আরো কিছুক্ষণ কথা বলি, তারপর বড় বড় আগাছার পাশ দিয়ে নদীর কিনারের দিকে এগিয়ে যাই। ছেলেটি হঠাৎ এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ওটা কি?

আমি বললাম, একটা ঢাকনাঅলা পাত্রের মতো মনে হচ্ছে।

একটা বিশাল আকারের ঢাকনাঅলা ধাতব পাত্র আমার চোখে পড়লো, উঁচু আগাছার মধ্যে বেশ কিছুটা আড়াল করা। আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম যে ভারি কোনো জিনিসে ওটা পূর্ণ। আমি ঢাকনাটা খুলে গন্ধ নিই।

আমি বললাম, এ তো মদ।

ছেলেটিও গন্ধ শুকলো, তার চোখ বিস্ফারিত হলো। ও বললো, তোমার কি মনে হয়? এটা আমরা বেচতে পারি না?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু জিনিসটা কার?

ও আবার বললো, ইশ্, এটা যদি বেচতে পারতাম!

আমি বললাম, কেউ হয়তো চোখ রাখছে।

আমরা চারপাশে তাকাই, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

আমি বললাম, এ নিশ্চয়ই কোনো মদ চোরাচালানকারীর।

ও বললো, এটা আমরা বিক্রি করতে পারি কিনা দেখা যাক।

আমি হলে এটা এখান থেকে সরাতাম না। পুলিশ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। আমার টাকা দরকার। কিছু টাকা পেলে পথে আমার সাহায্য হবে।

আমরা একজন শ্বেতাঙ্গ ক্রেতার খোঁজ করতে একমত হই। আমরা রাস্তায় গিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়া শ্বেতাঙ্গদের লক্ষ্য করি। অবশেষে গাড়িতে বসে থাকা এক শ্বেতাঙ্গ আমাদের নজরে পড়ে।

ছেলেটি তার কাছে গিয়ে বললো, মিস্টার, আমরা ওইখানে আগাছার ঝোপের মধ্যে একটা বড় সুরাভর্তি পাত্র পেয়েছি, আপনি কিনতে চান?

লোকটি চোখ কুঁচকে আমাদের ভাল করে দেখে নিয়ে বললো, ভাল মদ?

আমি বললাম, বলতে পারবো না। আপনি গিয়ে দেখুন না।

সন্দিগ্ধ গলায় লোকটি বললো, তোমরা নিগাররা আমাকে মিথ্যা কথা বলছো না তো?

আমি বললাম, আসুন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমরা লোকটিকে মদের কাছে নিয়ে যাই। ও পাত্রের মুখ খুলে গন্ধ শোঁকে, তারপর কর্কের ভেজা জায়গার স্বাদ নিয়ে বিস্ফোরিত করে ওঠে, কী কাণ্ড! তোমরা সত্যিই এটা এখানে পেয়েছো?

আমরা দুজনই বললাম, ওহ, ইয়েস, স্যার।

লোকটি চাপা গলায় বললো, মিছে কথা বললে আমি তোমাদের দুজনকেই খুন করে ফেলবো।

আমি বললাম, আমরা সত্যি কথা বলছি।

অন্য ছেলেটি অস্বস্তি ভরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমি একটু অবাক হয়ে ভাবি, ও কোনো কথা বলছে না কেন? একটা আবছা ভাবনা আমার অস্থি সরল, ভুল, বিশ্বাসঘাতক মনের মধ্যে আকুপাকু করে ঢোকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জিনিসটা স্পষ্ট হয় না, আমি তাকে হাত দিয়ে ঝেড়ে সরিয়ে দিই।

লোকটি বললো, যাও তোমরা দুজন গিয়ে পাত্রটা আমার গাড়িতে নিয়ে আসো।

আমার ভয় করে, কিন্তু ছেলেটিকে দেখলাম খুব ইস্পুক ও বাগ্র।

শ্বেতাঙ্গ লোকটির সোৎসাহ প্ররোচনায় আমরা পাত্রটা টানতে টানতে তার গাড়ির কাছে এনে গাড়ির পেছনে মেঝেতে বসিয়ে দিই।

শ্বেতাঙ্গ লোকটি ছেলেটির দিকে একটা পাঁচ ডলারের নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এই নাও, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। আমি তাকে চারপাশে চিন্তাকুল দৃষ্টিপাত করতে দেখি, আমার মনে হলো কোথাও কোন ফাঁদ পাতা আছে কিনা দেখছে।

ছেলেটি বললো, এবার নোটটা ভাঙ্গানো যাক।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা ভাগাভাগি করে নেবো।

ছেলেটি রাস্তার ওপরে একটা দোকানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ওই যে, ওখানে একটা দোকান আছে, আমি ছুটে গিয়ে নোটটা ভাঙ্গিয়ে আনি। আমি ঢালু বাঁধের ওপর বসে অপেক্ষা করি। ও দোকানের দিকে দৌড়ি যায়। আমি এতো প্রত্যাশী ছিলাম যে ওকে লক্ষ্যও করি না। আমার খুব মজা লাগছিল। এক টিন মদ পড়ে থাকতে দেখার ফলে। আড়াই ডলার পেতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে একজন হাইজ্যাকার বনে গেলাম। আর গত রাতে এক মেয়ে আমার জন্য পাগল হয়ে যায়। আর বাড়ি ছাড়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এসব ঘটে গেল। আমার গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছা করে। আমি চোখ তুলে ছেলেটির ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু, কই, ওকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমি মনে মনে বলি, অনেক সময় নিচ্ছে ও। অন্য যে সব চিন্তা আমার মনের মধ্যে বুদ্বুদের মতো ভেসে উঠেছিল সে সব আমি থামিয়ে দিই। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি আমি, তারপর উঠে দ্রুত দোকানের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিই। না, ছেলেটি ভেতরে নেই। আমি ভেতরে ঢুকে মালিককে জিজ্ঞাসা করি, একটি ছেলে এখানে এসেছিল কিনা।

মালিক বললো, হ্যাঁ, একটি নিগার বালক এখানে ঢুকে চারপাশে চোখ বোলায়, তারপর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। বিদ্যুৎ বেগে সে সরে পড়ে। ওর কাছে তোমার কিছু ছিল নাকি?

হ্যাঁ।

তো, ওই নিগারের দেখা তুমি আর কোনোদিন পাবে না।

আমি শীতের রোদের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, তো, ঠিক হয়েছে, বুদ্ধু কোথাকার। ওই মদের পাত্র নিয়ে বাঁদরামি করার তোমার কোনো দরকার ছিল না। তারপরই আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ি। ওরা দুজন যোগসাজসে কাজটা করেছে! শ্বেতাঙ্গ লোকটি তার কৃষ্ণাঙ্গ বালকটি আমাকে ওদের মদের কাছাকাছি হাঁটাহাঁটি করতে দেবে আমাকে নিশ্চয়ই একজন হাইজ্যাকার ভেবেছিল। আর তারপর তাদের মদের সুরাহা করার জন্য আমাকে ব্যবহার করেছে।

গত রাতে আমি এক নির্বোধ সরল মেয়ের দেখা পেয়েছিলাম। আর আজ সকালে আমি আচরণ করি এক নির্বোধ সরল বালকের মতো।

দ্বাদশ অধ্যায়

আমি উদ্দেশ্যহীন মেফিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, সুউচ্চ ভবনগুলি আর মানুষের ভিড় দেখি মুখ হা করে, কোনো রকমে সময় কাটাই, ব্যাগের পর ব্যাগ চুটার খই চিবাই। এমন সময় হঠাৎ আমার মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে যায়। জাকসনে একটা চশমার কারখানায় আমি আজ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি, এখন এই মেফিসের কোনো চশমার কারখানায় আমি কাজের চেষ্টা করে দেখি না কেন? মেফিস জাকসনের মতো ছোট শহর নয়, এটা বেশ বড় নগরী। আমার মনে হয় জাকসনে আমার যে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল এখানে সেটাকে কেউ বড় করে দেখবে না।

আমি একটা ডিরেক্টরিতে একটা কোম্পানির ঠিকানা দেখি, তারপর বেশ সাহসের সঙ্গে তাদের ভবনে প্রবেশ করে লিফটে চড়ে পাঁচ তলায় উঠে যাই। লিফট চালাচ্ছিল মাত্র পাঁচ ফুটের মতো উঁচু একটি মোটাসোটা, গোলগাল, হলদেটে বর্ণের নিগ্রো। পাঁচ তলায় পৌঁছে আমি একটা আপিসে ঢুকি। এক শ্বেতাঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসে। লোকটি বললো, টুপিটা খোলো মাথা থেকে!

আমি এক ঝটকায় আমার মাথা থেকে আমার টুপি নামাতে নামাতে বললাম, ওহ, ইয়েস, স্যার।

কি চাই তোমার?

আমি ভাবছিলাম, আপনাদের কি কোনো ছোকরা কাজের লোক লাগবে? জাকসনে থাকার সময় আমি অল্প কিছু দিনের জন্য একটা চশমার কারখানায় কাজ করেছি।

তো, সে কাজ ছেড়ে দিলে কেন?

আমি সত্য কথা বললাম, সামান্য একটা ঝামেলা হয়েছিল।

কোনো কিছু চুরি করেছিলে?

না, স্যার। আমি চশমা তৈরির পেশা শিখি ওখানকার একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মী তা চায় নি। ওই আমাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

আসো, বসো এখানে।

আমি বসে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করি। লোকটি বললো, আমি মিস্টার ব্লেনকে চিঠি লিখবো, কিন্তু তুমি এখানেও ওই পেশা শেখার সুযোগ পাবে না। ওটা আমাদের নীতির অন্তর্গত নয়।

আমি বললাম যে, আমি সেটা বুঝি এবং তার নীতি আমি মেনে নিচ্ছি।

আমি কাজে নিযুক্ত হলাম। বেতন পাবো সপ্তাহে আট ডলার, সেটা প্রতি সপ্তাহে বেড়ে দশ ডলার পর্যন্ত হবে। ক্যাফের চাকরিটার জন্য আমাকে যে বেতন দেয়ার কথা বলা হয়েছিল এটা তার চাইতে কম হলেও আমি এই কাজ গ্রহণ করলাম। এই লোকটি যে রকম খোলাখুলি ও সৎ ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে তা আমার ভাল লাগে। তা ছাড়া জায়গাটা আমার কাছে মনে হলো পরিচ্ছন্ন, চটপটে এবং ব্যবসা সুলভ।

আমার কাজ হলো নির্দেশ মতো এখানে ওখানে যাওয়া, মেশিন থেকে লাল উড়ো মাথানো চশমার কাজগুলি এলে সেগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করা। প্রতিদিন বিকালে আমি ডাকে দেবার জন্য গাদা গাদা প্যাকেজ পোস্ট অফিসে নিয়ে যাই। হালকা কাজ আর আমি দ্রুত চলতে পারতাম। দুপুরে আমি লাঞ্চ খেতাম না, দোকানে কাজ করা শ্বেতাঙ্গদের ফাই-ফরমাশ খাটতাম। আমি তাদের জন্য দুপুরের খাবার কিনে আনতাম, তাদের স্যুট ইস্ত্রি করিয়ে আনতাম, তাদের বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল দিতাম এবং নিকটবর্তী অফিসভবনগুলিতে কর্মরত টেনোগ্রাফার বান্ধবীদের কাছে তাদের চিঠি পৌঁছে দিতাম। প্রথম দিন আমি বকশিস হিসাবে দেড় ডলার উপার্জন করি। আমি যে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম তা জমা রাখি এবং বকশিস থেকে দৈনন্দিন খরচ চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি যে উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা অনুভব করতাম তা প্রশমিত করতে আমি দ্রুত শিখে উঠি। আর মেম্ফিসের লোকজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিকতর নাগরিক একটা পরিমার্জনার সুর ছিল যা নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের আচরণের রূঢ়তা কিছুটা কমিয়ে দিতো। আমি যে ষষ্ঠ তলায় কাজ করতাম, যেখানে আমার বেশির ভাগ সময় কাটতাম, সেখানে দশ বারোজন শ্বেতাঙ্গ ছিল। তাদের মধ্যে কু ক্লুস ক্ল্যান-এর সদস্য ছিল, ইহুদি ছিল, থিওসফিস্ট দার্শনিক ছিল, সাধারণ গরিব শ্বেতাঙ্গ মানুষ ছিল। আমার প্রতি তাদের আচরণের মধ্যে আমি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার প্রকাশ লক্ষ্য করতাম কিন্তু তারা আমাকে চিৎকার করে গালাগাল করতো না কিংবা আমাকে চড়থাপ্পড় মারতো না। যে তীব্র আতঙ্ক আমাকে নিঃশেষ করে দিতো সেটা ছাড়াই আমি এখন জাতি-বর্ণের সমস্যা নিয়ে সহজভাবে চিন্তা করতে পারি। আমার শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর পর্যবেক্ষণের মধ্যে কিছু পরিমাণে সহ্য করতে পারি অথবা আমি আমার মনের গভীরে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করার উপায় আবিষ্কার করেছি।

সেদিন সোমবার রাতে আমি যখন মিসেস মসের ওখানে ফিরে যাই তখন আমার প্ল্যানের পরিবর্তন ও নতুন কাজ নেয়ার কথা শুনে তিনি অবাক হন। আমি তাঁকে আমার ব্যাংক বই দেখাই, বলি যে আমার মাকে মেম্ফিসে নিয়ে আসার জন্য আমি টাকা জমাচ্ছি। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময় বেস আর আমার মধ্যে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে ওর মাকে কিছু বলেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করি, কিন্তু মিসেস মস ছিলেন সব সময়ের

মতোই নম্র ও মাতৃসুলভ। বেস আমাকে এড়িয়ে যায়, এখন আমরা দুজন যখন একা থাকি তখন আমার সঙ্গে কোনো কথা বলে না, কিন্তু তার মা উপস্থিত থাকলে আমার সঙ্গে অল্প আচরণ করে। কয়েকদিন পর মিসেস মস আমার ঘরে আসেন। তাঁর চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেস আর তোমার মধ্যে কি হয়েছে?

লজ্জায় মরে গিয়ে আমি বললাম, কিছু না।

তিনি বললেন, মনে হচ্ছে ও আর তোমাকে পছন্দ করে না। আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে তোমাদের দুজনের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি আর ওকে পছন্দ করো না?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না, তাঁর দিকে তাকাতেও পারি না। আমি মনে মনে ভাবি তিনিই কি বেসকে আমার কাছে দেহ দানের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে টেনে টেনে বললেন, তো, মানুষকে বোধহয় স্বাভাবিক ভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়তে হয়, বাইরে থেকে সেটা তৈরি করে দেয়া যায় না।

তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি বললেন, বেস কাউকে পেয়ে যাবে।

আমি যেন শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করি। অসহায়ত্ব ও নির্বোধ আশা আমাকে ক্লিষ্ট করে তোলে। তিনি আমাকে বহুবার বলেছেন এখনও ইঙ্গিত করেন যে, আমি ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে মিলিত হয়েও দেখতে পারি আমার তাকে ভাল লাগে কিনা। এখন তাঁর কথাগুলি আমার মধ্যে এমন একটা করুণা জাগিয়ে তোলে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অবশেষে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। একদিন রাতে কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আমি দেখি যে, তিনি হলঘরে টেবিলের পাশে বসে ঢুলছেন। আমাকে দেখে চোখ মিটমিট করলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, কেমন আছো, বাবা?

বেশ ভাল।

তো, তুমি আর বেস কি এখনো ভাল বন্ধু বা ওই রকম কিছু হও নি?

আমি নিচু গলায় বললাম, না, ম্যাম।

তোমার ব্যাপারটা কি? কেন বেসকে তোমার পছন্দ হয় না?

এবার আমিও রেগে উঠি। আমি বললাম, জানি না।

কারণ ও খুব বুদ্ধিমতী নয়, সে জন্য কি?

না, ম্যাম। বেস বেশ বুদ্ধিমতী।

তাহলে?

তবু আমি ওকে কিছু বলতে পারি না।

তিনি বলে চললেন, তুমি আর বেস এই বাড়িতেই সংসার করতে পারবে। এখানেই তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলতে পারবে।

আমি বললাম, কিন্তু মানুষকে তো নিজেদেরই পরস্পরের কাছাকাছি আসার পথ খুঁজে বের করতে হয়।

অবশেষে তিনি বললেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মাথায় কোনো বুদ্ধি নেই। আমার অল্প বয়সে কেউ যদি আমার জন্য সব কিছু ঠিক করে দিতো তাহলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম।

আমি বললাম, মিসেস মস, আমি বরং অন্য কোথাও উঠে যাই।

তিনি ফেটে পড়লেন, তাই যাও! তোমার মাথায়ও এক রত্তি বুদ্ধি নেই।

আমি ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গুছাতে শুরু করি। একটু পরেই দরজায় টোকার শব্দ শুনে আমি দরজা খুলে দেখি যে মিসেস মস দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কাঁদছেন। বললেন, বাবা, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আমি ও কথা মন থেকে বলি নি। তোমাকে কোনো কারণেই আমি কষ্ট দিতে চাই না। তুমি আমার কাছে ছেলের মতো, বাবা।

আমি বললাম, ঠিক আছে, কিন্তু আমার অন্যত্র উঠে যাওয়াই ভাল।

তিনি কান্না ভরা গলায় বলে উঠলেন, না! তার মানে তুমি আমাকে ক্ষমা করো নি। একজন মানুষ যখন মাফ চায় তখন সে সত্যিই ক্ষমাভিক্ষা করে।

আমি বড় বড় চোখ করে তাঁকে দেখি। বেস দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। বেস বললো, যেও না, রিচার্ড।

মিসেস মস বললেন, আমরা আর তোমাকে কোনো জ্বালাতন করবো না।

আমি ভেঙ্গে পড়ি, বিভ্রান্ত ও লজ্জিত ও দুঃখিত বোধ করি। মিসেস মস বেসের হাত ধরে তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

আমি এখন আমার মা ও ভাইকে এখানে নিয়ে আসার জন্য টাকা উপার্জনের দিকে আমার সমস্ত মনোযোগ দিই। আমি প্রতিটি পয়সা বাঁচাই, খুব কম খাই, হেঁটে কাজে যাই, কাগজের ব্যাগ থেকে এক বোতল দুধ ও দুটো রুটি দিয়ে দুপুরে খাই একটা হ্যামবার্গার ও কিছু মটরশুঁটি, আর রাতে খাই আমার ঘরে নিয়ে যাওয়া এক টিন সীম। ক্ষুধায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম, আর বেঁচে থাকার জন্য আমার খুব বেশি খাবার দরকার হতো না। আমার হাতে এখন যতো টাকা আছে এতো টাকা কখনো ছিল না। আমি সেকেণ্ড হ্যান্ড বই-এর দোকান থেকে বই কিনতে শুরু করি, পত্রপত্রিকাও কিনতে আরম্ভ করি। এভাবেই আমার পরিচয় ঘটে হ্যার্পার্স ম্যাগাজিন, অ্যাটলান্টিক মান্থলি এবং অ্যামেরিকান মার্কারির সঙ্গে। আমি কয়েক সেন্ট দিয়ে পত্রিকাগুলি কিনতাম এবং পড়ার পর বই-এর দোকানির কাছে আবার সেগুলি বিক্রি করে দিতাম।

একদিন মিসেস মস আমার এই পড়াশোনা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন, এতো সব বই তুমি কেন পড়ছো, ছেলে?

ভাল লাগে তাই।

আইন পড়ছো নাকি তুমি?

না, ম্যাম।

তো, তুমিই জানো তুমি কি করছো।

প্রতিদিন সকালে আমাকে নটার আগে কাজে হাজিরা দিতে না হলেও আমি আটটার সময় পৌঁছে যেতাম, তারপর নিচের তলার ব্যাংকের পরিষ্কার করে আমার চেয়ে নিয়ে সেটা পড়তাম। এভাবে প্রতিদিন আমি পাঁচ সেন্ট বাঁচাতাম এবং ওই পয়সাটা খরচ করতাম আমার দুপুরের খাওয়ার জন্য। পত্রিকাটা পড়া হয়ে গেলে আমি বৃদ্ধ পোর্টারটির সকালের নিয়মিত কাজ সমাধা করতে দেখতাম। সে একটা লম্বা ন্যাকড়ার ঝাড়, একটা বালতি, এক গাদা সাবানকুচি, পানি ইত্যাদি ঠিকঠাক করে নাটকীয়ভাবে একটু অপেক্ষা করতো। তারপর চোখ ঘুরিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে গানের সুরে বলে উঠতো, ঈশ্বর, এ আরেক দিন! আজও আমি কাজ করছি সাদা মানুষগুলির জন্য!

তারপর সে ধোয়ামোছার কাজ করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠতো। এই কাজকে সে ঘৃণা করতো এবং সারাক্ষণই এই কাজে ইস্তফা দিয়ে পোস্ট অফিসে কাজ নেয়ার কথা বলতো।

যে সব নিগ্রো এখানে কাজ করতো তাদের মধ্যে সব চাইতে কর্কশ ছিল শর্টি নামের গোলগাল, হলুদ রঙের মোটাসোটা লিফট-চালকটি। চর্বির গোল্লার মধ্য থেকে সে তার ছোট, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ কিন্তু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতো। তার গায়ের রঙ ছিল চীনাদের মতো, কপাল ছিল ছোট, আর তার চিবুক ছিল তিনটে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তার চাইতে বেশি বিস্ময়কর কোনো দক্ষিণী নিগ্রোর নমুনা আমি দেখি নি। বাস্তববুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শর্টি পত্র-পত্রিকা ও বই পড়তো, রাজনীতি সম্পর্কে তার গর্ববোধ ছিল, তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায় সম্পর্কে সে ছিল ক্রুদ্ধ। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের সামনে সে একটা চরম ঘৃণ্য ও নীচ শ্রেণীর ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতো।

একদিন লাঞ্চ খাওয়ার জন্য তার পঁচিশ সেন্টের দরকার হয়।

সেদিন সকালে আমি যখন লিফটে দাঁড়িয়ে ছিলাম ও আমাকে বললো, আমি প্রথম যে সাদা মানুষটাকে দেখবো তার কাছ থেকে কিভাবে পঁচিশ সেন্ট আদায় করি, তুমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখো।

ওই ভবনে কর্মরত শ্বেতাঙ্গ লিফটে উঠে উপরে তার নিজের তলায় যাবার জন্য অপেক্ষা করে। শর্টি বিড়বিড় করে নিচু গলায় গান ধরে হাসে, চোখ পাকায়, একটা বদমায়েশের ভঙ্গি করে শ্বেতাঙ্গটির দিকে তাকায়, তারপর বলে, আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে, মিস্টার হোয়াইট ম্যান, দুপুরের খাওয়ার জন্য আমার একটা কোয়ার্টার চাই, স্যার।

শ্বেতাঙ্গটি তার কথায় কোনো কান দেয় না। শর্টি লিফটের নিয়ন্ত্রণ-দণ্ডের ওপর হাত রেখে আবার গানের সুরে বলে ওঠে, পঁচিশ সেন্ট না পেলে আমি কিন্তু এই পাজি হতচ্ছাড়া লিফট নাড়াবো না, মিস্টার হোয়াইট ম্যান।

শ্বেতাঙ্গটি তাকে উপেক্ষা করে, তার কালো সিগার ফোঁকে, তারপর বলে, জাহান্নামে যাও, শর্টি।

শর্টি টেনে টেনে ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে, গানের সুরে বলে চলে, আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে মিস্টার হোয়াইট ম্যান, একটা কোয়ার্টার না পেলে আমি মরে যাবো, স্যার।

শ্বেতাঙ্গটি এবার প্রথমবারের মতো মৃদু হেসে বললো, তুমি যদি আমাকে উপরে আমার তলায় নিয়ে না যাও তাহলে তুমি ঠিকই মরবে।

শর্টি মুখ বাঁকায়, ভাঁড়ামি করে, টেনে টেনে গানের সুরে বলে, কিন্তু এই কালা হারামজাদার যে একটা কোয়ার্টার খুবই দরকার, স্যার।

ব্যাপারটার নির্মম আনন্দের দিকটি শ্বেতাঙ্গটিকে আকর্ষণ করে। সে বলে ওঠে এই কালা হারামজাদা, আমার কাজ আছে, তাড়াতাড়ি কর।

শর্টি কান্নার সুরে বলে, পঁচিশ সেন্ট লাগবে, মিস্টার হোয়াইট ম্যান, ছোট্ট দুটি মুদ্রা মাত্র।

একটা নীরবতা নেমে আসে। শর্টি লিফটের দণ্ডে একটা টান দেয়।

শ্বেতাঙ্গটির যে তলায় নামার কথা তার পাঁচ ফুটের মতো বাকি থাকতে লিফট থেমে যায়। শর্টি বললো, আমার কোয়ার্টার না পেলে আর যেতে পারবো না, মিস্টার হোয়াইট ম্যান। তার গলায় কান্না ঝরে পড়ে।

শ্বেতাঙ্গ লোকটির দৃষ্টি তখনো অন্য দিকে ফেরানো। সে জিজ্ঞাসা করলো, এক কোয়ার্টার পেলে তুমি কি করবে?

গানের সুরে শর্টি জবাব দিলো, এক কোয়ার্টারের জন্য শর্টি সব কিছু করতে পারবে।

শ্বেতাঙ্গটি প্রশ্ন করলো, যেমন?

শর্টি খিকখিক করে হাসলো, ঘুরে দাঁড়ালো, নিচু হলো, তার চওড়া, মাংসল পাছায় একটা খোঁচা দিয়ে বললো, এক কোয়ার্টার দিয়ে আপনি এখানে একটা লাথি মারতে পারবেন।

চোখের কোণা দিয়ে একটা ক্ষুদে শয়তানের মতো ওর দিকে তাকিয়ে সে হাসে।

শ্বেতাঙ্গটি তার পকেট থেকে কয়েকটা মুদ্রা নিয়ে শব্দ করে তার হাতে ঝাঁকায়, তারপর তার মধ্য থেকে একটা বেছে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে। শর্টি সেটা তুলে নেবার জন্য নিচু হতেই শ্বেতাঙ্গটি দাঁত বের করে হেসে ওঠে, তারপর তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর পাছায় প্রচণ্ড একটা লাথি কষিয়ে দেয়। শর্টি একটা প্রবল হাসির চিৎকার তোলে, আর লিফটের বায়ু চলাচলের সরু সুড়ং এর মতো জায়গাটি দিয়ে ওই শব্দ

ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

শ্বেতাঙ্গটি শব্দ করে তার ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বললো, এটার হারামজাদা কুত্তার বাচ্চা কালা শয়তান, এই দরজাটা খোল।

শর্টি গানের সুরে বলে, ই...য়ে..ই..য়েস, স্যা...র! কিন্তু তার আগে সে কোয়ার্টারটা তুলে মুখে পুরে রাখে। তারপর খলখল করে হাসতে হাসতে বলে, বাঁদরটা তার চিনাবাদাম পেয়ে গেছে!

শর্টি লিফটের দরজা খুলে দেয়। শ্বেতাঙ্গটি লিফট থেকে নেমে তার অপিসের দিকে যেতে যেতে পেছন ফিরে শর্টিকে লক্ষ্য করে বললো, কুত্তার বাচ্চা শর্টি, তুই ঠিকই আছিস।

শর্টি চেঁচিয়ে বললো, আমি সেটা জানি। তারপরই তার কণ্ঠস্বর একটা উন্মত্ত হাসির তোড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

আমি এই দৃশ্য কিংবা তারই ঈষৎ ভিন্ন রূপ কম করে হলেও অন্তত কুড়িবার দেখেছি। আমার রাগ বা ঘৃণা হয় না, আমার মধ্যে শুধু জেগে ওঠে বিতৃষ্ণা ও প্রবল বিরাগ। আমি একবার ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কেন এরকম করো?

সে গম্ভীর হয়ে গর্বের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আমার এক কোয়ার্টার দরকার ছিল আর সেটা আমি পেয়েছি।

কিন্তু ও তোমার সঙ্গে যা করেছে এক কোয়ার্টার দিয়ে তো তার মূল্য পরিশোধ হয় না।

ও আমাকে বলেছিল, একটা কথা শোনো, নিগার। আমার পাছা খুব মজবুত, আর কোয়ার্টার খুব বিরল।

এর পর আমি ওর সঙ্গে আর এ প্রসঙ্গ তুলি নি।

আরো কয়েকজন নিগ্রো এই ভবনে কাজ করতো– একজন বয়স্ক মানুষ, আমরা তাকে ডাকতাম এডিসন বলে; তার ছেলে জন; একজন নৈশকালীন দারোয়ান, তার নাম ছিল ডেভ। দুপুরে, কোনো ফাইফরমাশ খাটার না থাকলে আমি ভবনের সামনের দিকে একটি ছোট ঘরে অন্য নিগ্রোদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতাম। ওই ঘর থেকে রাস্তা দেখা যেতো। ভবনের ওই ক্ষুদ্র পাতাল পুরীর অংশে আমরা আমাদের লাঞ্চ খেতে খেতে নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আমাদের মধ্যে দু'তিন জন কথা বলতে শুরু করলেই অবধারিত ভাবে ওই প্রসঙ্গ এসে পড়তো। আমরা প্রত্যেকেই শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা ও ভয় করতাম, অথচ কোনো একজন শ্বেতাঙ্গ যদি হঠাৎ করে ওখানে হাজির হতো তাহলে আমরা তখনই আমাদের মুখে একটা নীরব, অনুগত হাসি ফুটিয়ে তুলতাম।

আমাদের কাছে শ্বেতাঙ্গদের জগৎ ছিল একটা অতি-উচ্চ অসাধারণ জগৎ। কাজের সময় ওরা যেসব কথাবার্তা বলতো, তাদের কি রকম দেখাতো, কি পোশাক তারা

পরেছিল, তাদের মেজাজ কেমন ছিল, কে ব্যবসা বাণিজ্যে কাকে পেছনে ফেলে নিজে এগিয়ে গেল, চাকুরিতে কার জায়গায় কে আসছে, কে চাকুরী খোয়ালো আর কে নতুন চাকুরি পেলো এসব আমরা ওই ছোট্ট ঘরে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করতাম। কিন্তু আমরা কেউ কখনো খোলাখুলি ভাবে বলতাম না যে ওই ভবনে আমাদের অবস্থান ছিল অধস্তন গৌণ কর্মচারীর। যে তুচ্ছ সম্পর্কসমূহ আমাদের জন্য জীবনের মর্মবস্তু তৈরি করে দিয়েছিল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো আমাদের সকল আলোচনা।

কিন্তু আমাদের আলোচনার তলা দিয়ে সহিংসতার একটা প্রচ্ছন্ন বোধ ছেঁসে যেতো। শ্বেতাঙ্গরা একটা লাইন টেনে দিয়েছিল, আমরা সে-লাইন অতিক্রম করার সাহস পেতাম না, আমরা সে-লাইন মেনে নিয়েছিলাম, কারণ তার উপর নির্ভরশীল ছিল আমাদের রুটি-রুজি। কিন্তু আমাদের নিজেদের সীমারেখার মধ্যে আমরাও একটা লাইন টেনে দিয়েছিলাম, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল শত তাচ্ছিল্য ও মর্যাদাহানি সত্ত্বেও আমাদের রুটি-রুজি অর্জনের অধিকার। কোনো শ্বেতাঙ্গ যদি আমাদের একটা চাকুরি থেকে বঞ্চিত করতে চাইতো কিংবা আমাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করতে দিতে চাইতো না, আমরা নীরবে তার ক্ষমতার সামনে মাথা নোয়াতাম। কিন্তু সে যদি আমাদের দশ পয়সা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করতো তাহলে রক্তপাত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিতো। তাই, আমাদের দৈনন্দিন জীবন এতো তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলে সেখানে আত্মসমর্পণের অর্থ ছিল যেন জীবনের অধিকারকেই সমর্পণ করা। আমাদের ক্রোধ ছিল ছোট ছেলেমেয়েদের ক্রোধের মতো, কোনো কল্পিত তুচ্ছ দুঃখ দুর্দশার বোধ থেকে তা দ্রুত অনুরূপ আরেকটা বোধে সঞ্চারিত হতো, একটা সামান্য অন্যায়ের স্মৃতি থেকে তা প্রবাহিত হতো অন্য একটা অনুরূপ স্মৃতিতে।

জন তার রসসিক্ত হ্যামবার্গারে কামড় দিতে দিতে বলতো, জানিস, ওই হারামজাদা ওলিন আজ সকালে আমাকে কি বলেছে?

শর্টি জিজ্ঞাসা করতো, কি বলেছে?

তো, ওর গ্যাস বিল দেয়ার পর যে খুচরা টাকা ওর ফেরৎ পাওনা ছিল আমি সেটা তার জন্য নিয়ে আমি... ও বললো, টাকাটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দে, আমার হাত নোংরা... আমি টাকাটা ওর পাশের টেবিলের উপর রেখে দিই। আমি ওর ব্যক্তিগত ক্রীতদাস না। ওরা টাকা ওর পকেটে আমি কেন রেখে দেবো? অসম্ভব।

শর্টি মন্তব্য করতো, ঠিকই তো।

বুড়ো এডিসন বলে উঠতো, সাদারা কখনোই কোনো কিছু ভেবে দেখে না।

নৈশকালীন দারোয়ান ডেভ বলতো, সত্যি, ওদের সঙ্গে খুব সাবধানে চলতে হয়। (তার রাতের ধোয়া মোছার কাজ শেষ করে ও এই ঘরেই একটা খাটিয়ায় শুয়ে থাকতো। কোনো বান্ধবীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে তৈরি হতো।)

আমি বলতাম, ফক ইট্ট করিয়ে আসবার জন্য আমাকে তার একটা স্যুট দেয়, কিন্তু তার জন্য এক পয়সাও আমার হাতে দেয় না, আমাকে বলে যে বেরুবার দিন সে মনে রাখবে।

জন বলতো, কী সাহস, দ্যাখ!

শর্টি বলতো, তুই তো ওর স্মৃতিশক্তি খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবি না।

বুড়ো এডিসন বলতো, কিন্তু ওদেরকে তোমার এসব সুযোগ-সুবিধা দিতেই হবে, না দিলে ওরা তোমাকে দেখতে পারবে না।

শর্টি বলতো, যে কোনো দিন আমি উত্তরে চলে যাবো।

আমরা হেসে উঠতাম। আমরা জানতাম ও কোনোদিন যাবে না, ওর অন্নের জন্য সাদাদের উপর ও বড় বেশি নির্ভরশীল।

আমি শর্টিকে জিজ্ঞাসা করতাম, উত্তরে তুই কি করবি?

আমি চীনা বলে নিজেকে চালিয়ে দেবো।

আমরা আবার হেসে উঠতাম। লাঞ্চের সময় শেষ হতো, আমরা আবার যে যার কাজে ফিরে যেতাম, কিন্তু ওই এক ঘন্টার আলাপ-আলোচনায় আমাদের মনে যে সব অনুভূতি ও বোধ জেগে উঠেছিল তার এক ফোঁটাও আমাদের মুখে প্রতিফলিত হয় না।

একদিন এক জোড়া চশমার কাচ পৌঁছে দেয়ার জন্য আমি একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চক্ষু বিষয়ক কাউন্টারে যাই। কাউন্টারে তখন কোনো খদ্দের ছিল না। একজন দীর্ঘদেহী, জমকালো মুখের অধিকারী, শ্বেতাঙ্গ কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন ইয়াংকি। তার দেহের গড়ন ছিল দক্ষিণের লম্বা ও কৃশকায় মানুষের গড়নের চাইতে একেবারেই ভিন্ন ধরনের।

আমি চশমার কাচ ও অ্যাকাউন্ট বই বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, দয়া করে এখানে সই করে দেবেন কি, স্যার?

তিনি বই আর কাচ হাতে তুলে নিলেন কিন্তু তখনো তার দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ।

তিনি ধীর গলায় বললেন, এই ছেলে, আমি উত্তরের লোক।

আমি একদম নিশ্চল হয়ে যাই। এটা কি কোনো ফাঁদ? তিনি একটা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তিনি কি বলতে চান তা ঠিকমতো বুঝবার আগ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে চাই। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের সঙ্গে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইতো না তার মধ্যে ছিল নিম্নোক্ত বিষয়গুলি : শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নারী; কুকুক্স ক্ল্যান; ফ্রান্স এবং সেখানে নিগ্রো সৈনিকদের অবস্থা; ফরাসী নারী; জ্যাক জনসন; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র উত্তরাঞ্চল; গৃহযুদ্ধ; আব্রাহাম লিঙ্কন ও ই.এস. গ্রান্ট; জেনারেল শারম্যান; ক্যাথলিক ধর্মের মানুষ; পোপ; ইহুদি জনগণ; রিপাবলিকান পার্টি; ক্রীতদাস প্রথা; সামাজিক সাম্য; কমিউনিজম সোশিয়ালিজম; শাসনতন্ত্রের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ সংশোধনী; অথবা নিগ্রোদের দিক থেকে কোনো সুস্পষ্ট জ্ঞান কিংবা

পৌরুষোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত তাবৎ বিষয়াবলী। সব চাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য বিষয় ছিল যৌনতা এবং ধর্ম।

আমি ওই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাই না, তার কথার কোনো উত্তর দিই না। একটি বাক্যের সাহায্যে তিনি নীরব অন্ধকার থেকে বর্ণবাদের বিষয়টি তুলেছেন এবং আমি এখন দাঁড়িয়ে একটা গভীর খাদের কিনারায়।

তিনি বললেন, আমাকে ভয় পেও না, আমি তোমাকে শুধু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি।

আমি নিরপেক্ষ সুরে জবাব দিই, ইয়েস, স্যার, তারপর অপেক্ষা করি।

তিনি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ক্ষুধার্ত, ছেলে?

আমি স্থির বড় বড় চোখ করে তাকে দেখি। তিনি সেই শব্দটি উচ্চারণ করেছেন যা আমার অন্তরে গিয়ে ঘা দেয়। কিন্তু আমি তাকে সেকথা বলতে পারি না, আমি তাকে জানতে দিতে পারি না যে উত্তরে যাবার জন্য টাকা জমাতে গিয়ে আমি উপবাসী থাকছি। ওকে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার মুখের অভিব্যক্তিতে কোনো রূপান্তর ঘটে না।

আমি কোনোরকমে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলি, ওহ্, না, স্যার।

আমি সত্যিই ক্ষুধার্ত ছিলাম আর সেটা তার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ, আর আমি ক্ষুধার্ত একথা তাকে জানালে, আমার মনে হয়, আমি খুব লজ্জাকর একটা জিনিস প্রকাশ করবো।

আমি তোমার চোখে-মুখে ক্ষুধার ছাপ দেখছি, ছেলে।

আমি মিছে কথা বলি, আমি যথেষ্ট খাই, স্যার।

তাহলে তুমি এতো রোগা কেন?

আমার মনে হয়, স্যার, এটা আমার স্বাভাবিক ধাত।

তিনি বললেন, তুমি অনর্থক ভয় পাচ্ছো, ছোকরা।

আমি আবারো মিছে কথা বলি, ওহ্, না, স্যার।

আমি তার দিকে তাকাতে পারি না। আমি কাউন্টার ছেড়ে চলে আসতে চাই, কিন্তু তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ এবং এটা আমার শেখা হয়ে গিয়েছিল যে কোনো শ্বেতাঙ্গ আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকলে তার সামনে থেকে হুট করে চলে আসা যায় না। আমি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি তার পকেটে হাত দিয়ে এক ডলারের একটা নোট বের করে বললেন, এটা নাও, কিছু খাবার কিনো এই টাকা দিয়ে।

আমি বললাম, না স্যার।

তিনি বললেন, বোকামি কোরো না। এটা গ্রহণ করতে তোমার লজ্জা হচ্ছে। ওই কারণে টাকাটা নেয়া এবং কিছু খাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করো না।

উনি যত বলতে থাকেন আমার পক্ষে টাকাটা নেয়া ততই অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমি নিতে চাই অথচ তার দিকে আমি তাকাতেও পারি না। আমি কথা বলতে চাই কিন্তু

আমার জিভ অসাড় হয়ে থাকে। উনি কেন আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না আমার ভীষণ ভয় করে।

তিনি বললেন, কিছু বলো।

আমাদের চারিদিকে অনেক বস্তুসামগ্রীর সম্ভার। শ্বেতাঙ্গ নারী পুরুষের দল এক কাউন্টার থেকে আরেক কাউন্টারে যাচ্ছে। এখন গরমের সময়। উঁচু ছাদ থেকে একটা বড় বৈদ্যুতিক পাখা ঘরঘর শব্দ করে ঘুরছে। আমি যে বোঝে পারি, কখন শ্বেতাঙ্গ লোকটি তার ইঙ্গিত দেবে আমি সেজন্য অপেক্ষা করি।

অবশেষে তিনি তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললেন, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। তুমি কতোদূর পড়াশোনা করেছো?

নবম গ্রেড শেষ করেছি। আসলে অষ্টম গ্রেডই। আমরা যা অষ্টম গ্রেডে পড়েছি নবম গ্রেডে তার পুনরালোচনা হয়।

নীরবতা। তিনি আমাকে এই দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিতে বলেন নি, কিন্তু যে লজ্জাজনক ফাঁক আমাদের দুজনের মধ্যে মুখ ব্যাদন করে ছিল তা পূরণ করার জন্য আমি এতো কথা বলি। আমাদের আলাপের অবাস্তব রূপকে আমি দক্ষিণের পরিচিত ও নিরেট বাস্তবতার বলয়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করি। আমাদের এই আলাপ ছিল অবশ্যই বস্তুত, বিষয়টা আমার মঙ্গল নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি আমার সারা জীবন যে গাঢ় অন্ধকার ভয়ের মধ্যে কাটিয়েছি এটা তা দিনের আলোয় তুলে আনে। শ্বেতাঙ্গ ইয়াংকি লোকটা জানে না তার কথাগুলি কী ভীষণ বিপজ্জনক।

(কিছু অস্পষ্ট, গভীর এবং নিগূঢ় জিনিস আছে যা নিয়ে একজন মানুষ অন্যদের সঙ্গে সহজে কথা বলতে পারে না। কিন্তু নিগ্রোদের ক্ষেত্রে জীবনের নিতান্ত ছোটখাটো জিনিস নিয়ে কথা বলাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সেসব ছোটখাটো জিনিসই তার নিয়তিকে গড়ে দেয়। একজন লোক নক্ষত্রমালার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলতে পারে, কিন্তু একটা মানুষের চেতনা যখন এক টুকরা রুটি পাওয়ার উপর নিবদ্ধ হয়ে থাকে তখন ওই এক টুকরা রুটিই নক্ষত্রমালার মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।)

এমন সময় আরেকজন শ্বেতাঙ্গ কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায় আর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

লোকটি বললো, ডলারটা নিতে চাও?

আমি ফিসফিস করে বলি, না, স্যার।

তিনি বললেন, ঠিক আছে। ভুলে যাও এই ঘটনার কথা।

তিনি অ্যাকাউন্ট বই-এ সই করে চশমার কাচ দুটি তার হাতে তুলে নিলেন। আমি বইটা আমার ব্যাগে ঢোকাই, কাউন্টার থেকে ঘুরে দাঁড়াই, মাঝখানের সরু পথ দিয়ে নিচে নেমে আসি। আমার শিরদাঁড়ায় আমি একটা শারীরিক শিরশিরানি অনুভব করি, আমি জানি যে ভদ্রলোক ঠিকই বুঝতে পেরেছেন যে আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। এই ঘটনার

পর থেকে আমি তাকে এড়িয়ে চলি। তাকে দেখলেই একটা অদ্ভুত ভাবে আমার মনে হতো যে তিনি আমার শত্রু, কারণ তিনি আমার আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারেন, আর দক্ষিণে আমার নিরাপত্তা নির্ভর করতো আমি কতো ভালোভাবে আমার আবেগ-অনুভূতি লুকিয়ে রাখতে পারি তার উপর।

একদিন সকাল বেলা, তখন গ্রীষ্ম কাল চলছিল, আমি কারখানার পেছন দিকে একটা বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে একজোড়া চশমার কাচ ধুয়ে পরিষ্কার করছিলাম। ওই কাচ সবে মাত্র পালিশ করার মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছে। মেশিনের শব্দে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেই তলার মেঝে তখনো থরথর করে কাঁপছিল। প্রতিটি মেশিনে একজন করে শ্বেতাঙ্গ ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগ সহকারে কাজ করছিল। আমার বাঁ দিকের একটা জানালা দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করে লাল চিটচিটে প্রলেপগুলি আলোকিত করে তুলছিল, যার ফলে কারখানাটাকে দেখাচ্ছিল অপ্রীতিকর ভাবে উজ্জ্বল, হিংসাত্মক ও বিপজ্জনক। দুপুরের আর বেশি দেরি নেই। আমার মন ভেসে চলেছে আমার প্রতিদিনকার দুপুরের লাঞ্চের দিকে– একটা হ্যামবার্গার আর এক থলে টানাবাদাম। দিনটা ছিল স্বাভাবিক ও গতানুগতিক, কম-বেশি আর দশটা দিনের মতো। এখানে ফাইফরমাশ খাটা ও চশমার কাচ ধোয়ার চাকুরি শুরু করার পর থেকে দিনগুলি যেভাবে কেটেছে এই দিনটাও ছিল সেই রকমই। এই জগতের সঙ্গে আমার অবস্থান ছিল শান্তিময়, তার মানে, দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গদের জগতে একটি কৃষ্ণাঙ্গ বালকের অবস্থান যতটা শান্তিময় হওয়া সম্ভব ততটা শান্তিময়।

হয়তো অন্য দিনগুলির সঙ্গে এই দিনটির মিলই শীঘ্রই এটাকে অন্য দিনগুলির চাইতে পৃথক করে তোলে। হয়তো মেশিনে কর্মরত শ্বেতাঙ্গ লোকগুলি তাদের নিরানন্দ একঘেঁয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল এবং কোনো এক ধরনের উত্তেজনার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, অচিরেই আমার পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ ঘুরাতেই আমি দেখি যে একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে, মিস্টার ওলিন, আমি যেখানে কাজ করতাম তার তাৎক্ষণিক ওপরওয়ালা। আমি চশমার কাচ থেকে শিরিস গুঁড়ার ধূলা পরিষ্কার করছিলাম। তিনি হাসছিলেন আর আমার কাজ দেখছিলেন।

কেমন কাজ চলছে, ছোকরা? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি দ্রুত নিজেকে এটা প্যাটার্ণের মধ্যে নিয়ে আসি– শ্বেতাঙ্গের উপস্থিতিতে একটা হাসিখুশি ও শান্ত স্বভাবের নিগার ছোকরার প্যাটার্ণ। এখন আমি খুব সহজে নিজেকে এই প্যাটার্ণের মধ্যে স্থাপন করতে পারি। আমি কপট প্রফুল্লতার সঙ্গে মিস্টার ওলিনের প্রশ্নের জবাব দিই, ওহ, চমৎকার, স্যার।

সেকথা বললেও আমি মনে মনে ভাবি, তিনি কি আমার কাজের কোনো সমালোচনা করতে যাচ্ছেন?

তিনি নিঃশব্দে আমার চারপাশে ঘুরঘুর করেন। কি চান তিনি? এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কাজ পর্যবেক্ষণ করা তো তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমি তার দিকে তাকাতে চাই, কিন্তু ভয়ে পারি না।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, রিচার্ড, তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমি তোমার বন্ধু?

প্রশ্নটা এতো বিপদ-ঠাসা ছিল যে আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারি না। মিস্টার ওলিনকে আমি চিনতামই না বলা চলে। কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের যে সর্বজনপরিচিত সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে আমারও তাই ছিল। তিনি হুকুম দেন, আমি ইয়েস স্যার বলি ও হুকুম তামিল করি। আর এখন, বিন্দুমাত্র সতর্ক না করে দিয়ে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন আমি তাকে আমার বন্ধু মনে করি কিনা। আমি জানতাম, সব দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গই নিজেদের মনে করে নিগ্রোদের বন্ধু। আমি মনে মনে একটা উত্তর খুঁজি, কিছু বলি না, মৃদু হাসি।

তিনি ছাড়লেন না, বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি সত্যিই মনে করো যে আমি তোমার একজন বন্ধু?

আমাদের দুজনের মাঝে বিরাজমান বিশাল বর্ণবাদী খাদটা এড়িয়ে গিয়ে আমি জবাব দিলাম, আমি তো তাই আশা করি।

তিনি জোর দিয়ে বললেন, আমি সত্যিই তোমার বন্ধু।

আমি আমার কাজ করে চলি, মনে মনে ভাবি তার উদ্দেশ্যটা কি? এর মধ্যেই আমার ভেতরে নানা রকম আশঙ্কা জেগে উঠতে শুরু করেছে।

তিনি বললেন, শোনো, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

ইয়েস, স্যার।

আমরা চাই না যে তুমি কোনো রকম আঘাত পাও। আমরা তোমাকে পছন্দ করি। তুমি একটা ভালো ছেলের মতো এখানে কাজকর্ম করছো।

আমি বললাম, ইয়েস, স্যার। কেন? কোনো গোলমাল হয়েছে?

তিনি বলে চললেন, তুমি কোনো ঝামেলায় পড়লে সেটা তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

আমি কি এমন কিছু করেছি যার জন্য একজন কেউ আমাকে দেখতে পারছে না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি ব্যাকুল ভাবে এখানে আমার বিগত কার্যাবলীর কথা স্মরণ করি। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের কাছ থেকে যেরকম প্রত্যাশা করে তার আলোকে আমি আমার আচার-আচরণের বিশ্লেষণ করি।

তিনি একটু থেমে, তার কথাগুলি যেন অর্থপূর্ণ ভাবে আমার মনে ঢুকে যায় সেই ভাবে বললেন, আমি ঠিক জানি না। তিনি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তুমি হার্লিসনকে

চেনো?

রাস্তার ওপারে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চশমার কারখানায় আমার বয়সী হ্যারিসন নামের একটি নিগ্রো ছেলে কাজ করতো। তিনি তার কথা বলছিলেন। হ্যারিসন আর আমি পরস্পরকে চিনতাম, খুব সাধারণ ভাবে, কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে কখনো সামান্যতম বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ঘটে নি।

আমি বললাম, ইয়েস, স্যার, আমি ওকে চিনি।

মিস্টার ওলিন বললেন, তো, সাবধানে থেকো। ও তোমার পিছু নিয়েছে।

আমার পিছু নিয়েছে? কি জন্য?

শ্বেতাঙ্গ লোকটি বললেন, তোমার বিরুদ্ধে ও ভীষণ ক্ষেপে আছে। তুমি ওর কি করেছো?

চশমার কাচ ধোয়ার কথা আমি ভুলে যাই। আমার দুচোখ এখন মিস্টার ওলিনের মুখের উপর নিবদ্ধ। তিনি কী বলতে চান তা বোঝার চেষ্টা করি আমি। ব্যাপারটা কি গুরুতর কিছু? আমি এই শ্বেতাঙ্গ মানুষটাকে বিশ্বাস করি না, আবার হ্যারিসনকেও আমি বিশ্বাস করি না। দক্ষিণে যেসব নিগ্রো শ্বেতাঙ্গদের অধীনে কাজ করতো তারা সচারচর তাদের শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের অনুগত থাকতো, তারা উপলব্ধি করতো যে ওটাই তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বোত্তম পন্থা। হ্যারিসনের কি মনে হয়েছে যে আমি কোনো না কোনো ভাবে তার চাকুরিকে হুমকির মুখে ফেলেছি? কে আমার বন্ধু? এই শ্বেতাঙ্গ মানুষটা, না ওই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটি?

আমি বললাম, আমি হ্যারিসনের বিরুদ্ধে কিছুই করি নি।

মিস্টার ওলিন নিচু, গোপন, অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, যাই হোক, তুমি নিগার হ্যারিসনটা সম্পর্কে সাবধানে থেকো। একটু আগে আমি একটা কোকাকোলা কেনার জন্য নিচে গিয়েছিলাম, তখন হ্যারিসনকে দেখি এই দালানের দরজার আড়ালে ছুরি হাতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। বললো, তোমাকে সে আচ্ছা শিক্ষা দেবে। তুমি নাকি ওকে খুব নোংরা গাল দিয়েছো। শোনো, আমরা আমাদের কাজের জায়গায় কোনোরকম মারামারি বা রক্তপাত দেখতে চাই না।

তখনো শ্বেতাঙ্গ লোকটিকে আমার সন্দেহ হয়। তবু এটাও ভাবি যে হ্যারিসন হয়তো আমার কোনো কথার ভুল অর্থ করেছে, ভেবেছে যে আমি তাকে অপমান করেছি।

আমার মনের ভাবনা সোচ্চার হয়। আমি বলি, ওই ছেলের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে হবে আমাকে।

মিস্টার ওলিন বললেন, না, না, সেটা ঠিক হবে না। তুমি বরং আমাদের শ্বেতাঙ্গ কয়েকজনকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দাও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এটার সূত্রপাত হলো কেমন করে?

আমার মন এখনো অর্ধেক বিশ্বাস করছে, অর্ধেক সন্দেহে পূর্ণ।

মিস্টার ওলিন বললেন, ও আমাকে শুধু বলেছে যে ও তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবে, ছুরি মারবে তোমাকে। কিন্তু তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।

আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মিস্টার ওলিন তার মেশিনের কাছে ফিরে যান। এই কারখানার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি এবং তার কথাকে আমি সব সময় শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছি। আমাকে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এসব বলার ক্ষমতা ও অধিকার ছিল তাঁর। এখন আমার সঙ্গে কেন তিনি হাঁড়ি-মস্করা করবেন? শ্বেতাঙ্গরা সাধারণতঃ কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে কৌতুক করতো না, অতএব তিনি যা বলেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়ি। আমরা কৃষ্ণাঙ্গ বালকরা দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন পরিশ্রম করতাম সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্য, আর প্রায় সব সময়ই আমরা অশান্ত ও টানটান হয়ে থাকতাম। ওই পাগলা হ্যারিসন হয়তো সত্যিই আমার উপর ক্ষেপে আছে। আমার খাওয়ার ইচ্ছা চলে গিয়েছিল। এই ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে হবে আগে। এক শ্বেতাঙ্গ মানুষ আমার অতিসূক্ষ্ম ভারসাম্যপূর্ণ জগতে প্রবেশ করে তাকে একপাশে হেলিয়ে দিয়েছে, এখন নিজেকে নিরাপদ বোধ করার আগে আমাকে ওই ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত করতে হবে। হ্যাঁ, আমি সরাসরি হ্যারিসনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো, ব্যাপার কি, আমি কী বলেছি যার জন্য সে এতো ক্ষুব্ধ হয়েছে। হ্যারিসন কৃষ্ণাঙ্গ, আমিও কৃষ্ণাঙ্গ। আমি শ্বেতাঙ্গ লোকটির সতর্কতামূলক পরামর্শ উপেক্ষা করবো, আমার নিজের রঙের ছেলের সঙ্গে আমি মুখোমুখি কথা বলবো।

দুপুরে আমি রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে যাই। হ্যারিসন তখন বেসমেন্টে একটা বাক্সের উপর বসে তার লাঞ্চ খাচ্ছিল। খেতে খেতে সে একটা সস্তা জনপ্রিয় ম্যাগাজিন পড়ছিল। আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতেই তার একটা হাত নিজের পকেটে ঢুকিয়ে আমার দিকে কঠোর সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালো।

আমি সাবধানে তার কাছ থেকে ফুট চারেক দূরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, হ্যারিসন, ব্যাপারটা কি? এসব কী হচ্ছে?

ও কোনো উত্তর না দিয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

আমি বললাম, আমি তো তোমার কিছুই করি নি।

ও তখনো সতর্ক। বিড়বিড় করে ও বললো, তোমার বিরুদ্ধে আমারও কিছু নেই।

আমি বললাম, কিন্তু মিস্টার ওলিন বললেন যে, সেদিন সকালে তুমি ছুরি নিয়ে আমার খোঁজে আমাদের ফ্যাক্টরিতে এসেছিলে?

আরে, না! আমি সারা দিনের মধ্যে একবারও তোমাদের কারখানায় যাই নি।

এখন আমি তার মধ্যে একটা স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করি, যদিও ওই কথাগুলি বলার সময় ও আমার মুখের দিকে তাকায় নি।

তাহলে মিস্টার ওলিনের ও-কথা বলার মানে কি? তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই, হ্যারিসন।

কী কাণ্ড! আমি ভেবেছিলাম যে তুমি ছুরি বসাবার জন্য আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছো।

হ্যারিসন বিশদ করে বললো, আজ সকালে মিস্টার ওলিন এখানে এসে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে আমাকে দেখা মাত্র তুমি আমার বুকে ছুরি বসিয়ে আমাকে খুন করে ফেলবে। তিনি বলেন যে আমি নাকি তোমাকে অপমান করেছি এবং তুমি সেজন্য রেগে আমার উপর আগুন হয়ে আছো। কিন্তু আমি কখনো তোমার সম্পর্কে ওকে কিছু বলি নি।

হ্যারিসন তখনো আমার মুখের দিকে তাকায় নি। সে উঠে দাঁড়ায়।

আমি বললাম, আর আমিও তোমার সম্পর্কে ওকে কিছু বলি নি।

অবশেষে সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। এবার আমি একটু ভালো বোধ করি। আমরা দুটি কৃষ্ণাঙ্গ বালক, প্রত্যেকেই সপ্তাহে দশ ডলার মজুরিতে চাকুরি করছি, এখন একে অন্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, মনে মনে ভাবছি, অনুপস্থিত শ্বেতাঙ্গ লোকটির উদ্দেশ্য কী হতে পারে তার তুলনামূলক বিচার করছি, প্রত্যেকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি অপরজনকে কি বিশ্বাস করা যায়।

আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু মিস্টার ওলিন কেন আমাকে ওরকম কথা বলবেন?

হ্যারিসন তার মাথা নিচু করে, তার হাতের স্যান্ডউইচ এক পাশে সারিয়ে রাখে, তারপর তোৎলাতে থাকে, আমি... আ...মি...

সে তার পকেট থেকে একটা লম্বা, চকচকে ছুরি বের করে। খাপ খোলা। সে বললো, তুমি কী করো সেটা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম...

আমি দুর্বল ভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াই, আমার গা গুলিয়ে ওঠে, আমার চোখ ছুরির তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলার উপর আটকে থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাকে ছুরি মারতে?

ও বললো, তুমি যদি আমাকে ছুরি মারতে তাহলে তুমি ছুরি চালাবার আগেই আমি আমার ছুরি চালাতাম। আমি কোনো ঝুঁকি নিতাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছো?

হ্যারিসন অস্বস্তির সঙ্গে বললো, শোনো, কারও উপর আমার কোনো রাগ নাই।

ছুরিকাহত হওয়ার কতো কাছে যে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম সেটা আমি উপলব্ধি করি। আমি যদি হঠাৎ করে হ্যারিসনের সামনে এসে পড়তাম তা হলে সে মনে করতো যে আমি তাকে খুন করার জন্য এসেছি, আর তক্ষুনি সে আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতো। হয়তো খুনই করে ফেলতো। আর একটা নিগার যদি আরেকটা নিগারকে খুন করে ফেলে তাতে কার কী এসে যায়?

আমি বললাম, শোনো, মিস্টার ওলিনের কথা বিশ্বাস করো না।

হ্যারিসন বললো, হ্যাঁ, এখন আমি বুঝতে পারছি। উনি আমাদের নিয়ে একটা জঘন্য খেলা খেলছেন।

তিনি বিনা কারণে, শুধু শুধু, আমরা যেন একে অন্যকে খুন করি তার চেষ্টা করছেন।

হ্যারিসন জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু কেন তার এমন ইচ্ছা হচ্ছে?

আমি আমার মাথা নাড়ি। হ্যারিসন বসে কিন্তু তখনো সে তার খোলা ছুরি নাড়াচাড়া করছিল। আমার সন্দেহ হয়। ওকি সত্যি সত্যি আমার উপর ঝেঁপে আছে? ওকি অপেক্ষা করে আছে, আমি পেছন ফিরলেই আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে? আমার বুকের ভেতরা যন্ত্রণায় মুচড়ে যেতে থাকে।

আমি জোর করে হেসে উঠে বললাম, আমাদের নিম্নশ্রেণীর মারামারি করতে দেখলে বোধ হয় শ্বেতাঙ্গরা খুব মজা পায়।

হ্যারিসন বললো, কিন্তু তুমি তো আমাকে খুন করে ফেলতে পারতে!

আমি বললাম, শ্বেতাঙ্গদের কাছে আমরা তো কুকুর কিংবা রাতা মোরগের মতো।

হ্যারিসন বললো, আমি তোমার গায়ে ছুরি চালাতে চাই না।

আমি বললাম, আর আমিও তোমার গায়ে ছুরি চালাতে চাই না।

পরস্পরের হাতের আওতার বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করি। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে অমাদের এই আলোচনার কথা আমরা কাউকে বলবো না। মিস্টার ওলিন যে আমাদের একে অন্যের সঙ্গে মারামারি করার জন্য উসকে দিচ্ছেন এবং আমরা যে একথা জানি, তা আমরা ওকে জানতে দেবো না। ভবিষ্যতের সব উস্কানি উপেক্ষা করতে আমরা একমত হই। বেলা একটার সময় আমি কারখানায় ফিরে যাই। মিস্টার ওলিন আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর আচরণ রাশভারি, মুখ গম্ভীর।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই হ্যারিসন নিগারটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

আমি মিথ্যা কথা বলি, না, স্যার।

ও কিন্তু এখনো তোমার জন্য ছুরি নিয়ে তৈরি হয়ে আছে।

আমার ভেতরে তীব্র ঘৃণা জমাট বেঁধে ওঠে কিন্তু আমি আমার মুখকে রাখি নির্বিকার।

তিনি বললেন, তুমি একটা ছুরি কিনেছো?

না, স্যার।

আমারটা ব্যবহার করতে চাও তুমি? বুঝতে পারছো তো, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে।

আমি বললাম, না, স্যার, আমি ভীত নই।

তিনি রেগে উঠে বললেন, নিগার, তুমি একটা গর্দভ। ওই নিগারটা তোমার বুকে ছুরি চালিয়ে তোমার কলজে কেটে বের করে আনবে তুমি কি তাই চাও? ওর মনিব তোমার বুকে ছুরি বসাবার জন্য ওকে একটা ছুরি দিয়েছে! এই ছুরিটা নাও, নিগার, আর বোকার মতো আচরণ করো না!

তার দিকে তাকাতে আমার ভয় করে। তার দিকে তাকালে আমাকে বলতে হবে তিনি যেন আমাকে একা থাকতে দেন, বলতে হবে যে তিনি যে মিথ্যা কথা বলছেন তা আমি জানি, তিনি যে আমার কোনো বন্ধু নন তাও আমি জানি, এটাও আমি জানি যে কেউ আমার হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দিলে তিনি শুধু উচ্চস্বরে হেসে উঠবেন। কিন্তু আমি কোনো কথা বলি না। তিনি হলেন কর্তা, আর আমাকে পছন্দ না হলেই তিনি আমাকে বরখাস্ত করতে পারেন। তিনি আমার হাত থেকে এক ফুটের মতো দূরে বেঞ্চের কিনারায় একটা খাপখোলা ছুরি নামিয়ে রাখলেন। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে, ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে ওর বুকে আমূল বসিয়ে দিই! কিন্তু ওরকম কিছুই আমি করি না। আমি ছুরিটা আমার হাতে তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখি।

মিস্টার ওলিন বললেন, এখন একটা বুদ্ধিমান নিগারের মতো আচরণ করছো তুমি।

আমি আমার কাজ করে চলি। মিস্টার ওলিন তার মেশিন থেকে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। পরে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি আমাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, শোনো, ছোকরা, আমরা ওই হ্যারিসনকে বলে দিয়েছি ও যেন এই দালানের কাছে ধারে না আসে, আর তোমাকে যেন একটুও না ঘাঁটায়। বুঝেছো? কিন্তু তুমি যখন বাড়ি ফিরবে তখন তো আর আমরা তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না। বাড়ি ফেরার পথে ওই নিগার যদি তোমাকে আক্রমণ করে তাহলে ও তোমার বুকে ছুরি বসাবার আগেই তুমি ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে, বুঝলে?

আমি তার মুখের দিকে তাকাই না। আমি চুপ করে থাকি।

মিস্টার ওলিন বললেন, ঠিক আছে, নিগার, তুমি যা ভালো বোঝো তাই কোরো, কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিই নি, সেকথা কখনো বোলো না।

চশমার কাচগুলি নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে পৌঁছে দেয়া ছিল আমার নিয়মিত কাজের অন্তর্ভুক্ত। সেই সময়ে আমি কয়েক মিনিট বাঁচিয়ে হ্যারিসনের সঙ্গে কথা বলার জন্য রাস্তার ওপারে ছুটে যাই। হ্যারিসনের মুখ গোমড়া, একটু লজ্জিতও, আমাকে বিশ্বাস করতে চায়, কিন্তু ভয় পায়। ও আমাকে বললো যে মিস্টার ওলিন তার মনিবকে টেলিফোন করে বলেছেন তিন যেন হ্যারিসনকে জানিয়ে দেন যে ছ'টার সময় আমি ভবনের প্রবেশপথে তার জন্য অপেক্ষা করবো এবং তাকে ছুরিকাহত করবো। আমার আর হ্যারিসনের পক্ষে পরস্পরের দিকে তাকানো কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা খুব বিচলিত

হই, একে অন্যকে সন্দেহ করতে থাকি। আমরা যে পরস্পরের প্রতি সত্যিই ক্রুদ্ধ হয়েছি তা নয়। আমরা বুঝি যে আমাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবরাই পরস্পরকে খুন করার ধারণাটা আমাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমরা নিজেদের বারবার বলি যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমরা এক মত নই। আমরা নিজেদের বারবার বলি যে আমাদেরকে পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। তবু আমাদের দুজনের মনের গভীরেই একটা সন্দেহ জেগে থাকে, আমরা উভয়েই হয়তো পরস্পরকে খুন করার চেষ্টা করছি।

আমি বললাম, হ্যারিসন, তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।

হ্যারিসন লাজুক লাজুক মুখ করে বললো, আমি কারো সঙ্গে মারামারি করতে চাই না। তবু ও কিন্তু তার হাত নিজের পকেটে তার ছুরির উপর রেখে দেয়। আমরা দুজন একই লজ্জায় পীড়িত হই, শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্যের সামনে নিজেদের বোকা এবং দুর্বল অনুভব করি।

আমি বললাম, ওরা আমাদের একা একা থাকতে দিলেই আমি খুশি হই।

আমিও, হ্যারিসন বললো।

আমি বললাম, ফাইফরমাশ খাটার জন্য আমাদের মতো হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে আছে। আমরা একে অন্যকে খুন করলে ওদের কিছুই এসে যাবে না।

হ্যারিসন বললো, আমি জানি।

ও কি অভিনয় করছে? আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমরা মৃত্যুর ধারণা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, কিন্তু এর কারণ আমাদের জীবন থেকে উৎসারিত হয় নি, যে সব লোক আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে তারা তা আমাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমরা উভয়েই আমাদের অন্নজলের জন্য শ্বেতাঙ্গদের উপর নির্ভরশীল ছিলাম, আর প্রকৃতপক্ষে আমরা পরস্পরকে যতটা বিশ্বাস করতাম তার চাইতে বেশি বিশ্বাস করতাম শ্বেতাঙ্গদের। অথচ আমাদের নিজেদের জাতি-বর্ণের মানুষকে বিশ্বাস করার জন্য একটা আকুলতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করতো। হ্যারিসন ও আমি আবার পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই, আমরা শপথ নিই যে আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা যাই বলুক না কেন আমরা তাদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হবো না।

হ্যারিসন আর আমাকে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে ও পরস্পরকে ছুরিকাহত করতে উস্কানি দানের খেলাটা এক সপ্তাহ ধরে চলে। শ্বেতাঙ্গদের কথা যে আমরা বিশ্বাস করছি না, ওদের সেকথা বলতে আমাদের সাহস হয় না, কারণ তার অর্থ হতো এই যে আমরা ওদের মিথ্যাবাদী বলছি, অথবা তা এমন একটা তর্কাতর্কির জন্ম দিতো যার পরিণতি হতো আমাদের বিরুদ্ধে কোনো সহিংস কার্যক্রম।

কয়েকদিন পর এক সকালে মিস্টার ওলিন এবং শ্বেতাঙ্গদের একটি দল আমার কাছে জানতে চাইলো হ্যারিসনের সঙ্গে আমার বিরোধ আমি মুষ্টিযুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসা করতে রাজি আছি কিনা। আমি ওদের বললাম যে, আমি হ্যারিসনের ভয়ে ভীত না

হলেও ওর সঙ্গে লড়তে চাই না, আর মুষ্টিযুদ্ধও আমি করতে জানি না। আমি অনুভব করি যে ওদের যে আমি আর বিশ্বাস করছি না তা ওরা জেনে ফেলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কারখানা থেকে চলে আসার সময় হ্যারিসন দূর থেকে চিৎকার করে আমায় ডাকলো। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করতেই ও ছুটে আমার কাছে এলো। ও কি আমাকে ছুরি মারার জন্য এসেছে? কাছে এগিয়ে আসতেই আমি পেছনে সরে যাই। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি ভরে মুখে লাজুক হাসি ফুটিয়ে তুলি। আমরা থেমে থেমে ওজন করে কথা বলি।

হ্যারিসন জিজ্ঞাসা করলো, ওরা কি তোমাকে আমার সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ লড়তে বলেছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু আমি রাজি হই নি।

হ্যারিসনের মুখে আগ্রহের চিহ্ন দেখা দেয়। সে বললো, ওদের ইচ্ছা আমরা পাঁচ রাউন্ড লড়ি। আমরা প্রত্যেকে পাঁচ ডলার পাবো। ওহ, পাঁচ ডলার পেলে আমি নগদ দামে একটা স্যুট কিনতে পারবো। পাঁচ ডলার তো প্রায় আধা-সপ্তাহের মজুরি।

আমি বললাম, আমি লড়তে চাই না।

ও বললো, আমরা কেউ কাউকে ব্যথা দেবো না।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের জন্য এরকম একটা কাজ কেন করা?

পাঁচ ডলার পাবো সেই জন্য।

পাঁচ ডলারের জন্য আমার অতো ব্যগ্রতা নেই।

ওহ, তুমি ভীষণ বোকা। তারপরই সে তাড়াতাড়ি হেসে ওঠে।

আমি বললাম, দ্যাখো, তুমি হয়তো সত্যিই আমার উপর রেগে আছো...

সজোরে মাথা নেড়ে হ্যারিসন বললো, না, তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।

আমি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের জন্য লড়তে চাই না, আমি বললাম। আমি কুকুর না, রাতা মোরগ না।

আমি তীক্ষ্ণ চোখে হ্যারিসনকে লক্ষ্য করি। সেও আমাকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ চোখে। সে কি তার ব্যক্তিগত কোনো কারণে আমার সঙ্গে লড়াই করতে চায়? নাকি টাকাটার জন্য? হ্যারিসন বড় বড় চোখ করে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমাকে দেখে। সে আমার দিকে এক পা অগ্রসর হয় আর আমি এক পা পিছিয়ে যাই। সে বিব্রত ভাবে হাসে, তারপর বলে, টাকাটা আমার দরকার।

আমি জবাব দিই, না, আমি এর মধ্যে নেই।

সে নিঃশব্দে চলে যায়। তার ভঙ্গিতে ক্রোধ ফুটে ওঠে। আমি মনে মনে বলি, এবার ও ঠিক আমাকে ছুরি মারবে। আমাকে ওই গাধাটা সম্পর্কে খুব সাবধান থাকতে হবে।

আরো এক সপ্তাহ ধরে দুই কারখানার শ্বেতাঙ্গরাই আমাদের দুজনকে বারবার লড়তে বলে। হ্যারিসন আমার সম্পর্কে কী বলেছে তা নিয়ে তারা নানা গল্প বানায় এবং হ্যারিসনের দেখা পেলে অনুরূপ ভাবে আমার সম্পর্কে তারা তাকে নানা মিথ্যা কথা

বলে। আমাদের দেখা হলেই আমরা পরস্পর সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেতাম। আমরা হাসতাম কিন্তু একে অন্যের আওতার বাইরে থাকতাম। নিজেদের জন্য আমাদের লজ্জা বোধ হতো।

একদিন আমি যখন ঘরে ফিরছিলাম হ্যারিসন আবার আমাকে ডাক দিলো এবং মিনতি করে বললো, এই, এসো, আমরা মুষ্টিযুদ্ধটা লড়ি।

আমি বললাম, না, আমি চাই না। আর তুমি আমাকে এ ব্যাপারে আর কখনো কিছু বলবে না।

কথাটা আমি এতো জোরে ও কঠিন করে বলতে চাই নি, কিন্তু বলে ফেলি।

হ্যারিসন আমাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করে, আমিও ওকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করি। শ্বেতাঙ্গ মানুষরা আমাদের যে ছুরি দিয়েছিল সেই দুটি ছুরি এখনো আমাদের সঙ্গে আছে।

হ্যারিসন বললো, আমি ওই পাঁচ ডলার দিয়ে আমার এটা স্যুটের দাম পরিশোধ করে দিতে চাই।

আমি বললাম, ওই শ্বেতাঙ্গরা তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখবে, আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করবে।

হ্যারিসন বললো, তাতে, ঘোড়ার ডিম, হবেটা কি? শোনো, নিগার, ওরা তো সারাক্ষণই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, সারাক্ষণই আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে।

কথাটা সত্য, কিন্তু একথা বলার জন্য আমি ওকে ঘৃণা করি। আমার ইচ্ছা করে ওর মুখে একটা ঘুসি মারি, ওকে আঘাত দিই।

হ্যারিসন বললো, আমাদের হারাবার কি আছে?

আমি বললাম, তো, কিছু আছে বলে মনে হয় না।

একদম ঠিক। টাকাটা তো পাওয়া যাক, আর অন্য কিছুতে কিছু এসে যায় না।

আমি বললাম, এখন ওরা জানে যে আমাদের নিয়ে ওরা কী করতে চেয়েছিল আমরা তা জানি, আর এজন্য ওরা আমাদের আরো ঘৃণা করে।

কথাটা বলার জন্য আমার নিজের প্রতি আমার ঘৃণা হয়।

হ্যারিসন বললো, নিশ্চয়। আর তাই টাকাটা নেয়া যাক। পাঁচ ডলার তুমি কাজে লাগাতে পারবে, পারবে না?

তা পারবো।

তবে, এসো, লড়ি আমরা।

আমার নিজেকে একটা কুকুরের মতো মনে হবে।

হ্যারিসন বললো, ওদের কাছে আমরা দুজন দুটো কুকুরই তো।

আমি স্বীকার করি, হ্যাঁ, তাই। এবং আবারও আমার ওকে আঘাত করতে ইচ্ছা করে।

হ্যারিসন বললো, শোনো, ওই সাদাগুলোকে আমরা বোকা বানাবো। আমরা একে অন্যকে সত্যিকার আঘাত দেবো না, শুধু ভান করবো। বুঝেছো? আমরা ওদের দেখিয়ে দেবো যে ওরা আমাদের যত বোকা ভাবে আমরা তত বোকা নই। বুঝলে?

কী জানি।

আরে, এটা তো শুধু অনুশীলণ। চার রাউন্ডের জন্য পাঁচ ডলার। তোমার ভয় করছে?

না।

তাহলে চলো, লড়ি।

আমি বললাম, ঠিক আছে। শুধু অনুশীলণই তো।

হ্যারিসন খুশি হয়। আমার মনে হয় এর সবটাই ভারি বোকামি। তা, জাহান্নামে যাক সব কিছু। আমি কাজটা করবো এবং সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু তবু আমার ভেতরে একটা অস্পষ্ট ক্রোধ জেগে থাকে, আর সেটা আমাকে ছেড়ে যায় না।

কারখানার শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলি যখন শুনলো যে আমরা লড়বো তখন তাদের উত্তেজনা যেন আর বাঁধ মানে না। ওরা আমাকে ঘুসি মারার নতুন নতুন কায়দা শেখাতে চাইলো। প্রতিদিন সকালে ওরা আমাকে ফিসফিস করে জানায় যে হ্যারিসন শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাঁচা পেঁয়াজ খাচ্ছে। আর হ্যারিসনের কাছ থেকে আমি শুনি যে ওরা ওকে বলেছে যে শক্তিবৃদ্ধির জন্য আমি কাঁচা মাংস খাচ্ছি। ওরা আমার প্রতিদিনের খাবার ওদের পয়সায় আমার জন্য কিনে দিতে চায় কিন্তু আমি তাতে অস্বীকৃতি জানাই। এ কাজটা করতে রাজি হওয়ার জন্য আমি লজ্জা বোধ করি, লড়াই থেকে সরে আসতে ইচ্ছা করে আমার, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় সে-চেষ্টা করলে ওরা আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে যাবে। আমি অনুভব করি যে শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলি যদি, অন্য কোনো কারণে নয় তাদের নিছক আমোদের জন্য, দুটি কৃষ্ণাঙ্গ বালককে পরস্পরকে ছুরিকাঘাত করার জন্য চাপ দিতে পারে তাহলে হঠাৎ রাগের মাথায় কিংবা কোনো ক্ষণিক আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় একটা কৃষ্ণাঙ্গ বালকের মাথায় একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন শক্ত আঘাত হানা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন কিছু হবে না।

লড়াইটা হলো একদিন শনিবার বিকালে, মেইন স্ট্রিটের একটি দালানের বেসমেন্টে। কংক্রিটের মেঝের এক কোণায় একটা টুপি রাখা ছিল। লড়াই দেখতে আসা প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ তার নির্ধারিত অংশের মুদ্রা তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল। বেসমেন্টে একমাত্র শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল। কোনো মহিলা বা নিগ্রোকে ঢুকতে দেয়া হয় নি। হ্যারিসন ও আমি ছিলাম কোমর পর্যন্ত নগ্নদেহ। আমাদের মাথার উপর একটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে। ওরা আমার হাতে গ্লাভস বেঁধে দেয়। আমি হ্যারিসনের দিকে তাকাই। আমি দেখি যে তার চোখ আমাকে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে। ও কি ওর কথা রাখবে? সন্দেহ আমাকে নার্ভাস করে তোলে।

আমরা হাতে হাত ঠেকিয়ে নিজেদের অবস্থান নিই আর তখনই আমি উপলব্ধি করি যে আমি নিজেকে কিসের ভেতর ঠেলে দিয়েছি সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নে ভালো করে ভেবে দেখি নি। লড়াই করার অভিনয় করার ক্ষমতা আমার ছিল না।

একটা পাঁচ বছরের শিশুকেও ধোঁকা দেয়ার মতো কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান আমার বা হ্যারিসনের ছিল না। এখন লজ্জায় আমার সারা অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলি চিৎকার করছে, আমাদের উদ্দেশে অশ্লীল কাদর্য কথাবার্তা ছুড়ে দিচ্ছে।

ওই নিগারটার বাঁচি গুড়িয়ে দাও!

ঘুসি লাগাও ওই নিগারের মুখে!

এই, লড়ো, লড়ো, হারামজাদা নিগারের বাচ্চা!

হারামজাদার আসল জায়গায় ঘুসি মারো!

রক্ত ঝরাও!

আমি হাল্কা ভাবে আমার বাঁ হাত চালাই। কিছু বুঝে উঠবার আগেই হ্যারিসনের একটা মুষ্টাঘাত আমার মাথার উপর এসে সজোরে পড়ে। আমি সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় নিজের অজান্তেই, আমার ডান হাত দিয়ে হ্যারিসনের মুখের উপর প্রবল বেগে আঘাত করি। সেখানে রক্ত দেখা দেয়। হ্যারিসন আমার নাকের উপর ঘুসি বসিয়ে দেয়। সত্যিকার লড়াই শুরু হয়ে যায়, এবং তা হয় আমাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার নিজেকে মনে হয় ফাঁদে ধৃত। আমার দারুন লজ্জা বোধ হতে থাকে। আমি আরো জোরে আমার হাত চালাই, আর আমি যতো জোরে আঘাত করি হ্যারিসনের ঘুসিও তত জোরালো হতে থাকে। আমাদের পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির আর কোনো অর্থ নেই এখন। আমরা কঠিন চার রাউন্ড লড়ি, সজোরে আঘাত করি, হাত চালাই, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি, থুতু ফেলি, শাপশাপান্ত করি, আর্তনাদ করি, রক্ত ঝরাই। নিজেদেরকে এই ভাবে ক্রীড়নকে পরিণত হতে দেবার জন্য আমরা যে লজ্জা ও ক্রোধ অনুভব করি তা সঞ্চারিত হয় আমাদের মুষ্টাঘাতে। আমাদের চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসে আমাদের প্রায় অন্ধ করে দেয়। যে লোকগুলিকে আমরা ধোঁকা দিতে চেয়েছিলাম তাদের প্রতি আমরা যে ঘৃণা অনুভব করি তা এখন আমাদের পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত ঘুসির মধ্যে স্থান করে নেয়। শ্বেতাঙ্গরা রাউন্ডগুলিকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, আর আমরা দুজনই থামতে ভয় পাই, পাছে প্রবল একটা ঘুসির আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়ি। অবসন্ন হয়ে যখন আমাদের মাটিতে লুটিয়ে পড়ার মতো অবস্থা হয় তখন ওরা আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে টেনে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

আমি হ্যারিসনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। আমি ওকে ঘৃণা করি। আমার নিজেকে আমি ঘৃণা করি। আমি আমার হাতের মুঠিতে আমার পাঁচ ডলার আঁকড়ে

ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরি। এর পর থেকে হ্যারিসন আর আমি পরস্পরকে এড়িয়ে চলি। আমরা প্রায় কোনো কথাই বলি না। শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলি আমাদের মধ্যে আরো লাড়াই-এর আয়োজন করার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে অস্বীকৃতি জানাবার মতো বুদ্ধি আমাদের হয়ে গিয়েছিল। ওরা অন্য কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের মধ্যে আরো মুষ্টিযুদ্ধের আয়োজন করে, আর ওদের এই সব পরিকল্পার কথা শুনলেই আমি সে-জায়গা থেকে সরে পড়তাম। আমার মনে হতো আমি নোংরা একটা কাজ করেছি, আর তার জন্য উপযুক্ত অনুশোচনা আমি কখনোই করতে পারবো না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

একদিন সকালে আমি বেশ আগে কাজে পৌঁছে গেলাম। আমি তখন ব্যাকের লবিতে যাই। নিগ্রো দারোয়ানটি ধোয়া-মোছার কাজ করছিল। আমি একটা কাউন্টারে বসিয়া মেক্সিসের কমার্শিয়াল অ্যাপিল পত্রিকাটি হাতে তুলে নিয়ে, আমার নিবন্ধের সংকলনটা শুরু করি। অবশেষে সম্পাদকীয় পাতায় পৌঁছে আমি জনৈক এইচ, এল, মেনকেন-কে নিয়ে লেখা একটা প্রবন্ধের কাছে এসে পড়ি। আমি লোকমুখে শুনেছিলাম যে, তিনি আমেরিকান মার্কারি পত্রিকার সম্পাদক, কিন্তু এর বাইরে তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানতাম না। প্রবন্ধটি ছিল মেনকেনের কঠোর নিন্দা ও তীব্র আক্রমণে পূর্ণ। সেটা শেষ হয় একটা ক্রুদ্ধ ছোট্ট বাক্য দিয়ে : 'মেনকেন এক নির্বোধ ব্যক্তি।'

আমি মনে মনে ভাবি, এই মেনকেন লোকটা কী করেছে– যার জন্য দক্ষিণ তার উপর এ রকম ঘৃণার পসারা উজাড় করে দিচ্ছে? দক্ষিণে আমি কোবল নিগ্রোদের নিন্দার পাত্র হতে দেখেছি আর লোকটা নিগ্রো নয়। তাহলে মেনকেন কী জাতীয় ধ্যান ধারণার বাহক যার কারণে কমার্শিয়াল অ্যাপিল এর মতো একটি পত্রিকা প্রকাশে তার এমন কঠোর নিন্দা করছে? কোনো সন্দেহ নেই যে সে এমন সব ধারণা প্রচার করছে, দক্ষিণ যা পছন্দ করে না। তাহলে কি নিগ্রো ছাড়াও এমন লোক আছে, যারা দক্ষিণের সমালোচনা করে? আমি জানতাম যে গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করতো, কিন্তু আমি আমার জীবনে ওই রকম ঘৃণা কোথাও দেখি নি। ওই সময় মেনকেন সম্পর্কে আর কিছু না জেনেও লোকটির প্রতি আমার একটা অস্পষ্ট সহানুভূতি জাগে। যে দক্ষিণ আমাকে একজন নন্-ম্যান বা একজন না-মানুষের ভূমিকা প্রদান করেছে, সেই দক্ষিণ কি তাকে কঠোরতম ভাষায় আক্রমণ করছে না?

তো, এখন এই মেনকেন সম্পর্কে আমি আরো তথ্য কিভাবে পাবো? নদী তীরের কাছে একটা বিশাল লাইব্রেরি ছিল কিন্তু আমি জানতাম যে তার বই-এর তাকগুলির কাছে যাবার অধিকার নিগ্রোদের ছিল না। ঠিক যেমন নগরীর পার্ক এবং খেলার মাঠগুলিতে যাবার অধিকারও তাদের ছিল না। আমাদের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্বেতাঙ্গদের জন্য বই আনতে কয়েকবারই আমি ওই লাইব্রেরিতে গিয়েছি। এখন ওদের মধ্যে বই-এর ব্যাপারে কে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন? এবং যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমি কাজ করি তাদের দুর্ভাবনায় না ফেলে আমি কেমন করে সে সব বই পড়তে পারবো? আমি এ পর্যন্ত আমার চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতিকে তাদের কাছ থেকে সাফল্যের সঙ্গে গোপন রাখতে পেরেছি কিন্তু এখন এই বই পড়ার ব্যাপারটায় যদি আনাড়ির মতো কিছু করে

ফেলি, তাহলে যে ওদের বৈরিতার শিকার হবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি লোকগুলির ব্যক্তিত্বের দিকটা খুঁটিয়ে দেখি। ডন ইহুদি, কিন্তু ওকে আমার বিশ্বাস হয় না। ওর অবস্থান আমার চাইতে খুব বেশি ভাল নয়, আর আমি জানতাম যে, ও অস্বস্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ডন সব সময় আমার সঙ্গে কাঠখোট্টা আচরণ করেছে, তার ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গির মধ্যে আমার প্রতি তার তাচ্ছিল্য গোপন থাকে নি। তার কাছে আমার বই-এর ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আমার ভয় করে। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তার বর্ণবাদী সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতায় সে হয়তো আমার বই-এর ব্যাপারে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে।

তাহলে কি কর্তাকে ধরবো? না, তিনি একজন ব্যাপ্টিস্ট, আর আমার সন্দেহ হয়, একটি কৃষ্ণাঙ্গ বালক কেন মেনকেন পড়তে চাইবে– তা তাঁর বোধগম্য হবে না। কারখানায় আরো কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কাজ করতো কিন্তু তাদের আচার-আচরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যেতো যে তারা হয় কু ক্লুস ক্ল্যানের সদস্য, নয়তো তাদের সমর্থক, আর তাই তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া ছিল প্রশ্নের বাইরে।

বাকি থাকতো শুধু একজন, যার মনোভঙ্গি নিগ্রো-বিরোধী শ্রেণীর সঙ্গে খাপ খেতো না। আমি অন্য শ্বেতাঙ্গদের তাকে পোপ-প্রেমিক বলে উল্লেখ করতে শুনেছি। তিনি ছিলেন আইরিশ ক্যাথলিক এবং দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে ঘৃণা করতো। আমি জানতাম যে তিনি বই পড়েন, কারণ আমি অনেকবার তাঁর জন্য লাইব্রেরি থেকে বই এনে দিয়েছি। যেহেতু তিনিও ছিলেন ঘৃণার পাত্র তাই আমার মনে হয় যে তিনি আমার অনুরোধ প্রত্যাখান করলেও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আমি ইতস্ততঃ করি, অজ্ঞেয় পরিণাম বাস্তবতাগুলি ওজন করি, বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি।

এক সকালে আমি ক্যাথলিক ভদ্রলোকটির টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তারপর নিচু গলায় বলি, আপনার কাছ থেকে আমি একটা অনুগ্রহ চাই।

কি সেটা?

আমি বই পড়তে চাই কিন্তু লাইব্রেরি থেকে বই আনার কোনো উপায় নেই আমার। আমি ভাবছিলাম, আপনি কি আমাকে আপনার কার্ডটা ব্যবহার করতে দেবেন?

তিনি সন্দেহভরা চোখে আমাকে লক্ষ্য করলেন, তারপর বললেন, বেশির ভাগ সময় আমার কার্ড তো ভরা থাকে।

আমি বললাম, ওহ্। তারপর নীরব প্রশ্নটা জাগিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে থাকি।

তিনি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমাকে কোনো ঝামেলায় ফেলতে চাইছো না তো, ছোকরা?

ওহ্, না, স্যার।

তুমি কী বই পড়তে চাও?

এইচ, এল, মেনকেনের বই?

তাঁর কোন বই?

আমি জানি না। তিনি কি আরও বই লিখেছেন?

অনেক বই লিখেছেন তিনি।

আমি জানতাম না।

তো, তুমি মেনকেন পড়তে চাও কেন?

ওহ্, আমি খবরের কাগজে তাঁর নাম দেখেছি।

তিনি বললেন, তুমি যে বই পড়তে চাও সেটা ভাল কথা, কিন্তু তোমাকে ঠিক তিনিসগুলো পড়তে হবে।

আমি চুপ করে থাকি। তিনি কি আমার পড়াশোনা তত্ত্বাবধান করতে চাইবেন?

তিনি বললেন, আমি একটু ভেবে দেখি। একটা উপায় আমি বের করতে পারবো।

আমি চলে যাবার উদ্যোগ নিতেই তিনি আমাকে আবার ডাকলেন, কিছুটা পরিহাসের দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করলেন, তারপর বললেন, রিচার্ড, অন্য শ্বেতাঙ্গদের কাছে এ বিষয়ের উল্লেখ করো না।

আমি বললাম, আমি বুঝতে পারছি। আমি কোনো কথা বলবো না।

কয়েকদিন পর তিনি আমাকে কাছে ডেকে বললেন, আমার স্ত্রীর নামে একটা কার্ড আমার কাছে আছে। এই নাও, এটা আমার কার্ড।

থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

তোমার কি মনে হয় তুমি এটা কাজে লাগাতে পারবে?

খুব ভালভাবেই পারবো।

ওরা সন্দেহ করলে তুমি বিপদে পড়বে।

আমি বললাম, আমাকে বই আনবার জন্য লাইব্রেরিতে পাঠাবার সময় আপনি যে রকম চিঠি দিতেন আমিও সেই রকম চিঠি লিখবো, তারপর আপনার নাম সই করে দেবো।

তিনি হেসে উঠলেন। ঠিক আছে, যাও। দেখি তুমি কতটুকু পারো।

সেদিন বিকালে আমি চিঠি জাল করার কাজে মন দিলাম। এখন এইচ, এল, মেনকেনের কি কি বই এর নাম লিখবো? আমি তো একটা নামও জানি না। অবশেষে আমি এমন একটা চিঠি লিখলাম, যা আমার কাছে মনে হলো একেবারে মোক্ষম– প্রিয় ম্যাডাম, আপনি কি এই নিগারটার হাতে– আমি নিগার কথাটা ব্যবহার করলাম, যেন লাইব্রেরিয়ান এই পত্রের সম্ভাব্য লেখক বলে আমাকে কিছুতেই বুঝতে না পারেন– এইচ, এল, মেনকেন রচিত কয়েকটা বই পাঠিয়ে দেবেন? এর নিচে আমি শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটির সই জাল করে বসিয়ে দিলাম।

শ্বেতাঙ্গ লোকদের জন্য বই আনতে আমি যেভাবে লাইব্রেরিতে ঢুকতাম আজো সেইভাবে সেখানে ঢুকলাম, কিন্তু আজ আমার ভয় হলো, আমি হয়তো একটা কোনো

ভুল করবো এবং ধরা পড়ে যাবো। আমি আমার মাথার টুপি খুলে টেবিলের কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়াই এবং যথাসম্ভব একজন অপড়ুয়ার মতো চেহারা করে শ্বেতাঙ্গদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। এক সময় টেবিলের সামনেটা ফাঁকা হয়ে যায়। তখনো আমি দাঁড়িয়ে থাকি। শ্বেতাঙ্গিনী লাইব্রেরিয়ান আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি দরকার, ছোকরা? আমার যেন কথা বলবার শক্তি নেই এমনিভাবে এক পা অগ্রসর হয়ে, ঠোঁট না ফাঁক করে, আমি শুধু তার হাতে ভাল করা চিঠিটা তুলে দিলাম।

লাইব্রেরিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, মেনকেনের কি বই চান তিনি?

তাঁর চোখের দিকে না তাকিয়ে আমি উত্তর দিই, আমি জানি না, ম্যাম।

এই কার্ড তোমাকে কে দিয়েছেন?

মিস্টার ফক।

উনি কোথায়?

কাজে ব্যস্ত আছেন, এম. অফিক্যাল কোম্পানিতে। আমি তাঁর জন্য বই নিতে আগেও এখানে এসেছি, ম্যাম।

আমার মনে আছে, কিন্তু তিনি কখনো এ রকম চিঠি আগে লেখেন নি।

হা, ঈশ্বর! উনি সন্দেহ করছেন। বইগুলি হয়তো আমাকে দেবেন না উনি? ওই মুহূর্তে তিনি যদি পেছন ফিরতেন তাহলে আমি তক্ষুণি এক ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতাম এবং আর কখনো এখানে ফিরে আসতাম না। তারপরই আমার একটা সাহসী পদক্ষেপের কথা মনে হলো। আমার বুক তখন ধড়ফড় করছে। আমি বললাম, আপনি ওঁকে ফোন করে দেখতে পারেন, ম্যাম।

তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে এসব বই পড়ছে না তো?

ওহ্, না ম্যাম। আমি পড়তে পারি না।

তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, উনি কি জন্য যে মেনকেন পড়তে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।

আমি তখন বুঝে গেলাম যে আমি জিতেছি। তিনি এখন অন্য কথা ভাবছেন, বর্ণবাদের বিষয়টি তার মন থেকে উঠে গেছে। তিনি তাকের কাছে যান, দু'একবার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখেন, যেন এখনো সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত নন। শেষে দুটি বই হাতে নিয়ে তিনি ফিরে এসে বললেন, এই দুটি বই পাঠাচ্ছি ওর জন্য, কিন্তু পরের বার মিস্টার ফককে নিজে আসতে বলবে, অথবা কি বই তিনি চান তার নাম লিখে দিতে বলবে। তিনি কি বই পড়তে চান আমি জানি না।

আমি চুপ করে থাকি। তিনি কার্ডে ছাপ মেরে আমাকে বই দুটো দিলেন। ও দুটোর দিকে তাকাতে আমার সাহস হলো না। আমি লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসি। আমার ভয় হচ্ছিলো আরো প্রশ্ন করার জন্য তিনি হয়তো আবার আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

লাইব্রেরি থেকে এক ব্লক দূরে এসে আমি একটা বই খুলে তার নাম পড়ি : এ বুক অব প্রিফেসেস। সামনের জন্মদিনে আমি উনিশে পড়বো, আমি বইটার পাতা উল্টাই আর অপরিচিত শব্দ এবং অচেনা সব নাম আমার চোখে পড়ে। আমি হতাশ হয়ে মাথা নাড়ি। অন্য বইটির দিকে তাকাই আমি। এটার নাম প্রেজুডিসেস। এ শব্দটার অর্থ আমি জানি। আমার সারা জীবন আমি এটা শুনেছি আর সঙ্গে সঙ্গে আমি মেনকেনের বই সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাই। একটা লোক কেন তার বই-এর নাম রাখবে প্রেজুডিসেস? বর্ণবাদী ঘৃণার সঙ্গে আমার স্মৃতিতে পক্ষপাতদুষ্ট পূর্ব-সংস্কার কথাটি এমনভাবে বাঁধাই হয়ে গিয়েছিল যে ওই রকম একটি শব্দ দিয়ে যে কেউ তার বই-এর নামকরণ করতে পারে আমি তা কল্পনাও করতে পারি না। মেনকেন সম্পর্কে আমি হয়তো একটা ভুল করেছি? যে লোকের পূর্ব-সংস্কার থাকে সে তো সঠিক হতে পারে না।

বইটা মিস্টার ফককে দেখাবার পর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আমি তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, লাইব্রেরিয়ান আপনাকে ফোন করতে পারেন।

তিনি বললেন, সেটা ঠিক আছে, তবে বই দুটো পড়ার পর তুমি এর মধ্য থেকে কি পেলে তা আমাকে এসে বলবে, কেমন?

সেদিন রাতে আমার ভাড়া নেয়া ঘরের বেসিনে আমার শুয়োরের মাংস আর সীমের টিনের উপর গরম জল ছেড়ে দিয়ে আমি এ বুক অব প্রিফেসেস খুলে পড়তে শুরু করি। তাঁর রচনা শৈলী, বড় ও চড়া বাক্যাবলীর স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন ভঙ্গি আমাকে একটা ধাক্কা দেয়। এভাবে লিখেছেন কেন তিনি? এবং এ রকম করে এখন লেখককে দেখি এক ক্রুদ্ধ দানবরূপে, কলম দিয়ে সব কিছু ফ্যালিফালি করে দিচ্ছেন, ঘৃণায় জ্বলে যাচ্ছেন, যা কিছু মার্কিনী তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন, যা কিছু ইউরোপীয় অথবা জার্মান, তার উচ্চ প্রশংসা করছেন, মানুষের দুর্বলতা দেখে হেসে উঠছেন, বিদ্রূপ করছেন ঈশ্বরকে, অথরিটিকে। কী এটা? আমি উঠে দাঁড়াই। এই শব্দাবলীর পেছনে যে বাস্তবতা আছে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

...হ্যাঁ, লোকটা যুদ্ধ করছে। শব্দ দিয়ে যুদ্ধ করছে। তিনি শব্দকে ব্যবহার করছেন একটা অস্ত্রের মতো, মানুষ যেভাবে একটা গদা ব্যবহার করে সেই ভাবে। শব্দ কি অস্ত্র হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে। তাইতো হয়েছে এখানে। তাহলে আমিও হয়তো শব্দকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে পারবো? না। আমি ভয় পাই। আমি পড়তে থাকি। যা আমাকে বিস্মিত করে তা তাঁর বক্তব্য নয়, আমি অবাক হয়ে ভাবি কেমন করে একটা মানুষের এসব কথা বলার মতো সাহস হয়।

মাঝে মাঝে আমি চোখ তুলে তাকাই, নিজেকে নিশ্চিত করতে চাই যে, ঘরে আমি একা আছি, আর কেউ নেই। কারা এই সব লোক যাদের সম্বন্ধে মেনকেন এতো আবেগদীপ্ত ভাবে লিখেছেন? কে আনাতোল ফ্রান্স? জোসেফ কনরাড? সিনক্লেয়ার লিউইস, শেরউড অ্যান্ডারসন, পন্তয়েডক্তি, জর্জ মুর, গুস্তাভ ফ্লবেয়ার মোপাসাঁ, তলস্তয়,

আর্নল্ড বেনেট, স্টিফেন ক্রেন, জোলা, নরিস, গোর্কি, বার্গস, ইবসেন, ব্যালজাক, বার্ণড শ, দ্যুমা, গো, টমাস মান, ও হেনরি, ড্রাইসার, এইচ. জি ওয়েলস, গোগোলে, টি.এস. এলিয়ট, জিদ, বোদলেয়ার, এডগার লী মাস্টার্স, স্ত্যাঁদাল, ভূর্গেনিভ, ডনেকার, নীলসে এবং আরো আরো অনেক? এরা কি সত্যি সত্যি বাস্তবের মানুষ? তাদের কি কোনো অস্তিত্ব আছে, বা ছিল? আর তাদের নামই বা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়?

আমি অনেক শব্দের সাক্ষাৎ পাই যার অর্থ আমি জানি না। আমি হয়ি অভিধানে তাদের অর্থ দেখে নেই, কিংবা তার আগেই অন্যত্র তার ব্যবহার দেখে মোটা পরিষ্কার বুঝে ফেলি। কিন্তু কি বিচিত্র এই জগৎ আমি যখন বইটা শেষ করি তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগে যে, এই জীবনে আমি সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এক সময় আমি লিখতে চেষ্টা করেছিলাম, অনুভূতির মধ্যে আমি বিপুল আনন্দ পেয়েছিলাম, আমার স্থূল কল্পনাকে আমি অবাধে বিচরণ করতে দিয়েছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞতা আমার স্বপ্ন দেখার প্রণোদনাকে ধীরে ধীরে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এখন তা আবার আমার মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো জেগে উঠলো। আমি বই-এর জন্য বুভুক্ষ হয়ে উঠলাম। নতুনভাবে দেখবার জন্য, লক্ষ্য করবার জন্য, আমি ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। আমি যা পড়ছি তা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার ব্যাপার ছিল না, এটা ছিল নতুন কিছু অনুভব করার ব্যাপার, নতুন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপার, যা পৃথিবীর চেহারাটাকে বদলে দেয়। প্রত্যুষের আলো দেখা দিলে আমি সীমা আর মাংস খাই। আমার নিজেকে মনে হয় মাতাল-মাতাল, নিদ্রাতুর। আমি কাজে যাই কিন্তু বই-এর মেজাজ আমার ভেতর থেকে অন্তর্হিত হয় না, সেটা চলতে থাকে, যা কিছু আমি দেখি, শুনি ও করি সেটা তাকে রাঙিয়ে দেয়। এখন আমার মনে হয় শ্বেতাঙ্গরা কী অনুভব করে তা আমি বুঝতে পারি। আমি একটা বই পড়েছি, যা তাদের জীবন ও চিন্তাধারার কথা বলেছে আর তাই আমি নিজেকে ওই বই-এর সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছি। অস্পষ্টভাবে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কেতাবী ধ্যানধারণায় আপ্লুত হয়ে আমি কি এমন আচরণ করবো যার ফলে শ্বেতাঙ্গরা আমাকে অপছন্দ করবে?

আমি আরো চিঠি জাল করি, আমার লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা বেড়ে যায়। বই পড়া একটা তীব্র অনুরাগে পরিণত হয়। আমার প্রথম পড়া গভীর উপন্যাস হলো সিনক্লেয়ার লিউইসের মেইন স্ট্রিট। ওই বই-এর মাধ্যমে আমি আমার মনিব মিস্টার জিরাল্ডকে দেখতে পাই এবং তাঁকে একটি আমেরিকান টাইপ রূপে শনাক্ত করি। অফিসে তাকে যখন তার গলফের ব্যাগ টেনে আনতে দেখি তখন আমার মুখে মৃদু হাসি ফোটে। কর্তা আর আমার মধ্যে আমি সব সময় একটা বিশাল ব্যবধান বোধ করতাম, এখনো দূরত্ব বোধ করি, কিন্তু তবে আগের চাইতে কাছাকাছি মনে হয়। এখন মনে হয় আমি যেন তাঁকে চিনি, তার সঙ্কীর্ণ জীবনে সীমানা যেন আমি অনুভব করি। আর এই সবই ঘটে জর্জ এফ, ব্যাবিট নামক এক কাল্পনিক ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা একটা উপন্যাস পড়ার ফলে।

উপন্যাসের কাহিনী বা আখ্যান ভাগ আমাকে তেতোটা আকর্ষণ করে না, যতটা করে তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত দৃষ্টিকোণ। আমি নিজেকে প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ঢেলে দিই, কিছুই হাতে রাখি না। আমি তার সমালোচনা করার চেষ্টা করি না। আমি যে ভিন্ন রকম একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি, তাই আমার জন্য যথেষ্ট হয়। আর আমার কাছে সব কিছুই ছিল ভিন্ন রকম। বই পড়া হয়ে ওঠে ওষুধের মতো, একটা নেশার মতো। কিন্তু আমার চারপাশের শ্বেতাঙ্গরা যে বুঝতে পারছে যে আমি বদলে যাচ্ছি, আমি ভিন্ন চোখে তাদের দেখতে শুরু করেছি, এই অপরাধ বোধ থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারি না।

আমি যখনই আমার কাজের জায়গায় কোনো বই নিয়ে যেতাম, তখনই তা খবরের কাগজে মুড়ে নিতাম। নানা শহরে, নানা পরিস্থিতিতে, বহু বছর পর্যন্ত আমার এ অভ্যাস অব্যাহত থাকে।

আমি ড্রাইসারের জেনি গারহার্ড ও সিস্টার ক্যারি পড়ি। পড়ার পর আমার মধ্যে আমার মায়ের দুঃখযন্ত্রণার বোধ নতুন করে সঞ্চারিত হয়। আমি অভিভূত হই। আমার জন্য নীরবতা নেমে আসে। আমার চারপাশের জীবন নিয়ে আমি ভাবি। এসব উপন্যাস থেকে আমি কী পাচ্ছি তা আমার পক্ষে কাউকে বলা ছিল অসম্ভব, কারণ আমি পাচ্ছিলাম জীবনের একটা সুস্পষ্ট বোধ, তার চাইতে কম কিছু নয়। আধুনিক উপন্যাসের এই বাস্তবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদের জন্য আমার গোটা জীবন আমাকে গড়ে তুলেছিল। এই সব উপন্যাস পড়ার ক্ষুধা যেন আমার আর মেটে না।

নতুন মেজাজ আর ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত হয়ে আমি এক তাড়া কাগজ কিনে আনি আর লেখার চেষ্টা করি কিন্তু কিছুই লিখতে পারি না, কিংবা যা লিখি তা হয় অকথ্য-রকম সাদামাটা। আমি আবিষ্কার করি যে লেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি ছাড়াও আরো কিছু জিনিস দরকার হয়। আমি লেখার চিন্তা বাদ দিই। তবু আমি ভাবতে থাকি, তাদের সম্পর্কে লেখার জন্য লোকজনকে কিভাবে আমি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারবো? জীবন এবং জনগণ সম্পর্কে কি আমি কখনো জানতে পারবো? আমার বিশাল অজ্ঞানতা ও জীবনে আমার জিম ক্রোত অবস্থানের জন্য আমার কাছে ওই অর্জন একটা অসম্ভব কাজ বলে মনে হয়। নিগ্রো হওয়ার অর্থ কি তা আমি এখন জানি। ক্ষুধা আমি সহ্য করতে পারতাম। ঘৃণার সঙ্গে জীবন যাপন করতে আমি শিখেছিলাম। কিন্তু এটা অনুভব করা যে এমন সব অনুভূতি আছে যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, জীবনের যা সত্যিকার হাওয়া তা আমার হাতের বাইরে থাকছে, সেটাই আর সব কিছুর চাইতে আমাকে বেশি ক্ষতবিক্ষত করে। আমার মধ্যে একটা নতুন ক্ষুধা জেগে ওঠে। আমার পড়াশোনা আমাকে উদ্দীপিত করার পাশাপাশি আমাকে বেদনাহতও করে। আমি দেখতে পাই কতো সম্ভাবনা ছিল, কতো কিছু আমি হারিয়েছি। আমার টানটান উত্তেজনা আমার মধ্যে ফিরে আসে। নতুন ভয়ঙ্কর, তিক্ত-প্রবলবেগে উদ্ভূত, আমি আর তা প্রায়

নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারি না। আমার চারপাশের জগৎ যে তৈরী, তা সে আমাকে মেরে ফেলছে, এখন আমি আর তা অনুভব করি না, আমি তা জানি। আমি লক্ষবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এ থেকে আমি নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবো, তার কোনো উত্তর আমি পাই না। আমার মনে হয় আমি চিরদিনের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত, চিরকালের জন্য প্রাচীর পরিবেষ্টিত। আমি আমার বইপড়া নিয়ে মিস্টার ফকের সঙ্গে– যিনি আমাকে তাঁর লাইব্রেরি কার্ড ধার দিয়েছিলেন, কোনো আলোচনা করি না। করলে তার অর্থ হবে আমার নিজের সম্পর্কে কথা বলা, আর সেটা ছিল ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। আমি প্রতিদিন মুচকি হাসি, আমার পুরানো আচরণ অব্যাহত রাখার জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করি, নিজেকে হাসিখুশি দেখাতে চাই, কিন্তু কতিপয় শ্বেতাঙ্গ মানুষ উপলব্ধি করে যে আমি কিছু জিনিস গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি।

একদিন মিস্টার ওলিন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এই ছেলে, জেগে ওঠো!

আমি বললাম, স্যার! এর চাইতে ভাল কোনো শব্দ আমি খুঁজে পেলাম না।

তোমার হাবভাব দেখে মনে হয় তুমি যেন কিছু চুরি করেছো।

আমি তাঁর প্রত্যাশিত ভঙ্গিতে হেসে উঠি, তবে আরো সচেতন থাকার সিদ্ধান্ত নিই, আমার প্রতিটি কাজের ওপর আমি আরো সতর্ক নজর রাখবো, যে নতুন জ্ঞান আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল তাকে সাবধানতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখবো।

আমি যদি উত্তরে চলে যাই, তাহলে কি সেখানে নিজের জন্য একটা নতুন জীবন নির্মাণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে? কিন্তু অস্পষ্ট এবং অগঠিত আকৃতির উপর নির্ভর করে কেমন করে একটা মানুষ নতুন জীবন গড়বে? আমি লিখতে চাই, অথচ ইংরেজী ভাষাটা পর্যন্ত আমি জানি না। আমি ইংরেজী ব্যাকরণের বই কিনে আনি কিন্তু আমার কাছে তা খুব নীরস মনে হয়। আমার মনে হয় ব্যাকরণের বই-এর চাইতে আমি উপন্যাসগুলির মধ্য থেকে ভাষার সুষ্ঠুতর বোধ লাভ করছি। আমি কঠিন পরিশ্রম করে প্রচুর পড়ি, যখনই আমার মনে হয় যে আমি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পেরেছি তখনই আমি তাকে ছেড়ে দিই। রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার গৃহকর্ত্রী মিসেস মস এক রবিবার সকালে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, এসব কি বই? যা তুমি দিন-রাত পড়ছো?

আমি বললাম, কিছু না, শুধু উপন্যাস।

এসব পড়ে তোমার কি কোনো লাভ হয়?

সময় কেটে যায়, ব্যস।

তিনি বললেন, কি জানি, আশা করি কি করছো তুমিই ভাল বুঝো। তিনি কথাটা এমন সুরে বললেন যাতে মনে হলো আমি কিছুই বুঝি না।

আমি যে সব বই পছন্দ করি তা আমি কোনো নিগ্রোকে কখনো পড়তে দেখি নি।

এসব বই-এর কথা তারা কখনো চিন্তা করেছে বলেও আমার মনে হয় না। আমি জানতাম যে নিগ্রো ডাক্তার, আইনজীবী ও সাংবাদিক আছে কিন্তু তাদের কারো সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। আমি যখন কোনো নিগ্রো সাংবাদপত্র পড়তাম তখন তার মধ্যে আমি আমার চিন্তাভাবনার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও দেখতে পেতাম না। আমার মনে হতো আমি যেন ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য আমি পড়া বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু বই-এর জন্য একটা অস্পষ্ট ক্ষুধা আবার এসে আমাকে অধিকার করতো, সেই সব বই যা অনুভূতি এবং দেখার নতুন দিগন্ত আমার সামনে খুলে দিতো, আর তখন আমি শ্বেতাঙ্গিনী লাইব্রেরিয়ানের কাছে নতুন একটা জরুরি চিঠি লিখতাম। আমি আবার পড়তে থাকি এবং একটি সরল ও অশিক্ষিত মানুষ যেভাবে পড়তে এবং ভাবতে পারে সেই ভাবে পড়ি ও ভাবি, আর প্রতিদিন নিজের মধ্যে বয়ে বেড়াই একটা গোপন অপরাধের বোঝা।

ওই শীতের সময় আমার মা ও ভাই এসে পড়ে আর আমরা সংসার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা কিস্তিতে আসবাবপত্র কিনলাম, বুঝতে পারি যে আমাকে ঠকানো হচ্ছে কিন্তু তা এড়াবার কোনো পথ দেখি না। আমি গরম খাবার খেতে শুরু করি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি যে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণের ফলে আমি দ্রুততর বেগে পড়তে পারছি। আমি নানা অসুখের মধ্য দিয়ে বেঁচে থেকেছি, কখনো সন্দেহ করি নি যে আমি অসুস্থ। আমার ভাই একটা কাজ পায়। আমরা উত্তরে চলে যাবার জন্য টাকা জমাতে থাকি, সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করি, যাত্রার আনুমানিক দিনক্ষণ ঠিক করি। আমি যে উত্তরে চলে যাবার পরিকল্পনা করছি এ কথা আমি আমার চাকুরি ক্ষেত্রে কোনো শ্বেতাঙ্গকে বলি না। আমি জানতাম, যে মুহূর্তে ওরা আমার উত্তরে চলে যাবার কথা জানবে, সে মুহূর্ত থেকেই আমার প্রতি তাদের আচরণ বদলে যাবে। তারা ভাববে যে, আমি এখানে যে জীবন যাপন করছি তা আমার পছন্দ নয়, এবং যেহেতু আমার জীবন তাদের কথা ও আচরণ দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হতো, সেহেতু তাদের মনে হবে যে আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করছি।

নিগ্রো হিসাবে দক্ষিণে আমার সুযোগ কতটুকু তা আমি এখন ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

আমি অন্য নিগ্রোদের সঙ্গে সংগঠিত হয়ে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়তে পারি, যেমন করেছিলেন আমার নানা। কিন্তু আমি জানতাম যে, ওই পথে আমি কোনোদিন জয়লাভ করতে পারবো না। সাদারা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি আর কালোরা অনেক কম। ওরা ছিল শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল। সরাসরি কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহ কখনো জয়যুক্ত হবে না। খোলাখুলিভাবে যুদ্ধ করলে আমি মারা যাবো আর আমি মরতে চাই না। বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার খবর প্রায়ই শোনা যেতো।

আমি আত্মসমর্পন করে একজন মিশুক ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে পারতাম

কিন্তু তা ছিল অসম্ভব। আমার সারা জীবন আমাকে গড়ে তুলেছিল আমার নিজের অনুভূতি ও চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে। আমি বেসের সঙ্গে মিটমাট করে তাকে বিয়ে করে উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়ি পেতে পারতাম। কিন্তু তাও হতো এক ক্রীতদাসের জীবন। তা করলে আমি আমার ভেতরের একটা জিনিসকে পিষে মেরে ফেলতাম এবং আমি নিজেকে ঘৃণা করতাম। যারা আত্মসমর্পন করে, সাদারা যে তাদের ঘৃণা করে তা আমার অজানা ছিল না। তা ছাড়া শর্টি যেভাবে পদাঘাত খাবার জন্য নিজেকে এগিয়ে দেয়, স্বেচ্ছায় তা করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার চাইতে বরং আমি মৃত্যুকে বেছে নিতাম।

আমি শর্টি এবং হ্যারিসনের সঙ্গে মারামারি করে আমার অস্থিরতা প্রশমিত করতে পারতাম। আমি অনেক নিগ্রোকে দেখেছি, যারা তাদের আত্মঘৃণা অন্য কালো চামড়াদের উপর স্থানান্তরিত করে তাদের সঙ্গে মারামারি করতো। তা করবার জন্য আমাকে কঠোর শীতল হতে হতো কিন্তু আমি তা ছিলাম না, আর কখনো হবেও না।

আমি অবশ্য যা কিছু পড়েছি তার কথা ভুলে যেতে পারতাম, শ্বেতাঙ্গদের কথা আমার মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতাম, তাদের কথা ভুলে যেতে পারতাম, যৌনতা আর সুরার মধ্যে আমার উদ্বেগ ও আকুলতা থেকে মুক্তি খুঁজে পেতে পারতাম। কিন্তু আমার বাবা নিজেকে যেভাবে পরিচালিত করেছিলেন সে কারণে ওই পথের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা জেগেছিল। আমি যখন চাই না যে, অন্যরা আমার জীবনকে লাঞ্ছিত করুক তখন আমি নিজে কেমন করে স্বেচ্ছায় সে কাজটা করবো?

একজন পেশাদার মানুষ হবার বিন্দুমাত্র আশা আমার ছিল না। আমার সব কিছু যেভাবে গড়ে উঠেছিল তাতে ওরকম হবার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, তা ছাড়া ওই রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার মতো ক্ষমতাও আমার ছিল না। সম্পদশালী নিগ্রোরা যে জগতে বাস করতো আমার কাছে তা প্রায় শ্বেতাঙ্গদের জগতের মতোই অচেনা ছিল।

তাহলে কী আছে? আমি প্রতিদিন আমার জীবনকে আমার মনের ভেতর, আমার চেতনার মধ্যে, ধরে রাখি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবো আর সেটাকে ছলকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেবো। চিরদিনের জন্য। আমার পড়াশোনা আমার এবং যে জগতে আমি বাস করি এবং যেখানে আমি আমার জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করছি তার মধ্যে একটা বিশাল ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছিল এবং প্রতিদিন ওই ব্যবধানের বোধ বেড়েই চলছিল। আমার দিন ও রাত্রিগুলো হয়ে দাঁড়ায় আতঙ্ক, উত্তেজনা ও উদ্বেগে পূর্ণ একটা দীর্ঘ, নীরব, অব্যাহত স্বপ্ন। কতদিন আমি এটা সহ্য করতে পারবো?

চতুর্দশ অধ্যায়

ম্যাগি খালা হঠাৎ আমাদের ওখানে মেফিনে বেড়াতে আসেন এবং সেটাই আমার উত্তরে যাবার পরিকল্পনাকে একটা বাস্তব ভিত্তি দান করে। ম্যাগি খালার স্বামী, যে আরকানসাস থেকে রাত দুপুরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি খালাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর খালা এখন নিজের জন্য জীবিকার খোঁজ করছেন। ম্যাগি খালা, আমার মা, আমার ভাই আর আমি সবাই মিলে দীর্ঘ আলোচনা করি, চাকরির সম্ভাবনা নিয়ে নানা কথা ভাবি, শিকাগোয় বাসা নিয়ে থাকতে গেলে কতো টাকা লাগবে সে কথা আলোচনা করি। আর যতবারই আমরা আলোচনা করি ততবারই আমরা হার মানি। আমরা এক সঙ্গে চারজন কিছুতেই যেতে পারবো না, ততো টাকা আমাদের নেই।

অবশেষে নির্ভেজাল ইচ্ছা এবং আশা প্রাধান্য বিস্তার করলো– সাধারণ জ্ঞান এবং বাস্তব তথ্যের ওপর। আমরা আবিষ্কার করলাম যে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার জন্য যদি আমরা অপেক্ষা করি তাহলে কোনোদিন আমাদের যাওয়া হবে না, প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা কোনোদিন জমাতে পারবো না। আমাদের জুয়া খেলতে হবে। অবশেষে ঠিক হলো ম্যাগি খালা আর আমি প্রথমে যাবো। যদিও তখন ছিল শীতকাল তবু আমরা যাবো এবং সেখানে আমার মা ও ভাই-র জন্য একটা জায়গা ঠিক করবো। তাহলে আগামী সপ্তাহ অথবা আগামী মাসের জন্য আর অপেক্ষা করা কেন? যাবোই যখন তখন এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়ি না কেন?

তারপর যে সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিলো তা হলো পরিচ্ছন্ন ও সাবলীলভাবে কোনো রকম তর্ক-বিতর্ক বা দৃশ্য সৃষ্টি না করে আমার চাকরি ছাড়ার ব্যাপারটা। আমি যে চলে যাচ্ছি এই খবরটা আমি আমার মনিবকে কিভাবে দেবো? হ্যাঁ, আমি এক অত্যন্ত সরল বালক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরবো। আমি তাঁকে বলবো যে আমার খালা আমাকে আর আমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মাকে শিকাগো নিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে তাঁর মনে ধারণা জন্মাবে যে, আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করছি না। এর ফলে তিনি যে আমার এই কাজটা অপছন্দ করছেন তা প্রকাশ করার পক্ষ তাঁর রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমি জানতাম ভিন্নতর বর্ণবাদী পরিবেশে বাস করার জন্য নিগ্রোদের অন্যত্র চলে যাওয়ার ধারণাকে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা ঘৃণা করতো।

আমার পরিকল্পনা সফল হয়। খবরটা আমি আমার যাত্রার দু'দিন আগে প্রকাশ করি। যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমি কাজ করতাম তাদের মধ্যে বৈরিতা জাগিয়ে তুলবার আশঙ্কায় আমি এর আগে তা করি নি। আমার মনিব তাঁর ঘোরানো চেয়ারে হেলান দিয়ে

আমার দিকে দীর্ঘক্ষণ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। তিনি এর আগে আমাকে আর এভাবে কখনো লক্ষ্য করেন নি।

তিনি নিচু গলায় বললেন, শিকাগো?

হ্যাঁ, স্যার।

ওখানে তোমার ভাল লাগবে না, ছোকরা।

তো, আমাকে তো আমার পরিবারের সঙ্গে যেতে হবে, স্যার।

অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা তাদের কাজ থামিয়ে আমাদের কথা শোনে। আমি আত্মসচেতন ও উত্তেজনা-উৎকণ্ঠায় টানটান হয়ে উঠি।

তিনি বললেন, ওখানে খুব ঠাণ্ডা।

আমি আমার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শীতল রেখে বলি, হ্যাঁ, স্যার, তাই তো সবাই বলে।

আমি তাঁকে লক্ষ্য করছি, বুঝতে পেরে তিনি অন্য দিকে তাকান এবং তিনি যে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন এবং এটা অপছন্দ করছেন তা লুকোবার জন্য তিনি অস্বস্তিভরে হেসে ওঠে ঠাট্টার সুরে বললেন, তো, দেখো, ওখানে গিয়ে হ্রদের মধ্যে পড়ে যেও না।

আমি বললাম, ওহ্, না, স্যার।

আমি মৃদু হাসি, যেন হঠাৎ লেক মিশিগানে পড়ে যাবার একটা সম্ভাবনা সত্যিই বাস্তবে বিরাজ করছে।

তিনি আবার গম্ভীর হয়ে যান, আমাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি মনে হয় তুমি ওখানে গিয়ে এখনকার চাইতে ভাল কিছু করতে পারবে?

আমি জানি না, স্যার।

এখানে তো তুমি ভালই করছিলে বলে মনে হয়।

যতটা সম্ভব আন্তরিকতা নিয়ে আমি মিথ্যা কথা বলি, ওহ্, হ্যাঁ, স্যার। আমার মা না গেলে আমি অবশ্যই এখানেই থাকতাম, এখানেই কাজ করতাম।

তো, থাকো না কেন? তুমি তোমার মাকে টাকা পাঠাতে পারো।

এবার তিনি আমাকে একটা ফাঁদে ফেলেন। আমি জানতাম যে আর আমি এখানে থাকতে পারবো না। আমি উত্তরে যেতে চেয়েছি এ কথা তাদেরকে বলার পর এখানে থাকলে আমি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমার সম্পর্ককে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না।

আমি বললাম, আমি আমার মায়ের সঙ্গে থাকতে চাই, স্যার।

তিনি অলস ভঙ্গিতে আবার বললেন, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে থাকতে চাও। তো, রিচার্ড, তোমার কাজ আমাদের ভাল লেগেছে।

একটা নীরবতা নেমে আসে। আমি অস্বস্তিভরে দাঁড়িয়ে থাকি, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যাই। তখনও নীরবতা বিরাজ করে। সাদা মুখগুলো বিচিত্রভাবে আমাকে লক্ষ্য করে। আমি উপরে উঠি। আমার মনে হয়, আমি যেন কোনো অপরাধ করছি।

খবরটা দ্রুত সারা কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। শ্বেতাঙ্গরা আমাকে নতুন চোখে দেখে। তারা আমার কাছে সরে আসে।

তাহলে তুমি উত্তরে যাচ্ছো, হুঁ?

হ্যাঁ, স্যার, আমার পরিবার আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

তোমাদের জন্য উত্তরটা ভাল জায়গা নয়, ছেলে।

কোনো রকমে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবো, স্যার।

উত্তর সম্পর্কে যে সব কাহিনী শোনো তা বিশ্বাস করো না কিন্তু।

না, স্যার, করি না।

তোমার বন্ধুরা এখানে আছে। তুমি এখানে ফিরে আসবে।

তো, স্যার, আমি জানি না।

ওখানে তুমি কেমন ব্যবহার করবে?

এখানে যেমন করছি, স্যার, সেই রকমই করবো।

না, তা করবে না। তুমি বদলে যাবে। উত্তরে গেলে নিগ্রোরা বদলে যায়।

আমার বলতে ইচ্ছা করে যে, বদলে যাবো বলেই তো আমি উত্তরে যাচ্ছি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। আমি বলি, আমি একই রকম থাকবো। আমি বোঝাতে চাই যে আমার মধ্যে কোনো কল্পনাশক্তি নেই।

এসব কথা বলার সময় আমার মনে হয় আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে বাস করছি। আমি মিথ্যা কথা বলতে চাই না, অথচ আমার অনুভূতি লুকোবার জন্য আমাকে মিথ্যা কথা বলতেই হয়। একটা সাদা সেন্সর আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্ন যেমন নিদ্রার নিরাপত্তার জন্য একটা পর্দা তৈরি করে তেমনি আমার মিথ্যা আমার জীবন্ত মুহূর্তগুলোর জন্য একটা নিরাপত্তার পর্দা তৈরি করে দেয়।

কর্তা বললেন, ছোকরা, আমি নিশ্চিত যে তুমি ওই বাজে বইগুলো খুব বেশি পড়েছো।

ওহ্, না, স্যার।

আমি পোস্ট অফিসে আমার শেষ ফরমাশ খাটি, আমার ব্যাগ সরিয়ে রাখি, হাত ধুই, মাথায় টুপি চাপাই। আমি কারখানার চারিদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই। বেশির ভাগ মানুষ তখনো কাজ করছে। দু'একজন মুখ তুলে আমাকে দেখে। মিস্টার ফককে আমি লাইব্রেরি কার্ড ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত, গোপন, মৃদু হাস্য করেন। আমি লিফটের কাছে যাই, শটির সঙ্গে নিচে নেমে আসি।

সে তিক্ত গলায় বললো, ভাগ্যবান হারামজাদা।

এ কথা বলছো কেন?

তুমি তোমার হতচ্ছাড়া টাকাগুলো জমিয়েছো আর এখন চলে যাচ্ছো।

আমি বললাম, আমার সমস্যা সবে শুরু হচ্ছে।

ও বললো, এখানে যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছো সে রকম আর কোথাও হবে না।

আমি বললাম, আমিও তাই আশা করি, কিন্তু জীবন বড় ধোঁকাবাজ।

মাঝে মাঝে আমি এখন ক্ষেপে যাই। আমার সবাইকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে। সে রেগে গিয়ে সবেগে থুতু ফেলে।

আমি বললাম, তুমি চলে যেতে পারো।

সে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললো, আমি এই অভিশপ্ত দক্ষিণ থেকে কখনো যাবো না। সব সময় আমি বলি যে যাবো, কিন্তু আমি যাবো না। আমি অলস। আমি বড় বেশি ঘুমাতে ভালবাসি। এখানেই মরবো আমি। অথবা ওরাই হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে।

আমি লিফট থেকে নেমে রাস্তায় পা দিই। আমার মনে হয় কেউ আমাকে পেছন থেকে ডাক দেবে, বলবে যে এই সব একটা স্বপ্ন, আমি কোথাও যাচ্ছি না।

এই সংস্কৃতি থেকেই আমি উঠে এসেছি। এই আতঙ্ক থেকেই আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ বিভীষিকা এবং বিজয় গৌরব

শিকাগোর কালো সমতলের বিস্তার যখন প্রথম আমার চোখে পড়ে তখন আমার মন খারাপ হয়ে যায়, আমি বিষণ্ন হয়ে উঠি। সে দৃশ্য আমার সমস্ত সুখ-কল্পনাকে বাধা করে। শিকাগোকে আমার মনে হয় এক অবাস্তব নগরী, যার বাড়িগুলি নির্মিত হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ কয়লার কঠিন মসৃণ খণ্ড দ্বারা, সেগুলো ধূসর ধোঁয়ায় ঢাকা, যার ভিত স্যাঁতস্যাঁতে প্রেইরির মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। থেকে থেকে চওড়া নিগর্ত বাষ্পের ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল, শীতের রৌদ্রালোকে তা অস্বচ্ছভাবে চমচক করছিল। নগরীর কোলাহল আমার চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে। বহু বছর যাবৎ তা সেখানে স্থায়ী হয়ে থাকে। বছরটা ১৯২৭ সাল।

এখানে আমার অবস্থা কেমন হবে? আমি কি টিকে থাকতে পারবো? আমার প্রত্যাশা ছিল খুব সামান্য। আমি একটা কাজ চাই। ক্ষুধা ছিল আমার দীর্ঘকালের নিত্য সঙ্গী। বইপড়া ছাড়া অন্য কোনো রকম আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদন ছিল আমার অজানা। আমার সারা জীবনে, আমি বহু মানুষ দ্বারা পরিবৃত থাকলেও, অন্যকোনো মানুষের সঙ্গে আমার কখনো একটি তৃপ্তিদায়ক স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, আর তা না গড়ে ওঠার ফলে আমি তার কোনো অভাবও বোধ করি না। অন্য কারো উপরে আমি কোনো দাবী করতাম না।

ট্রেন ডিপোতে প্রবেশ করে। ম্যাগি খালা আর আমি গাড়ি থেকে নেমে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ভিড়ের মধ্য দিয়ে স্টেশনে ঢুকি। আমি চারিদিকে তাকাই, সাদাদের জন্য, কালোদের জন্য, এ রকম কোনো চিহ্ন দেয়া আছে কিনা দেখার চেষ্টা করি। আমি কোনো লেখা দেখতে পাই না। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মানুষ চলাফেরা করছে, প্রত্যেকেই মনে হয় আপন আপন কাজে ব্যস্ত নিমগ্ন। জাতি-বর্ণগত শঙ্কার কোনো আভাস নেই। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকে এমনভাবে আচরণ করছে যেন সে ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই। একটা জনাকীর্ণ খবরের কাগজ বিক্রির জায়গায় আমি দেখি যে, এক শ্বেতাঙ্গ তার কাগজ কেনা শেষ করা পর্যন্ত একজন কৃষ্ণাঙ্গ অপেক্ষা না করে এগিয়ে গিয়ে নিজের কাগজটা কেনে, আর এ দৃশ্য আমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হয়। তবু, সব কিছু ছিল এতো নতুন যে আমি আবার উদ্বেগ-উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠি, তবে এটা ছিল এক নতুন ধরনের উত্তেজনা, যার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার পরিচয় হয় নি। আমি উপলব্ধি করি যে, এই যন্ত্র-নগরী চালিত হচ্ছে বিচিত্র সব আইন-কানুন দ্বারা। আমি কি কখনো তা আয়ত্ব করতে পারবো?

আমরা একটা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করি। আমরা ক্লিও খালার ওখানে যাবো, সাময়িকভাবে থাকার একটা ব্যবস্থা করবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি উত্তর দিকে ইস্পাত আর পাথরের বিশাল সুউচ্চ ভবনগুলির দিকে তাকাই। কোনো বাঁক নেই, কোনো গাছপালা নেই। শুধু কোণ, রেখা, চতুর্ভুজ আকার, ইট আর তামার তার। দূরে কোথাও কোনো কিছু পেটানো বা বাড়ি মারার শব্দে আমার পায়ের নিচের মাটি মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। আমার মনে হয় এই জগৎ তার বিশাল গুরুভার সত্ত্বেও বিপজ্জনকভাবে ভঙ্গুর। ইস্পাত লাইনের উপর দিয়ে কর্কশ শব্দ করে ট্রাম চলাচল করে। মোটরগাড়ির হর্ণ বাজে। আমার চারপাশে কাটাকাটা বাক্য শুনি। বরফশীতল হাওয়ায় দাঁড়িয়ে ম্যাগি খালাকে আমার নানা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে মন চায়, কিন্তু তার কঠোর মুখ দেখে আমি চুপ করে থাকি। এই নগরী তার লোকদের উপর যে কী রকম চাপ সৃষ্টি করে আমি খালার চোখের উদ্বেগাকুল দ্যুতি দেখে তা ইতিমধ্যে বুঝতে শুরু করেছিলাম। আমার মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। আমার কি এখানে আসা উচিত হয়েছে? কিন্তু এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আমি এক চেনা আতঙ্ক থেকে পালিয়ে এসেছি, এখন সামনে যে অচেনা আতঙ্ক পড়ে আছে, আমি হয়তো তার মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

ট্রাম এসে পড়ে। ম্যাগি খালা আমাকে উঠতে ইঙ্গিত করেন। তিনি আমাকে একটা আসনের দিকে ঠেলে দেন। সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ বসেছিলেন। তিনি জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি তার পাশে বসে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু পরে আমি আমার চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে চোরা চোখে দেখি। তিনি তখনো স্থির চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, অন্তর্গত কোনো একটা ভাবনায় তিনি নিমজ্জিত। তাঁর কাছে আমার যেন কোনো অস্তিত্ব নেই। রাস্তার পাশের দ্রুত ধাবমান পাথরের বাড়িগুলোর মতোই তার মন থেকে দূরে আমার অবস্থান। দক্ষিণের যে অঞ্চল থেকে আমি এসেছি, সেখানে এভাবে তার পাশে বসা আমার জন্য বেআইনী গণ্য হতো।

কালো ধোঁয়ার কালিতে আচ্ছন্ন দালানগুলোর পাশ দিয়ে ট্রাম ছুটে চলে, প্রতি ব্লকে থামে, তারপর আবার ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করে। কনডাক্টর এমন একটা সুরে রাস্তার নামগুলি উচ্চকণ্ঠে বলে যে আমি বুঝতেই পারি না। লোকজন ট্রামে ওঠে, ট্রাম থেকে নেমে যায়, কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকায় না। প্রতিটি লোক যেন অন্য লোকটিকে নগরীর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে করে। আমার পাশে বসা শ্বেতাঙ্গ লোকটি উঠে দাঁড়ায়, তাকে পথ করে দেবার জন্য আমি আমার হাঁটু সরিয়ে নিই, সে জায়গায় আরেকজন শ্বেতাঙ্গ লোক এসে আমার পাশে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে একটা খবরের কাগজে তার মুখ গুঁজে দেয়। কেমন করে এটা সম্ভব হয়? সে কি আমার কৃষ্ণত্ব সম্পর্কে সচেতন?

আমরা ক্লিও খালার ঠিকানায় গিয়ে দেখি যে তিনি একটা ভাড়াটে ঘরে থাকেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি বোধ হয় একটি আপার্টমেন্টে বাস করেন। আমি নিরাশ হই। আমি ক্লিও খালার গৃহকর্মীর কাছ থেকে একটা ঘর ভাড়া নিই। আমি ঠিক করি যে কাজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো। আমার নিজেকে বিচ্ছিন্ন লাগে। সব কিছুকে মনে হয় ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক। আমার চারপাশের মানুষের মধ্যে আমি দেখি একটা স্থায়ী নিরাপত্তাহীনতার বোধ। ক্লিও খালাকে দেখে মনে হলো তাঁর বয়সের তুলনায় তিনি অনেক বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর স্বামী, দক্ষিণী তুলাক্ষেতের এক কৃষক, তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। তিনি কেন চলে গেলেন? খালা বলতে পারেন না। আমার মা যেমন নগরীর জীবনের কাছে পরাজয় বরণ করেন, খালার ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। আমি যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি আহত, ভীত কালো মুখ, যে সভ্যতাকে তারা বুঝতে পারছে না তার মোকাবেলা করার ব্যর্থ প্রয়াসে তারা ব্যস্ত। আমি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করি। আমি এক নিরাপত্তাহীনতার কাছ থেকে পালিয়ে এসে অন্য এক নিরাপত্তাহীনতাকে আলিঙ্গন করেছি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি যে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে গেছে। শীতের সময় দক্ষিণের রাস্তাঘাট যে রকম ঠাণ্ডা মনে হতো আমার কাছে এই বাড়ি এখন সে রকম ঠাণ্ডা মনে হয়। আমি পোশাক পরি, দু' প্রস্থ জামা গায়ে চড়াই। একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খাই, তারপর ট্রাম ধরে দক্ষিণের দিকে যাই। চলতে চলতে এক সময় আমি ফুটপাথে আর কারো মুখ দেখি না। কালো অঞ্চলের সীমানা রেখা পার হয়ে আমি এখান যেখানে প্রবেশ করেছি সেখানে শ্বেতাঙ্গদের কাছে কোনো কাজ পাবে। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি, দোকানের জানালাগুলিতে কোনো কিছু লেখা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করি। এক সময় একটা খাবার দোকানে লেখা দেখি– দারোয়ান প্রয়োজন। আমি ভেতরে ঢুকি। একজন মোটাসোটা শ্বেতাঙ্গ মহিলা আমার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাট ডু ইউ ভান্ট? ওর কথা শুনে আমি একটা ধাক্কা খাই। উনি ইহুদি। এক সময় আরকানসাসে ইহুদি দোকানদারদের লক্ষ্য করে আমি যেসব অশ্লীল কথা বলেছি তা মনে করে আমার লজ্জা হয়।

আমি বললাম, আপনাদের বোধ হয় একজন দারোয়ান দরকার।

মহিলা বললেন, মিস্টার হফম্যান এখন নেই। তুমি অপেক্ষা করবে?

হ্যাঁ, ম্যাম।

তাহলে বসো।

না, ম্যাম, আমি বাইরেই অপেক্ষা করি।

বাইরে তো খুব ঠাণ্ডা।

ও কিছু হবে না।

তিনি ঘাড় কোঁচকালেন। আমি বাইরে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াই। তীব্র শীতের মধ্যে

আমি আধঘণ্টা অপেক্ষা করি। কেন ঈষদুষ্ণ দোকানের মধ্যে থাকি নি সেজন্য অনুতাপ করি, কিন্তু এখন আর ভেতর যেতে পারি না। এমন সময় একজন টাক মাথা, স্থূলদেহ শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক দোকানে ঢুকে তার ওভারকোট খুলে রাখেন। হ্যাঁ, ইনিই কর্তা... আমি ভেতরে যাই।

তো... ইউ ভান্ট এ জব?

আমি তার কথার অর্থ অনুমান করে উত্তর দিই, ইয়েস, স্যার।

আগে কোথায় কাজ করেছো?

মেম্ফিসে, টেনেসিতে।

আমার এক শ্যালক এক সময় মেম্ফিসে কাজ করেছে।

আমি চাকরি পাই। সোজা কাজ, তবে আমি হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, আমি ওদের কথার এক-তৃতীয়াংশও বুঝতে পারি না। ওদের মেঘাচ্ছন্ন উচ্চারণের ভারি ঝোঁক আমার শ্লথ দক্ষিণী কানকে বিভ্রান্ত করে দেয়। একদিন মিসেস হফম্যান আমাকে পাশের দোকানে গিয়ে সেখান থেকে, পাশের দোকানটি ছিল তার এক কাজিনের, একটা অ্যালা কিং চিকেনের টিন নিয়ে আসতে বললেন। ওই শব্দগুচ্ছ আমি আগে কোনোদিন শুনি নি। আমি তাকে আবার বলতে বললাম।

তিনি বললেন, তুমি কি কিছুই জানো না?

আমি ভীরু গলায় সাহস করে বললাম, আপনি যদি একটা কাগজে লিখে দেন তাহলেই কি আনতে হবে তা আমি বুঝতে পারবো।

তিনি হঠাৎ রেগে উঠে চিৎকার করে বললেন, আমি লিখতে জানি না। আচ্ছা, তুমি কি রকম ছোকরা হে?

তিনি যা বলেছিলেন আমি তার প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে মুখস্ত করে পাশের দোকানে গিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে বলি, মিসেস হফম্যান এক টিন অর লার চীক কীজ চেয়েছেন।

আমি মনে মনে আশা করি যে ভদ্রলোক কোনো অপরাধ নেবেন না।

তিনি আমাকে স্থির দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত লক্ষ্য করে বললেন, ঠিক আছে।

তিনি টিনটা একটা কাগজের ব্যাগে ভরে আমাকে দিলেন। আমি বাইরে রাস্তায় এসে ব্যাগটা খুলে লেবেলটা পড়ি : অ্যালা কিং চিকেন। আমি নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে নিজেকে শাপশাপান্ত করি। আমি তো কথাগুলি জানি। মহিলার উচ্চারণের ভারি ঝোঁক আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। তবু তার ভাঙ্গা ইংরেজীর জন্য তার ওপর আমার রাগ হয় না। আমার ইংরেজীও তো ভাঙ্গা। কিন্তু তিনি আরেকটু ধৈর্য ধরতে পারেন নি কেন? আমি একটা অর্থ খুঁজে পাই। আমি কৃষ্ণাঙ্গ আর তার কাছে আমার অনুভূতি ছিল মূল্যহীন। তাই মনে হয় আমার। আসলে আমি আমার নতুন পরিবেশকে তখনো আমার পুরানো দিনের আলোতেই বিচার-বিশ্লেষণ করছিলাম। আমি জিনিসটাকে যুক্তি দিয়ে

এইভাবে দেখি ইংরেজী আমার মাতৃভাষা এবং আমেরিকা আমার স্বদেশ হলেও তিনি একজন বিদেশী, এখানে এমন এক এলাকায় দোকান চালিয়ে জীবিকা অর্জন করছে সকল যেখানে আমি রাগ পর্যন্ত করতে পারি না। আমার মনে আরো যুক্তি জেগে ওঠে, তিনি বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন, এবং আমার বিরুদ্ধে তিনি তার নিজের অবস্থানকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন।

ওই দোকানের চাকরি ছেড়ে দেবার আগে পর্যন্ত মিস্টার হফম্যান ও তার স্ত্রীর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি যে আমি প্রচণ্ড রকম ভুল বুঝেছিলাম তা আমি বুঝতেই পারি নি। চরম বিভ্রান্তিকর জাতি-বর্ণের সম্পর্কাবলীর মধ্য দিয়ে পথ চলতে সাহায্য করতে পারে তেমন কোনো কিছুই আমি তখন পর্যন্ত শিখি নি। আমার পরিবেশের অপাতমূল্যকে মেনে নিয়ে, আমার নিজের আবেগের বেড়াজালে বন্দি হয়ে, আমি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করি, কালো মানুষগুলি কী করেছে যার জন্য তারা এই উন্মাদ পৃথিবীর শিকার হচ্ছে?

(কালো আর সাদাদের পার্থক্যের ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার ছিল। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর এর প্রভাব আমাকে বিভ্রান্ত ও বিষণ্ন করে তুলতো। আমার নিজেকে কখনো অন্যের জন্য হুমকি বলে মনে হতো না। তবু, চিন্তা করার মতো বয়স হওয়া মাত্র আমি জেনে ফেলি যে আমার সমগ্র ব্যক্তিত্ব, আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল আগেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে এবং কিছু পরিমাণে, আমি যা বলি তার অর্থও কেউ পুরোপুরি বোঝে না।

আর আমেরিকায় নিগ্রো মানুষকে যে অচিহ্নিত সীমানাবিহীন স্থানে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে তার কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার মনে হয় বর্ণবাদী বৈষম্যের ধারণা মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর যে রকম চরম অবক্ষয়ী ও বিধ্বংসী আক্রমণ চালায় তেমন কি সমগ্র মানব ইতিহাসে আর কখনো ঘটেছে? যে বর্ণবাদী আক্রমণ আমার জীবনের শেকড় পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি আমার বর্তমান জীবন থেকে অন্য যে কোনো ভিন্ন রকম জীবন সানন্দে বেছে নিতাম। আমি সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতনের পদ্ধতির অধীনেও জীবন যাপন করতে রাজি হতাম। সামন্ততন্ত্রের প্রতি যে আমার পক্ষপাত আছে সেজন্য নয় বরং এই জন্য যে, সামন্ততন্ত্র একটা মানুষে একটা সীমিত অংশকে কাজে লাগায়, সমাজে তার অবস্থান, তার পদবি, তার কর্ম নির্ধারণ করে দেয়। খুব কঠিন ধাঁচের স্বৈরতন্ত্রের অধীনেও আমি জীবন যাপন করতে রাজি হতাম কারণ আমি অনুভব করি যে, স্বৈরতন্ত্রও মানুষকে কাজে লাগাবার, তা সেটা যত মর্যাদাহানীকরই হোক না কেন, একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা তৈরি করে দেয়।

মেম্ফিসে কাজ করার সময় আমি যখন শ্বেতাঙ্গদের লাথি খাবার জন্য শরীরকে নিজেকে এগিয়ে দিতে দেখতাম তখন আমি অবাক হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন শিকাগোতে কাজ করার সময় আমার মনে হয় এই অনিশ্চয়তার চাইতে লাথি খাওয়াও বোধ হয় ভাল ছিল। মার্কিন পরিমণ্ডলে একটা সম্মানজনক সমঝোতার জন্য অতি ব্যাকুল অন্বেষণ

করতে গিয়ে আমি আত্মসমর্পণ না করার সিদ্ধান্ত নিই এবং তার হাত ধরেই আমি আলিঙ্গন করি নিত্যদিনের উদ্বেগ ও উত্তেজনা এবং অন্তহীন অশান্তিকে। যদিও আমি নিজে কখনো ওই রকম আচরণ অনুমোদন করতে পারবো না, তবু আমি এখন ওইসব নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি যারা হাল ছেড়ে দিয়ে তাদের নির্যাতিত শ্বেতাঙ্গদের কাছে গিয়ে বলে, আমার জন্য যদি এটাই থাকে, তাহলে আসুন আমাকে লাথি মারুন, আমাকে লাথি মারুন আর আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিন, শান্তিতে থাকতে দিন।

বর্ণভিত্তিক ঘৃণ্য কালোদের জীবনের অবস্থান সাদাদের জীবনের নিচে নির্ধারিত করে দিয়েছে। আর কালো মানুষরা সাদাদের মতো এই স্বপ্নে সাড়া দিয়ে নিজেদের অন্তরে পার্থক্যের চেতনাকে কবর দিতে চেষ্টা করেছে, কারণ তা তাকে নিঃসঙ্গ ও ভীত করে তোলে। সাদাদের ঘৃণার পাত্র হয়ে এবং যে সংস্কৃতি তাকে ঘৃণা করে তার একটা জৈবিক অংশ হবার কারণে কালো মানুষরা অন্যরা তাদের মধ্যে যে জিনিস ঘৃণা করে তারা নিজেরাও তাদের মধ্যে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কিন্তু অহঙ্কারের জন্য তারা ওই আত্মঘৃণা লুকিয়ে রাখে, তারা যে সাদাদের দ্বারা পুরোপুরি বিজিত হয়েছে, তাদের সমগ্র জীবন যে সাদাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তা তারা সাদাদের জানতে দিতে চায় না। কিন্তু এই আত্মঘৃণা গোপন জাগিয়ে তুলেছে তাদেরকে ঘৃণা না করে তারা পারে না। তাই তাদের জীবনের প্রতিটি অংশ নিজেদের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যয় হয়, তাদের শক্তির একটা বড় অংশ নিজেদের অসংযত আবেগ নিয়ন্ত্রিত করার কাজে অপচয়িত হয়। ওই আবেগকে তারা প্রশ্রয় দিতে চায় না। অন্যদের ঘৃণা দ্বারা কোণঠাসা হবার ফলে এবং নিজেদের অনুভূতির মধ্য বড় বেশি নিমজ্জিত থাকার কারণে তারা বাস্তবতার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই-এ লিপ্ত থাকে। তারা অদক্ষ হয়ে পড়ে এবং তাদের বাস্তব পৃথিবীকে দেখার এবং বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। আর তারা যখন ওই অবস্থায় পৌঁছে তখন শ্বেতাঙ্গরা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে আর বলে, দেখলে তো, আমি তোমাকে বলি নি যে, নিগাররা ওই রকমই?

পরিবঞ্চিত আবেগের এই জটাজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে আমি আমার ব্যক্তিত্বের তরণীর শূন্য অংশকে উচ্চাশার নানা রকম স্বপ্ন দ্বারা পূর্ণ করে তুলি যেন তা অচেতনতার সাগরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যায়। অন্য সব মার্কিনীর মতো আমি ব্যবসায়ী হয়ে টাকা বানাবার স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্ন দেখি আমি একটা ফার্মে কার্জ করবো, তারা আমাকে এগিয়ে যেতে দেবে এবং অবশেষে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হবো। আমি এমনও স্বপ্ন দেখি যে, সাদাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমি কালোদের গোপন দল সংগঠিত করবো...।

আর কালোরা যদি সংগঠিত হতে রাজি না হয় তাহলে তাদের সঙ্গেও লড়তে হবে। শেষে আমি আবার প্রত্যাবর্তন করি আত্মঘৃণাতে, কিন্তু এখন এই আত্মঘৃণা নিক্ষিপ্ত হয়

বাইরের দিকে, অন্য কালোদের উদ্দেশ্যে। অথচ আমি জানতাম, সাদাদের দেয়া আমার মনের একটা অংশ দিয়ে আমার কোনো স্বপ্নের বাস্তবায়নই সম্ভব হবে না। আর তখন অপ্রাপনীয়কে নিয়ে আমার মনকে চিন্তা করতে দেয়ার জন্য আমি নিজেকে ঘৃণা করতাম। আর এইভাবে বৃত্ত তার নিজেকে পূর্ণ করে।

শিকাগোর রাস্তাঘাট, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র আমার মধ্যে যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে তাকে অবদমন করার জন্য আমি আমার মনের গভীরে ধীরে ধীরে একটা কার্যসাধন পদ্ধতি নির্মাণ করি। আমি তখন একটা দ্বিতীয় শৈশবের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছিলাম। সম্ভাব্যের সীমানার একটা নতুন বোধ আমার মধ্যে জন্ম নেয়। আমি কী স্বপ্ন দেখতে পারি যা বাস্তবায়িত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে? কিছুই আমার মনে আসে না। এবং ধীরে ধীরে আমার মন ঠিক ওই শূন্যতাকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে, না পেয়েও নিরন্তর একটা চাওয়ার চারপাশে ঘুরতে থাকে, বিনা কারণে যে আমি ঘৃণার পাত্র হচ্ছি সে-কথা ভাবতে থাকে। আমেরিকাতে একটি নিগ্রোর কাছে জীবনের অর্থ কি তার একটা অস্পষ্ট ধারণা আমার চেতনায় দানা বাঁধতে থাকে, বাইরের ঘটনার দিক থেকে নয়, লিঞ্চিং এবং জিমক্রোবাদ এবং অনিঃশেষ বর্বরতার দিক থেকে নয়, বরং একটা লাঞ্ছিত অবদমিত অনুভূতির দিক থেকে, অন্তরাত্মার একটা বেদনার দিক থেকে। আমি অনুভব করি যে, নিগ্রো জীবন অচেতন যন্ত্রণার একটা বিশাল বিস্তৃত ভূমি, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক নিগ্রোই তাদের জীবনের অর্থ জানে। খুব অল্প সংখ্যক নিগ্রোই তাদের কাহিনী বলতে সক্ষম হবে।)

আমি খবর পাই যে, ডাক বিভাগে কেরানী নিয়োগের জন্য একটা পরীক্ষা আসন্ন। আমি তাৎক্ষণিক একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করি। পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসে আর আমি নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হই। চাকরি না খুইয়ে আমি কিভাবে একটা দিন ছুটি পাবো? দক্ষিণে একজন নিগ্রোর পক্ষ তার শ্বেতাঙ্গ মনিবের কাছে গিয়ে বলা যে সে অন্য একটা চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে চায় এটা খুব বোঝার মতো কাজ হতো। এর অর্থ হতো যে নিগ্রোটি তার শ্বেতাঙ্গ মনিবের কাজ করতে পছন্দ করছে না, সে মনে করছে যে মনিবের কাছ থেকে সে উপযুক্ত বেতন পাচ্ছে না এবং দক্ষিণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিগ্রোরা যেসব কাজ করতো তার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক বিরাজ করতো, সেহেতু এর ফলে একটা বিতর্ক সৃষ্টির ঝুঁকি থাকতো, যা হয়তো সহিংসতায় পর্যবসিত হতে পারতো।

আমি এখন ভাবতে শুরু করি, মিস্টার হফম্যান কি ধরনের মানুষ। আমি আবিষ্কার করি যে, তাকে আমি চিনি না, মানে, নিগ্রোদের প্রতি তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি কী তা আমি জানি না। আমি আবেদন করলে তিনি কি আমাকে সবেতন প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুর করবেন? টাকাটা তো আমার দরকার। তিনি হয়তো বলবেন, বাড়ি যাও, এই কাজ পছন্দ না হলে তুমি বরং বাড়িতেই থাকো। তাঁর সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পারি

না। শেষ পর্যন্ত আমি কোনো রকম ঝুঁকি না নেবার সিদ্ধান্ত নেই। আমি ওঁকে না বলেই অনুপস্থিত থাকবো, টাকাটা গচ্চা গেলে যাবে। এক সোমবার পরীক্ষার দিন ঠিক হয়। আমি এ সময় কঠোর পরিশ্রম করছিলাম, একটানা আর তাই আমি অনুভব করি যে, উপযুক্ত বিশ্রাম না নিলে আমি পরীক্ষায় আমার সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখাতে পারবো না। আমি স্থির করলাম যে, শনি, রবি আর সোমবার আমি কাজে যাবো না। কিন্তু মিস্টার হফম্যানকে কি বলবো? হ্যাঁ আমি বলবো যে আমার অসুখ হয়েছিল। না, সেটা খুব হালকা শোনাবে। আমি বলবো যে আমার মা মেক্সিসে মারা গেছেন এবং আমি তাঁকে কবর দেবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। এই মিথ্যাটা কার্যকর হতে পারে।

আমি যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে মঙ্গলবার দোকানে হাজির হই। মিস্টার হফম্যান আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি ভাবি নি যে তুমি ফিরে আসবে।

আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার হফম্যান।

কি হয়েছিল?

আমি মিছে কথা বলি, আমার মা মেক্সিসে মারা যান, তাঁকে কবর দেবার জন্য আমাকে ওখানে যেতে হয়।

তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, রিচ, তুমি মিছে কথা বলছো।

আমি জোর দিয়ে আবার মিথ্যা কথাটা বললাম, আমি মিছে কথা বলছি না।

তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি কিছু করতে চেয়েছিলে, আর সেজন্যই তুমি আসো নি।

আমি প্রথম মিথ্যার ওপর আরেকটা চাপাই, না, স্যার, আমি সত্যি কথাই বলছি।

না, তুমি মিছে কথা বলছো। তুমি আমাকে হতাশ করলে।

আমি রেগে গিয়ে বলি, তো, আমি আপনাকে সত্য কথা বলা ছাড়া আর তো কিছু করতে পারি না।

তুমি ফোন করলে না কেন?

আমি নতুন আরেকটা মিথ্যা কথা বলি, আমার মনে পড়ে নি।

তিনি বললেন, রিচ, তোমার মা মারা গেলে তুমি আমাকে সে কথা বলতে।

আমি আবারও মিছে করে বলি, আমার সময় ছিল না। আমাকে ট্রেন ধরতে হয়েছিল।

তুমি টাকা পেলে কোথায়?

খালা দিয়েছেন।

বারবার মিথ্যা কথা বলার জন্য আমি নিজের ওপর ভীষণ ঘৃণাশ্রদ্ধ হয়ে উঠি।

তিনি বললেন, মিথ্যাবাদী ছেলের আমার দরকার নেই।

নিজের মিথ্যা কথাকে রক্ষা করার জন্য আমি তীব্র আবেগের সঙ্গে আবারো মিছে কথা বলি। না, আমি মিছে কথা বলছি না। আমার খুব রাগ হয়, কারণ আমি বুঝতে

পারি যে, আমি যে মিথ্যা কথা বলছি তা তারা বুঝতে পেরেছেন। আমি আমার নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলেছিলাম, তারপর ওই মিথ্যাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আবারো মিথ্যা বলি।

আমি এতো শ্বেতাঙ্গ মুখ দেখেছিলাম যারা আমার পরীক্ষা দেয়াকে কিছুতেই এনুমোদন করতো না যে আমি মিস্টার হফম্যানকে সত্য কথা বলার ঝুঁকি নিতে পারি নি। কিন্তু এখন আমি তাঁকে কি করে বলবো যে আমি নিজের সম্পর্কে এতো অনিশ্চিত ছিলাম যে, তাঁকে সত্য কথাটা বলতে পারি নি? মিথ্যা কথা বলা খুব খারাপ কিন্তু আমার নিজের নিরাপত্তাহীনতার বোধের কথা প্রকাশ করা হতো আরো খারাপ। সেটা হতো খুব লজ্জাকর, আর আমি নিজেকে ওই অবস্থায় দেখতে চাই নি। ওদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে অবাক করে দেয়। ওদের দোকানের সঙ্গে কথা বলেন, এ রকম ব্যবহার আমি কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে ইতিপূর্বে পাই নি। দক্ষিণের একজন শ্বেতাঙ্গ এ অবস্থায় বলতো, বিদায় হও এখান থেকে, জাহান্নামে যাও! কিংবা বলতো, ঠিক আছে, নিগার, এবার কাজে লেগে পড়ো। কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গ এভাবে নিজের অবস্থানে অনড় থেকে এতো বিস্তারিতভাবে আমার ব্যাপারটা খুটিয়ে দেখতো না, আমাকে এতো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো না। আমার মনে হয় ওরা আমাকে তাদের সমপর্যায়ের বলে গণ্য করছেন, এবং এর ফলে আমি যে মিথ্যা কথা বলেছি এবং কেন বলেছি তা ওদেরকে বলা আমার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় এখন যদি আমি স্বীকার করি তাহলে ওরা আমার ওপর একটা নৈতিক সুবিধা লাভ করবে এবং তা হবে অসহনীয়।

মিস্টার হফম্যান বললেন, ঠিক আছে, রিচ। থাকো এখানে আর কাজ করো। আমি জানি তুমি মিথ্যা কথা বলছো কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আমি চলে যেতে চাই কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে আমার ভাল লাগে। হ্যাঁ, আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু কি রকম লোকের অধীনে আমি কাজ করছি তা আমি কেমন করে জানবো? মিস্টার হফম্যান হয়তো সানন্দে আমাকে পরীক্ষা নিতে দিতেন, কিন্তু আমার প্রবল ভয়ের তুলনায় আমার আশা ছিল অতিশয় দুর্বল। দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে কাজ করা এবং জানা যে আমি ভয়ের কারণে মিথ্যা কথা বলেছি এবং ওরা জানেন এটা আমাকে পিষ্ট করে ফেলে। আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, ক্ষুধার্ত থাকার ঝুঁকি নিয়েও আমি এখান থেকে চলে যাবো, ওদের এখানে আর কাজ করবো না। আমি আর ফিরে আসবো না এ কথা ওদের না বলেই আমি পরের শরিবার ওই কাজ ছেড়ে চলে যাই। বিদায় জানাবার মতো মনের জোর আমার হয় না। আমি শুধু ঝটপট চলে যেতে চাই। আমি চাই আমি যে কখনো ওদের জন্য কাজ করেছিলাম ওরা যেন সেকথা ভুলে যান।

এক সপ্তাহ বেকার থাকার পর আমি সদ্য খোলা একটি নর্থ সাইড ক্যাফেতে থালা-বাসন ধোয়ার কাজ পাই। আমার মনিব, এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা, আমাকে বাজ খুলে থালা-

বাসন-পেয়ালা বের করবার, টেবিলে সাজাবার, বিভিন্ন কাজ করবার নির্দেশ দেন। সকালে আমি প্রাতরাশ পরিবেশন করি আর শেষ বিকালে মেসর হোটেল-বাসিন্দারা খাওয়ার জন্য ঘরে বসে থাকে তাদের খাবারের ট্রে পৌছে দিই। বেতন পাই সপ্তাহে পনেরো ডলার। দীর্ঘসময় কাজ করতে হয় কিন্তু আমি কর্মক্ষেত্রে খাওয়া পাই। পাচিকা ছিলেন এক বয়স্কা ফিনল্যান্ডের মহিলা, তার মুখ ছিল তীক্ষ্ণ ও হাড় সর্বস্ব। সেখানে বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পরিবেশনকারী কাজ করতো। ওই ক্যাফেতে আমি ছিলাম একমাত্র নিগ্রো। পরিবেশনকারিনীরা ছিল কঠোর এবং দ্রুত কর্মতৎপর। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের সঙ্গে এদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সম্পর্কে আমি তীব্রভাবে সচেতন ছিলাম। নিজেদের এবং আমার মধ্যে কোনো ব্যবধান রাখার শিক্ষা তাদের দেয়া হয় নি। বর্ণবাদী ঘৃণার ঐতিহ্য থেকে তারা ছিল অপেক্ষাকৃত মুক্ত।

একদিন সকালে আমি যখন কফি বানাচ্ছিলাম তখন কোরা এক ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে কফি টেনে নেবার জন্য আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো, পার্ডন মি, রিচার্ড। আমি শান্ত গলায় বললাম, ওহ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি সচেতন হয়ে যাই যে ও একজন শ্বেতাঙ্গিনী আর তার শরীর আমার শরীরের সঙ্গে লেগে আছে ঘন হয়ে, এটা এমন একটা ব্যাপার যা আমার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি, এমন একটা ব্যাপার যা ছিল আতঙ্কের স্মৃতিতে পূর্ণ। কিন্তু ও আমার কৃষ্ণত্ব অথবা দক্ষিণে তার এ রকম আচরণের অর্থ কী হতো সে সম্পর্কে সচেতন হতো না হলে এই তুচ্ছ ঘটনা যেমন তার নজরে আসে নি তেমনি আমার নজরেও আসতো না। ও আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমি না ভেবে পারি না যে, দক্ষিণের একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে যদি কফি নিতে আসতো তাহলে সে আমাকে এক পাশে সরে দাঁড়াতে আদেশ করতো যেন আমার শরীরের স্পর্শ তার গায়ে না লাগে। উষ্ণ ব্যস্ত রান্নাঘরের কাজকর্ম এক মুহূর্তের জন্য থেমে যেতো যেন আমি আমার অশুচি শরীরটা যথেষ্ট দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকে তার এক পেয়ালা কফি নিতে দিই। এই শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি যে এখন নিতান্ত বেখেয়ালি ভাবে আমার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার কথা একটু ভাবছে না, এর মধ্যে আমি একটা গভীর আবেগগত নিরাপত্তার বোধ অনুভব করি, এর মধ্যে অস্পষ্ট, গভীর অযৌক্তি কোনো ভীতি ছিল না যার জন্য মেয়েটি মনে করতে পারতো যে আমি এমন একটি প্রাণী যাকে যে কোনো প্রকারে হোক এড়িয়ে চলতে হবে।

গ্রীষ্মের এক সকালে একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে দেরিতে কাজে আসে। আমি ভাঁড়ার ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সে হন্তদন্ত হয়ে মেয়েদের ঘরে ঢুকে তার পোশাক বদলায়। আমি তার দরজা খোলার শব্দ পাই। এক মুহূর্ত পরে তার কণ্ঠস্বর শুনে আমি বিস্মিত হই- রিচার্ড, জলদি! আমার এপ্রোনটা বেঁধে দাও!

ও আমার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর তার এপ্রোনের ফিতাগুলি ঢল ঢল করে দুলছিল। মুহূর্তের জন্য আমি ইতস্ততঃ করি, তারপর দুটি ঝুলতে থাকা ফিতা ওর

শরীরের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আবার তার পিঠের কাছে নিয়ে এসে অপটু হাতে গিঁট দিয়ে বেঁধে দিই।

এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্য ও আমার হাত ধরে আলতো করে চাপ দিয়ে ছুটে চলে যায়।

আমি আমার কাজ করে চলি আর যে দক্ষিণে আমার প্রায় সব ক্ষুব্ধতা নিমজ্জিত কেটেছে সেখানে একটি নিগ্রোর কাছে এই তুচ্ছ, সহজ, মানবিক ঘটনা কী অর্থ বহন করতো সেই ভাবনায় আমার সারা মন পূর্ণ হয়ে থাকে।

এই মেয়েদের প্রতি আমার কোনো প্রশংসার মনোভাব ছিল না, ঘৃণারও না। আমার মনোভাব ছিল একটা অচঞ্চল এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বিস্ময়ের। বেশির ভাগ সময় আমি ওদের সামনে নীরব থাকতাম, যদিও আমি জানতাম যে, ওদের প্রায় সবার চাইতে জীবন সম্পর্কে আমার উপলব্ধি অনেক বেশি। কাজ করতে করতে আমি ওদের কথাবার্তা শুনতাম আর জীবনের সমস্যাদি এবং আসল ব্যাপারগুলি নিয়ে তারা যে বিভ্রান্ত, এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অপটুভাবে পথ হাতড়াচ্ছে তা বুঝতে পারতাম। অনেক বিষয় নিয়ে তারা অবাক হয়ে ভাবে যা আমি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারতাম কিন্তু আমার কখনো সে সাহস হয় নি।

লাঞ্চের সময় আমি কাছের একটা পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতাম। মেয়েরা সেখানে এসে আমার পাশে বসতো, এলোমেলোভাবে নানা কথা বলতো, হাসতো, আমি জানতে পারি তাদের রুচিহীন চটকদার স্বপ্নের কথা, তাদের সরল সহজ আশার কথা, তাদের গৃহজীবনের কথা, গভীরভাবে কিছু অনুভব করতে তাদের ভীতির কথা, তাদের যৌন সমস্যার কথা, তাদের স্বামীদের কথা। তারা ছিল বগ্র, অস্থির, বাচাল, মূর্খের একটা দঙ্গল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা ছিল ঘরোয়াভাবে সহৃদয় এবং নৈর্ব্যক্তিক। তাদের মধ্যে ঘৃণা বা শঙ্কার কিছু ছিল না এবং সহজাতভাবেই তারা এড়িয়ে চলতো সকল রকম তীব্র আবেগ ও কামনা।

জীবনের কাছ থেকে ওরা কি পাওয়ার চেষ্টা করে আমি প্রায়ই তা নিয়ে ভাবতাম এবং হঠাৎ করেই আমি একটা সূত্র পেয়ে যাই। আমার মনে এ সম্পর্কে ওদের নিজেদেরও কোনো ধারণা ছিল না। তারা তাদের জীবন কাটায় উপর স্তরে। তাদের হাসি উপর-উপর, তাদের অশ্রুজল উপর-উপর। নিগ্রোরা তাদের চাইতে বেশি সভ্য এবং গভীর জীবন যাপন করে। কিন্তু আমি ভাবি নিগ্রোরাও যদি ওদের মতো চিন্তাশূন্য, মসৃণ জীবন যাপন করতে পারতো তাহলেই বোধহয় ভাল হতো। এই মেয়েরা কখনো তাদের অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বলতো না, তাদের কারোরই নিজেদেরকে কিংবা অপরকে বোঝবার মতো অন্তর্দৃষ্টি অথবা আবেগগত প্রস্তুতি ছিল না। সংস্কৃতির দিক থেকে আমাদের অবস্থান ছিল কতো দূরে! আমার সারা জীবন আমি অনুভব করা এবং অনুভূতির চর্চা করা ছাড়া আর কিছুই করি নি। আর ওরা তাদের সারা জীবন নগণ্য

লক্ষ্যার্জন এবং মার্কিন জীবনের তুচ্ছ জাগতিক পুরস্কার লাভের জন্য চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করে নি। আমরা ছিলাম একই ভাষার অংশীদার, কিন্তু আমার ভাষা ছিল ওদের ভাষার চাইতে ভিন্ন এক ভাষা।

আমার জন্য নিগ্রো সমস্যার গভীরতম অর্থ নিহিত ছিল যে, মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব দুটি জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার মধ্যে। এই বেচারা, মূর্খ শ্বেতাঙ্গ মেয়েগুলি যদি আমার জীবনটাকে বুঝতে পারতো তাহলে তাদের নিজেদের জীবনে একটা বিশাল বিপ্লব ঘটে যেতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, আমি যে রকম জীবন যাপন করেছি, দুঃখযন্ত্রণা নিজের মধ্যে ধারণ করেছি, সে রকম জীবনের একটা জ্ঞান যদি তারা তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ধারণ করতে পারে তাহলেই তারা তাদের নিজেদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে পারবে।

(এখন, আমার স্মৃতিতে, আমি যখন পেছন ফিরে ওইসব মেয়ে এবং তাদের জীবনের কথা ভাবি তখন আমি অনুভব করি যে, সাদা আমেরিকাকে নিগ্রো সমস্যার তাৎপর্য বুঝতে হলে এখন পর্যন্ত আমরা যে আমেরিকাকে চিনি তার চাইতে বৃহত্তর ও দৃঢ়তর এক আমেরিকার দরকার হবে। আমি অনুভব করি যে, আমেরিকার অতীত বড় বেশি তরল ও অগভীর, তার জাতীয় চরিত্র বড় বেশি উপর-উপর আশাবাদী, তার নৈতিকতা বর্ণ ঘৃণা দ্বারা এতো রঞ্জিত যে, এই রকম একটি বিশাল ও জটিল কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা তার নেই। সংস্কৃতির দিক থেকে নিগ্রোরা একটি আপাত স্ববিরোধিতা তুলে ধরে– যদিও সে জাতির একটা মূল জৈবিক অংশ তবু তাকে আমেরিকান সংস্কৃতির সমগ্র স্রোত ও গতিধারার বাইরে রাখা হয়। সত্যি বলতে কি, তাকে বাইরে রাখাই সঙ্গত মনে করা হয়, আর তাকে স্বাধীনভাবে প্রবেশাধিকার দেয়াই অন্যায় মনে করা হয়। আর তাই তার বর্তমান সংস্কৃতির চৌহদ্দির মধ্যে জাতি যদি কখনো তার বর্ণ ঘৃণা থেকে নিজেকে মুক্ত-বিশুদ্ধ করতে চায় তাহলে সে নিজের সঙ্গেই নিজেকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখবে, আর আবেগগত এবং নৈতিক এক বিশাল ঘূর্ণিস্রোতে নিমজ্জিত হবে। জাতিকে যদি কখনো নিগ্রোদের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখতে হয় তাহলে তাকে আরো অনেক কিছু করতে হবে, কারণ শ্বেতাঙ্গদের নিগ্রো-বিরোধী মনোভাব, প্রতীকী দিক থেকে খুব তাৎপর্যময় হলেও, গোটা জাতির নৈতিক মনোভাবের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের অতি-তরুণ এবং অতি-নবীন আমেরিকা, স্থূল–কারণ সে নিঃসঙ্গ, আগ্রাসী–কারণ সে শঙ্কিত, জোর করে পৃথিবীকে দেখতে চায় ভাল এবং মন্দ, পবিত্র এবং পাপী, উচ্চ এবং নীচ, সাদা এবং কালোর সূত্রে। আমাদের আমেরিকা তথ্যকে ভয় পায়, ইতিহাসকে ভয় পায়, প্রক্রিয়া-পদ্ধতিকে ভয় পায়, প্রয়োজনকে ভয় পায়। যাদের বুঝতে পারে না তাদের শাপশাপান্ত করে জাহান্নামে পাঠাবার সহজ পথ বেছে নেয়। যারা ভিন্ন রকম দেখতে তাদের সে বাইরে রাখে, আর স্বনির্মিত ন্যায় নিষ্ঠার পোশাক গায়ে চড়িয়ে সে তার বিবেককে প্রশমিত করে। আমি কি আমার স্বদেশকে জাহান্নামে

পাঠাচ্ছি? কারণ আমিও তো সত্যি মনে করি না যে আমেরিকা, যৌবনে পদার্পণোন্মুখ এবং অতি আস্থাবান, দুঃখযন্ত্রণা এবং পরিশ্রমী প্রচেষ্টার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, তীব্র আবেগ এবং আত্মোৎসর্গের যে শক্তি, সে সব চাইতে মৌলিক বিশ্বাসসমূহ পরীক্ষা করে দেখতে প্রস্তুত।

আমি জানি যে শুধু জাতি নয়, শুধু বর্ণ নয়, বরং যে বৈশিষ্ট্যিক মূল্যবোধসমূহ জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে তাই দাঁড়িয়ে আছে আমার আর যে মেয়েদের সঙ্গে আমি কাজ করি তাদের মাঝখানে। তাদের নিরন্তর বহুমুখী দৃষ্টি, রেডিও, মোটরগাড়ি ও হাজারো তুচ্ছ অলঙ্কারাদির জন্য তাদের প্রচণ্ড উন্মাদনার ফলে তাদের চোখ পড়ে থাকে জীবনের মূল্যহীন আবর্জনার ওপর, সে সবেরই স্বপ্ন দেখে তারা, এবং তার ফলেই যে ভাষা শিখলে তারা তাদের বা অন্যদের হৃদয়ের কথা বলতে পারতো সে ভাষা শেখা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের আত্মার শব্দাবলী হয়ে ওঠে জনপ্রিয় গানের পংক্তি।

আমার কাছে আমেরিকার নিগ্রোদের অবস্থার সব চাইতে বড় আয়রনি এইখানে যে তাকে থাকতে হয় বিচ্ছিন্ন ভাবে, আর যারা তাকে বাতিল করে দেয় তারা মগ্ন থাকে এমন নিকৃষ্টতম কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় না। যদি নিগ্রোদের বিশ্বাস করানো যেতো তারা তাদের দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করছে কোনো একটা সুদূর, উচ্চ, বাক্তি-সদৃশ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাহলে হয়তো তারা তাদের অবস্থা মেনে নিতে পারতো। কিন্তু যে সংস্কৃতি তাকে বর্জন করে দিচ্ছে তার অংশীদার হয়ে এবং যে মূল্যহীন আবর্জনার জন্য উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা জাতিকে তার দাবিদাওয়া সম্পর্কে অন্ধ করে দিচ্ছে তা দেখে নিগ্রোদের আত্মার মধ্যে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়।

দক্ষিণের চাপ থেকে পালিয়ে এলেও আমার বাইরের আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। সর্বদা পরিবর্তনহীন একটা হাসি মুখ দেখাবার শিক্ষা আমাকে খুব ভালভাবে দেয়া হয়েছিল এবং আমি তা অব্যাহত রাখি যদিও বর্তমান পরিবেশে আরো অবাধ ও মুক্ত অভিব্যক্তির সুযোগ ছিল। আমি আমার অনুভূতিসমূহ লুকিয়ে রাখি এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সেরকম সব সম্পর্ক আমি এড়িয়ে চলি।)

একদিন কর্ত্রী রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন যে আমি একটা বাক্সের উপর বসে আমেরিকান মার্কারি পত্রিকা পড়ছি। তিনি জানতে চাইলেন, কি পড়ছো তুমি?

অতি তৎক্ষণাত সতর্ক হয়ে যাই, যদিও তার যে কোনো দরকার নেই তা আমি জানতাম।

আমি বললাম, ওহ্, একটা ম্যাগাজিন।

এটা পেলে কোথায়?

এই, পেলাম আর কি। আমি মিছে কথা বলি। আসলে আমি ওটা কিনেছিলাম।

তুমি এর কিছু বোঝো?

হ্যাঁ, ম্যাম।

তিনি বিস্ময়োক্তি করে উঠলেন, কী কাণ্ড, নিগ্রো ডিশওয়াশার আমেরিকান মার্কারি পড়ছে। মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি চলে গেলেন।

আমার মধ্যে মিশ্র অনুভূতি জন্ম নেয়। আমি যে পুরোপুরি নির্বোধ ও মূর্খ নই এটা তিনি জেনেছেন, এজন্য আমি খুশি হই, কিন্তু তিনি যে একজন ডিশওয়াশারের পত্রপত্রিকা পড়াকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার মনে করেন এ জন্য আমার একটু রাগ হয়। এরপর থেকে আমি আমার বইপুথি ও পত্রপত্রিকা খবরের কাগজে মুড়ে রাখি যেন কেউ দেখতে না পায়। বাড়িতে কিংবা কাজে যাওয়া-আসার সময় ট্রামে আমি সেসব পড়ি।

ফিনল্যান্ডের রমণী, পাচিকা টিলি ছিল লম্বা, লাল মুখের, প্রকট হাড়ের, দীর্ঘ তুষারের মতো সাদা চুলের একটি মানুষ। সে তার ঘাড়ের পেছনে তার চুল শক্ত পুটলি পাকিয়ে বেধে রাখতো। সে ছিল অত্যন্ত নিপুণ রাঁধুনি আর অসম্ভব দক্ষ। একদিন সকালে হিসহিস করা তপ্ত স্টোভের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার মনে হলো আমি যেন টিলিকে কাশতে ও থুতু ফেলতে শুনলাম। আমি থেমে, কোথায় তার থুতু পড়লো দেখার জন্য সতর্কভাবে সেদিকে তাকালাম। আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। গরম বাষ্পে আচ্ছন্ন তার মুখ বড় পাত্রটার ওপর ঝুঁকে ছিল। আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে বললো যে, টিলি ওই পাত্রের মধ্যে কেশেছে, সেখানে তার থুতু ফেলেছে, কিন্তু আমার অন্তর আমাকে বললো যে, কোনো মানুষ সম্ভবতঃ এতো নোংরা হতে পারে না। আমি স্থির করলাম যে আমি তার ওপর চোখ রাখবো। ঘন্টাখানেক পর আমি টিলিকে সশব্দে গলা পরিষ্কার করতে শুনলাম আর তাকে কাশতে এবং ফুটন্ত স্যুপের মধ্যে থুতু নিক্ষেপ করতে দেখলাম। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যা দেখেছি তা বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছা হলো না।

আমার কি কর্ত্রীকে বলা উচিত? তিনি কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন? টিলি সত্যিই খাবারের মধ্যে থুতু ফেলছে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য আমি আরো একটা দিন তাকে লক্ষ্য করি। হ্যাঁ, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু এখানে যা ঘটছে তা যদি আমি ওদের বলি তাহলে কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? ওরা ভাববে যে পাচিকাকে আমি দেখতে পারি না। আমি ওখানে আর খাবার খাই না। আমি সময় নিই, অপেক্ষা করি।

ক্যাপের ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সালাদ বানাবার জন্য একটি নিগ্রো মেয়েকে কাজে নেয়া হলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে গিয়ে বললাম।

কিসের কথা বলছো তুমি?

কোনো কথা বলো না, শুধু পাচিকার দিকে খেয়াল রেখো।

কি জন্য?

ভয় পেও না, শুধু ওর ওপর নজর রেখো।

ও আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমার মাথা খারাপ। আর, সত্যি বলতে কি, আমারও মনে হলো যে এ বিষয়ে আমার কাউকে কিছু না বললেই বোধহয় ঠিক হতো।

মেয়েটি জানতে চাইলো, তুমি কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

আমি বললাম, ঠিক আছে, বলছি। আমাদের পাচিকা খাবারের মধ্যে থুতু ফেলে।

ও উচ্চস্বরে বলে উঠলো, কী বলছো তুমি?

আমি বললাম, আস্তে।

ও ফিসফিস করে বললো, থুতু? কেন? ও রকম করবে সে?

আমি জানি না, কিন্তু তুমি ওর ওপর নজর রেখো।

চোখে একটা বিচিত্র দৃষ্টি নিয়ে সে আমার কাছ থেকে সরে গেল। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরই সে আমার কাছে ছুটে এসে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। তাকে রীতিমত অসুস্থ দেখায়।

ওহ, গড, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

তুমি দেখেছো?

ও খাবারের মধ্যে থুতু ফেলছে!

আমি বললাম, এখন আমাদের কি করা উচিত?

ও বললো, কর্ত্রীকে বলে দাও।

আমি বললাম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।

ব্যাপারটা বোঝার পর তার চোখ বিস্ফারিত হয়। আমরা কালো আর পাচিকা হলো সাদা।

ও বললো, কিন্তু ও এ রকম করলে আমি তো এখানে আর কাজ করতে পারবো না।

তাহলে তুমি ওঁকে গিয়ে বলো।

উনি তো আমার কথাও বিশ্বাস করবেন না।

সে উঠে পড়ে মেয়েদের বাথরুমে ছুটে গেল। যখন ফিরে এলো তখন সে স্থির বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকালো। আমরা দুজন কৃষ্ণাঙ্গ, আর আমরা এখন নীরবে নিজেদের জিজ্ঞাসা করছি। আমরা যদি আমাদের শ্বেতাঙ্গ কর্ত্রীকে গিয়ে বলি যে তাঁর নিপুণ সুদক্ষ শ্বেতাঙ্গ পাচিকা স্টোভের উপর খাবার রান্না করার সময় সারাদিন তার মধ্যে থুতু ফেলতে থাকে তাহলে কি তিনি সেকথা বিশ্বাস করবেন?

মেয়েটি ফিসফিস করে আর্তনাদ করে ওঠে, আমি জানি না, তারপর অন্যদিকে হেঁটে চলে যায়।

আমি পাচিকার ব্যাপারটা পরিচারিকাদের বলার কথা ভাবি, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি না। ওই মেয়েদের অনেকেরই টিলির সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। অথচ আমি

তো পাচিকাকে সারাদিন খাবারের মধ্যে থুতু ফেলতে দিতে পারি না। আচরণের যে, কোনো মানবিক মানদণ্ডে এটা ছিল অন্যায়। আমি বাসন-কোসন ধুতে ধুতে ভাবি, চিন্তা করি। আমি প্রাতঃরাশ পরিবেশন করি, ভাবি, চিন্তা করি। আমি উপরে অ্যাপার্টমেন্টের খদ্দেরদের খাবার দিয়ে আসি, ভাবি, চিন্তা করি। প্রতিবার খাবারের ট্রে হাতে নিলেই আমার বমি পায়। অবশেষে নিগ্রো সালাদ মেয়েটি আমার কাছে এসে আমার হাতে তার ব্যাগ এবং টুপি দিয়ে বললো, আমি কর্ত্রীকে গিয়ে বলছি, তারপর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

আমি বললাম, উনি যদি ওকে বরখাস্ত না করেন তাহলে আমিও চাকরি ছেড়ে দেবো।

কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটি যন্ত্রণাবিদ্ধ গলায় বললো, ওহ্, উনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।

তুমি ওঁকে বলে দেখো। তুমি মেয়ে, উনি হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস করবেন।

তার চোখ জলে ভরে যায়। সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর সে উঠে অকস্মাৎ খাবার ঘরে ঢোকে। আমি দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি। হ্যাঁ, সে এখন টেবিলের সামনে, কর্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সে রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে যায়। আমি তাকে অনুসরণ করি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বলেছো ওঁকে।

হ্যাঁ।

তিনি কী বললেন?

তিনি বললেন যে আমার মাথা খারাপ।

ওহ্, গড!

মেয়েটি বললো, তিনি তার ধূসর দু' চোখ তুলে আমাকে দেখলেন, তারপর বললেন, টিলি কেন এটা করবে?

আমি ওঁকে বলি যে আমি জানি না। কর্ত্রী দরজার কাছে এসে মেয়েটিকে ডাকলেন, তারপর ওরা দুজন খাবার ঘরে ঢুকলো। টিলি আমার কাছে এগিয়ে এলো। তার দু' চোখে কঠোর, শীতল দৃষ্টি। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তার মুখে একটা চড় মারি।

ও বিড়বিড় করে কিছু একটা বললো, তারপর স্টোভের কাছে ফিরে গেল, কাশলো, টগবগ করা পাত্রের মধ্যে থুতু ফেললো। আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্য পেছনের খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কর্ত্রীও বেরিয়ে এলেন।

তিনি আমাকে ডাকলেন, রিচার্ড।

তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি একটা সিগারেট টানছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকাই নি।

এটা কি সত্য?

হ্যাঁ, মাম।

হতে পারে না। তুমি কি জানো তুমি কি বলছো?

আমি বললাম, আপনি শুধু লক্ষ্য করুন।

তিনি আর্তকণ্ঠে বললেন, আমি জানি না...

তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন। তিনি খাবার ঘরে ফিরে গেলেন কিন্তু আমি দেখলাম যে, তিনি দরজার মধ্য দিয়ে পাচিকাকে লক্ষ্য করছেন। আমি ওদের দুজনকেই লক্ষ্য করি, প্রার্থনা করি যেন পাচিকা আবার থুতু ফেলে। ফেললো। কর্ত্রী রান্নাঘরে এসে স্থির চোখে পাচিকাকে দেখলেন কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। তিনি কেঁদে ফেলে দৌড়ে খাবার ঘরে ফিরে গেলেন।

টিলি জিজ্ঞাসা করলো, এখানে ঘটছেটা কি?

কেউ কোনো উত্তর দিলো না। কর্ত্রী বেরিয়ে এসে টিলির দিকে তার টুপি, কোট এবং টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এবার বেরিয়ে যাও এখান থেকে, নোংরা কুকুর কোথাকার!

টিলি স্থির চোখে তাকালো, তার টুপি, কোট আর টাকা কুড়িয়ে তুলে নিলো, হাত দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছলো, তারপর থুতু ফেললো, এবার মেঝের উপর। সে চলে গেল। টিলির যে কেন খাবারের মধ্যে থুতু ফেলতে ভাল বাসতো কেউ কখনো সে রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে পারে নি।

টিলির কথা ভাবতে ভাবতে আমার মিসিসিপির মনিবের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি আমার কাছে এসে আমার দিকে আমার বেতনের টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, নিগার, এবার বিদায় হও, তোমার চেহারা আমি পছন্দ করছি না।

আমি মনে মনে ভাবি, যে নিগ্রো মৃদু হাসে না, দাঁত বার করে হাসে না, সে কি যে রাঁধুনি খাবারের মধ্যে থুতু ফেলে শ্বেতাঙ্গদের কাছে নৈতিকতার দিক থেকে একই রকম ঘৃণ্য...

আমি পুরো বসন্তকাল ক্যাফেতে কাজ করি, আর জুন মাসে একটা অস্থায়ী দায়িত্বপালনের জন্য পোস্ট অফিসে ডাক পাই। আমার আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। আমি যদি একজন নিয়মিত কেরানির চাকরি পাই তাহলে আমি দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা আমার লেখার কাজে ব্যয় করতে পারবো।

আমি পোস্ট অফিসে হাজির হই এবং অস্থায়ী কেরানি হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। ঘণ্টায় আমি সত্তর সেন্ট উপার্জন করি আর আমার জীবনে এই প্রথম আমি প্রতি রাতে ভরা পেটে শয্যা গ্রহণ করি। যখন আমার রাতে কাজ পড়ে তখন আমি দিনের বেলায় লিখি, আর যখন দিনে কাজ করি তখন আমি রাতের বেলায় লিখি। কিন্তু চাকরি পাওয়ার খুশি আমাকে আরেকটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় না। স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্তির আগে আমাকে একটা শারীরিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, শরীরের ওজন হওয়া প্রয়োজন

একশো বিশ পাউন্ড– আর বছরের পর অর্ধ-উপবাসী থাকার ফলে আমার ওজন ছিল কোনো রকমে একশো দশ। মরীয়া হয়ে আমি আমার সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা খাদ্যের পেছনে খরচ করি, আমি খেতে থাকি। কিন্তু আমার ত্বক আর মাংস খাদ্যের আহ্বানে সাড়া দেয় না। আমি হয়তো ঠিক খাবার খাচ্ছি না হয়তো আমার অন্তহীন উৎকণ্ঠা আমার ওজন বাড়তে দিচ্ছে না। আমি দুধ পান করি, মাংস খাই কিন্তু আমার ওজন এক আউন্সও বাড়ে না। আমি ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমাকে বললেন যে, অপুষ্টি ছাড়া আমার আর কোনো সমস্যা নেই, আমাকে খেতে হবে এবং লম্বা ঘুম দিতে হবে। তাই করি আমি। কিন্তু আমার ওজন একই থাকে। আমি বুঝতে পারি যে, আমার চাকরি অস্থায়ীই থাকবে এবং যখন আমার নিয়োগের সময় আসবে তখন আবার আমাকে চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি আমার পেটের মধ্যে খাদ্য ঠেসে ঠেসে ভরতে থাকি আর সেই সময়ে পড়ে ফেলি স্টীনের থ্রি লাইভস, ব্রেন-এর দি ব্যাগ অব কারেজ এবং দস্তয়েভস্কির দি পসেসড। এই সবগুলিই আমার সামনে অনুভূতির নতুন জগৎ উন্মোচিত করে দেয়। কিন্তু যখন আমি যথার্থ কথাসাহিত্য থেকে মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের অঙ্গনে প্রবেশ করলাম তখনই ঘটলো সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারসমূহ। আমি বই-এর পর বই পড়ি যার মধ্যে আমি খুঁজে পাই আমার ও আমার পরিবারের আচার-আচরণের কারণসমূহ। জনসংখ্যার ঘনত্বের সঙ্গে মস্তিষ্কবিকৃতির সম্পর্ক, বাসস্থানের সঙ্গে রোগ-ব্যধির সম্পর্ক, বিদ্যালয় এবং বিনোদনের সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক, বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত আচরণের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক, সাদা ও কালোদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো সংখ্যাগুলি আমি গভীর মনোযোগ সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করি।

তখনো আমার কোনো বন্ধু হয় নি, না খাপছাড়া, না অন্তরঙ্গ। আর তার প্রয়োজনও আমি অনুভব করি না। আমি নিজের মধ্যে এমন একটা পর্যাপ্ততার বোধ গড়ে তুলেছিলাম যা আমাকে অন্যদের কাছ থেকে দূরে রাখে, আবেগগত এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকে। মাঝে মাঝে আমি ভাড়াটিয়াদের পার্টিতে যেতাম। বাড়ির মালিকদের জন্য ভাড়ার টাকা তোলার উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী পরিবারের সদস্যরা এসব পার্টির আয়োজন করতো। প্রবেশমূল্য ছিল পঁচিশ সেন্ট কিংবা আধ ডলার। এসব অনুষ্ঠানে আমি ঘরে তৈরি বিয়ার পান করতাম, সেমাই আর বিস্কুট খেতাম, মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করা যে কালো মেয়েরা গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করতো তাদের সঙ্গে হাসতাম ও কথা বলতাম, কিন্তু তাদের কারো সাথে আমার গভীরতম অনুভূতিজাত কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। আমি পড়েছি তা নিয়ে আমি কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা করি না, আমি বিশ্বাস করে কারো কাছে আমার গোপন চিন্তা-ভাবনার কথা বলি না। আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে আমি নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক জগৎ থেকে গুটিয়ে

নিয়েছিলাম। আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি আমার নিজের চেতনার চার দেয়ালের মধ্যে শিথিলভাবে ভেসে বেড়াতো, তারই মধ্যে আনন্দ এবং নিষ্ক্রিয়তা।

আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি হিসেবে আমি কথা বলার একটা কাঠিন্যহীন, নৈরাসক্তিক আচরণ সম্পন্ন ভঙ্গি রপ্ত করে ফেলি। আমার সঙ্গে যারা খুব ঘনিষ্ঠ হতে চায় তাদের প্রতিহত করে। আলাপচারিতা ছিল অভিব্যক্তি এড়িয়ে যাবার আমার নিজস্ব পদ্ধতি। আমি যখন একাকী লিখতে বসতাম সেই সময়ের জন্য সংরক্ষিত থাকতো আমার কথা। আমার মুখ ছিল ভাবলেশহীন, সাধারণ বন্ধুত্বের একটা মুখোশ পরা; কোনো কথা, কোনো ঘটনা আমার মধ্যে উৎসাহ কিংবা হতাশার ভঙ্গি জাগিয়ে তুলতো না। সাবলীলভাবে আমি যা-ই শুনতাম তার উত্তর আমার প্রতিক্রিয়া জানাতাম দ্বিধাহীন সুরে 'উহুঁ' শব্দটি উচ্চারণ করে। আমার অনুমোদনের ভঙ্গি ছিল আস্তে মাথা দুলিয়ে বলা, 'বেশ ভালই তো'। প্রত্যাখান করতে হলে মুখে একটা ঠাণ্ডা হাসি ফুটিয়ে আমি শুধু দ্বিরুক্তি করে বলতাম 'ওহ, না'। যদিও আমার প্রতিক্রিয়া হতো অত্যন্ত গভীর তবু আমার প্রকৃত অনুভূতিগুলি থাকতো গোপন, তারা ছুটে যেতো ভূতল দিয়ে।

আমি সুচিন্তিতভাবে এ রকম করতাম না। লোকজনের সঙ্গে এ জাতীয় সম্পর্কের প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না। আমি চেয়েছিলাম এমন একটা জীবন যেখানে অপরের সঙ্গে একটা নিরন্তর একাত্মতার বোধ থাকবে, যেখানে আমরা সবাই জীবনের মৌলিক অনুভূতিসমূহের অংশীদার হবো, যেখানে এজমালি স্মৃতি একটা এজমালি অতীত তৈরি করে, যেখানে সম্মিলিত আশা প্রতিফলিত করে একটা জাতীয় ভবিষ্যত। কিন্তু আমি জানতাম আমার পরিবেশে ওই রকম কিছু সম্ভব নয়। আমি উপলব্ধি করি যে বড় উপেক্ষা অথবা কঠিন প্রত্যাঘাত ছাড়া আমার অনুভূতিসমূহ প্রকাশ পেতে পারে একমাত্র আমার লেখা ও পড়ার মধ্য দিয়ে, আর আমার জন্য তাই হয়ে ওঠে বাঁচার পথ।

ম্যাগি খালা এখন একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছেন। আমি তার পেছন দিকের একটা ঘরে থাকি। আমার মা ও ভাই এসে পড়ে। আমরা তিনজন ওই একটি ঘরে ঘুমাই। ঘরে কোনো জানালা নেই, শুধু চার দেয়াল আর একটা দরজা। আমার অত্যধিক বই পড়া ম্যাগি খালাকে বিভ্রান্ত করে। তিনি আবার ভয়ঙ্কর রকম অন্তর্মুখী স্বভাব অনুভব করেন এবং সেটা তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি নিজে ছিলেন খোলামেলা স্বভাবের, কথা বলতে ভালবাসেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, জীবন যাপনের ব্যাপারে আমি ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছি। বই পড়া আমকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করবে না। কিন্তু তাঁর কোনো কথাই আমার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। বহু আগেই আমি সমালোচনার বিরুদ্ধে নিজেকে শক্ত করে নিয়েছিলাম।

খালা জানতে চাইলেন, এই ছেলে, তুমি কি আইনজীবী হবার জন্য পড়াশোনা করছো?

না।

তাহলে সারাক্ষণ এ রকম পড়ছো কেন?

ভাল লাগে তাই।

কিন্তু তুমি এর মধ্য থেকে কি পাও?

এর মধ্য থেকে আমি অনেক কিছু পাই।

আমি জানতাম যে আমার পরিবেশে আমার কথাগুলি শোনাবে উদ্ভট এবং হাস্যকর। আমার পরিবেশে পড়ার ব্যাপারটা ছিল প্রায় অজানা। সেখানে সব চাইতে মূল্যবান ছিল একটা শ' পয়সা কিংবা একটা ডলার, একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা একটা চাকরি। সেখানে কেউ যদি কোনো কিছু হবার উচ্চাশা পোষণ করতো তা হলো সে একজন ডাক্তার অথবা একজন আইনজীবী হবে, একজন দোকানমালিক অথবা একজন রাজনীতিবিদ হবে। আমার পরিচিত মানুষরা যে জিনিসটা পেলে সব চাইতে খুশি হয় তাহলো একটা মোটরগাড়ি, তাদের সব চাইতে বেশি উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হলো এক বোতল হুইস্কি, তাদের সব চাইতে আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার হলো আরেকজনের স্ত্রী। আমার চারপাশের মানুষদের চাইতে আমি উন্নততর কিংবা নিকৃষ্ট এমন কোনো বোধ আমার ছিল না, আমি শুধু অনুভব করতাম যে, ভিন্নভাবে বাঁচতে শেখার কোনো সুযোগ তারা কখনো পায় নি। আমি কখনো তাদের সমালোচনা বা প্রশংসা করতাম না, তবু তাদের শাপশাপান্ত করার চাইতেও আমার নিরপেক্ষতার মধ্যে তারা এক গভীরতর প্রত্যাখ্যান অনুভব করতো।

আমি বারবার লিখতে বসি কিন্তু তার ফলাফল এতো দুর্বল হয় যে আমি পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলি। আমার পড়া উপন্যাসগুলির প্রকাশভঙ্গির অনুরূপ প্রকাশভঙ্গির জন্য আমি চেষ্টা করি। কিন্তু আমার চিন্তা ও অনুভূতিকে কিছুতেই কাগজের পাতায় ঠিক মতো রূপ দিতে পারি না। অব্যাহত আখ্যান রচনায় ব্যর্থ হয়ে আমি একক বাক্য ও শব্দগুচ্ছ নিয়ে খেলা করি। স্টীনের থ্রি লাইভস দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে শুধু কথার প্রেমে পড়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী লিখে চলি। আমি লিখি–

কোমল নরম মস্ত বড় মাখনের টুকরা গলে গিয়ে ফাঁক করা গাছ-আলুর দড়ির মতো খাঁজগুলির সোনালি ধারায় টিপ টিপ করে গড়িয়ে পড়ে।

কিংবা

ছেলেটির অপটু আঙ্গুলগুলি ঘুমের মধ্যে হাতড়ায়, তার স্বপ্নের ইচ্ছার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বুড়ো মানুষটা অন্ধকার দোরগোড়ায় জড়োসড়ো হয়ে থাকে, দূরের আকাশচুম্বী ভবনগুলির জানালা থেকে আসা উজ্জ্বল হলুদ তার শীর্ণ মুখ আলোকিত করে তোলে।

আমার উদ্দেশ্য ছিল একটা শারীরিক অবস্থা অথবা গতিকে আয়ত্ব করা যা একটি শক্তিশালী আত্মনিষ্ঠ ধারণা বহন করবে। এই অর্জন ছিল আমার বিবেচনায় কঠিনতম সংগ্রামের যোগ্য। আমি যদি পাঠকদের মনকে শব্দের ওপর এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করতে

পারি যে সে শব্দের কথা ভুলে যাবে এবং শুধু নিজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকবে তাহলে, আমার মনে হয়, কীভাবে আখ্যান রচনা করতে হয় তা আমার দৃষ্টির আওতায় আসবে। আমি শব্দকে আয়ত্ব করার, তাকে অদৃশ্য করার, নতুনত্ব দান করে তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করি। আমি চেষ্টা করি যেন শব্দ গলে গিয়ে, ঘুরে ঘুরে, আবেগদীপ্ত ঊর্ধ্বমুখে উঠে যেতে পারে, প্রতিটি স্তর অনাদির চাইতে বৃহত্তর, একে অন্যকে পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী করে চলেছে এবং সবকিছু গিয়ে শেষ হচ্ছে একটা আবেগপূর্ণ চূড়ান্ত পরিণতিতে যা পাঠককে একটা নতুন জগতের বোধে স্নিগ্ধ করবে। আমার বেঁচে থাকার তাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

শরৎ আসে। নিয়মিত পোস্টাল কেরানি পদের জন্য শারীরিক পরীক্ষার জন্য পত্র পাই আমি। আমি জানতাম যে, আমি পাশ করবো না। সেকথা আমার মা কিংবা ভাই কিংবা খালাকে আমি জানাই নি। পরীক্ষার দিন সকালে আমি প্রায় আড়াই লিটার ঘোল ও ছাঁটা কলা খাই কিন্তু সরকারি ওজন মাপার যন্ত্রে লাল তীর দেয়া প্রয়োজনীয় একশো পঁচিশ পাউন্ডে কাঁটা পৌঁছায় না। আমি বাড়ি ফিরে আমার পেছনের ঘরে শোকার্ত চিত্তে বসে থাকি। নিজের প্রতি ঘেন্না হয় আমার। এখন কোথায় আমি আরেকটা কাজ পাবো? একটা ভাল চাকরি প্রায় আমার হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল কিন্তু আমি তা হারালাম, তাকে আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিলাম। আত্মসংশয়ের ঢেউ আমাকে তাড়া করে ফেরে। আমাকে কি সর্বদা জীবনের প্রান্ত থেকে ঝুলে থাকতে হবে? আমার চাওয়া ছিল খুবই পরিমিত, তথাপি আমার অতীত, আমার খাদ্য সামগ্রী, আমার ক্ষুধা তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে। কিন্তু এ রকম আত্মসংশয় বেশিদিন টিকে থাকে না। পড়া, পড়া, লেখা এবং আরো লেখার মধ্য দিয়ে আমি আমার ক্ষতির অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিই।

মার্কিন জীবনের বস্তুগত ভিত্তিভূমি আমি প্রথমবারের মতো প্রায় আঁকড়ে ধরেছিলাম। বিধিমালায় যে পদ্ধতির কারণে আমি আমার চাকরি হারাই তার বিরুদ্ধে আমার মধ্যে কোনো বৈরী মনোভাব জাগে না। তবে কয়েক পাউন্ড মাংসের ঘাটতির জন্য যে আমাকে একটা ভাল চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হলো এটা আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হলো না। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমি বাস করি তাকে আবেগগতভাবে আমি বহু আগেই বাতিল করে দিয়েছিলাম। আমার প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম– তাদের সাহায্য আসুক বা না আসুক মানুষ চায় যে এ পদ্ধতিতেই জগৎ চলুক। আমার কাছে আমার চাকরি হারানো ছিল মার্কিন জীবন যাপনের বস্তুগত দিকের আরেকটি নিদর্শন। সে-জীবন সব কিছু হিসাব করে মূর্ত বাস্তবের নিরিখে– ওজন, বর্ণ, জাতি, পশমের কোটি, রেডিও, ফ্রিজ, মোটরগাড়ি, অর্থ... আমার মনে হয় আমি এই বস্তুবাদী জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অপারগ।

এখন যখন ডাক-কেরানি হবার আমার আর সম্ভাবনা নেই তখন আমার মা, আমার

ভাই আর ম্যাগি খালা বাসস্থানের পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ম্যাগি খালার চোখে আমি ছিলাম এক নির্লজ্জ ব্যর্থতা। তাঁর ভয় হয় আমাকে খাওয়ানোর ভার হয়তো তাঁকেই নিতে হবে। অল্পশস্ত্র বাসস্থানে আবেগগত পরিবেশ টানটান, কুৎসিত, ক্ষুব্ধমনা এবং ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। আমার লেখা ও পড়ার ব্যাপারে দোষ ধরা হলো, বলা হলো যে, আমার জন্য বৈদ্যুতিক বিল বাড়ছে। আমি প্রায় কোনো টাকা বাঁচাতে না পারলেও একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ক্লিও বালা একটা ভাড়াটে ঘরে থাকতেন, আমি তাঁকে আমার মা, ভাই ও আমার সঙ্গে আমার অ্যাপার্টমেন্টের অংশীদার হয়ে থাকার আমন্ত্রণ জানাই। তিনি রাজি হন। আমরা একটা ছোট্ট, নিষ্প্রভ, দু' ঘরের ডেরায় উঠে যাই, তার রান্নাঘরের দেয়ালে স্টোভের কাছে এক কোণায় একটা ঘাট আঁটসাঁট ভাবে আটকানো ছিল। জায়গাটা ছিল ইঁদুর আরশোলায় ভর্তি, বাতাসে দিন-রাত ভাসতো রান্নার গন্ধ।

আমি ক্যাফেতে আমার আগের চাকরির জন্য আবেদন করি। কর্ত্রী আমাকে ফিরে আসার অনুমতি দেন। আমি আবার প্রাতঃরাশ পরিবেশন করি, বাসন-কোসন ধুই, ট্রে করে অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে খাবার নিয়ে যাই। বসন্তে ডাক বিভাগের আরেকটা পরীক্ষা হবে। সেটা মাথায় রাখার ফলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যখন ইচ্ছা করে না তখনো আমি খাই, দুধ খেলে বমি-বমি লাগে তবু আমি দুধ খাই। ধীরে ধীরে আমার উপবাসী শরীর খাদ্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। মিসিসিপি, আরকানসাস এবং টেনেসীর শীর্ণ বছরগুলি আমি পেরিয়ে আসি, ভয়-ভরা, মাংস ক্ষয় করা দিনগুলির উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পেছনে পড়ে থাকে।

আমি রাত জেগে প্রুস্ত-এর এ রিমেমব্র্যান্স অব থিংগস, পার্ট পড়ি। স্বচ্ছ, নিপুণ কিন্তু বলিষ্ঠ গদ্যের প্রশংসা করি, তার চোখধাঁধানো জাদুতে স্তম্ভিত হয়ে যাই। ফরাসী লেখকের মৃত্যু ও অবক্ষয়ের মহাকাব্যের বিশাল, সুকুমার, জটিল এবং মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো লক্ষ্য করে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হই। কিন্তু আমি হতাশায় বিধ্বস্ত হয়ে যাই, কারণ আমি চেয়েছিলাম আমার পরিবেশে আমার মানুষদের নিয়ে ওই রকম অনুপুঙ্খভাবে আমি কিছু লিখবো, কিন্তু আমার চোখের সামনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখে আমি বুঝি যে, আমি তা কখনো করতে পারবো না।

আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহ্য করার ক্ষমতা ইতিমধ্যে বিস্ময়কর রকম বেড়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের বছরগুলির আকস্মিক যন্ত্রণা থেকে, যে দুশ্চিন্তা আমি পরিহার করতে চাইতাম তা থেকে, যে ভয়-ভীতি ছিল প্রায় অসহনীয় তা থেকে মুক্ত হয়ে আমি এখন আমার অব্যাহত অনুভূতির বোঝাকে পছন্দ করতে শিখেছি, আমি এখন আমার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, আমি এখন জীবনের সেই সব অঙ্গন, সেই সব পরিস্থিতি অনুসন্ধান করতে শিখেছি যা আমার অন্তর্গত মেজাজকে পূর্ণ করে তুলবে। আমার ভেতরে কি ঘটছে সে সম্পর্কে আমি সচেতন। আমি বুঝতে পারি যে, আমার

সতর্ক বিস্ময়ের দৃষ্টিকোণ আমার অন্য সব অনুভূতিকে গ্রাস করেছিল, আমার জীবনের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হয়ে উঠেছিল আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি যেটা করছিলাম তার দ্বারা বাঁচতে, সব কিছু তার মাপে ওজন করতে। অন্যের ওপর আমার কোনো দাবি না থাকায় আমি বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয় সেদিকে চলে পড়ি, আমার পরিবেশকে দিই যা আমার পরিবেশের, আর যা আমি অনুভব করি আমার নিজের তা আমার নিজেকে দিই।

এ ছিল বিপজ্জনক ভাবে বাঁচার পথ, আইন অমান্য আচরণের নৈতিক বিধিমালা লঙ্ঘন করার চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক, কিন্তু বিপদটা ছিল আমার, শুধুই আমার। আমি কী করছি সে সম্পর্কে যদি আমি সচেতন না থাকতাম তাহলে আমি সহজেই অন্য অলীক কল্পনার কুয়াশাচ্ছন্ন অঙ্গনে আমার পথ হারিয়ে ফেলতে পারতাম। তবু, আমি নাকানি-চুবানি ও হোঁচট খাই। কিন্তু কোনো রকমে, হাতড়ে হাতড়ে, আমি সব সময় সেই পথে ফিরে আসি যেখানে এক অদৃশ্য আলো থেকে আমি উষ্ণতার একটা আমেজ পাই।

আমি আমার নিজের জীবন এবং আমার চারপাশের মানুষদের জীবনের মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য বুভুক্ষ হওয়ার ফলে এবং আমার নিজের ভয়ঙ্কর রকম অন্তর্মুখী স্বভাব সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য আমি বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমার নিজের অংশের চাইতেও বেশি পূরণ করার চেষ্টা করি, যেন আমি আমার পরিবেশকে ক্ষমতাপ্রার্থনার তর্পণ অর্পণ করছি। বস্তুতপক্ষে আমার পরিবেশ যত বেশি আমার মনোযোগ দাবি করে, যেন চূড়ান্ত আত্মরক্ষার স্বার্থে, নৈর্ব্যক্তিক পৃথিবীর বাস্তবতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করার আমার ইচ্ছাও ততো বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, যেন আমি তার দাবিকে প্রয়োজনের চাইতেও বেশি পরিমাণে পূর্ণ করতে পারি। বিশ বছর বয়সেই আমার জীবনের ছাঁচ তৈরি হয়ে যায় এবং তা একটা কঠোর আদর্শে পরিণত হয়। যে আদর্শ ভালও নয়, মন্দও নয়, সঠিকও নয়, ভুলও নয়।

ভাই আর ম্যাগি খালা বাসস্থানের পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ম্যাগি খালার চোখে আমি ছিলাম এক নির্জলা ব্যর্থতা। তাঁর ভয় হয় আমাকে খাওয়ানোর ভার হয়তো তাঁকেই নিতে হবে। অগ্রশস্ত বাসস্থানে আরেগণত পরিবেশ টানটান, কুৎসিত, ক্ষুদ্রমনা এবং ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। আমার লেখা ও পড়ার ব্যাপারে দোষ ধরা হলো, বলা হলো যে, আমার জন্য বৈদ্যুতিক বিল বাড়ছে। আমি প্রায় কোনো টাকা বাঁচাতে না পারলেও একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ক্লিও খালা একটা ভাড়াটে ঘরে থাকতেন, আমি তাঁকে আমার মা, ভাই ও আমার সঙ্গে আমার অ্যাপার্টমেন্টের অংশীদার হয়ে থাকার আমন্ত্রণ জানাই। তিনি রাজি হন। আমরা একটা ছোট্ট, নিষ্প্রভ, দু' ঘরের ডেরায় উঠে যাই, তার রান্নাঘরের দেয়ালে স্টোভের কাছে এক কোণায় একটা খাট আঁটসাঁট ভাবে আটকানো ছিল। জায়গাটা ছিল ইঁদুর আরশোলায় ভর্তি, বাতাসে দিন-রাত ভাসতো রান্নার গন্ধ।

আমি ক্যাফেতে আমার আগের চাকরির জন্য আবেদন করি। কর্ত্রী আমাকে ফিরে আসার অনুমতি দেন। আমি আবার প্রাতঃরাশ পরিবেশন করি, বাসন-কোসন ধুই, ট্রে করে অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে খাবার নিয়ে যাই। বসন্তে ডাক বিভাগের আরেকটা পরীক্ষা হবে। সেটা মাথায় রাখার ফলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যখন ইচ্ছা করে না তখনো আমি খাই, দুধ খেলে বমি-বমি লাগে তবু আমি দুধ খাই। ধীরে ধীরে আমার উপবাসী শরীর খাদ্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। মিসিসিপি, আরকানসাস এবং টেনেসীর শীর্ণ বছরগুলি আমি পেরিয়ে আসি, ভয়-ভরা, মাংস ক্ষয় করা দিনগুলির উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পেছনে পড়ে থাকে।

আমি রাত জেগে প্রুস্ত-এর এ রিমেমব্রান্স অব থিংগস, পার্ট পড়ি। স্বচ্ছ, নিগূঢ় কিন্তু বলিষ্ঠ গদ্যের প্রশংসা করি, তার চোখধাঁধানো জাদুতে স্তম্ভিত হয়ে যাই। ফরাসী লেখকের মৃত্যু ও অবক্ষয়ের মহাকাব্যের বিশাল, সুকুমার, জটিল এবং মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো লক্ষ্য করে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হই। কিন্তু আমি হতাশায় বিধ্বস্ত হয়ে যাই, কারণ আমি চেয়েছিলাম আমার পরিবেশে আমার মানুষদের নিয়ে ওই রকম অনুপুঙ্খভাবে আমি কিছু লিখবো, কিন্তু আমার চোখের সামনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখে আমি বুঝি যে, আমি তা কখনো করতে পারবো না।

আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহ্য করার ক্ষমতা ইতিমধ্যে বিস্ময়কর রকম বেড়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের বছরগুলির আকস্মিক যন্ত্রণা থেকে, যে দুশ্চিন্তা আমি পরিহার করতে চাইতাম তা থেকে, যে ভয়-ভীতি ছিল প্রায় অসহনীয় তা থেকে মুক্ত হয়ে আমি এখন আমার অব্যাহত অনুভূতির বোঝাকে পছন্দ করতে শিখেছি, আমি এখন আমার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, আমি এখন জীবনের সেই সব অঙ্গন, সেই সব পরিস্থিতি অনুসন্ধান করতে শিখেছি যা আমার অন্তর্গত মেজাজকে পূর্ণ করে তুলবে। আমার ভেতরে কি ঘটছে সে সম্পর্কে আমি সচেতন। আমি বুঝতে পারি যে, আমার

সতর্ক বিস্ময়ের দৃষ্টিকোণ আমার অন্য সব অনুভূতিকে ম্লান করেছিল, আমার জীবনের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হয়ে উঠেছিল আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি চেষ্টা করছিলাম তার দ্বারা বাঁচতে, সব কিছু তার মাপে ওজন করতে। অন্যের ওপর আমার কোনো দাবি না থাকায় আমি বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয় সেদিকে চলে পড়ি, আমার পরিবেশকে দিই যা আমার পরিবেশের, আর যা আমি অনুভব করি আমার নিজের তা আমার নিজেকে দিই।

এ ছিল বিপজ্জনক ভাবে বাঁচার পথ, আইন অথবা আচরণের নৈতিক বিধিমালা লঙ্ঘন করার চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক, কিন্তু বিপদটা ছিল আমার, শুধুই আমার। আমি কী করছি সে সম্পর্কে যদি আমি সচেতন না থাকতাম তাহলে আমি সহজেই অন্য অলীক কল্পনার কুয়াশাচ্ছন্ন অঙ্গনে আমার পথ হারিয়ে ফেলতে পারতাম। তবু, আমি নাকানি-চুবানি ও হোঁচট খাই। কিন্তু কোনো রকমে, হাতড়ে হাতড়ে, আমি সব সময় সেই পথে ফিরে আসি যেখানে এক অদৃশ্য আলো থেকে আমি উষ্ণতার একটা আমেজ পাই।

আমি আমার নিজের জীবন এবং আমার চারপাশের মানুষদের জীবনের মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য বুভুক্ষ হওয়ার ফলে এবং আমার নিজের ভয়ঙ্কর রকম অন্তর্মুখী স্বভাব সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য আমি বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমার নিজের অংশের চাইতেও বেশি পূরণ করার চেষ্টা করি, যেন আমি আমার পরিবেশকে ক্ষমতাপ্রার্থনার তর্পণ অর্পণ করছি। বস্তুতপক্ষে আমার পরিবেশ যত বেশি আমার মনোযোগ দাবি করে, যেন চূড়ান্ত আত্মরক্ষার স্বার্থে, নৈর্ব্যক্তিক পৃথিবীর বাস্তবতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করার আমার ইচ্ছাও ততো বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, যেন আমি তার দাবিকে প্রয়োজনের চাইতেও বেশি পরিমাণে পূর্ণ করতে পারি। বিশ বছর বয়সেই আমার জীবনের ছাঁচ তৈরি হয়ে যায় এবং তা একটা কঠোর আদর্শে পরিণত হয়। যে আদর্শ ভালও নয়, মন্দও নয়, সঠিকও নয়, ভুলও নয়।

ষোড়শ অধ্যায়

বসন্তকালে আমি ডাক বিভাগের পরীক্ষা আবার দিই। ক্ষুধা যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ছিল সময় তা অনেকখানি মেরামত করে দেয় এবং প্রয়োজনীয় শারীরিক ওজনের ক্ষেত্রে আমি এবার উত্তীর্ণ হই। আমরা আরেকটু বড় অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাই। বেতন বাড়ার ফলে আমাদের পক্ষে আরেকটু ভাল খাওয়া-দাওয়া সম্ভব হয়। আমার নিজস্ব ধরনে আমি এখন সুখী।

আমি রাতে কাজ করি আর দিনের বেলা কাটাই পরীক্ষামূলক লেখালেখি করে। কৃষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের আমি যেভাবে দেখেছি, যেভাবে অনুভব করেছি, তা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি নিগ্রোদের আঞ্চলিক ভাষায়। চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহের আঙ্গিকে আমি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে ফেলি। আমার সমাজতত্ত্ব পঠন-পাঠনের ফলে নিগ্রো চরিত্রাবলীর নানা বিচিত্র টাইপ আমি দেখতে পাই, নিগ্রো আচরণের নানা ধরন আমি শনাক্ত করতে পারি, আর যা আমাকে সব চাইতে বেশি আলোড়িত করে তা হলো মানবিক অসুস্থতার পুনঃপুন সংগঠন, নাগরিক পরিবেশ কৃষ্ণাঙ্গ চাষীকুলের কাছ থেকে যে শোকাবহ মাশুল আদায় করে নেয় তা। আমার লেখালেখি হয়তো ছিল আত্মপ্রকাশের চাইতে এসব বোঝার একটা প্রয়াস। একটা প্রয়োজন যা আমি বুঝতে পারি না তা আমাকে দিয়ে ধর্মীয় টাইপ, অপরাধী টাইপ, বিকৃত, পরাজিত, বিভ্রান্ত মানুষ সৃষ্টি করার জন্য শব্দাবলী ব্যবহার করিয়ে নেয়। আমার পাতাগুলি ভরে ওঠে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, চরম দারিদ্র্যে এবং মৃত্যুতে।

কিন্তু আমার কল্পনার প্রচেষ্টায় কিছু একটা বাদ পড়ে যাচ্ছিল। আমার কল্পনার উড়াল ছিল বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক, সামাজিক কর্মযজ্ঞের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুবই কম। আমার মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে সমকালীন জীবনের কাঠামোটা ধরতে, আমার চারপাশের জীবনের রূপগুলি দেখবার চোখ পেতে, সেই সব তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যা আচরণের অস্পষ্ট ছায়াকে আলোকিত করে তুলবে। ডাকঘরে চিঠিপত্র বাছাই করার সময় এক তরুণ আইরিশ ছেলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার সংবেদনশীলতা আমাকে বিস্মিত করে। আমরা আমাদের হাতে এক তাড়া চিঠি নিয়ে, নিচু গলায় নিস্তরঙ্গ সুরে কথা বলতে বলতে, চিঠিগুলি তাদের নির্ধারিত খোপে নির্ভুলভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম, তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করতাম যে আমাদের হাত খালি, এবং আমরা যে এতোক্ষণ কাজ করেছি তার কোনো স্মৃতি আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা অনুভব করি না। অধিকাংশ কেরানিই এ রকম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতো। আইরিশ ছেলেটি আর

আমার পড়াশোনার মধ্যে প্রচুর মিল ছিল এবং আমরা একই রকম পরিবার নিয়ে হাসিঠাট্টা করতাম। নৈতিক অনুপ্রেরণা এবং আমার ব্যাপারে সে ছিল আমার মতোই নৈরাশ্যবাদীর আচরণ সম্পন্ন এবং আমরা যে, আমরা যাকে বলতাম শিকাগোর অধিবিদ্যামূলক ভয় তার হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি, সেজন্য গর্ববোধ করতাম। আমি আইরিশ, ইহুদি ও নিগ্রোদের একটা দল গড়ে তুলি। আমরা সরকার, জনগণ, কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যে জঙ্গীবিপ্লব ছুঁড়ে দিই। আমরা ধরে নিই যে সব মানুষই ভাল, ঠিক যে অনুপাতে তারা আমাদের অনক্য সেই অনুপাতে, অথবা যে অনুপাতে আমরা তাদের আমাদের হাসাকৌতুকের বস্তুতে পরিণত করতে পারবো সেই অনুপাতে। প্রতিবাদ অথবা সংগঠিত বিদ্রোহ অথবা বিপ্লবের সব ধারণাকে আমরা উপহাস করতাম। আমরা মনে করতাম সব ব্যবসায়ীই বোকার হদ্দ আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে সক্ষম এমন কোনো দলও নেই। আমরা ভোট প্রদানের বিষয়টিকে ঠাট্টা ও অবজ্ঞা করতাম কারণ আমাদের বিবেচনায় একটি রাজনৈতিক বদমাশ এবং আরেকটি রাজনৈতিক বদমাশের মধ্যে পার্থক্য এতো কম ছিল যে, তা নিয়ে কোনো গুরুতর চিন্তা ভাবনা করা ছিল অর্থহীন। আমরা বিশ্বাস করতাম যে, মানুষের বাঁচা উচিত একমাত্র কঠোর বাস্তবতা নিয়ে, আর ঈশ্বরকে আমরা এতো আগে আমাদের মন থেকে বিসর্জন দিয়েছিলাম যে তাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা পর্যন্ত করি না।

এ রকম নৈরাশ্যবাদীর আচরণসম্পন্ন পর্বে শিকাগোর সাউথ সাইডের একটি নিগ্রো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তারা ছিল বারো-চোদ্দজন ছেলেমেয়ের একটি দল। তাদের সবারই ছিল স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং লেখালেখির একটা ভাসাভাসা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি দেখলাম যে, আচার-আচরণে তারা তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রতিমূর্তিদের চাইতে বেশি আনুষ্ঠানিক। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কেতাদুরস্ত এবং ব্যক্তিগত চেহারার ব্যাপারে তারা বেশ খুঁতখুঁতে। আমি নির্বোধ সারল্যের সঙ্গে ভেবেছিলাম যে, তাদের সঙ্গে বোধহয় আমার বহু মিল থাকবে কিন্তু আমি দেখলাম যে, তারা শুধু বিকৃত যৌন সমস্যাদি নিয়েই মগ্ন। আমি জীবনের যে স্তর থেকে এসেছি তাকে তারা নিঃসন্দেহে নিম্ন শ্রেণী বলে অভিহিত করতো, আর সেই স্তর থেকে উঠে আসার জন্য যৌন আবেগ নিয়ে তাদের ওই রকম সর্বগ্রাসী নিমগ্নতা ছিল আমার বোধের অগম্য। আমি এই প্রথমবারের মতো পূর্ণবিকশিত উল্টানো নিগ্রো পিউরিটানদের দেখা পাই– যারা আবেগগত দিকে থেকে অসুস্থ– আর আমি আবিষ্কার করি যে, তাদের ধ্যান-ধারণা শুধু অজুহাত, যৌনতার জন্য অজুহাত, যা যৌনমিলনে নিয়ে যাবে কিংবা তার ইঙ্গিত দেবে তার অজুহাত, যৌনতার বিকল্পের অজুহাত। কথাবার্তা ও কাজে তারা নিজেদের যতটা সম্ভব অ-নিগ্রো রূপে তুলে ধরতে চেষ্টা করতো। তারা তাদের জীবনের জাতি ও বস্তুগত ভিত্তিকে অস্বীকার করতো, তাদের শ্রেণী ও জাতিগত অবস্থানকে এমন

তির্যকভাবে তারা মেনে নিতো যে ধারণা হতো যে তাদের জন্য কোথাও কোনো অসুবিধার অস্তিত্ব নেই। কোনো কলেজ প্রফেসরের কাছ থেকে কখনো কোনো নির্দেশ না পেলেও আমি নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ওদের যে-কারো চাইতে বেশি সময় ও বেশি কঠোর হওয়ার চেষ্টা করেছি। শিল্পকলার জন্য ভালবাসার শপথ নিলেও তারা শুধু বোহেমীয় জীবনের প্রান্তসীমানায় ঘোরাফেরা করতো। সর্বদা বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু কখনোই তারা কারো বন্ধু হতে পারতো না; সর্বদা পড়ছে, কিন্তু কখনোই তারা সত্যিকার কিছু শিখছে না; সর্বদা নিজেদের তীব্র কামনা-বাসনা নিয়ে অহঙ্কার করছে, কিন্তু সত্যিকার কিছুই অনুভব করছে না, আর তারা বাঁচতে ভয় পায়।

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে দেখার ওই দিনগুলিতে আমার একটি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যারা আমাকে বিমুগ্ধ করে, গারভেয়াইটস-রা। সেটা ছিল কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষের একটি সংগঠন। তারা নিঃসহায়ভাবে আফ্রিকায় ফিরে যাবার একটি পথ খুঁজছিল। তাদের ছিল আমেরিকার তীব্র আবেগদীপ্ত প্রত্যাখ্যান। একমাত্র সরল মানুষদের মধ্যে যে প্রত্যাক্ততা থাকে সেই প্রত্যক্ততা দ্বারা তারা উপলব্ধি করেছিল যে আমেরিকাতে তারা কখনোই একটা পরিপূর্ণ মানব জীবন যাপনের সুযোগ পাবে না। আধা-আধি বিশ্বাস করা ধ্যান-ধারণা দ্বারা তাদের জীবন দাগাদাগি করা ছিল না। তারা যখন বাঁচছে না তখন ভাববে যে বাঁচছে সেরকম মোহমায়া সৃষ্টিতে তারা ছিল অপারগ। তাদের দৈনন্দিন জীবন এমনই নিষ্ঠুর-কর্কস ছিল যে সেখানে কোনো কূট ছদ্মাবরণের অবকাশ ছিল না। আমি তাদের আবেগ-অনুভূতি বুঝতাম, কারণ আমিও কিছু পরিমাণে তার অংশীদার ছিলাম।

গারভেয়াইটস-রা একটি পুরোপুরি বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। এর ফলে তারা এমন একটা মর্যাদায় ভূষিত হয় যা আমি নিগ্রোদের মধ্যে ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি। তাদের অনুজ্জ্বল ফ্ল্যাটের দেয়ালে ঝুলতো আফ্রিকা, ভারত এবং জাপানের মানচিত্র, জাপানী সেনাপতি ও নৌসেনাধ্যক্ষদের ছবি, জাকজমকপূর্ণ সাজপোশাক মার্কাস গার্ভিয়ের প্রতিকৃতি, পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর মুখের ছবি।

গারভেয়াইজমের ভাবাদর্শের উপর আমার কোনো আস্থা ছিল না, কিন্তু তার অনুসারীদের আবেগময় গতিশীলতা আমার প্রশংসা উদ্রেক করে। আমার চেনাজানা গারভেয়াইটস-রা কখনো বুঝতে পারতো না আমি তাদের পছন্দ করলেও কেন তাদের অনুসরণ করি না। তাদের প্রতি করুণাবশত আমি তাদের বলতে পারি নি যে তারা কখনো তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না, আফ্রিকার মালিক হলো ইউরোপের রাজকীয় শক্তিসমূহ, আফ্রিকার স্বদেশবাসীদের জীবন ধারার চাইতে তাদের জীবনধারা ভিন্নতর, তারা নিজেরা হলো পশ্চিমের লোক এবং যতদিন পর্যন্ত তারা পশ্চিমের সঙ্গে মিশে না যাবে কিংবা ধ্বংস হয়ে না যাবে ততদিন পর্যন্ত তাই থাকবে। গারভেয়াইটস-রা যখন হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে তাদের নিজেদের দেশ গড়ার কথা বলে, তারা যে একদিন

ওদের নিজেদের তৈরি নিজেদের সংকুচিত সীমানার মাঝে বাস করবে তার কথা বলে, তখন আমি তাদের জীবনের তীব্র আবেগদীপ্ত ক্ষুধার কথা বুঝি, তখন আমি আমেরিকার নিগ্রোদের সম্ভাব্য শক্তি এক নজর দেখতে পাই।

বেকারত্বের গুজব শোনা যায় কিন্তু আমি তাতে কান দিই না। সাউথ সাইডের নিগ্রোদের মাঝে কম্যুনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক তৎপরতার কথা আমি শুনি, কিন্তু কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ এতো দূরবর্তী ছিল যে তা আমার মনে কোনো ঔৎসুক্য নিয়ে রেখাপাত করে না। কম্যুনিষ্ট হতে পারে এমন কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে আমি তার সঙ্গে আমারিকভাবে কথা বলতাম কিন্তু আবেগের দিক থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখতাম। আমি অনুভব করি যে, পৃথিবীতে সাংঘাতিক একটা ঘটনা শুরু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি আমার পড়াশোনা ও লেখালেখির মাধ্যমে তা আমার মনের পাঁচরে রাখার চেষ্টা করি।

যখন নিয়মিত কেরানি হিসেবে আমার নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হয় তখন আমাকে জানানো হলো যে সাময়িকভাবে সব নিয়োগ এখন বন্ধ থাকবে। ডাকের পরিমাণ হ্রাস পায়। আমার কাজের সময় কমে আসে। আমার বেতনের চেক ছোট হয়। বাড়িতে খাদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়। যে-ক্ষুধাকে আমি ভোলেছিলাম যে, পেছনে ফেলে এসেছি তা আবার ফিরে আসে। ১৯২৯-এর এক শীতে খবরের কাগজের স্ট্যান্ডে আমি গণগণে অক্ষরে লেখা দেখতে পাই :

স্টক মার্কেটে ধ্বস কোটি কোটি মুদ্রা উধাও

ইতিপূর্বে খবরের কাগজে আমি যেসব জিনিস দেখেছি তার বেশির ভাগের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না, কাজেই এটা নিয়ে আমি ভাববো কেন? খবরের কাগজে জীবনের যে সব কথা প্রকাশিত হয় আমার তাতে কোনো অংশ নেই। কিন্তু ডাকের পরিমাণ এতো কমে যায় যে আমাকে সপ্তাহে মাত্র এক কিংবা দু' রাত কাজ করতে হয়। পোস্ট অফিসের ক্যান্টিনে ছোকরারা দাঁড়িয়ে কথা বলে, পুলিশ আজ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে পিটিয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট দেশের ওপর জুলুমবাজি করছে।

উদ্বৃত্ত উৎপাদন লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকার করে দিচ্ছে।

বেকারের সংখ্যা বিশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

এ রকম করতে থাকলে বিপ্লব অনিবার্য।

আরে না, মার্কিনীদের মতো বুদ্ধুরা বিপ্লব করে না।

পোস্ট অফিসের চাকরি শেষ হয় আর আমি আবার বেকার হয়ে পড়ি। অর্থনীতির স্রোতধারা যে আমার চিন্তার বিষয় নয় আমি আর সে কথা ভাবতে পারি না। কিন্তু এ পৃথিবী যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার বিষয়ে কী করে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব? কী কী জিনিস চাকরি সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে বেড়ে উঠেছিলাম।

আমার বর্ণের কারণে এই জগৎ থেকে বহিষ্কৃত হবার ফলে আমি আমার নিয়তিকে মেনে নিয়েছিলাম, কী তাকে গঠিত করছে সে সম্পর্কে কৌতূহলী হই নি।

পরের বছর গ্রীষ্মকালে আমি পোস্ট অফিসের অস্থায়ী চাকরিটার জন্য আবার ডাক পাই। শীত পর্যন্ত ওই কাজ অব্যাহত থাকে। ওই সময় ক্রিও থালা কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তার অসুখের প্রায় পর পরই আমার ভাই-এর পাকস্থলীতে ক্ষত দেখা দেয়। আর আমার দুশ্চিন্তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার মা-ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার মনে হয় আমি যেন একটা বেসরকারি হাসপাতাল চালাচ্ছি। অবশেষে পোস্ট অফিসের কাজটি পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় এবং আমি আবার কাজের সন্ধানে সারা শহর চষে ফেলি। কিন্তু সকালে রাস্তায় বেরিয়ে আমি যে দৃশ্য দেখি তাতে আমার সব আশা উধাও হয়ে যায়। বেকার মানুষরা চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে দোরগোড়ায় দোরগোড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। মলিন পোশাক পরে হতাশভাবে সমাজের সিঁড়িগুলিতে বসে আছে, রাস্তার কোণায় কোণায় গোমড়ামুখের মানুষরা জড়ো হচ্ছে, শিকাগোর সাউথ সাইডের পার্কের শূন্য বেঞ্চগুলি লোকে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় আমার জন্য এক ধরনের সৌভাগ্য দেখা দেয়। আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই ছিলেন একটি মৃতদেহ সমাধিস্থকরণ সমিতির তত্ত্বাবধায়ক। নিগ্রোদের সমিতি। তিনি তার সংস্থায় আমাকে একজন এজেন্টের কাজ দেবার প্রস্তাব করলেন। ইন্সুরেন্সের এজেন্ট। মূর্খ নিগ্রোদের কাছে বীমার পলিসি বিক্রি করার চিন্তা আমার মনকে বিতৃষ্ণায় ভরে দেয়।

আমার কাজিন বললেন, তো, তুমি না করলে অন্য কেউ বিক্রি করবে। আর তোমাকে তো খেতে হবে, নাকি?

সে বছর আমি বেশ কয়েকটি কবর দেয়ার সমিতি ও বীমা সমিতির জন্য কাজ করি। তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল নিগ্রোদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমি একটা নতুন ধরনের শিক্ষা লাভ করি। আমি দেখি যে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, বেশির ভাগ কবর দেয়া সমিতিই অসাধু উপায়ে টাকা করার কাজে লিপ্ত ছিল। কয়েকটি সমিতি আইনসঙ্গত ভাবে ব্যবসা করতো কিন্তু অনেক সমিতিই তাদের কৃষ্ণাঙ্গ খদ্দেরদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করতো।

আমি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে আমার বেতন পেতাম। কোম্পানির খাতায় আমি যদি এক ডলারের নতুন প্রিমিয়াম যোগ করতে পারতাম তাহলে ডলার প্রতি আমি রাব করতাম পনেরো ডলার, আর এক ডলার মূল্যের কোনো পুরানো প্রিমিয়াম অপরিশোধিত থাকলে আমাকে দণ্ড দিতে হতো ডলার প্রতি পনেরো ডলার। তাছাড়া, মোট আদায়কৃত প্রিমিয়ামের কমিশন। তবে মন্দার যুগে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারকে দশ পয়সা প্রিমিয়ামের একটা বীমা ক্রয়ে প্ররোচিত করা ছিল অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। নতুন ব্যবসা থেকে অপরিশোধিত প্রিমিয়াম বাবদ দণ্ডের অর্থ বাদ দিয়ে যদি আমার জন্য পনেরো ডলার

থাকতো তাহলেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম।

কয়েকটি কবর দেয়ার সমিতি বীমা গ্রাহকদের বিশাল লেনদেনের পরিমাণের জন্য বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে এই জুয়াড়ি পদ্ধতি অনুসরণ করতো। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের নতুন ব্যবসায়ের একটা নিরন্তর প্রবাহ সচল রাখতে হতো। যখনই কোনো কৃষ্ণ পরিবার অন্যত্র চলে যেতো কিংবা সামান্য ভাগ্য নিপর্যয়ের মুখোমুখি হতো তখনই তারা সাধারণত তাদের পলিসি বাতিল হয়ে যেতে দিতো, তারপর অন্য কোনো কোম্পানি থেকে নতুন একটা পলিসি নিতো।

শিকাগোতে নিগ্রোরা কিভাবে জীবন ধারণ করে আমি এখন প্রতিদিন তা দেখতে পাই, কারণ আমি তাদের শত শত মলিন ফ্ল্যাটে যাই, তাদের জীর্ণ আসবাবপত্র এবং নোংরা জামাকাপড় পরিহিত ছেলেমেয়েদের দেখি। বেশির ভাগ বীমাগ্রাহকরা ছিল অশিক্ষিত এবং তাদেরকে প্রদেয় কল্যাণে অর্থ নানা শর্তের মাধ্যমে যে কি রকম কঠোর ভাবে সীমিত করে দেয়া হয় তা তারা জানতো না, আর বীমা কোম্পানির একজন দালাল হিসেবে তাদের সেকথা জানানো আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা এবং প্রিমিয়াম আদায়ের জন্য দরজায় করাঘাত করার পর আমার নিজেকে মনে হয় শুষ্ক, নিঃশেষিত এবং এতো ক্লান্ত যে পড়তে বা লিখতে পারি না। একটু স্বস্তির জন্য আমি বুভুক্ষু হয়ে উঠি। ইন্সুরেন্সের একজন বিক্রেতা হিসেবে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীর সঙ্গে আমার দেখা হতো, আর সেখানেই আমি আমার স্বস্তি খুঁজে পাই। অনেক সুশ্রী কৃষ্ণাঙ্গ গৃহবধূ তাদের ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়ার জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করে, তারা তাদের দশ সেন্ট প্রিমিয়াম প্রদান থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটা রফা করতে রাজি হয়। এই সূত্রে আমি প্রতি সপ্তাহে দশ সেন্ট প্রিমিয়াম নিয়ে তার সঙ্গে একটা দীর্ঘ যন্ত্রণাময় সম্পর্ক স্থাপন করি। সে ছিল একটি অজ কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে, একটি শিশু সন্তানের মা, শিশুটির বাবা কে সে জানে না। তার সঙ্গে পুরো সম্পর্কের সময়টায় আমার কাছে তার একটি মাত্র দাবি ছিল, তাকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। তার কাছে সার্কাস দেখার যে কী তাৎপর্য ছিল তা আমি কোনোদিন জানতে পারি নি।

তার সঙ্গে রাত কাটাবার পর দশ সেন্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে- একদিন সকালে আমি সামনের ঘরের সোফায় বসে আমার সঙ্গে আনা একটা বই পড়তে শুরু করি। ও সলজ্জভাবে এগিয়ে এসে বললো, দেখি তো!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি?

বইটা।

আমি তাকে বইটা দিই, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখে। আমি লক্ষ্য করি যে সে বইটা উল্টো করে ধরেছে।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এখানে কি পড়ছো?

তুমি সত্যিই পড়তে পারো না?

খিলখিল করে হাসতে হাসতে ও বললো, না। তুমি জানো যে আমি পড়তে পারি না।

কিছু তো পারো।

না।

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনায় তার মতো একটা জীবনের কী অর্থ সেকথা ভাবি, আর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তার জীবনে একেবারেই কোনো অর্থ নেই। আর আমার জীবনেরও কোনো অর্থ নেই।

ও জিজ্ঞাসা করলো, তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?

এমনি।

তুমি খুব বেশি কথা বলো না।

বলার তো বিশেষ কিছু নেই।

ও নিঃশ্বাস ফেলে বললো, জিম থাকলে খুব ভাল হতো।

ঈর্ষান্বিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, জিম কে?

আমি জানতাম যে সে অন্য লোককেও সঙ্গ দিয়েছে। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে তাদের নাম উচ্চারণে আমি ক্ষুব্ধ হই।

ও বললো, একজন বন্ধু মাত্র।

তখন ওর প্রতি আমার ঘেন্না জাগে, আর ওর কাছে আসার জন্য আমি আমার নিজেকে ঘৃণা করি।

আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি জিমকে আমার চাইতে বেশি পছন্দ করো?

না। জিম শুধু কথা বলতে ভালবাসে।

তো, জিমকে যদি বেশি পছন্দ করো তাহলে আমাকে সঙ্গ দাও কেন? আমি এটাকে একটা আলোচ্য বিষয় করে তুলতে চাই, আর এই চাওয়ার জন্য নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হয়ে উঠি।

ও খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, তুমি ঠিক আছো। আমি তোমাকে পছন্দ করি।

আমি বললাম, তোমাকে আমি খুন করতে পারি।

কি? ও চেঁচিয়ে বিস্ময়োক্তি করে।

আমি লজ্জিত হয়ে বলি, কিছু না।

আমাকে খুন করবে বললে তুমি? তুমি তো দেখছি একটা পাগল।

আমি বিড়বিড় করে বলি, হয়তো তাই। আমার ভেতরে ক্রোধ জেগে ওঠে, আমি এমন একটি মানুষের পাশে বসে আছি যার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। তার কাছে আসার জন্য আমার নিজের ওপর রাগ হয়, আমার বেপরোয়া এবং অস্থির একাকীত্বের জন্য আমি নিজেকে ঘৃণা করি।

মেয়েটি বললো, বাড়ি গিয়ে তোমার ঘুমানো উচিত। তুমি ক্লান্ত।

আমি কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিয়ে ভাবো?

অনেক কিছু।

যথা?

মৃদু হেসে ও বললো, তোমার কথা।

আমি বললাম, তুমি জানো যে, তোমার কাছে আমার মূল্য সপ্তাহে দশ সেন্ট।

না। আমি সত্যিই তোমার কথা অনেক ভাবি।

তারপর কি ভাবো?

তুমি যখন কথা বলো তখন কিভাবে বলো তার কথা ভাবি। সে গম্ভীরভাবে বললো, আমার ইচ্ছা করে তোমার মতো করে কথা বলতে।

আমি ব্যঙ্গ করি, কেন?

অকস্মাৎ ও জানতে চায়, তুমি কবে আমাকে সার্কাসে নিয়ে যাচ্ছো?

আমি বললাম, তোমার নিজেরই সার্কাসে যোগ দেয়া উচিত।

ওর চোখ চকচক করে।

খুব ভাল হয় তাহলে।

আমার হেসে উঠতে ইচ্ছা করে কিন্তু ওর গলার স্বর এমন আন্তরিক শোনায় যে আমি হাসতে পারি না। আমি বললাম, শহরে এখন কোনো সার্কাস নেই।

ঠোঁট ফুলিয়ে ও বললো, অবশ্যই আছে। তুমি বলছো না কারণ তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও না।

কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে, সত্যিই এখন শহরে কোনো সার্কাস নেই।

কখন আসবে?

আমি জানি না।

তুমি কাগজে তার খবর দেখতে পারো না?

কাগজে সার্কাস সম্পর্কে কোনো খবর নেই।

আছে। আমি যদি পড়তে পারতাম তাহলে ঠিক খুঁজে পেতাম।

আমি হেসে উঠলে ও কষ্ট পায়।

ও জোর দিয়ে বললো, শহরে সার্কাস আছে।

আমি বললাম, নেই। তবে তুমি যদি পড়তে শিখতে চাও তাহলে আমি তোমাকে শেখাবো।

ও খিলখিল করে হাসতে হাসতে আমার পাশে ঘন হয়ে বসে।

আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, এই শব্দটা দেখছো?

হ্যাঁ।

এটা হলো এবং।

ও হেসে গড়িয়ে পড়ে।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো?
ও মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়, খিলখিল করে হাসতে থাকে।
এর মধ্যে এতো হাসির কি আছে?
ও হাসতে হাসতে জবাব দেয়, তুমি। তুমি এতো ফানি।
আমি উঠে পড়ে বলি, জাহান্নামে যাও তুমি।
ও বললো, দেখো, তুমি আমাকে শাপশাপান্ত করো না। আমি তোমাকে করি না।
আমি বললাম, আমি দুঃখিত। আমি আমার টুপি তুলে নিয়ে দরজার কাছে যাই।
আগামী সপ্তাহে তোমার দেখা পাবো তো?
হয়তো।
আমি ফুটপাথে নেমে এলে জানালা থেকে ও আমাকে ডাকে, তুমি আমাকে সার্কাসে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছো, মনে আছে তো?
হ্যাঁ।
আমি জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, সার্কাসে তোমার কী এতো পছন্দ?
ও সরলভাবে বললো, প্রাণীগুলি।
আমার মনে হলো ওর কথার পেছনে বোধহয় কোনো গোপন অর্থ আছে কিন্তু আমি তা দেখতে পাই না। ও হেসে উঠে সশব্দে জানালা বন্ধ করে দেয়।
ওর কাছ থেকে চলে আসার সময় আমি প্রতিবারই সিদ্ধান্ত নিই যে, আর যাবো না। আমি ওর সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারি না। আমি শুধু তার সার্কাস দেখার আবেগদীপ্ত ইচ্ছার কথা শুনি। ওর মধ্যে কোনো শঠতা ছিল না। কাউকে তার ভাল লাগলে ভাল লাগতো, ব্যস। ও যা লাভ করেছিল তা ছিল একমাত্র যৌন সম্পর্ক। তার বুদ্ধি এতো সীমিত ছিল যে তার সঙ্গে অন্য কোনো রকম সম্পর্ক গড়া সম্ভব ছিল না।
বেশিরভাগ দালালদেরই তাদের কেনা মেয়ে ছিল, আর অন্য দালালরা যেন সেখানে হাত না দেয় সে ব্যাপারে তারা বেশ সতর্ক থাকতো। একদিন প্রিমিয়াম আদায়ের জন্য আমাকে সাউথ সাইডের এক নতুন অংশ দেয়া হলো। এটা আগে যে এজেন্টটার এলাকা ছিল সে হঠাৎ আমার প্রতি খুব বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠলো।
সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এই রাইট, তুমি কি চ্যাম্পলেইন অ্যাভিনিউর ইউইসের কাছ থেকে টাকা তুলেছো?
আমি আমার খাতা দেখে বললাম, হ্যাঁ।
আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ও বললো, তোমার ওকে কেমন লাগে?
বেশ ভালই তো দেখতে।
ওর সঙ্গে কি এর মধ্যে তুমি কিছু ঘটিয়েছো?
আমি সহাস্যে বললাম, না, তবে ঘটাতে ইচ্ছা করছে।

সে বললো, দেখো, আমি তোমার একজন বন্ধু।
কখন থেকে?
না, না, আমি সত্যি তোমার বন্ধু।
তোমার মনের মধ্যে কি আছে খুলে বলো না কেন?
সে গম্ভীর হয়ে বললো, শোনো, ওই মেয়ের অসুখ আছে।
মানে?
ওর সিফিলিস আছে। ওর কাছ থেকে দূরে থেকো। ও পরলে সবার সঙ্গে শোয়।
আমি বললাম, ওহ। তুমি যে আমাকে বললে সে জন্য আমি সত্যি আনন্দিত।
সে জিজ্ঞাসা করলো, ওর ওপর তোমার নজর ছিল, তাই না?
আমি বললাম, হ্যাঁ, তা ছিল।
ওর কাছে যেও না, ও তোমাকে পেড়ে ফেলবে।
সেদিন রাতে আমি আমার কাজিনকে ওই এজেন্ট মিস ইউইস সম্পর্কে যা বলেছিল তা বলি। আমার কাজিন হো হো করে হেসে উঠে বললো, ওই মেয়ে একদম সুস্থ। ওই এজেন্ট ওর সঙ্গে অনেক দিন ধরে ফস্টিনস্টি করছে। তোমাকে ওর রোগের কথা বলে ভয় দেখিয়েছে যেন তুমি ওর পেছনে না লাগো। সে ওকে তোমার কাছ থেকে রক্ষা করছিল।
কৃষ্ণাঙ্গ রমণীদের সঙ্গে ওরা এ রকম ব্যবহারই করতো। কিছু কিছু এজেন্ট ছিল অতিশয় পাপাচারী। কোনো অসুস্থ কৃষ্ণাঙ্গ রমণীর যদি তাদের প্রদেয় কোনো টাকা থাকে আর সেই রমণী যদি যৌন মিলনে সক্ষম হয় তাহলে তারা তাদেরকে মিলনে বাধ্য করে এবং প্রদেয় অর্থকে ব্যবহার করে ঘুষ হিসেবে। রমণী যদি রাজি না হয় তাহলে তারা আপিসে গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, বলে যে অসুস্থতার ভান করে সে তার দেয় প্রিমিয়াম দিচ্ছে না। সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গ রমণীটি রাজি হয়ে যায়, কারণ টাকাটার তার বিশেষ প্রয়োজন।
ইন্সুরেন্সের একজন এজেন্ট হিসেবে আমাকে একটা জোচ্চুরিতে অংশ নিতে হয়। কবর দেয়া সমিতি দেখে যে প্রথম যে বীমা দেয়া হয়েছে তাতে, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, শর্তগুলি বেশি উদার হয়েছে, তাই কর্মকর্তারা ঠিক করেন যে, গ্রাহকদেরকে তারা ওই পলিসির পরিবর্তে নতুন পলিসি দেবেন, সেখানে শর্তগুলি অনেক কঠিন থাকবে। কিন্তু এ কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে বীমাগ্রাহক বুঝতে না পারে যে তার বীমা বদলে দেয়া হচ্ছে এবং তাকে ঠকানো হচ্ছে। এটা আমার পছন্দ হয় না কিন্তু নিরুপায় হয়ে আমাকে এর মধ্যে অংশ নিতে হয়। বিকল্প হিসেবে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে উপোস করতে পারতাম। কিন্তু সৎ থাকার মূল্য হিসেবে উপোস করতে আমার ইচ্ছা হয় না।
প্রতারণাটা করা হতো এইভাবে– প্রিমিয়াম আদায়ের জন্য আমি যখন বীমাগ্রাহকদের বাড়ি যেতাম তখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমার সঙ্গে থাকতেন। তিনি বলতেন

যে, এটা তার রুটিন পরিদর্শনের অংশ। বীমাগ্রাহক সাধারণত এক অজ্ঞ কৃষ্ণাঙ্গ রমণী, তার বাক্সো-প্যাটরা মেঝে তলা থেকে তার পলিসি বের করে সুপারিন্টেন্ডেন্টের হাতে তুলে দিতো। আমি ওই সময় প্রিমিয়াম বইয়ে হিসাব তুলে রাখি, যার ফলে মহিলার দৃষ্টি সুপারিন্টেন্ডেন্টের ওপর আর থাকে না, তিনি কি করছেন তা আর সে লক্ষ্য করে না। ওই অবসরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুরানো পলিসির বদলে একটা নতুন পলিসি রেখে দেন, একই রং, একই ক্রমিক নম্বর, উপকারী ভোগকারী ব্যক্তিও একই, কিন্তু সেখানে প্রাপ্য টাকার অঙ্ক থাকে অনেক কম। এটা ছিল নোংরা একটা কাজ, আর কি করে এটা বন্ধ করা যায় তা নিয়ে আমি ভাবি। যখন আমি কোনো নিরাপদ পথ দেখতে পাই না তখন আমি নিজেকে শাপশাপান্ত করি, যারা এর বলি হচ্ছে তাদের শাপশাপান্ত করি, তারপর ব্যাপারটা ভুলে যাই। (কবর দেয়া সমিতির কৃষ্ণাঙ্গ মালিকরা ছিলেন নিগ্রো সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং শ্বেতাঙ্গরা তাদের শ্রদ্ধা করতো।)

টাকা আদায়ের জন্য বাড়ি বাড়ি যাবার সময় আমি কৃষ্ণাঙ্গদের রাস্তার মোড়ে বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বক্তৃতা দিতে শুনতাম। তারা রুটি, তাদের অধিকার এবং বিপ্লবের কথা বলতো। আমি তাদের সাহসের প্রশংসা করি কিন্তু তাদের প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হয়। তারা দাবি করে যে, নিগ্রোরা এখন ক্রুদ্ধ, তারা ফুঁসে উঠে তাদের শ্বেতাঙ্গ সহ-শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিতে শীঘ্রই একটা বিপ্লব ঘটাবে। আমি প্রতিদিন বহু নিগ্রো বাড়িতে যাওয়া-আসা করি, আমি জানি যে, নিগ্রোরা বিভ্রান্ত, অজ্ঞ, দেহ ও মনে অসুস্থ। আমি লক্ষ্য করি যে, বিক্ষোভকারীরা এবং জনগণের মধ্যে একটা বিশাল ব্যবধান বিরাজ করছে, তাদের মাঝখানের দূরত্ব এতো বিশাল যে, যে জনগণকে তারা পরিচালনা করতে চান তাদের কাছে কিভাবে আবেদন করতে হবে তাও তারা জানেন না।

কোনো কোনো সকালে আমি আমার সিঁড়িতে প্রচারপত্র পড়ে থাকতে দেখি। সেখানে চীন, রাশিয়া ও জার্মানির কথা বলা হয়। কোনো কোনোদিন আমি পাঁচ হাজারের মতো বেকার নিগ্রোকে রাস্তা দিয়ে স্রোতের মতো মিছিল করে যেতে দেখি, মিছিল পরিচালনা করে কম্যুনিস্টরা। বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে আমি তাদের দেখি, তারা যে প্রবঞ্চিত হচ্ছে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আমাকে যদি তাদের সমস্যা সমাধানের কোনো পথনির্দেশ করতে বলা হতো তাহলে কী বলতে হবে তা আমার জানা ছিল না।

নির্ধারিত প্রিমিয়ামগুলির আংশিক আদায় করার পর ওয়াশিংটন পার্কে যাওয়া আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। আমি বেকার জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াই, এখানে-ওখানে একটু থেমে কম্যুনিস্ট বক্তাদের দ্বান্দ্বিকতা কিংবা ক্রোধের কথা শুনি। আমি যা দেখি ও শুনি তা আমাকে বিভ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ করে তোলে। নিগ্রো কম্যুনিস্টরা তাদের ব্যক্তিগত উপস্থিতির ক্ষেত্রে সচেতনভাবে অমনোযোগী থাকেন, তাদের শার্টের কলার তারা এমনভাবে ভাঁজ করেন যেন গলার কাছে ভি চিহ্নের মতো দেখা যায়, তারা

মাথায় টুপি চড়ান, কারণ লেনিন টুপি পরতেন, তারা তাদের টুপির স্ট্র্যাপে আঙুল ঢুকে দেন ঘাড়ের কাছে যেন একটু উঁচু হয়ে থাকে। তাদের অনেকে আবার, উচ্চারণ, বক্তৃতার ভাষা তারা সম্পূর্ণ দেবার জন্য শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে সচেতনভাবে অনুকরণ করেন। আলাপ করার সময় তারা তাদের প্যান্টে তাদের বুড়ো আঙুল ঢুকে দেন কিংবা তাদের বাঁ হাত তাদের শার্টের বুকের কাছে রাখেন, কিংবা তাদের প্যান্টের পেছনের পকেটে তাদের বুড়ো আঙুল বাঁকা করে আটকে রাখেন, লেনিন তাঁর স্ট্যালিনকে ফটোতে যেমন দেখেছেন ঠিক সেইভাবে। তারা জানতেন না, কিন্তু তারা নির্বোধ সারল্যের সঙ্গে মায়ার খেলা খেলছিলেন। তারা ভাবছিলেন যেসব লোক জাতিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তারা যদি তাদের মতো আচরণ করেন তাহলে তারাও নিশ্চয়ই আমেরিকায় নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

কথা বলার সময় তারা ইউরোপীয় ঢং-এ তাদের আর-কে প্রলম্বিত করতেন, পার্টিকে উচ্চারণ করতেন পারবটী, জোর দিতেন শেষ অক্ষরের ওপর। এই ঢঙটা তারা গ্রহণ করেন শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে। কমরেডস হয়ে দাঁড়ায় কামরাডস, আর ডিস্ট্রিবিউট, যে শব্দ তারা সারা জীবন উচ্চারণ করে এসেছেন তা বেঁকে গিয়ে হয়ে উঠে ডিসট্রিইউটবিউউট, দ্বিতীয় অক্ষরের পরিবর্তে তার জোর দেন শেষ অক্ষরের ওপর, আর এই ঢঙটা তারা নকল করেন অভিবাসী পোলিশ কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে যারা ওই শব্দটি এমন করে উচ্চারণ করে যা নিগ্রো কম্যুনিস্টদের কর্মসূচির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতো, কিন্তু যেসব নিগ্রোকে কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যে সদস্যপদ প্রদান করেছে তাদের নীচু মন দেখে তারা তাদের দলভুক্ত হতে রাজি হয় না।

মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করার সময় নিগ্রো কম্যুনিস্টরা নিগ্রো ধর্মযাজকদের ঐতিহ্যবাহী ভঙ্গিকে পরিহার করতো, যেন কম্যুনিস্ট প্রচারণার ক্ষেত্রে নিজস্ব ভঙ্গিকে বিকশিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতো, মাথা পেছনে হেলিয়ে দিতো, তাদের বক্তব্য শ্রোতৃচিত্তে সঠিকভাবে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে নিজেদের ডান কব্জাদের পার্শ্বদেশ ঝাঁকুনি দিয়ে হাতুড়ির মতো তাদের প্রসারিত বাম করতলের ওপর নামিয়ে আনতো, বারবার, যে ভঙ্গি লেনিনদের বক্তৃতার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। হাঁটার সময় তাদের পদক্ষেপ দ্রুততর হতো; কথা বলার সময় তাদের ভঙ্গিতে যে চাষীসুলভ দ্বিধা ছিল তা অন্তর্নিহিত হয়, তাদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে কাটাকাটা, বাহুল্যবর্জিত। বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষের চাইতে গলা আরেক পর্দা চড়িয়ে তারা তাদের বাধা দিতো, প্রতিপক্ষ যদি তাদের বক্তব্য শোনাবার জন্য গলা আরেকটু উঁচু করতো তখন কম্যুনিস্টরা নিজেদের কণ্ঠস্বর আরো উঁচু মাত্রায় নিয়ে যেতো, শেষ পর্যন্ত গোটা পার্ক চেঁচামেচিতে পূর্ণ হতো। এবং যে কথা জোরে চেঁচিয়ে বলা হতো এবং যা দ্রুত বোঝা যেতো তাই সত্য বলে বিরাজ করতো।

জ্ঞানের এমন একটা ভাণ্ডারে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল যা ছিল সাধারণ মানুষের

অনর্গলমা, কিন্তু তাদের একদিনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করাই তাদের চিন্তাধারা বোঝাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক ঘন্টা তাদের কথাবার্তা শুনলেই তাদের মনের অন্ধ অসহিষ্ণুতা ধরা পড়তো। নতুন ধারণা, নতুন তথ্য, নতুন অনুভূতি, নতুন দৃষ্টিকোণ, জীবন যাপনের নতুন কোনো পথের ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে তাদের মন ছিল সিলমোহর করা অবরুদ্ধ। সব বই তারা কখনো পড়ে নি, যেসব মানুষের সঙ্গে তাদের কখনো পরিচয় হয় নি, যে সব ধারণা তারা কখনো বোঝে নি, আর যেসব মতবাদের নাম পর্যন্ত তারা উচ্চারণ করতে অক্ষম অবাধে সেগুলির নিন্দা করে তাদের বাতিল করে দিতো তারা। অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে কম্যুনিজম তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতো, তাদেরকে করতে পারতো নতুন ধ্যানধারণা ও জীবনের প্রভু, কিন্তু তার পরিবর্তে তা তাদেরকে কম্যুনিজমের দেখা পাওয়ার আগে তারা যে অজ্ঞতার স্তরে ছিল তার চাইতেও নিম্নতর স্তরে তাদেরকে শক্ত হিমায়িত করে রাখে।

হুভার যখন হুমকি দিলেন যে, বোনাসের দাবিকে মিছিলকারীদের ওয়াশিংটন থেকে বের করে দেয়া হবে তখন জনৈক কম্যুনিষ্ট বক্তা বললেন, তিনি যদি বোনাস মিছিলকারীদের ওয়াশিংটন থেকে বের করে দেন তাহলে জনগণ জেগে উঠবে এবং একটা বিপ্লব ঘটাবে।

তিনি কী বলতে চান তা জানার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে বলি, আপনি জানেন যে, মার্কিন সেনাবাহিনী যদি বোনাস মিছিলকারীদের হত্যাও করে তবু কোনো বিপ্লব সংঘটিত হবে না।

তিনি ফেটে পড়লেন, বললেন, জনগণের ক্রোধ সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নেই।

আমি বললাম, কিন্তু বিপ্লবের জন্য কি কি দরকার হয় আপনি তা জানেন বলে মনে হয় না। বিপ্লব খুব বিরল ঘটনা।

তিনি আমাকে বললেন, আপনি জনগণকে ছোট করে দেখছেন।

আমি তাকে বললাম, না, আমি জনগণকে খুব ভাল করে চিনি, কিন্তু বিপ্লব সংঘটিত হয় কঠিন বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

অবজ্ঞা ভরে মৃদু হেসে তিনি বললেন, আপনি একজন বুদ্ধিজীবী।

কয়েকদিন পর, বেয়োনেটের মুখে হুভার বোনাস মিছিলকারীদের ওয়াশিংটন থেকে বিতাড়িত করে দেবার পর, আমি উপযাচক হয়ে তাকে গিয়ে বলি, বোনাস মিছিলকারীদের বের করে দিলে আপনি যে বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার কি হলো?

তিনি কাঁধ কুঁচকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, পূর্বাবশ্যক অবস্থাটা ছিল না।

আমি তার কাছ থেকে চলে আসি, মনে মনে ভাবি কেন তিনি এতোগুলি হাস্যকর অতিশয়োক্তি করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। কম্যুনিস্টরা পৃথিবীর যে সাধারণ

বিশ্লেষণ প্রদান করে আমি তা আজ প্রমাণিত করতে পারি না। একমাত্র অনুমিত এই যে তাদের পৃথিবী বড় বেশি সরল, সেটা বিশ্বাস করা যায় না। আজে বাঁপিয়ে পড়ার তাদের বাগ্রতা আমার পছন্দ হয় কিন্তু আমার মনে হয় তারা যেন নির্বুদ্ধিতার জালে বৃহৎ, একটা অলীক কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছে কোনো গহবাল ছিল না, কোনো আগামীকাল নেই, আছে শুধু আজকের দিনের বর্তমান মুহূর্ত। তাদের একমাত্র কাজ হলো, যে কোনো উপায়ে সম্ভব, তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করা।

মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আগুনে জ্বল জ্বল করা তাদের বক্তৃতা সান্ত্বনা ক্ষুধার্ত নিম্নোদের কাছে ছিল চরম অশালীন।

একবার এক নিগ্রো কম্যুনিষ্ট বক্তা ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলেন, গড ডাম হট। গড বলে কেউ নেই। যদি থাকে তাহলে আমি সেই ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করছি তিনি যেন এই মুহূর্তে আমাকে মেরে ফেলেন।

তিনি তার কৃষ্ণাঙ্গ শ্রোতৃবর্গের সমাবেশের সামনে ঈশ্বরকে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় দিয়ে নাটকীয়ভাবে একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন, কিন্তু ঈশ্বর কিছু করতে অস্বীকার করেন। তিনি তখন তার ঘড়ি বের করে বললেন, ঈশ্বর হয়তো আমার কথা শুনতে পান নি। তারপর তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমি ঈশ্বরকে আরো দু' মিনিট সময় দিচ্ছি। তারপর ব্যঙ্গ ভরে বললেন, মিস্টার গড, আমাকে মেরে ফেলুন।

তিনি অপেক্ষা করেন, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তার ঘড়ির দিকে তাকান, আর শ্রোতৃবর্গ অস্বস্তির সঙ্গে হেসে ওঠে।

বক্তা কর্কশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে চলেন, ঈশ্বরকে কোথায় পাওয়া যাবে আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। মাঝরাতে যখন বৃষ্টি নামবে তখন আপনাদের টুপি হাতে তুলে নেবেন, একটা অন্ধকার ঘরের মেঝের ওপর সেটা উল্টো করে পেতে রাখবেন, আর আপনারা তখন আপনাদের ঈশ্বরকে পাবেন।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে নিরীশ্বরবাদিতার এ রকম ভঙ্গী উচ্চারণ আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনি নি, কিন্তু আমার মনে হলো শ্রোতৃবর্গের চিত্তে কোনো দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদনের পরিবর্তে তিনি যেন তাদের আমোদিত এবং ভয়ার্ত করে তুলছিলেন।

বক্তা গর্জন করে ওঠেন, যদি ওপরের ওই শূন্য আকাশে কোনো ঈশ্বর থাকেন তাহলে আমি সেখানে উঠে গিয়ে তার দাড়ি ধরে তাকে টেনে এই ক্ষুধার্ত ধরণীতে নামিয়ে আনবো, তারপর তাকে জবাই করবো।

বক্তা মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, এখন দেখি, ঈশ্বর আমার কী করেন।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে শ্রোতারা মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকে, তারপর সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। আমি আমার মাথা নাড়তে নাড়তে ওখান থেকে সরে আসি। মানুষের ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বাসসমূহকে ধ্বংস করার পথ এটা নয়... ওরা দায়িত্বজ্ঞানহীন শিশুর মতো কাজ করছিলেন...।

আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তারা নিগ্রো জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ, যে কাজটা তারা হাতে নিয়েছেন তার বিশালতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। তারা বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জীবনের প্রতি একটি সৃষ্টিশীল মনোভাব আলিঙ্গন করার জন্য এটা একটা প্রথম পদক্ষেপ বলে আমার মনে হয়। আমি অনুভব করি যে, পৃথিবীকে ভিন্ন রকম করবার আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কেউ তার প্রতি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং আবেগ নিয়ে তাকাতে পারে না। কিন্তু এই মানুষগুলি তাদের চোখের সামনে যা আছে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু কী প্রত্যাখ্যান করছে এবং কেন করছে তা তারা ঠিক মতো জানে না।

আমার মনে হয় আমেরিকা নিগ্রোদের ওপর যে অবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে তাতে কোনো নিগ্রোদের পক্ষে একটা পরিপূর্ণ মানবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। এবং এটাও আমার মনে হয় যে, ভিন্ন কারণসমূহের জন্য আমেরিকার পক্ষেও একটা পরিপূর্ণ মানবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। তাহলে, আমার মনে হয়, নিগ্রোরা যদি তাদের সমস্যার সমাধান করে তাহলে তারা শুধু নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে না, তার চাইতে অনেক বড় সমস্যার সমাধান করবে। আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করি যে, মার্কিন সভ্যতার গভীরতর সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার সমাধান না করা পর্যন্ত নিগ্রোরা কখনোই তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। আর যেহেতু আমেরিকার সকল প্রত্যাখ্যাত মানুষদের মধ্যে নিগ্রোরাই সব চাইতে বেশি প্রত্যাখ্যাত সেহেতু আমাদের মার্কিন জীবনের অর্থ কী সে সমস্যার মোকাবিলা করতে নিগ্রোদের চাইতে দক্ষতার আর কোনো গোষ্ঠি আমেরিকাতে নেই।

কিন্তু কম্যুনিস্ট বক্তাদের ভাষণ শুনতে শুনতে আমি মনে মনে ভাবি, তিনশো বছরের অত্যাচার-নির্যাতনে বিধ্বস্ত নিগ্রোরা কি তাদের ভয় এবং দুর্নীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এ কাজটা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। নিগ্রোরা কি কখনো আত্মস্থ হতে পারবে পাশ্চাত্য সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে নিজেদের ক্ষেত্রে কি ঘটছে সেটা কখনো বুঝতে শিখবে? আমার মনে হয়, নিগ্রোদেরকে যদি নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয় তাহলে প্রথমে তাদের নিজেদের কথা ভুলে গিয়ে যে বিভ্রান্ত, বস্তুবাদী জাতি আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে বাঁচাতে হবে। নিগ্রোরা কি এই অলৌকিক কাজটি সম্পাদন করতে পারবে?

নির্বাচনের সময় নিকটবর্তী হয়। একজন নিগ্রো রিপাবলিকান মহল্লা-ক্যাপ্টেন ভোট সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করতে বলেন। প্রার্থীকে সে সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ ছিল না, কিন্তু আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল। আমি মহল্লা-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাই। আমি দেখি যে, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দীর্ঘ উৎকোচের প্রক্রিয়া লোকেরা তিন ডলারের বিনিময়ে, অথবা তাদের বেআইনি যৌন ব্যবসা চালিয়ে যাবার অধিকারের বিনিময়ে, অথবা সুরার বিনিময়ে ভোট দেয়। নির্বাচনের দিন আমি ভোট

কেন্দ্রে প্রবেশ করে পর্দা টেনে দিয়ে আমার ব্যালট কাগজগুলি বের করি। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কদর্য অর্থগুলি আমার মনে ঝলসে ওঠে। স্থানীয় রিপাবলিকান যন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বিগ বিল টমসন এবং আমি জানতাম যে নগর ভবনকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সে নিগ্রোদের ভোটকে কাজে লাগাচ্ছে। আর ওই সূত্রে সে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে অংশ নিচ্ছে যে সম্পর্কে রাজনৈতিক দিক থেকে মূর্খ ও সরল নিগ্রো ভোটারদের কিছুমাত্র ধারণা নেই। আমি ব্যালট পেপারগুলির ওপর আমার পেন্সিল দিয়ে দৃঢ় অক্ষরে লিখি :

আমি এই জুয়াচুরির প্রতিবাদ জানাই। আমি জানতাম যে, আমার এই পদক্ষেপের কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে, কৃষ্ণ অঞ্চলের বিশাল সমুদ্রের মধ্যে অন্তত একজন লোক আছে যে এই খেলাটার স্বরূপ বোঝে এ কথাটা যেন কেউ না কেউ জানে। আমি আমার দশ ডলার সংগ্রহ করে বাড়ি চলে যাই।

মন্দা ঘনীভূত হয়। ক্ষুধার্ত নিগ্রোদের কাছে আমি আর ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করতে পারি না। আমি আমার ঘড়ি বেচে দিই, আরো কম ভাড়ায় ঘরের খোঁজ করি। একটা জরাজীর্ণ ভবনে আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিই। জায়গাটা ছিল নিরানন্দ; দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে, কাঠের সিঁড়িগুলি চাপের ভারে বেঁকে যাচ্ছে। মা এসব দেখে কেঁদে ফেলেন। আমি হতাশায় ডুবে যাই। যা করার জন্য আমি এই শহরে এসেছিলাম তা আমি করতে পারি নি।

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মা আমাকে জানালেন যে প্রাতঃরাশের জন্য ঘরে কিছু নেই। আমি জানতাম যে, নগরীতে ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছে, কিন্তু যতবারই আমি সেখানে যাবার কথা ভেবেছি ততবারই লজ্জায় আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি, ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করি, মায়ের চোখের দিকে তাকাই না। অবশেষে আমি উঠে দাঁড়াই, মাথায় টুপি ও গায়ে কোট চড়াই, তারপর বেরিয়ে যাই। রুটির জন্য আবেদন করার উদ্দেশ্যে বুক কাউন্টির জনকল্যাণ দপ্তরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি অনুভব করি যে, আমি একটা কিছুর শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি।

সপ্তদশ অধ্যায়

ত্রাণকেন্দ্রে পৌঁছার পর আমার মনে হলো আমি যেন জনসাধারণের সামনে আমার ক্ষুধার একটা প্রদর্শনী করছি। চারপাশের ক্ষুধার্ত জনতার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি। আমার পালা যখন আসে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক নিগ্রো মহিলা এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আমার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে চান। আবার অপেক্ষা করার সময় ঘরের মধ্যে যে একটা কিছু ঘটছে আমি সে সম্পর্কে সচেতন হই। কৃষ্ণাঙ্গ নারী ও পুরুষরা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় বিড় বিড় করে কথা বলছিল। এখানে আসার আগে তারা একে অন্যকে চিনতো না, কিন্তু এখন তাদের ভীরুতা ও লজ্জা প্রশমিত হয়েছে, তারা এখন তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছে। এর আগে তারা জীবন ধারণ করেছে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে, একে অন্যের সম্পর্কে ঈষৎ ভীত, মার্কিনী ব্যবস্থা তাদের যেটুকু সুযোগ দিয়েছে তারই আওতায় প্রত্যেকে নিজ নিজ আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু এখন জীবন তাদের একসঙ্গে একটা জায়গায় ছুঁড়ে দিয়েছে, আর প্রথমবারের মতো তাদের প্রতিবেশীদের অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা অনুধাবন করতে শিখছে। তারা তাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের যৌথ রূপটি অনুভব করতে পারছে, এবং তাদের ভয়-ভীতি কিছু পরিমাণে দূর হয়ে যাচ্ছে।

কী ঘটছে তা কি ত্রাণ কর্মকর্তারা বুঝতে পারছেন? না। পারলে তারা এটা বন্ধ করতেন। কিন্তু তারা তাদের খদ্দেরদের দেখেন তাদের পেশার চোখ দিয়ে, তাদের বিজ্ঞান তাদের যতটুকু দেখতে সাহায্য করে তারা শুধু ততটুকু দেখেন। ওদের কথা শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারি যে, তাদের অনেক মোহ কেটে যাচ্ছে। এরা এখন বুঝতে পারে যে, অতীত তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তারা জানে না ভবিষ্যৎ কি রকম হবে। তারা জানে না তারা কী চায়। হ্যাঁ, কম্যুনিস্টরা যেসব জিনিস বলে তার কিছু কিছু যথার্থ। তারা বলে যে ইতিহাসে অনেক সময় এসেছে যখন শাসকরা আর শাসন করতে পারে নি। আমি বসে বসে নৈরাজ্যের সূচনা প্রত্যক্ষ করি। এই লোকগুলির মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষে ওরা বাধা দিচ্ছে না। এটাই প্রমাণ করে যে শাসকরা এখনো ঠিক বুঝতে পারছে না তারা কী করছে। তারা ধরে নিয়েছে যে, তারা তাদের নিজেদের ও তাদের শ্রেণীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। কী ঘটছে তা বুঝতে পারলে তারা কখনই লক্ষ লক্ষ এবং পরাজিত মানুষকে এভাবে এক সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কথা বলতে দিতো না, কারণ ওই সব কথা থেকেই উঠে আসছিল জীবনের একটা নতুন বোধ।

খাদ্যবস্তু আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি ত্রাণকেন্দ্র ত্যাগ করি, তবে আমি এটাও বুঝতে পারি যে, ত্রাণ কর্মকর্তারা আমাকে এই সহায়তা দিতে চান নি। যে সমাজে তারা বাস করে সেই সমাজ ওই ত্রাণ প্রার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। শিকাগোর পত্রিকা ডেইলি ট্রাইবুন কর্তৃক ওই সব মানুষ অলস বলে অভিহিত হয়েছে, যেন তারা ইচ্ছা করে নিজেদের বর্তমান অসহায় অবস্থা ডেকে এনেছে। আমি ওই সব মানুষের মনে জীবনের একটা নতুন উপলব্ধি সৃষ্টির সম্ভাবনা অনুভব করি।

কে ওই সব মানুষকে জীবনের একটা অর্থপূর্ণ পথের সন্ধান দেবে? কম্যুনিস্ট পার্টি? ওই সব মানুষকে সংজ্ঞায়িত করেছে মানবজাতির ভবিষ্যতের রূপকার বলে কিন্তু পার্টি আমি যে সব কম্যুনিস্ট বক্তৃতা-ভাষণ শুনেছি তা ওই সংজ্ঞাকে বিদ্রূপ করে। ওই মানুষরা অবশ্যই কোনো বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়। ওরা তাদের অতীত জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে নি, তারা তা ত্যাগ করেছে শুধু এই কারণে যে তারা আর সেই পুরানো জীবন যাপন করতে পারছিল না। এখন নতুন কোনো বিশ্বাস তারা আঁকড়ে ধরবে? নগর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আমি যেদিন রুটি ভিক্ষা করে নিই সেই দিনটি আমাকে দেখিয়ে দেয় যে আমার নিঃসঙ্গতায় আমি একা নই, সমাজ আমার সঙ্গে আরো লক্ষ লক্ষ মানুষকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমি কেমন করে তাদের সঙ্গে মিলবো? যা ঘটছে তা ক'জন বুঝতে পারছে? আমার মনে হাজারো প্রশ্ন জেগে ওঠে যার উত্তর আমি জানি না।

আমি ধীরে ধীরে আমার পরিবেশের অর্থ বুঝতে শুরু করি। আমার জীবনের পরিবেশ থেকে গতিপথের একটা ধারণা তৈরি হতে শুরু করে। আমি এমন একটা কিছু অনুভব করি যা আমার প্রকাশ ক্ষমতার চাইতে বড়। আমার আচার-আচরণ ও কথা বলার ভঙ্গি বদলে যায়। আমার হতাশাবাদ খসে পড়ে। আমি খোলামেলা ও জিজ্ঞাসু হয়ে উঠি। আমি জানতে চাই।

(আমি যদি শাসক শ্রেণীর একজন সদস্য হতাম তাহলে আমি জাতির সকল অঞ্চলে লোক নিযুক্ত করতাম, বিদ্রোহী শ্রমিকদের ওপর নজর রাখা বা তাদের পিটিয়ে শায়েস্তা করার জন্য নয়, স্ট্রাইক ভাঙ্গা কিংবা ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং যারা যে সিস্টেমের মধ্যে বাস করে কিন্তু সে সিস্টেমের ডাকে সাড়া দেয় না তাদের খুঁজে বের করার জন্য। আমি জানিয়ে দিতাম যে, যারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধন-সম্পদে তাদের অংশ ছিনিয়ে নিতে চায় কিংবা যারা সহিংসতার মাধ্যমে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করতে চায় বিপদটা তাদের কাছ থেকে আসবে না, কারণ ওই দুই দলই তাদের হ্যাঁ-সূচক কর্মকাণ্ড দ্বারা তারা যে সিস্টেমের মধ্যে বাস করে সেই সিস্টেমকে চালু রাখতে সাহায্য করে। আমি ভয় করতাম সেই সব লক্ষ লক্ষ মানুষকে যাদের দিকে জাতি যে পুরস্কার বাড়িয়ে ধরেছে তার স্বপ্ন তারা দেখে না, কারণ তাদের মধ্যেই, যদিও তারা তা জানে না, একটা বিপ্লব ঘটে গেছে এবং তারা শুধু সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে যখন তারা নিজেদেরকে একটা নতুন ও অভূতপূর্ব জীবন ধারায় সমর্পণ করবে।

আমি অনুভব করি যে, আমেরিকার সঙ্গে নিগ্রোদের সম্পর্ক প্রতীকীরূপে বিচিত্র এবং নিজেদের খাঁচায় আটকে পড়া অবস্থার প্রতি নিগ্রোদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া থেকে আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিগ্রোদের এমন একটা ভাষায় বলা হয়, যেখানে ভুল বোঝার কোনো সম্ভাবনা নেই, যে, তাদের স্বদেশ তাদের নিজেদের দেশ নয়। এবং তারা যখন শ্বেতাঙ্গদের মতো একই প্রশাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়ে তাদের জন্মগত দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় তখন শ্বেতাঙ্গরা আতঙ্কিত হয়ে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তারা একটু থেমে কখনো বিবেচনা করে দেখে না যে নিগ্রোরা যদি পুরোপুরি সব কিছু ছেড়ে দেয় তাহলে তার পরিণতি কী হবে। সামাজিক অগ্রাসন দ্বারা উজ্জীবিত নিগ্রোদের চাইতে যে নিগ্রোরা কিছুই দাবি করে না তাদের মুখোমুখি হলে শ্বেতাঙ্গরা যে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়বে তারা তার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করে না। নিজেদের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিগ্রোদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে সম্ভবত কোনো মানুষই ব্যক্তিগত ভাবে দেশদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী হতে পারে না। একটা মানুষ যখন দেখে যে অন্যরা তার পরিবেশকে এমনভাবে বিকৃত করেছে যে সে তার স্বদেশের প্রাণের মধ্যে পুরোপুরি অংশ নিতে পারছে না, তখন তার বিদ্রোহাত্মক কাজ ওই সব লোকের বিরুদ্ধে তার মরীয়া হয়ে উঠা উত্তরমাত্র। রাষ্ট্রদ্রোহিতা রাষ্ট্রের একটা অপরাধ।)

বড়দিন আসে, আর আমি আবার সাময়িক কাজের জন্য পোস্ট অফিসে ডাক পাই। আবার আমার দেখা হয় আইরিশ তরুণটির সঙ্গে, বিশ্বের ঘটনাবলী নিয়ে আমরা আলোচনা করি, আমরা কথা বলি বিশাল বেকার-বাহিনী এবং চরমপন্থী কার্যক্রমের যে জোয়ার জেগে উঠছে সে সম্পর্কে। যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমার দেখা হয় আমি তাদের মধ্যে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করি। তাদের নিজেদের অনুবস্ত্রাভাব তাদেরকে নিগ্রোদের নতুন চোখে দেখাতে শেখাচ্ছিলো। আর এই প্রথম আমি তাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হই।

পোস্ট অফিসের কাজের মেয়াদ শেষ হলে ত্রাণ কর্তৃপক্ষ আমাকে শিকাগোর অন্যতম একটি বৃহৎ ও সম্পদশালী মেডিকেল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে পরিচালকের কাজ দেয়। আমি অস্ত্রোপাচারের কক্ষগুলি আর কুকুর-বোড়াল-ইঁদুর ও খরগোশের খাঁচাগুলি পরিষ্কার করি, গিনিপিগগুলিকে খাওয়াই। আমরা চারজন নিগ্রো ওখানে কাজ করি, আমাদের অবস্থান ছিল নিচু স্তরে, আমরা মনে রাখতাম যে কোনো কাজ না থাকার আমাদের নির্ধারিত স্থান হলো বেসমেন্টের করিডর, যেন শ্বেতাঙ্গ নার্স, ডাক্তার ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে আমাদের কোনো মেলামেশা না ঘটে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যে তীক্ষ্ণ বর্ণবাদী বিভাজন গড়ে দেন তা প্রথমদিন সকালেই আমার চোখে পড়ে। ভূগর্ভস্থ একটা করিডর দিয়ে হাঁটার সময় আমি মহিলাদের দুটি দীর্ঘ সারি আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখি। এক সারিতে ছিল শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা, সাদা

কককাকে মাড় দেয়া ইউনিফর্ম পরিহিত, সতর্ক মুখ, কাব সোজা, মুখগুলি একটা ডাক্তারশার অভায় আলোকিত। তাদের পরে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের একটি সারি এগিয়ে আসে- বয়স্ক, মোটা, জীর্ণ ছাপা সূতির কাপড় পরিহিত, বিবিধ পরনেশ, তাদের হাতে ওঁড়া সাবানের টিন, ন্যাকড়া, লম্বা হাতির আগায় বাঁধা ঝাড়ুবরুশ, ঝাড়ু... আমি মনে মনে ভাবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বিধান এদের মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে? কয়েকটি কালো মেয়ে যদি প্রথম সারিতে থাকতো তাহলে তো সূর্য ওঠা বন্ধ হয়ে যেতো না। কয়েকটি সাদা মেয়ে যদি দ্বিতীয় সারিতে থাকতো তাহলে আকের ওপর পৃথিবীর ঘূর্ণন তো বন্ধ হয়ে যেতো না। কিন্তু আমি যে দুটি সারি দেখি সেখানে তাদের স্থাপন করা হয়েছে শুধু বর্ণের ভিত্তিতে।

আমার তিন নিগ্রো সহকর্মীর মধ্যে একটি ছিল আমার বয়সী, তিল। অধিকাংশ সময়ই সে চুল সোজা করে নিয়েছিল এবং আমার সন্দেহ হয় আমরা গিনিপিগগুলিকে যে খড় খাওয়াতাম সে ওই খড়ের গাদায় কোনো এক জায়গায় একটা বোতল লুকিয়ে রাখতো। ও আমাকে পছন্দ করতো না, আর আমি ওকে পছন্দ করতাম না, যদিও আমি আমার অপছন্দকে গোপন রাখার জন্য ওর চাইতে বেশি চেষ্টা করতাম। আমরা দুজনই কৃষ্ণাঙ্গ এবং দুজনই পরাজিত এ ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনো মিল ছিল না। আমি যেখানে আমার হতাশা নিয়ন্ত্রণে রাখি সে সেখানে তার হতাশা সুরায় চুবিয়ে দেয়। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, সহজ ভাষায় আমার কিছু কিছু ধারণা তাকে জানাবার চেষ্টা করি। সে নীরবে, চাপা ক্রোধ নিয়ে আমার কথা শোনে। একদিন সে তার মুখে-চোখে একটা ক্রুদ্ধ ভাব নিয়ে আমার কাছে এসে বললো, আমি পেয়ে গেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি পেয়ে গেছো?

তুমি যে বর্ণ-সমস্যার কথা বলো তার সমাধানের পথ।

কিভাবে?

সে গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করে এইভাবে– সরকার প্রত্যেককে একটা বন্দুক আর পাঁচটা বুলেট দিক। তারপর আমরা সবাই আবার গোড়া থেকে শুরু করবো। গোড়াতে যেমন ছিল ঠিক সেই রকম। যারা জিতবে, শ্বেতাঙ্গ কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ, তারাই শাসন করবে।

তার সরলতা আমাকে আতঙ্কিত করে। আমি এর আগে কোনো নিগ্রোকে এরকম প্রতিকারের অসাধ্য নৃশংস বর্বর পরিণত হতে দেখি নি। আমি বিলের মস্তিষ্কে আমার ধ্যান-ধারণা সঞ্চারিত করা থেকে বিরত থাকি। আমার ভয় হয় পাছে সুরার বাষ্প তাকে অদ্ভুত কোনো নিয়তির দিকে ঠেলে নিয়ে না যায়।

অন্য দুজন নিগ্রো ছিল প্রৌঢ়। তারা এ ইন্সটিটিউটে পনেরো বছর কিংবা তারও দীর্ঘকাল ধরে কাজ করছে। একজনের নাম ব্র্যাড, কালো, খাটো, গোমড়ামুখের এক অবিবাহিত লোক। অন্যজনের নাম কুক, দীর্ঘদেহী, হলুদাভ রঙের, চোখে চশমা, সে তার অবসর সময় কাটাতো শিকাগো ডেইলি ট্রাইবুন পড়ে, তার সাহায্যে সে বিশ্বের

ঘটনাবলী অনুসরণ করতো। ব্র্যান্ড আর কুক পরস্পরকে ঘৃণা করতো, কি জন্য তা আমি কখনো সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি নি। প্রতিদিন তারা ঝগড়া করে অনেকখানি সময় কাটাতো।

ইন্সটিটিউটে কাজ করতে শুরু করার পর আমি আমার কৈশোরের স্বপ্নের কথা স্মরণ করি, যখন আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গনে একজন গবেষক হবার কথা ভেবেছিলাম। প্রতিদিন আমি তরুণ ইহুদি ছেলেমেয়েদের রসায়ন শাস্ত্র এবং চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখি যা মধ্যমানের কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েরা কখনই লাভ করতে পারবে না। আমি যখন একা থাকি তখন আমি এদিক-ওদিক যাই, বিচিত্র রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে আমার আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিই, জটিল যন্ত্রপাতিকে রুলটানা কাগজের ওপর লাল-কালো রেখা এঁকে দিতে দেখি। কখনো কখনো আমি দাঁড়িয়ে পড়ে স্থির চোখে ঘরের দেয়াল, ঘরের মেঝে, আর প্রশস্ত টেবিলে বসা শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারদের লক্ষ্য করতাম। আমি উপলব্ধি করি যে আমি একটা ভিন্ন জাতির ভুবনকে দেখছি। এ সময় আমার মধ্যে এমন একটা অনুভূতি জেগে উঠতো যাতে আমি কখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি নি।

যে অন্য তিনজন নিগ্রোর সঙ্গে আমি কাজ করি তারা ইন্সটিটিউটে কি ঘটছে সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল দেখে আমোদ পেতো। সাদা মানুষদের জিনিসপত্র সম্পর্কে তাদের কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না, আর আমি জানতে চাইতাম ডায়াবেটিসের জন্য চিকিৎসাধীন কুকুরগুলি সেরে উঠছে কিনা; যে ধেড়ে ও ছোট ইঁদুরগুলির মধ্যে ক্যান্সার সঞ্চারিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে চিকিৎসায় সাড়া দেবার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কিনা। খরগোশ নিয়ে যে অ্যাশহাইম-জনডেক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে, গিনিপিগ নিয়ে যে ওয়াসারম্যান পরীক্ষা চালানো হচ্ছে, আমি তার মূল সূত্র জানতে চাই। কিন্তু আমি যখন কোনো লাজুক প্রশ্ন করি তখন দেখি যে ইহুদি ডাক্তাররা পর্যন্ত এখানে জন্মা দেয়া শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারদের মতো নিগ্রোদের নতজানু করার নিষ্ঠুর আচরণ আয়ত্ব করে ফেলেছে।

এক ডাক্তার আমাকে একদিন বললেন, তুমি যদি খুব বেশি জেনে ফেলো, ছোকরা, তাহলে তোমার মগজ ফেটে যেতে পারে।

প্রতি শনিবার সকালে শহরের খোঁয়াড় থেকে সংগৃহীত কুকুরের একটা নতুন দলের প্রত্যেকের কণ্ঠনালী ছুরি দিয়ে ছিন্ন করার কাজে আমি এক তরুণ ইহুদি ডাক্তারকে সাহায্য করতাম। এর উদ্দেশ্য ছিল কুকুরগুলিকে কণ্ঠহীন করে দেয়া, যেন তাদের চিৎকার হাসপাতালের অন্য অংশের রোগীদের কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। আমি এক একটা কুকুর ধরে রাখতাম, ডাক্তার তার শিরায় নেমবুটাল ঢুকিয়ে দিতেন ইঞ্জেকশন করে, কুকুরটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতো, তারপর আমি কুকুরটির চোয়াল ফাঁক করে রাখলে ডাক্তার তার শল্যবিদের ছুরি ওর চোয়ালের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে কণ্ঠের নালীগুলি কেটে ফেলতেন। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর কুকুরগুলি মাথা উঁচু করে ছাদের দিকে তাকিয়ে নীরব আর্ত চিৎকার করতো। ওই দৃশ্য নিঃশব্দ যন্ত্রণাভোগের একটা প্রতীক হয়ে

আমার কল্পনায় স্থায়ী বাসা বাঁধে। আমার কাছে নেমবুটাল ছিল একটা শক্তিশালী রহস্যময় তরল পদার্থ, কিন্তু তার উপাদান সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমি একটি বিন্দুবিসর্গ উত্তরও পাই না। তরুণ ইহুদি ডাক্তারটি আমাকে সরাসরি উপেক্ষা করে বলতো, যাও, পরবর্তী কুকুরটা নিয়ে আসো, আমি সারাটা দিন এখানে কাটাবো না।

এক শনিবার সকালে, আমি কুকুরগুলির কণ্ঠনালী ছেদনের জন্য তাদের ধরে রাখার পর, ডাক্তার নেমবুটালের শিশিটা একটা বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখে চলে যান। আমি ওটা হাতে তুলে নিই, মুখটা খুলি, গন্ধ শুঁকি। কোনো গন্ধ নেই। এমন সময় হঠাৎ ব্র্যান্ড আমার দিকে এগিয়ে এলো। তার মুখ খুব পাণ্ডুর।

সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি করছো?

আমি এটা শুঁকে দেখছিলাম, এটার কোনো গন্ধ আছে কিনা তা দেখছিলাম।

সত্যি সত্যি শুঁকেছো?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, ঈশ্বর!

আমি জানতে চাইলাম, কেন? কি হয়েছে তাতে?

সে উচ্চকণ্ঠে বললো, ওটা করা তোমার উচিত হয় নি।

কেন?

সে আমার হাত আঁকড়ে ধরে আমাকে ঘরের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেল, দরজা খুলতে খুলতে চিৎকার করে বললো, কেন? কী ব্যাপার? ব্র্যান্ড হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, বড় বেশি দেরি হয়ে যাবার আগে তোমাকে এক্ষুণি একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আমার নির্বোধ কৌতূহলের ফলে আমি কি কোনো বিষাক্ত জিনিস নাকে টেনে নিয়েছি?

আমি বললাম, ওটা... ওটা কি বিষাক্ত?

সে আমাকে টানতে টানতে বললো, দৌড়াও, ছোকরা, দৌড়াও! তুমি এখনই হয়তো পড়ে মরে যাবে।

আমি ভয়ে বিহ্বল হয়ে যাই, ব্র্যান্ড আমার হাত ধরে টানে, আমরা অন্য একটা ঘরে পৌঁছাই, তারপর একটা লম্বা করিডর ধরে ছুটে চলি।

কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে আমি ব্র্যান্ডকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কিন্তু আমরা বড় বেশি জোরে ছুটছিলাম। অবশেষে ব্র্যান্ড নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামলো। আমার বুক তখন ভীষণভাবে ধড়ফড় করছিল, মাথার মধ্যে রক্ত দপদপ করছিল আর ব্র্যান্ড তখন শান বাঁধানো মেঝের ওপর সটান চিৎ হয়ে হো হো করে হাসতে শুরু করেছে, হাসির দমকে তার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে শূন্যের গায়ে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত ঠোকে, চাপা আওয়াজ করে, খিলখিল করে হাসে। আমি সাহস সঞ্চয়

করার চেষ্টা করি, শ্বেতাঙ্গ ডাক্তাররা তাকে এই রসিকতা করতে বলেছেন কিনা মনে মনে সে কথা ভাবি। ব্র্যান্ড উঠে দাঁড়ায়, চোখের জল মোছে, তখনো সে হাসছে। আমি তার কাছ থেকে সরে আসি। সে বোঝে যে আমি খুব রেগে গেছি, সে আমার পেছন পেছন আসে, তারপর তার হাসির মধ্য দিয়ে কোনো রকমে বলে, রাগ করো না।

আমি শুধু বললাম, জাহান্নামে যাও তুমি!

সে খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি। তোমার মুখ দেখে আমার মনে হয় আমি যা বলবো তাই তুমি বিশ্বাস করবে। শুধু কী ভয়ই যে তুমি পেয়েছিলে...

সে দেয়ালে হেলান দিয়ে আবার হাসতে শুরু করে, জোরে জোরে মাটিতে পা ঠোকে। আমার খুব রাগ হয়। আমার মনে হয় সে সবাইকে এ গল্পটা বলে বেড়াবে। আমি জানতাম যে বিল আর কুক কখনো নিগ্রোদের নিরাপদ এলাকার বাইরে যায় না, এ রকম একটা ভুল তারা কখনো করতো না। এটা শোনার পর তারা কয়েক মাস ধরে হাসাহাসি করবে।

আমি দিব্যি কেটে বললাম, ব্র্যান্ড, তুমি যদি এ কথা কাউকে বলো তাহলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো।

সে হাসতে হাসতে চোখের জলের ভেতর দিয়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি সত্যই রেগে গেছো?

নাক টানতে টানতে ব্র্যান্ড আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। আমি তাকে অনুসরণ করে কুকুরগুলির ঘরে দিয়ে উপস্থিত হই। সারাদিন সে কাজ করতে করতে একটু থামে আর খিলখিল করে হাসে, তারপরই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসিটা গিলে ফেলে, চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে তাকায়, মাথা নাড়ে। এক সপ্তাহ ধরে সে আমাকে ঠাট্টা করে। আমি আমার মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখি, তাকে মজা পেতে দিই। অবশেষে ডাক্তারি বই ঘেঁটে আমি নেমবুটালের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হই, কিন্তু ব্র্যান্ডকে কখনো কিছু বলি না।

গ্রীষ্মের এক সকালে আমি সবে কাজ শুরু করেছি, একটি অল্পবয়সী ইহুদি ছেলে হাতে একটা স্টপওয়াচ নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, ডাক্তার আমাকে বলেছেন একটা ঘর পরিষ্কার করতে। তুমি কতটা সময় নাও আমি যেন তার নির্ভুল হিসাব রাখি। আমরা হাসপাতালটাকে আরো বেশি দক্ষ করার চেষ্টা করছি।

আমি বললাম, আমি আমার কাজ করি এবং সময়ের মধ্যেই আমার কাজ শেষ করি।

সে বললো, এটা বড় সাহেবের হুকুম।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, মাঝে মাঝে তুমি নিজে একটু কাজ করো না কেন?

সে বললো, দ্যাখো, এটাই আমার কাজ, এবার তুমি তোমার কাজ করো।

আমি ঝাড় আর বালতি হাতে নিই, একটা ঘরে সাজানো রোগীবিহীন অব্যবহৃত ছিটিয়ে দিই, জমাট বাঁধা রক্ত আর তকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া কুকুর ইঁদুর ও খরগোশের মল ঘষে ঘষে পরিষ্কার করি। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ছিল নব্বই ডিগ্রি, কিন্তু ছাদের উপরের জানালা দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করার ফলে এক সময় তাপমাত্রা একশো ডিগ্রির উপরে উঠে যায়। কোমর পর্যন্ত গা খালি করে আমি ন্যাকড়া প্যাচানো লম্বা বংশদণ্ড দিয়ে ঘর পরিষ্কার করি, একটা যন্ত্রের মতো স্থির গতিতে আমার কাজ চালিয়ে যাই, একটা ঘর পরিষ্কার করা শেষ হতেই ইহুদি ছেলেটি তার হাতের ঘড়ির রোতাম টিপে দেয়, ঘুটি করে একটা শব্দ হয়। সকাল সাতটা থেকে দুপুর পর্যন্ত আমি কাজ করি, আমি নেতিয়ে পড়ি, নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত মনে হয় আমার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তো, কি রকম দেখলে?

ও বললো, শেষ ঘরটা পরিষ্কার করতে তোমার সতেরো মিনিট লেগেছে। প্রত্যেকটা ঘরই ওই সময়ের মধ্যে তোমার পরিষ্কার করা উচিত।

আমি বললাম, কিন্তু ওই ঘর তো খুব বেশি নোংরা ছিল না।

আমি যেন কোনো কথা বলি নি। সে ওইভাবে বলে যায়, তোমার সতেরোটা ঘর পরিষ্কার করার কথা। সতেরো গুণ সতেরো-তে চার ঘণ্টা উনপঞ্চাশ মিনিট।

সে একটা ছোট খাতায় লেখে, দুপুরের খাওয়ার পর পাথরের সিঁড়িগুলি তুমি পাঁচ তলা পর্যন্ত পরিষ্কার করবে। একটা ছেলেকে দিয়ে সিঁড়ি ঘষিয়ে আমি দেখে নিয়েছি প্রতি সিঁড়ি ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে কত সময় লাগে। তারপর সিঁড়ির সংখ্যা দিয়ে আমি তা গুণ করেছি। ছটার সময় তোমার কাজ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত।

আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার যদি একটু বিশ্রাম নেয়ার দরকার হয়?

তুমি ঠিকই পারবে, এ কথা বলে সে চলে যায়।

প্রতিদিন অপরাহ্নে আমি যখন ওই পাথরের সিঁড়িগুলি ঘষামাজা করি তখন আমার নিজেকে যে রকম ক্রীতদাসের মতো মনে হয় এমন তার আগে কখনো মনে হয় নি। আমি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিই, পাঁচটা সিঁড়ি ভেজাই, তার উপরে সাবান-গুঁড়া ছিটাই, তারপর কোনো শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার বা নার্স সেখানে আসে আর সাবানজলে ভেজা সিঁড়িগুলি না এড়িয়ে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, যে সিঁড়িগুলি আমি সদ্য পরিষ্কার করেছি তার ওপর নোংরা পায়ের দাগ ফেলে। এটা এড়াবার জন্য আমি একবারে দুটো করে সিঁড়ি পরিষ্কার করি, যার ওপর দিয়ে একটা দশ বছরের ছেলেও পার হতে পারে। কিন্তু আমার ওই পন্থা কোনো কাজে লাগে না: সাদা মানুষগুলি নোংরা জলের ওপর থপথপ করে তাদের পা ফেলে এবং পরিষ্কার করার জন্য সিঁড়িগুলিও নোংরা করে দেয়। আমি যদি কখনো অবিবেচক শ্বেতাঙ্গদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে থাকি তাহলে এটা ছিল সেই সময় আমার ইন্সটিটিউটে কাটানো গোটা সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গও ভেজা সিঁড়ি এড়িয়ে যাবার সৌজন্য দেখায় নি। আমি হাঁটু মুড়ে বসি, ঘষামাজা করি, আমার যৎকিঞ্চিৎ খাওয়া-দাওয়া

আমাকে যে শক্তি দেয় তার সবটুকু উজাড় করে ঢেলে দিই, আর আমি এগিয়ে আসা পদধ্বনি শুনি। তখন আমি থেমে আমার টানটান ঠোঁট ফাঁক করে শাপ দিয়ে উঠি :

ওই হারামজাদারা সিড়িগুলি নোংরা করে দেবার জন্য আবার আসছে। জাহান্নামে যাক ওরা!

কখনো কখনো কোনো সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন নিষ্ঠুর স্বভাবের শ্বেতাঙ্গ লক্ষ্য করতো যে সে সিঁড়িতে নোংরা জলের রেখা ফেলে যাচ্ছে, তখন সে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলতো, তোমাকে আমরা বেশ ব্যস্ত রাখি, তাই না, ছোকরা?

আর আমি কোনো জবাব দিতে পারি না।

ব্র্যান্ড আর কুকের ঝগড়া অব্যাহত থাকে। যে ভবনে তারা রোজ কাজ করছে সেখানে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস তৈরি হচ্ছিল কিন্তু চোখে কখনো কৌতূহলের আলো দেখা যায় না। তাদের বর্ণবাদী অবস্থানে তাদের পুরোপুরি অভ্যস্থ করে দেয়া হয়েছিল, তারা শ্বেতাঙ্গদের এবং শ্বেতাঙ্গ জগতের একটা অংশ মাত্র দেখতে সক্ষম হয়, আর শ্বেতাঙ্গরাও কৃষ্ণাঙ্গদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদের জগতের একটা অংশ মাত্র দেখতে পায়।

হয়তো ব্র্যান্ড আর কুক নিজেদের মধ্য রাখতে পারে এমন কিছুই না পেয়ে ছোটদের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ফুঁসে ওঠে, গভীরভাবে অনুভব করতে পারে এমন কিছু পাওয়ার আমায় পরস্পরের প্রতি ঘৃণাকে উদ্ভাবন করে নিয়েছে। কিংবা হয়তো তাদের দীর্ঘস্থায়ী জীবনধারা থেকে একটা অস্পষ্ট মানসিক বেদনা জেগে উঠেছে, যে বেদনার কারণ তারা জানে না। আর সে বেদনা জেগে উঠলে কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়া ওই কুকুরগুলির মতো তারা লাফ দিয়ে উঠে বাতাস খামচে ধরতে চায়। সে যাই হোক ওরা দুজন তর্ক করে চলে অবহাওয়া, খেলাধূলা, যৌনতা, যুদ্ধ, বর্ণবাদ, রাজনীতি আর ধর্ম নিয়ে। যা নিয়ে তর্ক করে সে বিষয়গুলি দুজনের কেউ জানে না, কিন্তু, মনে হয়, যত কম জানে ততো জোরেসোরে যেন তারা তর্ক করতে পারে।

প্রৌঢ় মানুষ দুটির দ্বন্দ্বযুদ্ধ এক শীতের দুপুরে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। দিনটি ছিল অবিশ্বাস্য রকম ঠাণ্ডা। একটা বরফ-শীতল প্রবল হাওয়া তুষার-ঝড়ের দাপট নিয়ে শিকাগোর রাস্তায় হুটোপুটি করছিল। আমাদের প্রাণীভর্তি ঘরে দরজা ছিল তালাবন্ধ। আমরা সব সময় জোরের সঙ্গে বলে এসেছি যে, খাওয়া আর বিশ্রামের জন্য আমাদের এক ঘণ্টা সময় অবশ্যই দিতে হবে। বিল আর আমি কাঠের বাক্সের ওপর বসে কাগজের ব্যাগ থেকে আমাদের দুপুরের খাওয়া খাচ্ছিলাম। ব্র্যান্ড বেসিনে তার হাত ধুচ্ছিলো।

একটা জরাজীর্ণ টুলে বসে আপেল চিবাতে চিবাতে কুক শিকাগোর ডেইলি ট্রাইবুন পড়ছিল।

মাঝে মাঝে কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া কোনো কুকুর ছাদের দিকে নাক তুলে নিঃশব্দ চিৎকার করে ওঠে। ঘরটা ছিল ইস্পাতের তাকের অনেকগুলি সারিতে ভর্তি। প্রত্যেকটি তাকের ওপর রাখা ছিল স্তরের পর স্তর ইস্পাতের খাঁচার ভেতর কুকুর, ধেড়ে ইঁদুর, ক্ষুদে

ইঁদুর, খরগোশ আর গিনিপিগ। প্রত্যেকটি খাঁচার গায়ে অবোধ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় লেখা লেবেল লাগানো ছিল। ঘরের চারপাশের দেয়াল জুড়ে ছিল লম্বা লম্বা রেখাচিত্র, সেখানে আঁকাবাঁকা করে অঙ্কিত ছিল লাল আর কালো বিচ্ছিন্ন রেখা, যার মাধ্যমে ধুসর ধরা হয় কোনো গবেষণার সাফল্য অথবা ব্যর্থতার চিত্র। গিনিপিগগুলির বিষণ্ন কণ্ঠস্বর আমাদের চারপাশে ভাসে, আমরা তাতে কান দিই না। একটা খরগোশ অস্থির হয়ে তার খাঁচায় লাফ দেয়, খড়ের খসখস শব্দ হয়। একটা ইঁদুর তার ইস্পাতের বন্দিশালায় এদিক-ওদিকে ছোটাছুটি করে। কুক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তার খবরের কাগজে চাপড় দেয়।

মুখভর্তি আপেল নিয়ে সে অস্পষ্টভাবে বললো, ১৮৮৮ সালের পর আজকের দিনই হচ্ছে সব চাইতে ঠাণ্ডা দিন। সে বলে আর আমি বসে থাকি। তার কথায় আমরা কোনো মনোযোগ দিই না। কিন্তু ব্র্যান্ড চাপা হাসি হেসে ওঠে।

কুক ব্র্যান্ডের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, এই তুমি হাসছো কেন?

ব্যান্ড বললো, ট্রাইবুন-এর কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো না।

আমি বিশ্বাস করতে পারবো না কেন? ট্রাইবুন হলো পৃথিবীর সব চাইতে বড় কাগজ। ব্র্যান্ড উত্তর দেয় না। সে করুণাভরে তার মাথা নাড়ে এবং আবার চাপা হাসি হাসে। কুক রেগে যায়। আমাকে লক্ষ্য করে তোমার ওই নচ্ছার হাসি থামাও।

আমার যতো খুশি তত হাসবো আমি। তুমি কী বলছো তুমি জানো না। হেরাল্ড-একজামিনার পত্রিকা বলেছে যে আজকের দিনটা হলো ১৮৭৩ সালের পরে সব চাইতে ঠাণ্ডা দিন।

কুক পাল্টা জবাব দিলো, কিন্তু ট্রাইবুন-এর তো জানার কথা। ওটা একজামিনার-এর চাইতে পুরানো কাগজ।

ট্রাইবুন ঘোড়ার ডিম জানে! ব্র্যান্ডের চিৎকারে কুকের কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়।

কুকের রাগ চড়তে থাকে। সে উচ্চ কণ্ঠে বলে, তুমি হতচ্ছাড়া সেকথা কেমন করে জানো?

তর্কাতর্কি ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে কুক চিৎকার করে বললো, ব্র্যান্ড যদি চুপ না করে তবে সে তার 'কালা-গলাটা চিরে দেবে।'

ব্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে বেসিন থেকে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ায়। তার হাত থেকে সাবান-জল ঝরে পড়তে থাকে। তার দু' চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ছোটে। সে বললো, তোমার ওই কথা ফিরিয়ে নাও।

কুক ব্যঙ্গভরে বললো, আমি কিছুই ফিরিয়ে নেবো না। কি করতে চাও তুমি এখন? দুই প্রৌঢ় নিগ্রো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকায়। আমি মনে মনে ভাবি, এটা কি সত্যিকার ঝগড়া, নাকি আগে যেমন বহুবার হয়েছে তেমনিভাবে এটাও একটা নিছক তর্কাতর্কির মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যাবে?

অকস্মাৎ কুক ডেইলি ট্রাইবুন পত্রিকাটা তার হাত থেকে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে একটা লম্বা ছুরি বের করলো। একটা বোতাম টিপতেই ছুরির মধ্য থেকে একটা চকচকে ইস্পাতের ব্লেড এক লাফে বেরিয়ে আসে। ব্র্যান্ড দ্রুত পেছনে সরে যায়, তারপর বেসিনের পেছনে কাঠের তক্তায় যে বরফ ভাঙার কুড়াল আটকানো ছিল সেটা আঁকড়ে ধরে।

ব্র্যান্ড বললো, ছুরিটা ফেলে দাও।

কুক তাকে সতর্ক করে দেয়, আমার কাছে এসো না বলছি। এলে আমি তোমাকে জবাই করে ফেলবো।

ব্র্যান্ড দ্রুত শরীর বাঁকিয়ে কুড়াল নিয়ে কুকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কুক পাশ কাটিয়ে ওর আওতা থেকে সরে যায়। ওরা দুজন একটা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ মুষ্টিযোদ্ধার মতো পরস্পরের চারপাশে ঘুরতে থাকে। ক্যান্সার এবং যক্ষায় আক্রান্ত ইঁদুরগুলি তাদের খাঁচায় লাফাতে শুরু করে।

গিনিপিগগুলি ভয় পেয়ে শিস দিয়ে ওঠে। ডায়াবেটিস হওয়া কুকুরগুলি দাঁত বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘেউ ঘেউ করে নেতিয়ে গিয়ে নিজেদের খাঁচার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা করে। কুক এবার গুটিসুটি মেরে থাকে, তারপর ছুরি হাতে সামনের দিকে লাফ দেয়। বিল আর আমি উঠে দাঁড়াই। বিস্ময়ে আমাদের মুখ দিয়ে কথা সরে না। ব্র্যান্ড পেছনে হটে। ওদের দুজনের চোখ এখন কঠিন, কারো চোখের পলক পড়ে না। দুজনই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আমি আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠি, থামাও এসব!

বিল অবাক হয়ে বললো, ওই বৃদ্ধ দুটো সত্যিই মারামারি করছে!

একে অন্যকে ফালাফালা করার চেষ্টায় ব্র্যান্ড আর কুক ইস্পাতের তাকগুলির মাঝখান দিয়ে ছোটাছুটি করে। হঠাৎ ব্র্যান্ড এক প্রচণ্ড গর্জন ছেড়ে কুকের দিকে ছুটে যায় এবং তাকে সজোরে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। কুক ব্র্যান্ডের হাত আঁকড়ে ধরে থাকে যেন বরফ ভাঙার কুড়ালটা তার বুকের মধ্যে ঢুকে না যায়।

ব্র্যান্ড কুকের হাতের বাঁধন থেকে ছুটে গিয়ে আবার তাকে আক্রমণ করে এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে জানোয়ার-ভর্তি একটা ইস্পাতের তাকের ওপর ফেলে দেয়। তাকটা তার পায়ের ওপর এক মুহূর্তের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করে, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, তারপর হুড়মুড় করে উল্টে পড়ে যায়।

যখন একটা ইস্পাতের তাক আরেকটা ইস্পাতের তাকের ওপর সজোরে পড়ে আর সবগুলি এমন সশব্দে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে যে মনে হয় বুঝি ছাদ ভেঙ্গে পড়লো। চোখের পলক পড়ার আগেই গোটা ঘরের চেহারা বদলে যায়। ব্র্যান্ড আর কুক বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের চোখ একে অন্যের ওপর দৃঢ় আবদ্ধ, তাদের তাক করা অস্ত্র উঁচু করে তুলে ধরা, তবে তাদের চারপাশে যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে চলেছে সে

সম্পর্কে এখন আবছাভাবে তারা সচেতন।

ইস্পাতের তাকগুলি একটা অন্যটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, খাঁচার দরজাগুলি সশব্দে খুলে যায়। আতঙ্কে পাগল হয়ে গিয়ে ইঁদুর, কুকুর আর খরগোশগুলি মেঝের ওপর ছুটতে থাকে। ওয়াসারম্যান গিনিপিগগুলি এমন তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি করতে থাকে যে মনে হয় শেষ বিচারের দিন এসে গেছে। এখানে ওখানে খাঁচার নিচে চাপা পড়ে একটা প্রাণীকে পিষ্ট হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আমরা চারজন পরস্পরের দিকে তাকাই। এটার অর্থ কী আমরা বুঝতে পারি। আমাদের চাকরি যাবে। এমনিতেই আমাদের মনে করা হতো কালো বুদ্ধু সব, আর ডাক্তাররা এই অবস্থা দেখলে তাদের ধারণার অর্থপ্রমাণ পাবেন। বিল দরজার কাছে ছুটে গিয়ে ওটা যে তালাবন্ধ আছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়। আমি ঘড়ির দিকে দেখি, সাড়ে বারোটা। আমাদের হাতে দেড় ঘণ্টা সময় আছে।

বিল অস্বস্তির সঙ্গে বললো, আমাদের এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

ব্র্যান্ড এবং কুক পরস্পরের দিকে তাকায়, দুজনের চোখেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

আমি বললাম, কুক, আমাকে তোমার ছুরিটা দাও।

কুক বললো, তুমি বললেই হলো? আগে ওর কাছ থেকে ছুরিটা নাও।

এমন সময় দরজায় একটা টোকার শব্দ হয়।

বিল বললো, শস্‌স্‌।

আমরা অপেক্ষা করি। আমরা শুনতে পাই পদধ্বনি সরে যাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবি এবার আমাদের সবার চাকরি ঠিক চলে যাবে।

দ্বন্দ্বরত দুজনকে তাদের অস্ত্র সমর্পণে রাজি করানো একটা কঠিন কাজ ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্পাদিত হয়। আমরা তখন সব কিছু ঠিকঠাক করার কাজ শুরু করতে পারি। ব্র্যান্ড ধীরে ধীরে নিচু হয়ে একটা ইস্পাতের তাকের এক প্রান্ত ধরে টান দেয়। কুক তাকে সাহায্য করার জন্য ঝুঁকে পড়ে। ওরা দুজনই স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো কাজ করে। তবে, একটু পরেই, ঘড়ির দিকে চোখ রেখে আমরা সবাই মরীয়া হয়ে কাজ করতে থাকি।

আমরা পরিশ্রম করে চলি আর নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিই যে, মারামারির কথাটা আমরা গোপন রাখবো। যদি কোনো ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমরা বলবো যে, লাঞ্চের সময় আমরা কেউ এ ঘরে ছিলাম না। দরজায় টোকা দেয়ার পর দরজা না খোলার ব্যাখ্যাও তার মধ্যে পাওয়া যাবে।

আমরা তাকগুলি ঠিক মতো বসাই, খাঁচাগুলি আবার যথাস্থানে রাখি। তারপরই আমরা মুখোমুখি হই এক অসম্ভব কাজের। ক্যান্সার আক্রান্ত ধেড়ে ইঁদুর আর ক্ষুদে ইঁদুর, ডায়াবেটিস হওয়া কুকুর, অ্যাশহাইম-জনডেক খরগোশ আর ওয়াসারম্যান গিনিপিগগুলি যথাযথভাবে আলাদা করতে হবে। মারামারির সব চিহ্ন আমরা কতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার

মারামারির স্মৃতি তার মনে তখনো এতো তাজা হয়েছিল যে, সে কোনো কথা বলতে পারলো না।

আরো দিন কাটে, কিছুই ঘটলো না। তারপর আরো একদিন। ডাক্তাররা প্রাণীগুলি পরীক্ষা করেন, তাঁদের ছোট কালো খাতায় আর বড় খাতায় লেখেন, তাঁদের রেখাচিত্র লাল আর কালো লাইন এঁকে চলেন।

এক সপ্তাহ কেটে যায়। আমরা নিজেদের বিপদমুক্ত অনুভব করি। কেউ একটি প্রশ্নও করে নি।

অবশ্যই আমাদের চার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট বিনয় ছিল, আমাদের অবদানের কথা আমরা কাউকে জানাই নি, কিন্তু ওই গোপন রাখা বিপর্যয়ের পর গবেষণাগারে কি কার্যক্রম চলে তা নিয়ে আমরা প্রায়ই মনে মনে ভাবতাম। শীতের ওই ঠাণ্ডা দিনে কিছু আকস্মিক তথ্য পাওয়ার ফলে কি সপ্রমাণিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োগের চূড়ান্ত মুহূর্তের পূর্বক্ষণে, কোনো বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব পরিত্যাক্ত হয়? নতুন, উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়ার ফলে কি কোনো পরীক্ষিত তত্ত্ব নতুন ও বিচিত্রভাবে পরিশীলিত হয়ে উঠে? কোনো চিন্তামগ্ন গবেষণা কর্মী, যারা বিশেষ রকমের ঘড়ি হাতে নিয়ে চলাফেরা করে, আর আমি যে সিঁড়িগুলি পরিষ্কার রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি তার জলধারার ওপর অসতর্কভাবে থপথপ করে হাঁটে, সে কি কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক সত্যের, অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, বিচিত্র একটা ঝলক দেখতে পেয়েছিল? তো, এ রকম কোনো খবর আমরা কখনো শুনি নি...

আমি অবশ্য মাঝে মাঝেই ভেবেছি, আমার কি পরিচালকের ঘরে গিয়ে যা ঘটেছে তার কথা তাঁকে জানানো উচিত? কিন্তু যতবার আমি একথা ভাবি ততবারই আমার মনে পড়ে যে এই পরিচালকই আমার কাজের সময় মাপার জন্য ওই ছেলেটিকে স্টপওয়াচ হাতে নিয়ে আমার ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে একজন মানুষ বলে বিবেচনা করেন নি। তাঁর ভুবনে আমার কোনো ভূমিকা নেই। আমি সপ্তাহে তেরো ডলার রোজগার করি, এই তেরো ডলার দিয়ে আমাকে চারজন মানুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়, আমি কি আদর্শ প্রণোদিত হয়ে এমন কিছু করতে পারি যা এই তেরো ডলারকে কুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে? ওটা করলে র‍্যান্ড এবং কুক আমাকে ঘৃণা করতো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের গোপন কথা ফাঁস করার জন্য আমাকে এই চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতো। হাসপাতাল আমাদের চার নিগ্রোকে এমনভাবে রাখতো যেন আমরা যে প্রাণীদের পরিচর্যা করতাম তাদেরই অতি ঘনিষ্ঠ জন। আমরা হাসপাতালের পাতালপুরীর করিডরে গাদাগাদি করে থাকতাম, হাসপাতালের বাকি অংশে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া চলে তা থেকে এক বিশাল মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হতো- তিনশো বছর ধরে আমেরিকা যেভাবে আমাদের আমেরিকান পাতালপুরীর অন্ধকারে অবরুদ্ধ করে রেখেছে ঠিক সেইভাবে। আর নিজেরা তৈরি করে নিয়েছি নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং আনুগত্যের আমাদের নিজস্ব বিধিবিধান।

অষ্টাদশ অধ্যায়

এক বৃহস্পতিবার রাতে শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের একটি দলের কাছ থেকে আমি একটি আমন্ত্রণ পাই। ডাকঘরে কাজ করার সময় এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ওরা সাউথ সাইডের একটি হোটেলে মিলিত হয়ে পৃথিবীর পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবে। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি যে তাদের অনেকেই কমুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। আমি যখন পার্কে আমার দেখা নিগ্রো কমুনিস্টদের উদ্ভট আচরণের কথা বলি তখন ওরা আমাকে জানায় যে, ওসব একটা কৌশল, ওসব ভাঁওতা ঠিকই আছে। আমার সন্দেহ থেকে যায়।

তারপর এক বৃহস্পতিবার রাতে সল, একটি ইহুদি ছেলে, একটা খবর দিয়ে আমাদের চমকে দেয়। তার একটা ছোট গল্প আলভিল নামের একটি লিটল ম্যাগাজিনে গৃহীত হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক জ্যাক কনরয়। সল একটা বৈপ্লবিক শিল্পী সংস্থা জন রীড ক্লাব-এ যোগ দিয়েছে। ও আমাকে ওদের ক্লাবে যোগ দেবার জন্য বারবার মিনতি করে। আমি সব সময় একটা না একটা সহজ অজুহাত দেখিয়ে তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি।

সল বললো, তোমার ভাল লাগবে।

আমি জানালাম, আমি সংগঠিত হতে চাই না। ওরা তোমাকে লিখতে সাহায্য করতে পারবে।

কি লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে, তা কেউ আমাকে বলে দিতে পারে না। সল পীড়াপীড়ি করে, এসেই দেখো না। তোমার হারাবার তো কিছু নেই।

আমার মনে হয় নিগ্রোদের ব্যাপারে কমুনিস্টদের কোনো আন্তরিক উৎসাহ থাকা সম্ভব নয়। আমি ছিলাম নৈরাশ্যবাদী। কোনো শ্বেতাঙ্গ যদি বলতো যে সে নিগ্রোদের শ্রদ্ধা করে তাহলে আমি তাকে সন্দেহ করতাম। বরং কোনো শ্বেতাঙ্গ যদি বলতো যে সে নিগ্রোদের মাধ্যমে নিজেদের সময়ের ঐতিহ্য থেকে উপরে উঠে এসে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে নিগ্রোদের দেখতে সমর্থ-এ রকম খুব বেশি শ্বেতাঙ্গের অস্তিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।

এক শনিবার রাতে আমি অলসভাবে বাড়িতে বসেছিলাম। আগের ইস্কুলের কাজের সময় যে সব মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাদের ওখানে বেড়াতে যেতে আমার ইচ্ছা করছিল না। পড়তেও ভাল লাগছিল না। আমি ঠিক করলাম যে, জন রীড ক্লাবে যাবো, মজা করে সময় কাটানো এক দর্শকের ভূমিকা নেবো। আমি লুপ পর্যন্ত

গিয়ে নম্বরটা খুঁজে বের করি। একটা অন্ধকার সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। খুব বেশি সাদর অভ্যর্থনার মতো দেখায় না। এ রকম মলিন একটা জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ কী ঘটতে পারে? আমার উপরের জানালাগুলি দিয়ে আমি দেয়ালে দেয়ালে আবছা ম্যুরাল চিত্রমালা দেখতে পাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা দরজার সামনে দাঁড়াই। দরজার গায়ে লেখা আছে :

দি শিকাগো জন রীড ক্লাব

আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি। ওই রকম অদ্ভুত একটা ঘর আমি এর আগে দেখি নি। মেঝের ওপর কাগজ আর সিগারেটের গোড়া পড়ে আছে। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে কয়েকটা বেঞ্চ পাতা আছে। তার উপরে দেখা যায় উজ্জ্বল রঙে আঁকা শ্রমিকদের বিশাল বিশাল ছবি, তারা বহন করছে পতপত করে ওড়া দীর্ঘ পতাকা। তারা চিৎকার করছে, তাদের মুখ হা করা, তাদের পা ছড়ানো শহর-নগরের ওপরে।

হ্যালো।

আমি ঘুরে দাঁড়াতেই একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষকে দেখি, সহাস্য মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, আমার এক বন্ধু, আপনাদের ক্লাবের সদস্য, আমাকে আসতে বলেছে এখানে। তার নাম সল–

শ্বেতাঙ্গ লোকটি বললো, স্বাগতম। আজকে আমাদের এখানে কোনো অনুষ্ঠান নেই, তবে আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর একটা সভা হবে। আপনি কি ছবি আঁকেন?

ওর মাথার চুল ঈষৎ পাকা। গোঁফ আছে।

আমি বললাম, না। আমি লেখার চেষ্টা করছি।

তাহলে আমাদের পত্রিকা লেফট ফ্রন্ট-এর সম্পাদকীয় সভায় যোগ দিন।

আমি তো সম্পাদনার কিছুই জানি না।

ও বললো, তাহলে শিখতে পারেন।

আমি দ্বিধান্বিতভাবে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই, তারপর বলি, আমি এখানে আপনাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে চাই না।

লোকটি বললো, আমার নাম গ্রিস। আমি তাকে আমার নাম বলি, আমরা করমর্দন করি। সে একটা আলমারি থেকে হাত বোঝাই করে ম্যাগাজিন নিয়ে আসে, তারপর বলে, এখানে মাসেস পত্রিকার কিছু পুরানো সংখ্যা আছে। কখনো পড়েছেন এই পত্রিকা?

আমি বললাম, না।

আমেরিকার সেরা লেখকদের অনেকেই এই পত্রিকায় লেখেন।

ও আমাকে ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার নামক একটা পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা দিয়ে বললো, এখানে জিদের লেখা আছে, গোর্কির লেখা আছে...

আমি ওকে কথা দিই যে আমি ওগুলি পড়ে দেখবো। ও আমাকে একটা দফতরে নিয়ে গিয়ে একটি ইহুদি ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে ওই ছেলে দেশের একজন অগ্রণী চিত্রশিল্পী হয়। ও আমাকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দেয়, একজন পরবর্তী সময়ে তার কালের একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার হয়, একজন লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় যে তার প্রজন্মের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সৃষ্টি করে, একটি তরুণ ইহুদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় যে পরবর্তী সময়ে নাগরিকের চেতনাভিত্তিক অভিযানের ওপর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। আমি এমন কয়েকজন নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হই পরবর্তী বহু দশকের জন্য যাদের সঙ্গে আমার আলাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাদের সঙ্গে আমার জীবনের এই প্রথমবারের মতো একটা অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ওরা ওদের পত্রিকা লেফট ফ্রন্ট নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে, আমি এক কোণায় বসে মন দিয়ে শুনি। আমি নিগ্রো বলে কি ওরা আমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করছে? আমি আমার নিজেকে বলি, এদের সঙ্গে চলতে হলে আমাকে শীঘ্রই দ্রুটি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। ওরা আমাকে তাদের পত্রিকায় লেখা দিতে বলে। আমি জানাই যে আমি বিবেচনা করবো। সভার শেষে একটি আইরিশ মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করে, সমাজ সেবামূলক কাজে অংশ নেয়, একজন স্কুল শিক্ষিকা এবং একজন খ্যাতিমান ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের স্ত্রী। এক সময় আমি এ জাতীয় মানুষের ভৃত্য হিসেবে কাজ করেছি। আমি নানা রকম সন্দেহে আক্রান্ত হই, তাদের উদ্দেশ্যের গভীরে পৌঁছতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে কোনো রকম অনুকম্পা প্রদর্শনের চিহ্ন দেখি না।

আমি নানা চিন্তায় ডুবে গিয়ে বাড়ি ফিরি। যে সব বিচিত্র শ্বেতাঙ্গ মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হলো তাদের আন্তরিকতার বিষয়টি আমি গভীরভাবে বুঁটিয়ে দেখতে চাই। আমি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করি, ওরা নিগ্রোদের সত্যি সত্যি কি চোখে দেখে? আমি আমার বিছানায় শুয়ে পত্রিকাগুলি পড়ি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি যে নির্যাতিত ও বিচ্ছিন্ন মানুষদের জীবনের সত্তা জানার জন্য এই পৃথিবীতে একটা সংগঠিত অনুসন্ধানী কাজ চলছে। আমি যখন ত্রাণ কর্মকর্তাদের কাছে রুটির জন্য মিনতি করছিলাম তখন আমি মনে মনে অস্পষ্টভাবে ভাবি এই পরিত্যক্ত মানুষগুলি কি কখনো কর্ম, চিন্তা ও অনুভূতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে? এখন আমি জানি। ধরণীর এক ষষ্ঠাংশে এটা এখনই হচ্ছে। মুদ্রিত পৃষ্ঠা থেকে বৈপ্লবিক কথাগুলি লাফিয়ে উঠে এসে সজোরে আমাকে আঘাত করে।

সাম্যবাদের অর্থনীতি অথবা ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের বিশাল ক্ষমতা অথবা নিষিদ্ধ গোপন রাজনীতির উত্তেজনা আমাকে অভিভূত করে না। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার মিল এবং বিচ্ছিন্ন কিন্তু সমবর্তী মানুষের একত্রিত হয়ে একটি সমগ্র পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। আমার নৈরাশ্যবাদ, যা ছিল আমাকে বর্জন করা আমেরিকার বিরুদ্ধে আমার আত্মরক্ষামূলক বর্ম, তা আমার কাছ থেকে খসে পড়ে এবং আমি ভয়ে ভয়ে ভাবতে থাকি কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে। নিগ্রো হিসেবে আমেরিকায় বাস করে আমি অনুভব

করছি– যদিও আমার অসহায়ত্বের কারণে আমি তা আমার নিজের কাছ থেকেও গোপন রাখার চেষ্টা করেছি যে মানুষের ঐক্যের সমস্যাটি রুটির চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি দৈহিকভাবে বেঁচে থাকার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমি অনুভব করি যে মানুষকে একত্রিত করার মতো একটা অব্যাহত স্রোতধারা ছাড়া, শরীরের মধ্যে রক্তের প্রবহমান ধারার মতো, কোনো বাঁচাই মানুষের মতো বাঁচা বলার যোগ্য হতে পারবে না।

আমি আমার সময়ের প্রধান ধারণাগুলিতে অংশ নেয়ার জন্য বুভুক্ষ হয়ে উঠি। আমি সে অনুযায়ী কাজ করতে চাই। আমি অরণ্যের একটি প্রাণীর মতো অনুভব করতে চাই না যে, এই পৃথিবী অচেনা এবং বৈরী। আমি কোনো ব্যক্তিগত যুদ্ধ করতে বা ব্যক্তিগত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। এখন পর্যন্ত আমি বইপত্র থেকে রক্ত আহরণ করে কোনো কারণে একটা মানবিক জীবন টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছি। এ পর্যন্ত অন্যদের সঙ্গে আমার যে বাস্তব সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার মধ্যে এমন কিছুই আমি পাই নি যা আমাকে আমার নিজের অনুভূতির ওপর আস্থা স্থাপন করতে উৎসাহিত করতে পারে। আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তাকে অস্বীকার করে, আমার শরীর দিয়ে যা অনুভব করেছি তার সঙ্গে বিবাদ করে, আমি আমার পরিচয় ও স্বরূপতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় এখানে, এই বৈপ্লবিক অভিব্যক্তির মধ্যে নিগ্রো, অভিজ্ঞতা একটা ঠিকানা, একটা কার্যকর মূল্যবোধ এবং একটা ভূমিকা খুঁজে পাবে। আমার পড়া পত্রিকাগুলি থেকে উত্তরাধিকারচ্যুত মানুষগুলির অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য আবেগপূর্ণ ডাক আসে, এবং তার মধ্যে ধর্মযাজকদের দুর্বল আধো-আধো বুলি নেই। ওরা বলে না, আমাদের মতো হও, তাহলে, হয়তো, আমরা তোমাদের পছন্দ করতেও পারি। ওরা বলে, তুমি যা সে কথা বলার সাহস যদি তোমার থাকে, তাহলে তুমি দেখবে যে তুমি একা নও। ওরা জীবনে বিশ্বাস করার জন্য জীবনের কাছে দাবি জানায়। আমি সারা রাত ধরে পড়ি, তারপর সকালের দিকে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে আমার টাইপ রাইটারের মধ্যে লেখার কাগজ গুঁজে দিই। আমি প্রথমবারের মতো অনুভব করি যে, আমি এমন মানুষদের কাছে কথা বলতে পারবো যারা আমার কথা শুনবে। আমি মুক্ত ছন্দে একটা উদ্দাম, অশোধিত কবিতা রচনা করি, কিছু প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করি কৃষ্ণাঙ্গ হাতের, তারা খেলছে, কাজ করছে, বেয়নেট হাতে তুলে নিচ্ছে, অবশেষে মৃত্যুর কোলে শক্তকঠিন হয়ে জমে যাচ্ছে। আমি কবিতাটি পড়ি, আমার মনে হয় আমি অপটুভাবে হলেও এখানে শ্বেতাঙ্গ জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ জীবনকে যুক্ত করেছি, এই অভিজ্ঞতার দুটি স্রোতধারাকে মিশিয়ে দিয়েছি।

রান্নাঘরে কারো খুটখুট করার শব্দ শুনতে পাই আমি। মা জিজ্ঞাসা করলেন, রিচার্ড, তোমার কি শরীর খারাপ?

না, মা, আমি পড়ছি।

মা দরজা খুলে আমার বালিশের ওপর স্তূপ করে রাখা পত্রিকাগুলির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি কি এমন পত্রিকা কিনে তোমার পয়সার অপচয় করছো নাকি?

আমি বললাম, না, আমাকে এগুলি একজন দিয়েছে।

মা তার পঙ্গু পায়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে ঘাটের পাশে এসে মাংসে-এর একটা সংখ্যা হাতে তুলে নেয়। সেখানে ছিল মে দিবসের একটা রোমান্সকর ছবি। মা তার চশমা ঠিক করে নিয়ে ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর অস্ফুট ভয়ার্ত গলায় বলে, হা ঈশ্বর।

কি হলো, মা?

মা পত্রিকাটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রচ্ছদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলো, এই লোকটার কি হয়েছে?

মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তার চোখ দিয়ে কম্যুনিষ্ট চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবিটিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখি– হেঁড়াখোঁড়া আলখাল্লা পরা এক শ্রমিক, একটা লাল পতাকা উঁচু করে ধরে আছে। লোকটির দু' চোখ স্ফীত, মুখ হা করা, দাঁত দেখা যাচ্ছে, ঘাড়ের মাংসপেশী দড়ির মতো। তাকে অনুসরণ করছে একদল সাদামাটা নরনারী ও শিশু, তারা আন্দোলিত করছে গদা, পাথরের টুকরা, লম্বা হাতলঅলা কাঁটা লাগানো খড় তোলার দণ্ড।

মা জিজ্ঞাসা করলো, ওই লোকগুলি কি করতে যাচ্ছে?

আমি সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললাম, আমি জানি না।

এগুলি কি কম্যুনিস্ট পত্রিকা?

হ্যাঁ।

জনগণ এ রকম করুক তাই কি চায় ওরা?

ইয়ে– আমি ইতস্ততঃ করি।

আমার মায়ের মুখে বিতৃষ্ণা ও নৈতিক অবজ্ঞার চিহ্ন ফুটে ওঠে। মা ছিল অতিশয় শান্ত প্রকৃতির মহিলা। তার আদর্শ ছিল ক্রুশবিদ্ধ যিশু। আমি কেমন করে তাকে বলবো যে কম্যুনিস্টরা চায় তিনিও রাস্তায় মিছিল করবেন, শ্লোগান আওড়াবেন, গান গাইবেন?

মা জিজ্ঞাসা করলো, কম্যুনিস্টরা জনগণকে কি মনে করে?

আমি শব্দ হাতড়াই, তারপর বলি, ওরা ঠিক এটা বলতে চায় না।

তাহলে কি বলতে চায়?

এটা প্রতীকী।

যা বলতে চায় তা পরিষ্কার করে বলে না কেন ওরা?

বোধহয় সেটা জানে না, তাই।

তাহলে এসব জিনিস ছাপে কেন?

আমি স্বীকার করি, মানুষের কাছে কিভাবে আবেদন করতে হবে তা ওরা এখনো জানে না। আমি মনে মনে ভাবি আমি যখন আমার মাকেই বিশ্বাস করাতে পারি না তখন আর কাকে বিশ্বাস করাতে পারবো?

মা পত্রিকাটা ফেলে দেয়, বলে, এই ছবি যে কোনো লোকের মাথা খারাপ করে দেবার জন্য যথেষ্ট। চলে যাবার জন্য ঘুরে, দরজার কাছে থেমে মা বললো, তুমি ওই লোকগুলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছো না তো?

আমি পাশ কাটিয়ে যাই, আমি শুধু পত্রিকাগুলি পড়ছি, মা।

মা চলে যায়। আমি যে তার সাধারণ প্রশ্নের মোকাবেলা করতে পারি নি সে বিষয় নিয়ে ভাবি। আমি মাসেস-এর প্রচ্ছদচিত্রের দিকে আরেকবার তাকাই। আমি জানি যে, এই উদ্দাম ছবিটির মধ্যে সাধারণ মানুষের আবেগের প্রতিফলন ঘটে নি। আমি পত্রিকাটি আবার পড়ি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে শিল্পীর যা অন্যদের আলোড়িত করবে বলে মনে করেছে তার অভিব্যক্তিই এখানে ঘটিয়েছে, যা নতুন সদস্য যোগাড় করবে বলে মনে করেছে সে রকম ভাবেই কথা বলেছে। তাদের একটা কর্মসূচি, একটা আদর্শ আছে, কিন্তু তারা এখনো একটা ভাষা খুঁজে পায় নি।

তাহলে এখানেই আমি কিছু করতে পারি, কিছু তুলে ধরতে পারি, কিছু বলতে পারি। কম্যুনিস্টরা যাদের নেতৃত্ব দিতে চায় তাদের অভিজ্ঞতাকে অতি সরলীকৃত করে ফেলেছে। জনগণকে দলভুক্ত করার প্রয়াসে তারা জনগণের জীবনের অর্থটা হারিয়ে ফেলেছে। তারা জনগণকে বড় বেশি বিমূর্তভাবে গ্রহণ করেছে। আমি সফরে বেরোবো, আবিষ্কার করবো, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখবো। আর তারপর ওই অর্থ কিছু পরিমাণে পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করবো। আমি দু' দলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবো : সাধারণ মানুষ কি রকম অনুভব করে আমি কম্যুনিস্টদের সে কথা জানাবো, আর কম্যুনিস্টরা তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে আত্মত্যাগ করছে সাধারণ মানুষকে তার কথা বলবো।

পরের বৃহস্পতিবার রাতে আমি যখন হোটেলে বীয়ারের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হই তখন আমি আমার স্থূল কবিতাগুলি পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখি। সল পড়লো, তারপর বললো, প্রকাশ করা যাবে।

আমি বললাম, কথা সেটা নয়। তোমার কাছে এগুলির অর্থ কি?

ও বললো, উত্তরাধিকার বঞ্চিতদের স্বপ্ন।

আমাকে দলভুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি তোমরা এগুলি ছাপাও তাহলে কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই, আমি বললাম।

ও বললো, তুমি দলে যোগ দাও বা না দাও এ কবিতাগুলি ছাপা হবে।

আমি মাসেস-এর ছবিটি সম্পর্কে আমার মায়ের প্রতিক্রিয়ার কথা ওদের বলি।

কে একজন বললো, ওকে বিপ্লবের প্রতীকের ব্যাপারটা শিখতে হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কেউ বুঝতে পারেন এমন ভাষায় কম্যুনিস্টরা কেন কথা বলে না?

অনেক তর্ক-বিতর্ক হয় কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয় না।

আমার সন্দেহ তখনো দূর হয় না। নিগ্রো-বিরোধী মনোভাবের সম্ভাবনাকে অভিব্যক্তি কোথাও ঘটে কিনা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমি ক্লাবের পরবর্তী সভায় যোগ দিই। অবশেষে আমাকে স্বীকার করতে হয় যে, আমাকে ওদের মধ্যে দেখে ওরা যথার্থই আনন্দিত হয়। তবু ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সন্দিহান থাকি। ওরা কি একটা ধর্মঘটে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করছে যেন ভাল ধারণা পাওয়া যায়? অথবা ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী কি ওরা আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছে? সেটা হলো যারা এই ক্লাবে কোনো নিগ্রোকে চায় না তারা পদত্যাগ করতে পারতো। কিন্তু কেউ পদত্যাগের কোনো উদ্যোগ নেয় নি। কেমন করে এই লোকগুলি লাদের কথা না ভেবে, তাদের ঘরবাড়ি ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, যে বাধা আমেরিকার শিল্পীগুলি পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে নি সেই বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হলো?

লেফট ফ্রন্ট-এর সম্পাদক আমার দুটি অপরিশীলিত কবিতা তাদের কাগজে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করে, দুটি কবিতা পাঠিয়ে দেয় অ্যানভিল-এর জ্যাক কনরয়ের কাছে, আরেকটা পাঠিয়ে দেয় মাসেস-এর উত্তরাধিকারী নিউ মাসেস-এ। তবু আমার মনের মধ্যে সন্দেহ লেগে থাকে।

আমি বলি, আপনি যদি মনে করেন যে, কবিতাগুলি যথেষ্ট ভাল নয় তাহলে পাঠাবেন না।

লেফট ফ্রন্ট-এর সম্পাদক বললো, কবিতাগুলি যথেষ্ট ভাল।

আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি যেন আপনাদের দলে যোগ দিই সে জন্য কি আপনি এ কাজটা করছেন?

ও বললো, না। তোমার কবিতাগুলি স্থূল কিন্তু আমাদের জন্য উত্তম। দেখো, আমরা সবাই এ কাজে নতুন। আমরা নিগ্রোদের সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখি, কিন্তু নিগ্রোদের আমরা কখনো দেখি না। তোমার লেখা আমাদের দরকার।

আমি ওদের ক্লাবের কয়েকটা সভায় যোগ দিই। তাদের কাজের ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব আমার মনে দাগ কাটে। বেকার শিল্পীদের জন্য চাকরি সৃষ্টির দাবি জানায় তারা সরকারের কাছে। তারা পরিকল্পনা নেয় এবং চিত্র প্রদর্শনী সংগঠিত করে।

লেফট ফ্রন্ট প্রকাশের জন্য তারা তহবিল সংগ্রহ করে। আর ট্রেড ইউনিয়নের সভায় বক্তব্য রাখার জন্য তারা বহু বক্তাকে সেখানে পাঠায়। এদের সদস্যরা ছিল ঐকান্তিক, গণতান্ত্রিক, চঞ্চল, ব্যগ্র, আত্মত্যাগ পরায়ণ। আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগে এবং আমি কি করবো তা স্থির করে ফেলি : কম্যুনিস্টরা কি আমি তা নিগ্রোদের জানাবো। মেডিকেল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের অস্ত্রোপচারের ঘরগুলি ন্যাকড়া দিয়ে ধুয়ে মুছতে মুছতে আমার মনে একটা ধারণা জন্মে : আমি নিগ্রো কম্যুনিস্টদের একটা জীবনী তথামালা রচনা করবো। আমি আমার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা কাউকে বলি না। আমার উচ্চাশা যে কতো উদ্ভট ও নির্বোধ সারল্যমাখা ছিল তা আমি জানতাম না।

আমি কয়েকটা সভায় যোগদানের পরই বুঝতে পারি যে, ক্লাবের সদস্যদের দুটি দলের মধ্যে একটা তিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। কিন্তু আমি যখন ওই দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটা জানতে চাই তখন কেউ আমাকে কিছু বলে না। প্রতি সভাতেই তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। আমি দেখতে পাই যে, আসলে চিত্রশিল্পীদের একটা ছোট গোষ্ঠী ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আধিপত্য করছে। লেখকদের যে ছোট গোষ্ঠী লেফট ফ্রন্ট-এর চারপাশে জড়ো হয়েছিল তারা চিত্রশিল্পীদের কর্তৃত্বে ক্ষুব্ধ হয়। মূলত লেফট ফ্রন্ট-এ উৎসাহী হওয়ার জন্য সহজ অনুপাতের সূত্রে আমি লেখকদের পক্ষাবলম্বন করি। তারপর ঘটনা একটা বিচিত্র মোড় নেয়। লেফট ফ্রন্ট গোষ্ঠী ঘোষণা করলো যে, ক্লাবের বর্তমান নেতৃত্ব ক্লাবের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে না। একটা বিশেষ সভা আহূত হয় এবং সেখানে একজন কার্যনির্বাহী সম্পাদককে পুনর্নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ওই পদে মনোনয়ন প্রদানের সময় আমার নামটি অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করি, বলি যে তাদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে আমি এতো কম জানি যে, আমাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা ওদের পক্ষে ঠিক হবে না। সারারাত ধরে বিতর্ক চলে। ভোরের দিকে হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে ভোট নেয়া হলো। আমি নির্বাচিত হই। আমি এখানে সদস্য হবার পর দু' মাসও কাটে নি, সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ আমি তখন পর্যন্ত পুরোপুরি বুঝে উঠতেও পারি নি।

কি ঘটেছিল তা আমি পরে জানতে পারি। চিত্রশিল্পীরা ছিল পার্টি-সদস্য। ক্লাবের লেখকরা ওদেরকে নেতৃত্বের স্থান থেকে হটিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার অজান্তেসারে এবং আমার অনুমতি ব্যতিরেকে একজন নিগ্রোকে তারা পার্টি-সদস্যদের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ওরা জানতো যে, এমন একজন লোক যে, বৃহত্তম একক সংখ্যালঘু গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করে তাকে ভোট দিতে অস্বীকার করা কম্যুনিস্টদের পক্ষে কঠিন হবে, তাছাড়া নিগ্রোদের সমঅধিকার দেয়া ছিল কম্যুনিস্টদের একটি প্রধান মতবাদ।

আমি কম্যুনিস্ট না হওয়া সত্ত্বেও দোদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাকে পার্টির একটি অগ্রণী সাংস্কৃতিক সংস্থার নেতার স্থানে বসিয়ে দেয়। আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করি কিন্তু সদস্যরা আমার কথা কানেই নিলো না। তারা কি আন্তরিক আমি বুঝতে পারি না। আমার ভয় হয় যে, পরাজিত সচিব, যিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গ, একজন নিগ্রোর কাছে হেরে যাবার জন্য ক্ষুব্ধ বোধ করবেন, কিন্তু তাঁর আচরণে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

ক্লাবের নেতা হিসেবে আমি তাড়াতাড়ি ঝগড়ার কারণটা আবিষ্কার করি। কম্যুনিস্টরা ক্লাবের মধ্যে গোপনে একটা ক্ষুদ্র চক্র গড়ে তুলেছিল। ক্লাবের অল্প কয়েকজন সদস্য কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচ্ছন্ন সদস্য ছিল। তারা ক্লাবের বাইরে মিলিত হয়ে ক্লাব কি নীতিমালা অনুসরণ করবে তা নির্ধারিত করতো। তারপর প্রকাশ্য সভায় যখন তারা তাদের প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করতো তখন তাদের যুক্তিতর্কের নিছক জোরেই পার্টির বাইরের সদস্যরা তাদের পক্ষে ভোট দানে প্ররোচিত হতো। যা দ্বন্দ্বের জটিলতার

মূলে ছিল তা হলো এই যে, স্থানীয় পার্টি কর্তৃপক্ষ ক্ষুদ্র চক্রটির মাধ্যমে ক্লাবের ওপর বড় বেশি চাপ দিতো, তার কাছ থেকে বেশি বেশি দাবি করতো, আর পার্টি বহির্ভূত সদস্যরা এতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হতো। যেমন, চক্রটি দাবি জানালো যে, কম্যুনিস্ট পার্টির সরকারি সাময়িকী ডেইলি ওয়ার্কার ও নিউ মাসেস বিক্রির জন্য তাদের সব সভায় রাখতে হবে। পার্টি বহির্ভূত সদস্যরা বললো যে এটা করলে ক্লাবের সদস্যপদ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, যারা ইতিমধ্যেই সাম্যবাদে বিশ্বাস করে শুধু তারাই ক্লাবের সদস্য হবে।

স্থানীয় পার্টি কর্মকর্তাদের কাছে থেকে অর্থ, বক্তা এবং পোস্টার শিল্পীদের জন্য এতো বেশি দাবি আসতে থাকে যে, লেফট ফ্রন্ট-এর প্রকাশনা বিপন্ন হয়ে পড়ে। লেফট ফ্রন্ট-এ তাদের লেখা প্রকাশিত হবে এই আশায় অনেক তরুণ লেখক ক্লাবে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র চক্রটির মাধ্যমে কম্যুনিস্ট পার্টি খবর পাঠালো যে পত্রিকাটি তুলে দিতে হবে। লেখকরা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলো। এটা দেখা হলো পার্টির প্রতি তৈরি আচরণ রূপে।

আমি পার্টির সদস্যদের সঙ্গে ক্লাবের জন্য আরো উদার নীতি অবলম্বনের পক্ষে ওকালতি করি। অনুভূতি হিংস্র ও তিক্ত হয়ে ওঠে। তারপর চূড়ান্ত বোঝাপড়ার ক্ষণ এসে উপস্থিত হয়। আমাকে জানানো হলো আমি যদি ক্লাবের সেক্রেটারি থাকতে চাই তাহলে আমাকে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে হবে। আমি জানালাম যে, আমি এমন একটি নীতি অনুসরণ করতে চাই যা লেখক ও শিল্পীদের বিকাশের সুযোগ দেবে। আমার এই নীতি অনুমোদিত হলো। আমি সদস্যপদের কার্ড সই করে দিলাম।

ক্লাবের নেতা হিসবে ঝগড়া-দ্বন্দ্বকে সীমার মধ্যে রাখার জন্য আমি অনেকগুলি আপোসরফা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। যেমন– ডেইলি ওয়ার্কার-এর বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হলো, কিন্তু নিউ মাসেস-এর বিক্রি অব্যাহত থাকলো। আমি গ্রহণ করি মধ্যবর্তী অবস্থান। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য চক্র আমার ওপর চাপ দেয়, আর সদস্যরা আমার ওপর চাপ দেয় আমি যেন লেফট ফ্রন্ট চালিয়ে যাই, যাকে কম্যুনিস্ট পার্টি অর্থহীন বলে চিহ্নিত করেছে। সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করে আমি কাউকেই খুশি করতে পারি না। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্লাবের সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় বিল জমা হতে থাকে। ভাড়া বাকি পড়ে। সর্বপ্রকার ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি চাই যে, ক্লাবটা টিকে থাকুক। আমার অনুভূতি ছিল তীব্রভাবে ব্যক্তিগত। এই ক্লাব ছিল আধুনিক জগতের সঙ্গে আমার প্রথম সংযোগ স্থল। আমি এতোকাল এতো চূড়ান্ত বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছিলাম যে, ক্লাব আমার এমন একটা চাহিদা পূরণ করে যা ক্লাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠা শ্বেতাঙ্গ সদস্যরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। আমি স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যে পথ খুঁজে পাবার জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলাম তারা তো তা স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে গিয়েছিল।

এক রাতে একটি ইহুদি ছেলে আমাদের সভায় এসে যোগ দেয়, নিজের পরিচয়

দেয় ডেট্রয়েটের কমরেড ইয়ং বলে। সে আমাদের বলে যে সে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য এবং ডেট্রয়েটের জন্য রীড ক্লাবেরও একজন সদস্য। সে শিকাগোতে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেঁটে খাটো, বদ্ধভাবাপন্ন, কালো চুলের, বেশ লেখাপড়া করা একটি ছেলে, ছোট ঈষৎ ঝুলে পড়া, চোখ দুটি ফোলা ফোলা। কম্যুনিস্ট পার্টির দাবি-দাওয়া পূরণে আমাদের ঘাটতি থাকায় আমরা তাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু আমি ইয়ং-এর ব্যক্তিত্ব ঠিকমতো বুঝতে পারি না। একটা সরল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেও সে অনদিকে তাকিয়ে থাকে, তোৎতালে তোৎলাতে একটা তালগোলপাকানো উত্তর দেয়। আমি স্থির করি যে, তার সম্পর্কে তথ্য জানাতে কম্যুনিস্ট পার্টিকে বলবো, সেই সঙ্গে আমি তাকে আমাদের ক্লাবের সদস্যপদ প্রদানের জন্য তার নাম করি। আমার মনে হয় ও ঠিকই আছে। শুধু এক উদ্ভট প্রকৃতির শিল্পী...

সভার পর কমরেড ইয়ং একটা সমস্যা নিয়ে আমার মুখোমুখি হলো। সে আমাকে বললো যে, তার কোনো টাকা-পয়সা নেই। সে ক্লাব ভবনে রাত্রিযাপনের জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করে। আমি তাকে বিশ্বস্ত বিবেচনা করে অনুমতি দিই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইয়ং সংস্থার একজন অত্যন্ত উৎসাহী সদস্য হয়ে ওঠে এবং সকলের প্রশংসা অর্জন করে। তার ছবি– যা আমি বুঝতাম না– আমাদের সেরা চিত্রশিল্পীদের মনে দাগ কাটে। কম্যুনিস্ট পার্টির দফতর থেকে ইয়ং সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট আসে না, কিন্তু তাকে একজন বিবেকবান কর্মী বলে মনে হওয়ায় আমি ওই রিপোর্ট না আসাকে বিশেষ গুরুত্ব দিই না।

একদিন রাতের সভায় ইয়ং এজেণ্ডাতে তার নাম দেবার জন্য আমাকে বলে। তার বক্তব্য পেশের সময় এলে ইয়ং উঠে দাঁড়ায় এবং সোয়ান নামক আমাদের একজন তরুণ চিত্রশিল্পীর বিরুদ্ধে এক হিংস্র ও তিক্ত রাজনৈতিক আক্রমণ পরিচালনা করে। সোয়ান ছিল ক্লাবের ইতিহাসে আমাদের ক্লাবের সেরা চিত্রশিল্পীদের একজন। আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। সে সোয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো, সোয়ান শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে সুবিধাবাদী, পুলিশের দালাল এবং ট্রটস্কিপন্থী। আমি বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়ে প্রস্তাব করি যে ইয়ং-এর বক্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কার্যকরী সংসদে জানানো হোক। সোয়ান সঙ্গতভাবেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললো যে, প্রকাশ্য সভায় তাকে আক্রমণ করা হয়েছে, সে-ও প্রকাশ্য সভায় তার উত্তর দেবে।

ভোট নেয়া হয়। সোয়ানকে বলার অনুমতি দেয়া হলে সে ইয়ং-এর হঠকারী অভিযোগসমূহ অসত্য বলে প্রমাণ করে, কিন্তু ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যদের বিভ্রান্তি দূর হয় না, তারা সোয়ানকে বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারে না। আমরা সবাই সোয়ানকে পছন্দ করতাম, সে কোনো অসদাচরণের অপরাধে অপরাধী সেটা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আমরা পার্টিকে অসন্তুষ্ট করতে চাইলাম না। একটা বাকযুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে যে সব সদস্য পার্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে যতক্ষণ চুপ করেছিল তারা উঠে

দাঁড়িয়ে আমার কাছে দাবি জানালো যে, সোয়ানের বিরুদ্ধে আনীত ওই হাস্যকর অভিযোগসমূহ তুলে নিতে হবে। আমি আবারও প্রস্তাব করি যে, বিষয়টি কার্যকরী সংসদে রেফার করা হোক, আবারও আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। সভাটা তখন পার্টির উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সম্বিধান হয়ে উঠতে শুরু করে। ইয়ং একজন পার্টি-সমর্থক, কার্যকরী সংসদের অধিকাংশ হলো পার্টির সদস্য তাই তারা কার্যকরী সংসদের হাতে ইয়ং-এর আনীত অভিযোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দিতে শঙ্কা বোধ করে।

তিক্ত বিতর্কের মধ্য দিয়ে তিনটি সভা শেষ হয়। আমরা সভার ফাঁকে ফাঁকে ইয়ংকে বারবার জিজ্ঞাসা করি সোয়ানকে ওই রকম তীব্র নিন্দাজ্ঞাপক ভাষায় আক্রমণ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাকে কে প্রদান করেছে? ইয়ং আবছা ইঙ্গিত দেয় যে সে কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্দেশে এটা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে এটা দাগ কাটে। অত উর্ধে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংস্থার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কি অধিকার আছে আমাদের? সোয়ানের প্রতি আমরা সহানুভূতি থাকলেও পাছে আমার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয় সেই ভয়ে আমি পক্ষাবলম্বন করে কিছু বলি না।

সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল আমার কাছে জানতে চায় সোয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা ছিল কিনা। আমি এতো আহত ও অপমানিত বোধ করি যে, আমি ইয়ং-এর সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের কথা অস্বীকার করি। এই প্রহসনকে শেষ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ইয়ংকে পাকড়াও করি এবং দাবি করি যে, তাকে কে এই ক্ষমতা দিয়েছে তা আমাকে জানতে হবে।

সে বললো, ক্লাবকে বিশ্বাসঘাতক মুক্ত করতে তাকে বলা হয়েছে।

আমি বললাম, কিন্তু সোয়ান তো বিশ্বাসঘাতক নয়।

তার চোখ বিস্ফারিত হয়, তার মুখ আবেগে থরথর করে কাঁপে, সে বলে, আমাদের শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে।

তার বৈপ্লবিক উদ্দীপনা আমি মেনে নিই কিন্তু আমার মনে হয় ওই উদ্দীপনা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল আমাকে জানিয়ে দেয় যে সোয়ানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রত্যাহৃত না হলে তারা একযোগে সবাই পদত্যাগ করবে। আমি ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। সোয়ানকে কেন শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তা জানতে চেয়ে আমি কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে চিঠি লিখি। সেখান থেকে আমাকে জানানো হলো যে, ও রকম কোনো নির্দেশ দেয়া হয় নি।

তাহলে ইয়ং-এর উদ্দেশ্যটা কি? তাকে কে পেছন থেকে পরিচালিত করছে? অবশেষে আমি ক্লাবের কাছে মিনতি জানাই, বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য তারা যেন আমাকে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেয়। তীব্র বিতর্কের পর আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

একদিন রাতে আমাদের মধ্য থেকে দশজন পার্টির এক নেতার দফতরে মিলিত হই। সেখানে ইয়ং সোয়ানের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ পুনর্বার উত্থাপন করবে, আমরা তা শুনবো। পার্টি নেতাকে উদাসীন মনে হয়, আবার তিনি যেন বেশ মজাও পাচ্ছেন মনে হয়। তিনি ইয়ংকে শুরু করতে বললেন। ইয়ং একগাদা কাগজ খুলে রাজনৈতিক অপরাধের এক দীর্ঘ তালিকা উচ্চ কণ্ঠে পড়ে যায়, যা ছিল বিদ্বেষপূর্ণতার দিক থেকে আগের চাইতেও তীব্র। একটা স্বজ্ঞা আমাকে সতর্ক করে দেয়, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে, কিন্তু ঠিক কি তা আমি ধরতে পারলাম না। আমি স্থির চোখে ইয়ং-এর দিকে তাকিয়ে থাকি, আমি অনুভব করি যে ইয়ং একটা মারাত্মক ভুল করছে, কিন্তু তাকে আমি ভয়ও পাই, কারণ তার নিজের কথা অনুযায়ী উচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তার এ কাজ অনুমোদন করেছে। ইয়ং-এর কথা শেষ হলে পার্টি লিডার তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি এই অভিযোগ আমাকে পড়ে দেখতে দেবেন?

ইয়ং অভিযোগপত্রটি তার হাতে দিয়ে বললো, অবশ্যই। আপনি এটা রেখে দিতে পারেন। আমার কাছে আরো দশটা কার্বন কপি আছে।

নেতা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এতোগুলি কার্বন কপি কেন করেছেন?

ইয়ং বললো, এগুলি কেউ চুরি করুক আমি তা চাই নি।

সোয়ান বললো, আমার বিরুদ্ধে আনা এই লোকটির অভিযোগগুলি যদি কেউ গুরুত্বের সঙ্গে নেয় তাহলে আমি পদত্যাগ করবো এবং জনসমক্ষে ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবো।

ইয়ং চিৎকার করে উঠলো, দেখছেন তো! ও পুলিশের লোক!

আমার কাছে ব্যাপারটা ভীষণ বিতৃষ্ণাকর মনে হয়। অবশেষে পার্টি নেতা কথা দিলেন যে, তিনি অভিযোগগুলি আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখবেন এবং সোয়ানকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে কিংবা হবে না সে সম্পর্কে তাঁর রায় দেবেন। সভা শেষ হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে কিন্তু ঠিক কোথায় তা আমি ধরতে পারছি না।

একদিন বিকালে ইয়ং-এর সঙ্গে একটা দীর্ঘ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি ক্লাবে যাই। সেখানে পৌঁছে দেখি যে ইয়ং নেই। পরদিনও সে অনুপস্থিত থাকে। এক সপ্তাহ ধরে আমি তার ব্যর্থ খোঁজ করি। ছেলেটার হলো কি? কাছে-দূরে অনেক জায়গায় আমি তার সম্পর্কে খোঁজ নিই কিন্তু কারো কাছ থেকে তার কোনো খবর পাই না। এর মধ্যে ক্লাবের সদস্যরা ইয়ং কোথায় আমার কাছে জানতে চায়। আমি যখন বলি যে আমি জানি না তখন তারা আমার কথা বিশ্বাস করে না। ও কি অসুস্থ? ওকে কি পুলিশ গ্রেফতার করেছে? একজন পরামর্শ দিলো, ইয়ং-এর বাক্স-প্যাটরা এখনো ক্লাবের পেছন ঘরে পড়ে আছে, সেখানে তল্লাশি করে দেখা হোক।

একদিন অপরাহ্নে আমি আর কমরেড গ্রিম চুপিচুপি ক্লাবের সদর দফতরে গিয়ে

ইয়ং-এর বাক্স-প্যাটরা খুলে দেখি। যা দেখলাম তা আমাদের বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করে দেয়। সর্বপ্রথম, বিশগজ লম্বা একটা কাগজের ফালি দেখি আমরা, এক পাতার সঙ্গে আরেক পাতা জুড়ে দেয়া হয়েছে, এখানে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ড্রিগ-এর মাধ্যমে মানবজাতির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম পাতার শিরোনাম : মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার একটি সচিত্র রেকর্ড।

আমি বললাম, এ তো ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যাপার।

গ্রিম বললো, ও প্রচুর পড়াশোনা করেছে।

আমরা দেখলাম হাতে লেখা কয়েকটি দীর্ঘ গবেষণামূলক নিবন্ধ, কিছু রাজনীতি নিয়ে। অবশেষে আমরা একটা চিঠি পেলাম, সেখানে উত্তর দেবার জন্য ছেট্টোয়েটের একটা ঠিকানা দেয়া আছে। আমি তরিৎ সেখানে চিঠি লিখে আমাদের শ্রদ্ধেয় সদস্যের খবর জানতে চাই। কয়েকদিন পর একটা চিঠি আসে—তার অংশ বিশেষ ছিল এই রকম

:

প্রিয় মহোদয়

আপনাদের... তারিখের উত্তরে আমরা জানাচ্ছি যে মিস্টার ইয়ং প্রতিষ্ঠানের একজন রোগী, কয়েক মাস আগে এখান থেকে পালিয়ে যান। তিনি ধরা পড়েছেন এবং মানসিক চিকিৎসার জন্য তাকে আমাদের এখানে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমি বজ্রাহত হয়ে যাই। এ কি সত্য? নিঃসন্দেহে সত্য। তাহলে কি রকম ক্লাব আমরা পরিচালনা করছি যেখানে একটি উন্মাদ সহজেই ঢুকে পড়ে সেটা চালাতে আমাদের সাহায্য করতে পারে? আমরা নিজেরা কি এতোটাই পাগল যে, একজন পাগল দেখলে চিনতে পারি না? আমি ক্লাবের কয়েকজন সর্বোচ্চ বিশ্বস্ত সদস্যদের একটা সভা ডেকে ব্যাপারটা তাদের জানাই। আমরা শপথ নিই যে, এটা আমরা গোপন রাখবো এবং বিষয়টা আমরা চাপা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সবাই স্বীকার করি যে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর ভুল করেছি।

কিন্তু ক্লাবের সদস্যদের প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখার কোনো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। সোয়ান সভার পর সভায় বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

কমরেড ইয়ং কোথায়? তিনি কি অসুস্থ? তিনি কি মারা গেছেন? তিনি কি কারাগারে? কম্যুনিস্ট পার্টি কি তাকে ক্লাব থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়েছেন?

এই সব প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু মিছে কথাই বলতে পারতাম : কমরেড ইয়ং-এর কাছ থেকে আমি কোনো খবর পাই নি। কোনো কিছু জানলেই আমি ক্লাবকে সঙ্গে সঙ্গে তা জানাবো।

ইতিমধ্যে সোয়ানের বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ বাতিল করার জন্য আমি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করি। আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমি সোয়ানের কাছে ক্ষমা চাই, তবে শিকাগো জন রীড ক্লাবের নেতা হিসেবে আমি খুব আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং একজন সংযমী কম্যুনিস্ট হয়ে উঠে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

আমি ব্যাপকভাবে বিপ্লবী সাহিত্য পড়েছিলাম, বহু কম্যুনিস্টকে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ এবং তারা দৈনন্দিন যে বিপদের মুখোমুখি হয় এবং যে রকম ত্যাগ স্বীকার করে তা আমি দেখেছিলাম। আমি যে জীবনীমূলক রেখাচিত্র আঁকার পরিকল্পনা করেছিলাম এবার তার জন্য সময় দিতে চাই। আমি নিগ্রো কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে যতটা জানতে চাই ততোটা জানতাম না। অনেক সময় আমি যখন তাদের অনুভূতি, তাদের কাজ, তাদের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করি তখন তারা স্বল্পবাক হয়ে পড়ে।

আমার প্রতি আগ্রহের জন্য আমি ওই সব রূঢ় প্রত্যাখ্যানের কথা ভুলে যাই। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার প্রকল্পটি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেই একটা অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

জন রীড ক্লাবের কম্যুনিষ্ট ক্ষুদ্র চক্রটি আমাকে আমার পার্টি কেন্দ্র– তাকে বলা হতো ইউনিট– তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললো, তারা যেন আমাকে ক্লাবের সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত থাকতে দেয়। পার্টি ইউনিট আমাকে নির্দেশ দিলো, আমার কাজকর্ম, লেখালেখি, সাংগঠনিক কাজ ও বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে ইউনিটকে রিপোর্ট দিতে হবে। আমি রাজি হই এবং একটা রিপোর্ট দিই।

ইউনিটের সদস্যভুক্ত হওয়া ছিল সব কমিউনিস্টের জন্য বাধ্যতামূলক। ইউনিটই হলো পার্টি সংগঠনের মৌলিক কাঠামো। ইউনিট মিটিং সংঘটিত হতো নির্দিষ্ট কয়েকটি রাতে, পুলিশী তল্লাশির আশঙ্কায় এটা গোপন রাখা হতো। ওই সব সভায় দেশদ্রোহিতামূলক কিছুই হতো না, কিন্তু একবার কম্যুনিষ্ট হলেই সে জানে যে, পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তার কোনো অন্যায় করার প্রয়োজন পড়ে না। এসব সভায় সদস্যরা তাদের চাঁদা দেয়, পার্টির জন্য কি করতে হবে তা জেনে নেয় এবং বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে পার্টির ব্যাখ্যায় প্রশিক্ষণ লাভ করে।

আমি আমার প্রথম ইউনিট মিটিং-এর যেটা অনুষ্ঠিত হয় সাউথ সাইডের কৃষ্ণ এলাকায় এবং নিম্নো সংগঠকের কাছে নিজের পরিচয় দিই।

তিনি সহাস্যমুখে বললেন, স্বাগতম কমরেড। আমাদের মাঝে একজন লেখককে পেয়ে আমরা আনন্দিত।

আমি বললাম, আমি তেমন কিছু লেখক নই।

সভা শুরু হয়। জনা বিশেক নিগ্রো সমবেত হয়েছে। আমার রিপোর্ট পেশ করার

সময় উপস্থিত হলে আমি আমার টোকাগুলি বের করে আমি কিভাবে পার্টিতে যোগ দিই তা ওদের জানাই, আমার কি কি ছুটকো লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার কথা বলি, জন রীড ক্লাবে কি কি দায়িত্ব পালন করতে হয় তার কথা ওদের অবহিত করি। আমি শেষ করে তাদের মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করি। আমি নীরবতা বিরাজ করতে দেখি। আমি চারিদিকে তাকাই। বেশিরভাগ কমরেডকেই মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখি। তারপর এক নিগ্রো রমণীর মুখে কুঞ্চিত হাসি দেখে আমি বিস্মিত হই। কয়েক মিনিট কেটে যায়। নিগ্রো রমণীটি মাথা তুলে সংগঠকের দিকে তাকায়। সংগঠক একটা উদাত্ত হাসি চাপা দেয়। তারপর রমণী অপ্রতিরোধ্য হাসিতে ফেটে পড়ে, সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে। আমি বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকি। আমি কি কৌতুকের কিছু বলেছি?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

এবার খিলখিল হাসি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ইউনিট সংগঠক তার হাতের পেন্সিল নিয়ে খেলছিলেন। তিনি এবার মুখ তুলে বললেন, ঠিক আছে, কমরেড। আমাদের পার্টিতে একজন লেখককে পেয়ে আমরা আনন্দিত।

আরো চাপা হাসির তরঙ্গ বয়ে যায়। আরেকটু বুদ্ধিমান কয়েকজন ভাবলেশহীন মুখ করে বসে থাকে। কি রকম লোক এরা? আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট পেশ করলাম, আর এরা সবাই খিলখিল করে হাসছে।

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি জানি যে, এটা মৌলিক নয়, গুরুত্বপূর্ণও নয়, কিন্তু আমার মনে হয় সময় পেলে আমি হয়তো কিছু অবদান রাখতে পারবো।

কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠক বললেন, আমরা জানি আপনি তা পারবেন, কমরেড।

তাঁর কণ্ঠস্বরে দক্ষিণের একজন শ্বেতাঙ্গের চাইতেও বেশি মুরুব্বীয়ানা ও পিঠ চাপড়ানোর ভাব ফুটে ওঠে। আমি রেগে যাই। আমি ভেবেছিলাম যে এই লোকগুলিকে আমি চিনি, কিন্তু স্পষ্টতই আমি এদের চিনি না। ওদের দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবেলা করতে আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমার মধ্যে সতর্কতার বোধ জেগে ওঠে। আমি অন্যদের সঙ্গে আগে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিই। বিভ্রান্ত চিত্তে আমি সভা ত্যাগ করি।

পরবর্তী কয়েক দিনে সতর্ক প্রশ্ন করে করে আমি আবিষ্কার করি যে কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টদের কাছে আমাকে একটা চমৎকার উপাদান বলে মনে হয়। আমি অবাক হয়ে শুনি যে, আমাকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, যে আমি মাত্র গ্রামার স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। একজন বুদ্ধিজীবী কি? আমাকে যে অর্থে বুদ্ধিজীবী বলা হলো আমি সে অর্থে কথাটিকে কখনো ব্যবহৃত হতে শুনি নি। আমার আশঙ্কা হয়, আমি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর নই এই অজুহাতে ওরা হয়তো আমাকে বাতিল করে দেবে। আমি ভেবেছিলাম, চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে ওরা বোধহয় আমাকে কিছুকাল

পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রাখবে। আমি ভেবেছিলাম, ওরা বোধহয় বলবে যে, আমার সম্পর্কে ওদের আরও খোঁজখবর নিতে হবে। কিন্তু ওরা শুধু হেসে উঠেছিল। এবং এখন আমি বুঝতে পারি কেন এতো কম সংখ্যক স্পর্শকাতর ও অনুভূতিশীল নিগ্রো আমার মতো এদের এতো কাছে আসে।

আমি হতাশার সঙ্গে শুনি যে, আমার ইউনিটের কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টরা আমার পালিশ করা জুতা, আমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শার্ট আর টাই নিয়ে মন্তব্য করেছে। সর্বোপরি, আমার কথা বলার ভঙ্গি ওদের কাছে মনে হয় একটা অচেনা বিজাতীয় জিনিস। এক নিগ্রো কমরেড মন্তব্য করেছে, ও বই-এর মতো কথা বলে।

এবং ওটা আমাকে চিরদিনের জন্য বুর্জোয়া বলে দোষী সাব্যস্ত করে। নিগ্রো কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আমি যত জানি আমি ততো দেখতে পাই যে, তারা বিপ্লবপরায়ণই নয়, তারা আঘাত দিতে চায় না। আসলে তারা কিছুই জানে না, আর কিছুই শিখতে চায় না। তারা মনে করে যে, সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়ে গেছে, আর এখন কেউ যদি নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কিংবা পুরনো প্রশ্নের ভিন্ন উত্তর দেবার চেষ্টা করে তাহলে তা হবে বিপদজনক। কাউকে লেখক বললেই একজন কৃষ্ণাঙ্গ শিকাগো কম্যুনিস্ট মনে করে যে লোকটা ভুল পথে গেছে।

আমি অবিরাম করি যে, কম্যুনিস্ট পার্টির অনুমোদন বহির্ভূত কোনো বই পড়তে দেখা গেলে তা খুব প্রাজ্ঞ ব্যাপার হবে না। একবার আমাকে আমার হাতের একটা বই দেখাতে বলা হয়। কমরেড বইটা দেখে তার মাথা নাড়লেন, তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা পড়ছেন কেন?

আমি বললাম, এটা বেশ ইন্টারেস্টিং।

বইটা ফেরৎ দিয়ে তিনি বললেন, বুর্জোয়া বইপত্র পড়লে আপনি শুধু বিভ্রান্ত হবেন, কমরেড।

আমি বললাম, আমার মনে হয় আপনি খুব নিশ্চিত যে, আমি সহজেই বিভ্রান্ত হই।

তিনি স্বর গলা নামিয়ে গোপনীয় কিছু বলার মতো করে বললেন, জানেন, বুর্জোয়াদের বইপত্র পড়ে অনেক কম্যুনিস্ট ভুল করে বসে। সোভিয়েতে ওই রকম লোকদের নিয়ে ওরা বেশ অসুবিধায় পড়েছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, লেনিন কি বুর্জোয়া বইপত্র পড়েন নি?

তিনি দ্রুত উত্তর দিলেন, কিন্তু আপনি লেনিন নন।

আমি বললাম, কিছু বই কি কারো কারো পড়ার জন্য সংরক্ষিত থাকে, অন্যরা যা পড়তে পারবে না?

তিনি বললেন, কমরেড, আপনি বুঝতে পারছেন না।

যাদের সঙ্গে আমি আমার নিয়তিকে জড়িয়ে ছিলাম তাদের আর আমার মধ্যে একটা অদৃশ্য দেয়াল ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। তো, আমি ওদের শিখিয়ে দেবো যে যারা

বই লেখে তারা সবাই ওদের শত্রু নয়। যাদের কাছে তারা পৌঁছতে পারে না আমি তাদের কাছে ওদের জীবনের অর্থ জানিয়ে দেবো। তখন নিশ্চয়ই, আমার উপদেশের প্রতি তাদের আস্থা জন্মাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাদের বিরোধের ব্যাপারটা আমি উড়িয়ে দিই। আমার মনে হয় ওটা আমার ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

আমার সামনে যে সমস্যা তা আমার মনে হয় অনেক বেশি সরল। যে সব লোক এতোবার ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে তাদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণকারী বাড়িমালকেই তারা ভয় পায়, আমাকে ওইসব লোকের আস্থা অর্জন করতে হবে। তবু আমার মনের গভীরে আমি তাদের জন্যে অজ্ঞানতাকে ভয় পাই। পার্টির কাজ করার সময় রস নামের এক নিগ্রো কম্যুনিস্ট-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়। দাঙ্গায় উস্কানি দেয়ার অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আমি আমার জীবনীমূলক রেখাচিত্রমালায় তাকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিই। তার বিচারকার্য মুলতবি ছিল। সে তার পক্ষে সমর্থন সাগ্রহ ও সংগঠিত করছিল। রস ছিল একজন প্রতিনিধিত্বশীল রাজপথের আন্দোলনকারী। সে জন্মগ্রহণ করেছিল দক্ষিণে, বসবাস করার জন্য সে উত্তরে চলে আসে। তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় নগরীতে আসা কৃষকের ভুল আশা ও আশাভঙ্গের চিত্র। সন্দিগ্ধচিত্ত কিন্তু আগ্রাসী, দুটি সমাজের মধ্যে অন্ধের মতো যুদ্ধরত সে ছিল নানা দুর্বলতা ও গুণাবলীর একটা পুঁটলি, একটা মানুষ যে একটা সংস্কৃতির প্রান্তসীমায় বাস করছে। আমার মনে হয় আমি যদি তার কাহিনীটা জানি তাহলে গ্রামীণ মানুষরা নাগরিক পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেবার ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয় আমি তা অন্যদের বলতে পারবো। তার জীবন তার নিজের কাছে যতটা বোধগম্য আমি তা অন্যদের কাছে অধিকতর বোধগম্য করে তুলতে পারবো। তার বিশৃঙ্খল দিনগুলি আমি পুনরুদ্ধার করবো এবং তা এমনভাবে বিন্যস্ত করবো যেন মানুষ তা ধরতে পারে, দেখতে পারে, বুঝতে পারে এবং মেনে নিতে পারে।

আমি রসের কাছে গিয়ে তাকে আমার পরিকল্পনার কথা বলি। সে রাজি হয়। সে আমাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। তার ইহুদি স্ত্রী, বাচ্চা ছেলে এবং বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা রসের সঙ্গে কথা বলি, আমি যা করতে চাইছি তা বুঝিয়ে বলি, তাকে তর্ক করে দিয়ে বলি যে, সে চায় না এমন কোনো কথা যেন প্রকাশ না করে।

আমি বললাম, যে সব জিনিস তোমাকে কম্যুনিস্ট বানিয়েছে আমি তার কথা শুনতে চাই।

ঠিক হলো যে আমি প্রতিদিন সকালে ওর ওখানে যাবো এবং দু'ঘন্টা নোট নেবো। আমি মনে মনে বলি, এই সব সামান্য মানুষদের হৃদয়ে যে আশার স্বপ্ন, ভয়, প্রেম এবং ঘৃণা জেগে রয়েছে অবশেষে আমি তা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবো। বিশাল মানবজাতির জীবনের সঙ্গে আমি এদের জীবনকে মিশিয়ে দেবো। আমি জানতাম যে, সেটা করতে

পারবো। আমার জীবন আমাকে তা করার জন্য প্রস্তুত করেছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে আমি রসের জীবন সম্পর্কে নোট নিচ্ছি। তারপর থেকে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করে। এক দীর্ঘদিন বৃক্ষাদ কম্যুনিস্ট একদিন রাতে আমার বাড়ি এসে আমাকে রাস্তায় ডেকে নিয়ে যায়, আমার সঙ্গে গোপনে সে কিছু কথা বলতে চায়। আমার সম্পর্কে সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করলো তাতে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি।

সে গম্ভীর মুখে বললো, বুদ্ধিজীবীরা পার্টিতে ভালভাবে খাপ খায় না, রাইট।

আমি আপত্তি করি, কিন্তু আমি তো বুদ্ধিজীবী নই। জীবিকার জন্য আমি রাস্তা ঝাঁড় দিই।

অতি সম্প্রতি ত্রাণ কর্মকর্তারা সপ্তাহে তের ডলার মজুরিতে আমাকে সড়ক ঝাঁড় দেবার কাজ দিয়েছিল।

তাতে কিছু এসে যায় না। অতীতে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আমাদের যে ঝামেলা হয়েছে তার রেকর্ড আছে আমাদের। অনুমান করা হয় যে, তাদের মাত্র পনেরো শতাংশ পার্টিতে থাকে।

আমি তাকে বলি, আপনি যখন আমাকে বুদ্ধিজীবী বলবেনই তখন আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন তারা পার্টি ছেড়ে চলে যায়?

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা স্বেচ্ছায় করে পড়ে।

তো, আমি পড়ছি না।

তিনি গম্ভীর মুখে ইঙ্গিত দিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহিষ্কার করা হয়।

আমি জিজ্ঞাস করলাম, কি জন্য?

পার্টির নীতিমালার সাধারণ বিরোধিতার জন্য।

কিন্তু আমি তো পার্টির কোনো নীতির বিরোধিতা করছি না।

কিন্তু আপনাকে তার প্রমাণ দিতে হবে।

মানে?

আপনাকে আপনার বিপ্লবী আনুগত্য প্রমাণ করতে হবে।

আমার লেখার মধ্যে দিয়ে আমি তো তাই করার চেষ্টা করছি।

ওটা করার পথ তা নয়। আপনাকে কাজ করতে হবে।

কিভাবে?

মানুষকে পরীক্ষা করার পার্টির একটা পদ্ধতি আছে।

তো বলুন। কি সেই পদ্ধতি?

পুলিশ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ওরা আমাকে নিয়ে কখনো কোনো ঝামেলা করে নি।

তিনি একজন স্থানীয় জঙ্গী কম্যুনিস্টের উল্লেখ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইভান্সকে চেনেন?

হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ও যে আহত হয়েছে তা লক্ষ্য করেছিলেন?

হ্যাঁ, তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল।

একটা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিশের আঘাতে ও আহত হয়। এই হলো বিপ্লবী আনুগত্যের প্রমাণ।

তাহলে আমার আন্তরিকতা প্রমাণ করার জন্য কি আমাকে আমার মাথায় পুলিশের লাঠির বাড়ি খেতে হবে?

আমি সে রকম কিছু বলছি না, আমি শুধু ব্যাখ্যা করছি।

আন্তরিকতা প্রমাণের একটা আদিম পন্থা এটা।

এটা একটা বাস্তবসম্মত পন্থা।

ধরুন, পুলিশের আঘাতে আমার মস্তিষ্কের প্রচণ্ড ক্ষতি হলো, আমি তারপর পাগল হয়ে গেলাম? আমি কি তখন লিখতে পারবো? আমি কি প্রমাণিত করলাম?

তিনি উত্তর না দিয়ে তার মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক বুদ্ধিজীবীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, গুড গড। আপনি কী বলছেন তাকি আপনি জানেন? আপনি রাশিয়ায় নেই। আপনি শিকাগোর একটা ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার কথা শুনে মনে হয় আপনি একটা স্বপ্ন-কল্পনার জগতে বিচরণ করছেন।

তিনি কিছু বললেন না। রসের জীবন সম্পর্কে আমি যেসব নোট নিচ্ছিলাম তা নিয়ে যে স্থানীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, আমার উদ্দেশ্য নিয়ে যে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল, আমি তা জানতাম না। আমার হঠকারি কথাবার্তা আমার পক্ষে যায় না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ট্রটস্কির কথা শুনেছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

তার কি হয়েছিল জানেন?

তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হন।

কেন তা জানেন?

সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ট্রটস্কির বিরোধের বিশদ খবরাখবর আমি রাখি নি। আমার রাজনৈতিক অজ্ঞতা গোপন রাখার লক্ষ্যে আমি থেমে থেমে বলি, মনে হয় একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, ট্রটস্কি পার্টির বিরুদ্ধে সংগঠন করে ওই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করেন। তিনি অধৈর্যভরে তীব্র কণ্ঠে বললেন, ট্রটস্কিকে বহিষ্কার করা হয় তাঁর প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য। আমি পরে জানতে পারি যে, আমার উত্তর সন্তোষজনক

হয় নি; গ্রহণযোগ্য তিক্ত টক্তি-বিরোধী নিন্দার ভাষায় আমি উত্তর দিই নি।

আমি বললাম, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি কখনো ট্রটস্কি পড়ি নি।

সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে তাঁর অবস্থান কি?

আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমি ট্রটস্কি পড়ি না।

আচ্ছা, আপনি যদি আমাকে ট্রটস্কি পড়তে দেখেন তাহলে আপনার কি মনে হবে?

আপনার ট্রটস্কি পড়ার কোনো দরকার নেই।

আপনার কি মনে হয় না যে, ট্রটস্কি পড়েও আমি তাকে অনুসরণ না করতে পারি?

তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, কমরেড, আপনি বুঝতে পারছেন না!

ওখানেই আমাদের কথোপকথনের ইতি ঘটে, কিন্তু কমরেড, আপনি বুঝতে পারছেন না, এই শব্দগুচ্ছ আমাকে এর পরও বহুবার শুনতে হয়েছে আমি যে ভুল ধ্যান-ধারণা পোষণ করছিলাম সে সম্পর্কে আমি আদৌ সচেতন ছিলাম না। আমি ট্রটস্কির কোনো বই-ই পড়ি নি, বরং তার উল্টোটাই ছিল সত্য। স্ট্যালিনের জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন পুস্তিকাটি আমার কল্পনাকে অধিকার করে নিয়েছিল।

বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায় স্ট্যালিন তা প্রদর্শন করেন। আমি এ গ্রন্থকে রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত অনুভূতিশীল বিবেচনা করি। বিভ্রান্ত ও পরাজিত জনগোষ্ঠিকে নতুনভাবে অবলোকন করার একটা দৃষ্টিকোণ এখানে উন্মোচিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল উন্নয়নের মধ্যে যে পদ্ধতিতে বহু পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠিকে একটা জাতীয় মাত্রায় ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে তা আমাকে মুগ্ধ করে। কম্যুনিস্টরা কিভাবে শতাব্দির পর শতাব্দি জারদের দ্বারা নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা জনগণের অস্ফুট আঞ্চলিক ভাষা শোনার জন্য মানুষের বাচনধ্বনি বিশেষজ্ঞদের সেখানে পাঠায় আমি শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তার বিবরণ পড়ি। আমি যখন পড়ি কিভাবে বাচনধ্বনি বিশেষজ্ঞরা ভাষাহীন মানুষদের একটা ভাষা দেয়, সংবাদপত্র এবং নানা প্রতিষ্ঠান দেয়, তখনই আমার মধ্যে আমার জীবনের প্রথম সর্বাত্মক আবেগগত অঙ্গীকার জন্ম নেয়। কিভাবে ওই সব বিস্মৃত জনগণকে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ধরে রাখতে উৎসাহিত করা হয়, কিভাবে তাদের প্রাচীন প্রথাসমূহের মধ্যে এমন অর্থ ও তৃপ্তি লাভ করতে উৎসাহিত করা হয় যা তথাকথিত উন্নততর জীবনধারার তুলনায় মোটেই কম গভীর নয়, আমি মুগ্ধ হয়ে এসব পড়ি। এবং আমি আপন মনে বিস্ময়োক্তি করে উঠি, আমেরিকায় নিগ্রোদের যেভাবে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করা হয় তার চাইতে কতো ভিন্ন রকম ছিল ওই পদ্ধতি।

তাহলে কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে আমি যে সতর্কবাণী পাই তার মানে কি? আমি নিগ্রো জীবনের বিশাল দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসযজ্ঞের কথা বলতে চাই, এই প্রত্যাখ্যাত মানুষদের মধ্যে যে প্রবল প্রগাঢ়তা লুকিয়ে আছে তা তুলে ধরতে চাই, মানুষ আর সূর্য আর পাহাড় আর সমুদ্রের মতো সুপ্রাচীন সেই সব নাটক যা কৃষ্ণ আমেরিকার

দারিদ্রের মধ্যে ঘটে চলেছে তার কথা বলতে চাই, আর এ জন্যই কি আমি একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি হয়ে উঠি? নিগ্রোদের দুঃখকষ্ট ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ব্যবধানের মধ্যে যে আত্মীয়তা বিরাজ করছে তা দেখানোর মধ্যে বিপদটা কোথায়?

আমি একদিন সকালে রসের বাড়িতে বসেছিলাম, তার স্ত্রী ও ছেলেও সেখানে ছিল। আমার হলুদ কাগজের পাতায় আমি দ্রুত বেগে গভীর মনোযোগ সহকারে লিখে চলছিলাম। এমন সময় দরজায় ঘন্টি বেজে ওঠে। রসের স্ত্রী দরজা খুলে দিলে এক ত্রিন নামক একজন কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্ট ঘরে ঢোকে। দীর্ঘদেহী, মৌন স্বভাবের চৌকো কাঁধ, সৈনিকের মতো ভাবভঙ্গি। আমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তিনি শক্তভাবে মাথা হেলালেন।

ত্রিন কাঠখোট্টাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি হচ্ছে?

রস তার কাছে আমার প্রকল্পের কথা ব্যাখ্যা করে বললো। আমি দেখলাম যে রসের কথা শুনতে শুনতে তার মুখে আধার ঘনিয়ে আসে। তিনি আসন গ্রহণ করেন না।

রসের স্ত্রী তাঁকে বসতে বলে কিন্তু ওর কথা তাঁর কানে যায় না।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব নোট দিয়ে আপনি কি করবেন?

আমি বললাম, আমি আশা করছি যে, এসব দিয়ে আমি কিছু গল্প তৈরি করতে পারবো।

ত্রিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি পার্টি সদস্যদের কি জিজ্ঞাস্য করছেন? সাধারণভাবে তাদের জীবনের কথা, এসব করার কথা কে আপনাকে বলেছে?

কেউ না। আমার নিজেরই এটার কথা মনে হয়েছে।

আপনি কি কখনো অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন?

আমি এক সময় রিপাবলিকান দলের সঙ্গে কাজ করেছি।

আমি বিপ্লবী সংগঠনের কথা বলছি।

নাঃ, কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

আপনি কি ধরনের কাজ করেন?

জীবিকার জন্য আমি রাস্তা ঝাঁড় দিই।

পড়াশোনা কতদূর করেছেন?

গ্রামার স্কুল শেষ করেছি।

আপনার কথা শুনে মনে হয় তার চাইতে বেশি পড়েছেন।

আমার শিক্ষা সম্পর্কে কেন আমি আপনাকে মিছে কথা বলবো?

তিনি সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি জানি না।

আমি বললাম, আমি বইপত্র পড়েছি। আমি স্বশিক্ষিত।

আপনি রসের অভিযোগপত্র সম্পর্কে জানেন?

হ্যাঁ।

তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, আমি জানি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলতে চাইছেন আপনি? গণ্ডগোলটা কোথায়?

এসব তথ্য আপনি কাকে দেখিয়েছেন?

এখন পর্যন্ত কাউকে দেখাই নি।

তিনি কেন আমাকে এসব প্রশ্ন করছেন? এসবের অর্থ কি? নির্বোধ সারল্যের সঙ্গে আমি মনে মনে ভাবি আমার জীবনীমূলক রেখা চিত্রের জন্য যে উনি বেশ ভাল একটা মডেল হবেন।

আমি বললাম, আমি এরপর আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে চাই।

তিনি কড়া গলায় বললেন, আমার এতে কোনো উৎসাহ নেই।

তাঁর আচরণ এতো কর্কশ ছিল যে, আমি আর জোর করলাম না।

তিনি রসকে পেছনের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি বসে থাকি, আমার মনে হয় আমি যেন কোনো অপরাধ করেছি। কয়েক মিনিট পর গ্রিন ফিরে আসেন, নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করেন, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

আমি রসকে জিজ্ঞাস করলাম, উনি নিজেকে কি ভাবেন?

রস জানালো, উনি কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য।

কিন্তু উনি এ রকম আচরণ করছেন কেন?

রস অস্বস্তির সঙ্গে বললো, উনি সব সময়ই এই রকম। তিনি ভাবছেন এই সব তথ্য দিয়ে তুমি কি করবে।

আমি তার দিকে তাকালাম। তার মধ্যেও সন্দেহ ঢুকে গেছে। সে তার মুখে ভয়ের চিহ্ন ঢাকার চেষ্টা করে।

আমি বললাম, বলতে মন চায় না এমন কিছুই আমাকে তোমার বলতে হবে না। এক মুহূর্তের জন্য তাকে আশ্বস্ত মনে হলো, কিন্তু সন্দেহের বীজ ইতিমধ্যে রোপণ করা হয়ে গিয়েছিল। আমার মাথা ঘুরতে থাকে। আমি কি উন্মাদ? না, এই লোকগুলি উন্মাদ?

রসের স্ত্রী বললো, দেখো ডিক, অভিযোগপত্র ঝুলছে রসের মাথার ওপর। এড গ্রিন হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিরক্ষা-র সাউথ সাইডের জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। যাদের তিনি রক্ষা করার চেষ্টা করছেন তাদের খোঁজখবর নেয়া তাঁর কর্তব্য। তিনি জানতে চান রস তোমাকে এমন কোনো তথ্য দিয়েছে কিনা যা আদালতে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে।

আমি বাক্যহারা হয়ে যাই। আমি জানতে চাইলাম, উনি আমাকে কি ভাবেন? টেবিলে একটা ঘুসি মেরে আমি উঁচু গলায় বলে উঠি, ওহ্ সব বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছো তোমরা!

রস একটা ভীষণ ধাক্কা খায়। তাকে লজ্জিত দেখায়। সে বিড়বিড় করে বললো, রস একটু বেশি সাবধান।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, রস, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?

অস্বস্তির সঙ্গে ও বললো, ওহ্, হ্যাঁ।

আমরা দুজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ একই ঘরে বসে ভীত চিত্তে পরস্পরকে দেখি। আমরা দুজনই ক্ষুধার্ত। আমাদের আহার ও রাতে ঘুমাবার জায়গার জন্য আমরা দুজনই সরকারি দানের ওপর নির্ভরশীল। অথচ যে সব লোক আমাদের জীবনের ওই ছাঁচ গড়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যত সন্দেহ তার চাইতে আমাদের অন্তরে আমরা বেশি সন্দেহ পোষণ করি পরস্পরের বিরুদ্ধে।

আমরা আত্মসচেতন হয়ে কাজ চালিয়ে যাই, কিন্তু একটা কিছু অন্তর্হিত হয়ে গেছে। ওরা কি মনে করে যে, আমি পুলিশের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছি? আমি কী করতে চেষ্টা করছি তা ওদের বোঝাবো কিভাবে? আমি দেখি যে বিমূর্তভাবে আমি যখন ওদেরকে কিছু বলি তখন তারা তা বোঝে না, আমার ধ্যান-ধারণা তাদের বোধগম্য হয় না। আমি, যাকে প্রায় চুরি করে বইপত্র পড়তে হয়েছে, আর তারা দাবি করে যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত করছে, তাদেরকে জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টি দান করছে, তারাই আমাকে বুদ্ধিজীবী বলে চিহ্নিত করে। বিড়ম্বনটা ওইখানে। যাদের চাইতে আমার জীবনের বেশি অংশীদার আর কেউ হতে পারতো না তারাই আমার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে।

এড গ্রিনের আন্তরিকতাকে আমি সন্দেহ করতে পারি না। কম্যুনিস্ট পার্টিতে তাঁর ছিল দীর্ঘ সংগ্রামী রেকর্ড। কেন তা হলে তিনি আমার সম্পর্কে সন্দিহান হলেন? আর আমাকেই যদি সন্দেহ করেন তাহলে কাকে তিনি কখনো বিশ্বাস করতে পারবেন? আমি যদি বুদ্ধিজীবী হই তাহলে একজন নিগ্রো ডাক্তার আইনজীবী, শিক্ষক কি? এর কোনো মানে হয় না। তবু ব্যাপারটা তো ঘটছে।

এড গ্রিন পরে স্প্যানিশ লয়ালিস্টদের পক্ষে যুদ্ধ করার সময় রণক্ষেত্রে নিহত হন। তিনি কিভাবে মরতে হয় আর কিভাবে বাঁচতে হয় তা তিনি সব চাইতে বেশি ভালো জানতেন। তিনি জৈবিকভাবে কেবলমাত্র নিতান্ত প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন। যদি কেউ তাঁর মতো করে কোনো কিছু না দেখতো, তাঁর মতো করে কথা না বলতো, তাঁর মতো করে অনুভব না করতো, তাহলেই তাঁর ভয়-তাড়িত জীবন তাঁকে তাদের প্রতি সন্দিহান করে তুলতো। তাঁর অস্তিত্ব আমাকে একই সঙ্গে আনন্দিত ও ভীত করে। তিনি জঙ্গি বলে আমি আনন্দিত হই, কিন্তু তাঁর জঙ্গীত্ব নিয়ে তিনি কি করবেন যখন সে কথা ভাবি তখন আমি ভীত হয়ে পড়ি। তিনি শুধু তাদেরই তাঁর প্রতি আস্থাশীল করতে পারতেন যারা ছিল তাঁর নিজের ভয়-তাড়িত জীবনের অংশীদার, তাঁর ভয়ঙ্কর সীমিত জীবনের দৃষ্টির বাইরে যে জগৎ তার সবটাই ছিল তাঁর জন্য শত্রু-অঞ্চল।

যে প্রতিমা-প্রতিচ্ছবি সমূহ ইতোমধ্যে যোগাযোগের অভিন্ন মুদ্রা হিসাবে গৃহীত হয়েছে তার মাধ্যমে আমি এইসব মানুষের জীবনের কথা জানতে চাই। আমি জানতে

চাই যে, তাদের মিত্র আছে, তারা যা ভাবে তার চাইতে বেশি আছে, তারা বুঝতে পারে না এমন দিক থেকে তাদের অনেক বন্ধু আছে, আর আমি তাদের বন্ধু। তাদের মধ্যে যে সব কথা আছে কিন্তু যাকে তারা ভাষা দিতে পারছে না, আমি সেই সব কথা বলবো, তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য প্রদান করবো। অথচ তারা আবছে যে পুলিশের সঙ্গে আমার ষড়যন্ত্র আছে!

আমার মধ্যে এ যাবৎ যে সব প্রণোদনা জেগে উঠেছে তার মধ্যে সব চাইতে স্বাধীন প্রণোদনা নিয়ে আমি তাদের উদ্দেশ্যসমূহকে আলিঙ্গন করি। আমি সতর্ক সন্দেহবাদী, যে মানুষটা আত্ম-উৎসর্গের যোগ্য কোনো কিছু এই পৃথিবীতে আছে বলে মনে করতো না, সে প্রকাশ্যে নিজেকে তাদের সঙ্গে একাত্ম করেছে, আর এখন তারা আমাকে সন্দেহ করছে! এই সন্দেহ আমাকে আমার ভেতরে থেকে প্রচণ্ড আঘাত হানে। আমি দুপুরের রৌদ্রে অন্ধের মতো পথ হাতড়াই। আমি কিসের খোঁজ করছি? তারা আমার কাছ থেকে তা জানতে চায়! আর আমি যখন তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তখন দেখা যায় আমি ভুল কথাগুলি বলছি। আমার বিরুদ্ধে ধরাছোঁয়া যায় এমন কোনো অভিযোগ তারা আনতে পারে না। যা তাদের অচেনা তারা শুধু তার ভয়েই ভীত হয়ে ওঠে। আমি তাদের বিরুদ্ধে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে তারা যতখানি ভয় পেতো আমার ধ্যান-ধারণাকে তার চাইতে বেশি ভয় পায়। তারা আমার বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে কি করবে তা ছিল তাদের অজানা।

কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আলাপ করি, কিন্তু আমি কী বলছি তা আমি তাদের বোঝাতে পারি না। শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টরা কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টদের এতোটাই আদর্শায়িত করেছিল যে, আমি যে নিগ্রোদের দেখি তারা তাদের দেখতে পায় না। আর আমি আমার ধারণাগুলি যত তাদের কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তারা ততো বেশি সন্দেহ করতে শুরু করে যে, আমার কোথাও সাংঘাতিক একটা ভুল হচ্ছে। শব্দ তাদের প্রচলিত অর্থ হারিয়ে ফেলে। সরল উদ্দেশ্য অশুভ রঙ নেয়। মনোভঙ্গির দ্রুত ও বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে। যাকে আপনি চেনেন বলে মনে করতেন তার সঙ্গে কথা বলার সময় ধারণাগুলি উল্টে বিপরীত হয়ে যায়। আমি এমন একটা অনুভূতিগত বিচ্ছিন্নতা অনুভব করতে শুরু করি যে ঘৃণা পর্যদুস্ত দক্ষিণের গভীরতার মধ্যেও কখনো অনুভব করি নি।

রসের জীবন সম্পর্কে আমার নোট নেয়া অব্যাহত থাকে, কিন্তু প্রতি সকালেই আমি তাকে স্বল্পবাক হয়ে উঠতে দেখি। তার প্রতি আমার করুণা জাগে কিন্তু আমি তার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হই না, কারণ আমি জানতাম যে পীড়াপীড়ির মাধ্যমে তার শঙ্কা দূর হবে না। তার পরিবর্তে আমি বসে বসে তার আর তার বন্ধুদের দক্ষিণের নিয়ো অভিজ্ঞতার কথা শুনি, আমার মনের মধ্যে সে সব কথা টুকে নিই, প্রশ্ন করতে ভয় পাই পাছে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

তাদের ভয়-ভীতি সত্ত্বেও তাদের জীবনের বিশদ কাহিনী শুনে আমি বীতিমত সিক্ত হয়ে যাই। আমি জীবনীমূলক রেখাচিত্র অঙ্কনের ধারণা ত্যাগ করি। শেষ পর্যন্ত আমি স্থির করি যে, রস ও তার বন্ধুদের কাছ থেকে আমি যেসব তথ্য পেয়েছি তা ব্যবহার করে আমি কয়েকটি ছোট গল্প লিখবো, তার ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজন মতো উদ্ভাবন অনধিকার প্রবেশ করেছে বলে তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। গল্পটি একটি সঙ্কলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, নাম দেয়া হয় বিগ বয় লীভস হোম। কিন্তু যে কম্যুনিস্টরা আমি তাদেরকে আমার সম্পর্কে আস্থাবান করার সুযোগ ঘটার আগেই বড় বেশি দেরিতে আমার গল্পটি প্রকাশিত হয়।

ত্রাণ কর্মকর্তারা আমাকে যে অনিয়মিত ক্ষণস্থায়ী কাজ দিতো তা বন্ধ হয়ে যায়। আমি অন্য কাজের খোঁজ করি কোথাও যার অস্তিত্ব নেই। ক্লাবের কাজে যাওয়া-আসার জন্য আমি টাকা ধার করি; মা, খালা আর আমার ভাই-র জন্য রেল-লাইনের পেছনে একটা ছোট অপরিসর চিলেকোঠা যোগাড় করি। অবশেষে ত্রাণ কর্তৃপক্ষ আমাকে সাউথ সাইড বয়েজ ক্লাবে স্থাপন করলেন, আমার বেতন দিয়ে কোনো রকমে, অপর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা গেল।

এরপর আমাকে বিপর্যস্ত করার জন্য রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলো। আমি যে রসের জীবন নিয়ে লিখতে চেষ্টা করেছিলাম তার বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট পার্টি অভিযোগ আনলো নেতৃত্ব-বিরোধী প্রবণতা, শ্রেণী-দালালির দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শগত দলালির অপরাধের। ওই সব জমকালো শব্দ শুনে আমার মুখ হা হয়ে যায়। সবাই জানে যে আমি রসের ওখানে যেতাম, তার জীবন সম্পর্কে আমি নোট নিয়েছি, তারা বিশ্বাস করে যে, আমি রাজনৈতিকভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, যদিও কিভাবে তা তারা বলে না। আগের মতোই, আমি যত আমার অবস্থান বোঝাতে চেষ্টা করি আমার কমরেডদের চোখে আমি ততো বেশি অপরাধী হয়ে উঠি। আমি কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো নীতি নির্ধারণে অংশ নিই নি, তার নেতৃত্ব কিংবা কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো মতামত দিই নি, কিন্তু আমার অসন্তুষ্টি সম্পর্কে গুজব অব্যাহত থাকে।

এক রাতে কৃষ্ণাঙ্গ কমরেডদের একটি দল আমার বাড়ি এসে আমাকে সতর্ক করে দেয় আমি যেন রসের ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস না করি। আমি যখন তাদের নিশ্চয়তা দিলাম যে, রসের মতামত আর আমার মতামত এক নয় তখন তারা আমাকে ওর কাছ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিলো।

আমি জানতে চাইলাম, কিন্তু কেন?

ওরা বললো, সে একটা অস্থাস্থ্যকর উপাদান। আপনি কি একটা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন না?

এটা কি কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত?

ওরা জানালো, হ্যাঁ।

আমি বললাম, আমি যদি অন্যায় কিছু করতাম তাহলে আপনাদের সিদ্ধান্ত মানা আমি বাধ্যতামূলক মনে করতাম, কিন্তু আমি কিছুই করি নি।

কমরেড আপনি বুঝতে পারছেন না। পার্টির সদস্যরা পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করে না।

কিন্তু আপনাদের সিদ্ধান্ত আমার প্রতি প্রযোজ্য নয়। আমি এটা কিছুতেই মেনে নেবো না।

আপনার মনোভাব আমাদের আস্থা অর্জন করছে না।

আমি রেগে যাই। উঠে দাঁড়িয়ে আমার নিরানন্দ চিলেকোঠার দিকে হাত প্রসারিত করে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আপনাদের ভয় পাওয়ার মতো কি আছে এখানে? আমি কোথায় কাজ করি তা আপনারা জানেন। আমি কি রোজগার করি তা আপনারা জানেন। আমার বন্ধুদের আপনারা চেনেন। তো, দোহাই ঈশ্বরের গণ্ডগোলটা কোথায়?

ওরা নিরানন্দ হাসি হেসে চলে যায়, যার অর্থ গণ্ডগোল কোথায় তা আমি শিগগিরই জানবো।

কিন্তু এ জাতীয় ছায়াচ্ছন্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে কিছু মুক্তিও ছিল। সাউথ সাইড বয়েজ ক্লাবের কাজের মধ্যে আমি গভীরভাবে ডুবে যাই। প্রতিদিন আট থেকে পঁচিশ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা এখানে আসে সাঁতার কাটতে, ছবি আঁকতে, বই পড়তে। এরা ছিল বেপরোয়া, গৃহহীন, সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিভ্রান্ত, আত্মিক দিক থেকে উত্তরাধিকার বঞ্চিত, চিকিৎসাকেন্দ্র, লাশকাটা ঘর, সংশোধনালয় আর রাজ্যের মৃত্যুভবনে বৈদ্যুতিক চেয়ারের প্রার্থী। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওদের কথাবার্তা শুনতাম।

বিমান, মেয়েমানুষ, বন্দুক-পিস্তল, রাজনীতি আর অপরাধ নিয়ে তাদের আলাপ আলোচনা শুনতাম আমি। তাদের বাকভঙ্গি ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা কোনো জনগোষ্ঠির চাইতে কম জোরালো বা বর্ণাঢ্য ছিল না। আমি তাদের শব্দের ছন্দ এবং প্রতিক্রিয়া টুকে নেয়ার জন্য আমার পকেটে সব সময় কাগজ-পেন্সিল রাখতাম। এই ছেলেরা মানুষকে এতোটা ভয় করতো না যে প্রতিটি লোককে তাদের চোখে গুপ্তচর বলে মনে হতো। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে কম্যুনিস্টরা সন্দেহ পোষণ করেছিল তারা এই ছেলেদের চেনে না, তাদের দোমড়ানো স্বপ্ন এবং অতি-স্বচ্ছ নিয়তি সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। আর আমার সন্দেহ হয় আমি এখানে যে ট্র্যাজেডি দেখছি তা কি কখনো ওদের কাছে পৌছে দিতে পারবো।

শব্দ নিয়ে লড়াই করার মধ্যে আমি আমার মুহূর্তগুলির গভীরতম অর্থ খুঁজে পাই। আমার ছোটগল্প বিগ বয় লীভস হোম একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে : যে দেশ তার মানবতাকে অস্বীকার করে সেখানে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে এবং মরতে হলে একজন

নিগ্রোর মধ্যে কি ধরনের ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে? আমার অন্তরের গভীরতা থেকে এর একটা উত্তর পথ হাতড়ে হাতড়ে উঠে আসে, একটা অনুচ্চারিত প্রশ্ন করে আমার মনে। একটা বন্যার গল্প ডাউন বাই দি রিভারসাইড, অতি কষ্টে তার কাহিনীজালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাই, পথের গতিধারা অনুসরণ করে করে, চেষ্টা করে চলি আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে। কিন্তু গল্পটা শেষ করার পর আমি খুশি হই না, তাই ওটা সরিয়ে রেখে আমি ওই একই জিনিস লং ব্ল্যাক সঙ্গ-এ ভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতার যে বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ খোঁজ করছিলাম সেটা তার মধ্যে ধরা পড়ে না।

আমার অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পার্টির কাজ একটা বাধার সৃষ্টি করে। মধ্য পশ্চিম আমেরিকার সব বামপন্থী লেখকদের নিয়ে ক্লাব একটা সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি ধারণাটি সমর্থন করি এবং বলি যে, সম্মেলনে লেখার শিল্প কৌশলের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা হবে। আমার মতামত প্রত্যাখ্যান হয়। ক্লাব সিদ্ধান্ত নেয় যে সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রশ্নাদি আলোচিত হবে। আমি একটা সংজ্ঞা জানতে চাই। লেখকের কাছে প্রত্যাশা কি? গ্রন্থ, না রাজনৈতিক সক্রিয়তা? উত্তর হলো : দুটোই। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা লিখবেন, বাকি সময়টা কাটাবেন রাজপথে প্রতিবাদী আন্দোলনে। আমি বললাম, একজন বিপ্লবী শিল্পীর কাজ হবে বিপ্লবী শিল্পকলা সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে যদি একটা সুস্পষ্ট নীতি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে ক্লাবের ভবিষ্যৎ সংশয়াকুল হয়ে পড়বে।

সম্মেলন শুরু হয়। একজন নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্ট উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিলেন। যে প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হয় তা হলো, ক্লাবের কাছ থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি কি চায়? কম্যুনিস্ট নেতার উত্তর হলো : সাংগঠনিক কাজ এবং উপন্যাস লেখা। আমি বললাম, একটা লোক হয় সংগঠন করে, নয়তো উপন্যাস রচনা করে। পার্টি নেতা বললেন যে, দুটোই করতে হবে। পার্টি নেতার মত গৃহীত হলো এবং লেফট ফ্রন্ট, যার জন্য আমি এতো দীর্ঘকাল কাজ করেছি, তা ভোটের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

পার্টি নেতা দাবি জানালেন যে ট্রেড ইউনিয়নে ব্যবহার করার জন্য লেখকদের পুস্তিকা রচনা করতে হবে। আমি আপত্তি তুললাম : কল্পনাশ্রয়ী কাজ পরিত্যাগ করে লেখকদের পুস্তিকা রচনার কাজে ব্রতী হতে বললে পার্টি ভুল করবে। ক্লাবের লেখকদের শিল্পকর্মের মেয়াদী লাভ ও সুবিধার কথা আমি ব্যাখ্যা করলাম। সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে লেখা পুস্তিকা রচনার চাইতে ওই জাতীয় স্থায়ী সৃষ্টি অনেক বেশি মূল্যবান হবে বলে আমি যুক্তি দেখাই। কিন্তু আমার এই মতও ভোটে প্রত্যাখ্যাত হলো। আমি এরপর এমন একটা সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য আবেদন জানালাম যেখানে সকল ধরনের শৈল্পিক কাজের সুযোগ থাকবে। আমার আশা ছিল এর মাধ্যমে অভিপ্রায় ও কৌশল সম্পর্কিত সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব পরিহার করা যাবে। কিন্তু আমার সব প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হয়।

আমি ততক্ষণে বুঝতে পারি যে, ক্লাব তার অন্তিম অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার বিষণ্ণ উপসংহারগুলি বাজ করি এবং ক্লাব বিলুপ্ত করার সুপারিশ করি। আমার এই মনোভাবকে পরাজয়বাদী আখ্যায়িত করা হলো এবং আমার মস্তকের ওপর বর্ষিত হলো পার্টির নেতার তীব্রতম অসন্তুষ্টি ও অননুমোদন। চীন, ভারত, জার্মানি, জাপান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পরিস্থিতি নিয়ে এক গাদা প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু লেখালেখি সম্বন্ধে একটি ধারণাও উদ্ভূত হলো না।

সাউথ সাইডের কম্যুনিস্টদের মধ্যে আমি ইতিপূর্বে যে সব সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিলাম সম্মেলনে উপস্থাপিত আমার ধারণাবলীর সঙ্গে তা যুক্ত হয়ে যায়।

কম্যুনিস্ট পার্টি এখন তাদের মধ্যে একজন বিপদজনক শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়। একটা গুঞ্জন শুরু হয়, আমি পার্টির বিরুদ্ধে একটা গোপন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছি। আমি জেনে গিয়েছিলাম যে অভিযোগের উত্তর দান নিষ্ফল। এখন কোরো কম্যুনিস্ট-এর সঙ্গে দেখা হওয়া ছিল আমার জন্য বেদনাদায়ক, কারণ তার মনোভাব কি রকম হবে আমি জানতাম না।

সম্মেলনের পর একটা জাতীয় জন রীড ক্লাব কংগ্রেস আহূত হয়। সব স্টেটের বামপন্থী লেখকরা ১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত ওই কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু অধিবেশনগুলি চলাকালীন সময়ে লেখকদের মধ্যে একটা শৈথিল্য বিভ্রান্তি এবং অসন্তোষের অনুভূতি জাগতে থাকে। এই লেখকদের বেশির ভাগ ছিল তরুণ, আগ্রহশীল এবং তাদের সেরা কাজের কাছাকাছি। তাদের কাছ থেকে কি আশা করা হচ্ছে কেউ তা জানে না, আর ঐক্যসূত্রে বাঁধার মতো কোনো ধারণা কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত হয় না। অলাপচারিতার মধ্য দিয়ে আমি জানতে পারি যে, কংগ্রেস যে রকম উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে নিউইয়র্ক জন রীড ক্লাব হতাশ হয়ে পড়েছে কিন্তু তারা তাদের অননুমোদনের কথা গোপন রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এটা আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়, কারণ আমি অনুভব করি যে, সমস্যাটা খোলাখুলি আলোচনার জন্য সামনে নিয়ে আসা উচিত। তবে শিকাগো কম্যুনিস্টরা কি রকম বর্বরতার সঙ্গে শিকাগো জন রীড ক্লাবে সদস্যদের কাছে তাদের দাবি পেশ করেছিল সেকথা শুনে নিউইয়র্ক কম্যুনিস্টদের বিস্ময় ও আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখে আমি খুশি হই। জনৈক বিস্মিত নিউইয়র্ক কমরেড বললেন, শিকাগো কম্যুনিস্ট তো একটা চলমান আতঙ্ক।

কংগ্রেস প্রায় শেষ হয়ে আসে। ক্লাবের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে আমি একটা ছোট কমিটিতে যোগ দিই। আমরা দশজন একটা হোটেল-কক্ষে মিলিত হই। আমি অবাক হয়ে দেখি যে, ক্লাবের জাতীয় বোর্ড ক্লাবগুলির পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে আমার সমালোচনার সঙ্গে একমত হয়। আমি উদ্দীপ্ত হই। আমার মনে হয় ক্লাবগুলি এবার একটা নব জীবন লাভ করবে। লেখকরা এবার তাদের সৃজনশীল কাজের মধ্য

দিয়ে তাদের রাজনৈতিক অবদান রাখার স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু এরপর জাতীয়ভাবে সুপরিচিত এক কম্যুনিস্ট নেতা কর্তৃক ক্লাবগুলি বিলুপ্তির ঘোষণা এল আর আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। কেন? আমি জানতে চাই। আমাকে বলা হলো, কারণ ক্লাবগুলি আর নতুন সিপলস ফ্রন্ট পলিসির কোনো কাজে আসে না। আমি বললাম, এটা তো ঠিক কাজ নেয়া যায়। ক্লাবগুলিকে সুস্থ ও প্রশস্ত করা যায়। না, আরো বড় এবং আরো ভাল সংগঠন চালু করতে হবে, যেখানে জাতির অগ্রণী সব লেখককে স্থান দেয়া যাবে- এই হলো তাদের বক্তব্য। তারা আমাকে জানালো যে, পিপলস ফ্রন্টই এখন জীবনের সঠিক ছবি তুলে ধরছে, এখন আর ক্লাবগুলির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ক্লাবে যোগ দেবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি যে তরুণ লেখকদের পীড়াপীড়ি করেছিল এবং এখন যারা নতুন গোষ্ঠির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হচ্ছে না তাদের কি হবে। আমি কোনো উত্তর পাই না। আমি আপন মনে বলি, সমস্ত ব্যাপারটা এতো শীতল। নীতির একটা দ্রুত পরিবর্তন সাধনের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি একটা সংগঠনকে আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, আর তারপর সম্পূর্ণ নতুন এক দল লোক নিয়ে একটা নতুন পরিকল্পনা সংগঠিত করছে।

বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক এমন অনেক লেখককে ক্লাবের সদস্যভুক্ত করার জন্য আমি আমার বহু শক্তি নিয়োগ করেছিলাম, এখন দেখছি যে, আমার সমস্ত প্রয়াস অপচয়িত ও অর্থহীন হয়ে পড়ছে। আমি আমার অনুভূতিকে এর বিরুদ্ধে লড়তে দেখি। আমি এই প্রথম একটি কম্যুনিস্ট নীতি নির্ধারণী কমিটির সঙ্গে বসি। আমার অলীক ধারণা ছিল যে, প্রতিটি সদস্য তার বক্তব্য পেশ করবে এবং পরিবেশিত তথ্যাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আমি ছিলাম খুবই নির্বোধ-সরল। সিদ্ধান্ত আগেই গৃহীত হয়ে গিয়েছিল, আমি আহূত হই শুধু আমার অনুমোদন দেবার জন্য। ব্যাপারটা আমাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে।

আমি দেখলাম যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে একমাত্র আমিই যুক্তিতর্ক উত্থাপন করছি। অবাক বিস্ময়ে আমি আরেকটা আবিষ্কার করি। আমি দেখলাম যে, যারা আমার সঙ্গে একমত তারাও আমাকে সমর্থন করছে না। ওই সভায় আমি জানলাম যে, যখন কাউকে পার্টির ইচ্ছার কথা জানানো হয় তখন সে তাতে সায় দেয়, যদিও সে তার মস্তিষ্কের সকল ক্ষমতা দিয়ে জানে যে, ওই ইচ্ছা কোনো প্রাজ্ঞ ইচ্ছা নয় এবং পরিণামে তা পার্টির স্বার্থের ক্ষতি করবে। কম্যুনিস্টদের বিমূর্তভাবে শৃঙ্খলার বিষয়টি আলোচনা করার কথা আমি শুনেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে তা দেখতে পেয়ে আমার আবেগ অনুভূতি ভীষণ আঘাত পেলো।

আমি যে পার্টির বিরোধিতা করলাম তা আমার সাহসের কারণে নয়। অন্য কিছু করার কথা আমি জানতামই না। দক্ষিণী ঘৃণার কোলে বেড়ে উঠলেও একটা মানুষ যে তার নিজের কথা বলতে পারবে না তা ছিল আমার ধারণাতীত। আমি আমার জন্মস্থান থেকে উত্তরে চলে আসার জন্য আমার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটিয়েছি। আশা ছিল

আমি এখানে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবো, ভয়ের চাপ থেকে মুক্ত থাকবো। অর এখন আমি এখানে আবার ভয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। মিসিসিপিতে আমি এক সময় নির্বোধ সারল্যে যখন চশমার কাচ বানানোর পেশা শিখতে পারবো বলে মনে করেছিলাম ইথন আমার ওপর সহিংস আক্রমণ নেমে এসেছিল। আমার কোনো ধারণা ছিল না যে, আমার মাথার ওপর আবার ওই রকম একটা হিংস্র আক্রমণের আগুন জ্বলাবার জন্য অতি ধীরে ধীরে জ্বালানির যোগান দিয়ে যাচ্ছিলাম।

শিল্পী এবং রাজনীতিবিদ দুটি বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন। শিল্পী জীবনের ওপর তার দীর্ঘ পূর্ণ মনোযোগ দ্বারা তাকে সমৃদ্ধ করেন আর রাজনীতিবিদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন দলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জীবনের নৈর্ব্যক্তিক দিকটির ওপর জোর দেন। শিল্পী কর্তৃক জীবনের সমৃদ্ধিকরণ কখনো কখনো এমন সব জিনিসের ওপর জোর দেয় যা একজন রাজনীতিবিদ কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু, অন্যান্য সময়ে, জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যগ্র রাজনীতিবিদ শিল্পীকে অবজ্ঞা করতে পারেন, কারণ শিল্পকর্মটি তিনি কাজে লাগাতে পারেন না। তাই, একই দিকের যাত্রী, একই জীবনদৃষ্টির প্রতি নিবেদিতচিত্ত দুই দল মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এমন তীব্র যা উভয় দলের অনাকাঙ্ক্ষিত, আর ইতাবসরে তাদের পারস্পরিক শত্রুরা সবিস্ময়ে ওই দৃশ্য অবলোকন করে।

আমরা লেখকরা কেন রাজনীতির অঙ্গন ত্যাগ করে নিজেদের সংগঠিত করি না? কেমন করে করতে হয় আমরা জানি না, শুধু সে কারণেই আমরা তা করি না। আমরা ছিলাম আমাদের পরিবেশের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এবং অন্যান্য মার্কিন লেখকরা কিভাবে অনুরূপ সমস্যার মোকাবেলা করেছিলেন তা ছিল আমাদের অজানা। নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা সংস্কৃতি নির্মাণের চাইতে কম কিছু করতে চাই না। আর আমাদের দৃষ্টান্তের জন্য আমরা রাশিয়া, জার্মানি এবং ফ্রান্সের দিকে তাকাই। আমাদের কালের সঙ্গে আমাদের পদক্ষেপের কোনো মিল নেই। এই অবস্থায় কমুনিস্ট পার্টি যখন বলে : আমাদের সঙ্গে তোমাদের জীবনদৃষ্টিকে আমরা জঙ্গি কার্যক্রম দ্বারা সমর্থন করবো, তখন ওই আহ্বানে সাড়া দেয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

বস্তুতপক্ষে আমরা অনুভব করি যে আমরা ভাগ্যবান। আমরা সোচ্চার হলেই যখন লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের কথা শুনবে তখন কেন আমরা গজদন্ত মিনারে বসে ভয় লজ্জায় আমাদের ব্যক্তিগত কথাগুলি সঙ্কুচিত করে রাখবো? আমাদের রচনাবলী ফরাসি, জার্মান, রুশ, চীনা, স্প্যানিশ এবং জাপানিতে অনূদিত হয়েছে... সমগ্র মানব ইতিহাসে আর কারা তরুণ লেখকদেরকে এতো বিশাল শ্রোতৃবর্গ উপহার দিয়েছে? সত্য বটে, আমাদের রয়্যালটি ছিল সামান্য, সামান্যের চাইতেও সামান্য, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

আমরা যা অনুভব করি তাই আমরা লিখি। একটা বৈপ্লবিক এবং পরিবর্তনশীল

পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের অন্তর থেকে প্রবল বেগে উচ্চারিত হয় ওই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া, আমাদের আশা, নির্মাণকল্পে বিরুদ্ধ অবাধের ক্রোধ, আমাদের একটা নতুন জীবনের স্বপ্ন। এটা উচ্চারিত হয় কোনো রকম জোড়-জবরদস্তি ছাড়া কারো ওকালতি ছাড়া।

কংগ্রেস মুলতবি হবার আগে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ১৯৩৫ সালে, নিউইয়র্কে মার্কিন সাহিত্যিকদের আরেকটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমি তেমন উৎসাহ বোধ করি না। আমি মন্তব্য করতে চেষ্টা করি, একা থাকবো আমি, আমি একা থেকেই লিখবো। ইতিমধ্যেই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম, যে গল্পগুলি আমি লিখেছি তা এই নতুন সরকারি মেজাজের সঙ্গে খাপ খাবে না। আমাকে কি আমার কাহিনীর ধারণাগুলি বর্জন করে নতুন ধারণাবলী খুঁজতেই হবে? না, তা আমি পারবো না। আমার লেখা ছিল আমার দেখার পথ, আমার বাঁচার পথ, আমার অনুভবের পথ। আর কে পারে তার দৃষ্টি, তার গতিপথের ধারণা, তার ইন্দ্রিয় চেতনাকে বদলাতে?

কমুনিস্টদের সঙ্গে আমরি সম্পর্ক একটা স্থানু অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমি হাসে এড়িয়ে চলি, তারা আমাকে এড়িয়ে চলে। কমুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্য, বাড়ি নিলসন, নিগ্রো কর্মকাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য শিকাগোয় এসে উপস্থিত হলো। শুঞ্জনে শোনা যায় যে, ইনি হলেন নিগ্রো প্রশ্নে পার্টির তত্ত্ববিদ। আমি খবর পেই যে ইনি কমুনিস্ট পার্টিকে সকল ট্রটস্কিপন্থী নিগ্রো উপাদান থেকে মুক্ত করার জন্য একটা আন্দোলন শুরু করেছেন। আমার পরিচিত তাবৎ কমুনিস্টদের মধ্যে রাজনীতিতে একটা ট্রটস্কিপন্থী অবস্থান নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক সক্ষমতা কারো ছিল না। তাদের বেশির ভাগই ছিল দক্ষিণের কৃষি খামার অঞ্চল থেকে এখানে বসবাস করতে আসা অর্ধশিক্ষিত মানুষ। কমুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের আগে রাজনীতি সম্পর্কে তাদের কোনো আন্তরিক উৎসাহই ছিল না। তবু নিগ্রো ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতা চলতে থাকে, যদিও আমি তা থেকে দূরে থাকি এবং কী ঘটছে সে সম্পর্কে আমি সামান্যই খবর রাখি।

১৯৩৫-এর বসন্তকাল এসে যায়। লেখক সম্মেলনের পরিকল্পনা দ্রুত এগিয়ে চলে। কোনো দুর্বোধ্য কারণে– হয়তো আমাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে– কমুনিস্টরা আমাকে সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য বিশেষভাবে বলে এবং আমার নাম প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাউথ সাউড বয়েজ ক্লাবে আমার চাকরি থেকে আমাকে সাময়িক ছুটি দেয়া হয় এবং আরো কতিপয় প্রতিনিধির সঙ্গে আমি বিনা ভাড়ায় গাড়িতে চড়ে নিউ ইয়র্ক যাই।

পশ্চিমে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত থাকার পর নিউইয়র্কের প্রথম দর্শন আমাকে চমকে দেয়। আমরা হাডসন নদীর পাশ দিয়ে আসি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িঘর ও প্রাঙ্গণ দেখে আমি অবাক হই। কিন্তু কোথায় ধোঁয়ার ভারি আচ্ছাদন? কোথায় ধোঁয়ার ঝুলকালি? শস্য উত্তোলনের যন্ত্রগুলি? বলকারখানা? দিগন্তে বাষ্পের ঝলকানি? ফুটপাথের লোকজনদের

আমি এখানে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবো, ভয়ের চাপ থেকে মুক্ত থাকবো। আর এখন আমি এখানে আবার ভয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। সিসিসিপিতে আমি এক সময় নির্বোধ সারল্যে যখন চশমার কাচ বানানোর পেশা শিখতে পারবো বলে মনে করেছিলাম তখন আমার ওপর সহিংস আক্রমণ নেমে এসেছিল। আমার কোনো ধারণা ছিল না যে, আমার মাথার ওপর আবার ওই রকম একটা হিংস্র আক্রমণের আগুন জ্বালাবার জন্য আমি ধীরে ধীরে জ্বালানির যোগান দিয়ে যাচ্ছিলাম।

শিল্পী এবং রাজনীতিবিদ দুটি বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন। শিল্পী জীবনের ওপর তার দীর্ঘ পূর্ণ মনোযোগ দ্বারা তাকে সমৃদ্ধ করেন আর রাজনীতিবিদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন দলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জীবনের নৈর্ব্যক্তিক দিকটির ওপর জোর দেন। 'শিল্প' কর্তৃক জীবনের সমৃদ্ধিকরণ কখনো কখনো এমন সব জিনিসের ওপর জোর দেয় যা একজন রাজনীতিবিদ কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু, অন্যান্য সময়ে, জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যগ্র রাজনীতিবিদ শিল্পীকে অবজ্ঞা করতে পারেন, কারণ শিল্পকর্মটি তিনি কাজে লাগাতে পারেন না। তাই, একই দিকের যাত্রী, একই জীবনদৃষ্টির প্রতি নিবেদিতচিত্ত দুই দল মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এমন তীব্র যা উভয় দলের অনাকাঙ্ক্ষিত, আর ইতাবসরে তাদের পারস্পরিক শত্রুরা সবিস্ময়ে ওই দৃশ্য অবলোকন করে।

আমরা লেখকরা কেন রাজনীতির অঙ্গন ত্যাগ করে নিজেদের সংগঠিত করি না? কেমন করে করতে হয় আমরা জানি না, শুধু সে কারণেই আমরা তা করি না। আমরা ছিলাম আমাদের পরিবেশের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এবং অন্যান্য মার্কিন লেখকরা কিভাবে অনুরূপ সমস্যার মোকাবেলা করেছিলেন তা ছিল আমাদের অজানা। নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা সংস্কৃতি নির্মাণের চাইতে কম কিছু করতে চাই না। আর আমাদের দৃষ্টান্তের জন্য আমরা রাশিয়া, জার্মানি এবং ফ্রান্সের দিকে তাকাই। আমাদের কালের সঙ্গে আমাদের পদক্ষেপের কোনো মিল নেই। এই অবস্থায় কম্যুনিস্ট পার্টি যখন বলে : আমাদের সঙ্গে তোমাদের জীবনদৃষ্টিকে আমরা জঙ্গি কার্যক্রম দ্বারা সমর্থন করবো, তখন ওই আহ্বানে সাড়া দেয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

বস্তুতপক্ষে আমরা অনুভব করি যে আমরা ভাগ্যবান। আমরা সোচ্চার হলেই যখন লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের কথা শুনবে তখন কেন আমরা গজদন্ত মিনারে বসে ভয়ে লজ্জায় আমাদের ব্যক্তিগত কথাগুলি সযত্নে রক্ষা করে রাখবো? আমাদের রচনাবলী ফরাসি, জার্মান, রুশ, চীনা, স্প্যানিশ এবং জাপানিতে অনূদিত হয়েছে... সমগ্র মানব ইতিহাসে আর কারা তরুণ লেখকদেরকে এতো বিশাল শ্রোতৃবর্গ উপহার দিয়েছে? সত্য বটে, আমাদের রয়্যালটি ছিল সামান্য, সামান্যের চাইতেও সামান্য, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

আমরা যা অনুভব করি তাই আমরা লিখি। একটা বৈপ্লবিক এবং পরিবর্তনশীল

পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের অন্তর থেকে প্রবল বেগে উৎসারিত হয় ওই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া, আমাদের আশা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধ, আমাদের একটা নতুন জীবনের স্বপ্ন। এটা উৎসারিত হয় কোনো রকম জোর-জবরদস্তি ছাড়া কারো ওকালতি ছাড়া।

কংগ্রেস মুলতবি হবার আগে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী বছর, ১৯৩৫ সালে, নিউইয়র্কে মার্কিন সাহিত্যিকদের আরেকটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমি তেমন উৎসাহ বোধ করি না। আমি মন্তব্য করতে চেষ্টা করি, একা থাকবো আমি, আমি একা থেকেই লিখবো। ইতিমধ্যেই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম, যে গল্পগুলি আমি লিখেছি তা এই নতুন সরকারি মেজাজের সঙ্গে খাপ খাবে না। আমাকে কি আমার কাহিনীর ধারণাগুলি বর্জন করে নতুন ধারণাবলী খুঁজতেই হবে? তা আমি পারবো না। আমার লেখা ছিল আমার দেখার পথ, আমার বাঁচার পথ, আমার অনুভবের পথ; আর কে পারে তার দৃষ্টি, তার গতিপথের ধারণা, তার ইন্দ্রিয় চেতনাকে বদলাতে?

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটা স্থানু অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমি তাদের এড়িয়ে চলি, তারা আমাকে এড়িয়ে চলে। কম্যুনিস্ট ইস্টারন্যাশনালের একজন সদস্য, বাড়ি নিলসন, নিগ্রো কর্মকাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য শিকাগোয় এসে উপস্থিত হলো। গুঞ্জনে শোনা যায় যে, ইনি হলেন নিগ্রো প্রশ্নে পার্টির তত্ত্ববিদ। আমি খবর পাই যে ইনি কম্যুনিস্ট পার্টিকে সকল ট্রটস্কিপন্থী নিগ্রো উপাদান থেকে মুক্ত করার জন্য একটা আন্দোলন শুরু করেছেন। আমার পরিচিত তাবৎ কম্যুনিস্টদের মধ্যে রাজনীতিতে একটা ট্রটস্কিপন্থী অবস্থান নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক সক্ষমতা কারো ছিল না। তাদের বেশির ভাগই ছিল দক্ষিণের কৃষি খামার অঞ্চল থেকে এখানে বসবাস করতে আসা অর্ধশিক্ষিত মানুষ। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের আগে রাজনীতি সম্পর্কে তাদের কোনো আন্তরিক উৎসাহই ছিল না। তবু নিগ্রো ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতা চলতে থাকে, যদিও আমি তা থেকে দূরে থাকি এবং কী ঘটছে সে সম্পর্কে আমি সামান্যই খবর রাখি।

১৯৩৫-এর বসন্তকাল এসে যায়। লেখক সম্মেলনের পরিকল্পনা দ্রুত এগিয়ে চলে। কোনো দুর্বোধ্য কারণে– হয়তো আমাকে বাচাবার উদ্দেশ্যে– কম্যুনিস্টরা আমাকে সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য বিশেষভাবে বলে এবং আমার নাম প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাউথ সাউড বয়েজ ক্লাবে আমার চাকরি থেকে আমাকে সাময়িক ছুটি দেয়া হয় এবং আরো কতিপয় প্রতিনিধির সঙ্গে আমি বিনা ভাড়ায় গাড়িতে চড়ে নিউ ইয়র্ক যাই।

পশ্চিমে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত থাকার পর নিউইয়র্কের প্রথম দর্শন আমাকে চমকে দেয়। আমরা হাডসন নদীর পাশ দিয়ে আসি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িঘর ও প্রাঙ্গণ দেখে আমি অবাক হই। কিন্তু কোথায় ধোঁয়ার ভারি আচ্ছাদন? কোথায় ধোঁয়ার কুণ্ডলি? শস্য উত্তোলনের যন্ত্রগুলি? কলকারখানা? দিগন্তে বাষ্পের ঝলকানি? ফুটপাথের লোকজনদের

শিকাগোর লোকজনের চাইতে বেশি ভাল পোশাক পরিহিত বলে মনে হলো। তাদের চোখ সম্প্রতিভ, নৈর্ব্যক্তিক। তারা হাটে দ্রুততর বেগে, যেন গন্তব্যস্থল পৌঁছার জন্য তাদের বিশেষ তাড়া আছে।

আমরা সন্ধ্যা রাতে পৌঁছে যাই এবং অধিবেশনগুলির জন্য নাম রেজিস্ট্রি করি। উদ্বোধনী গণ-সভা হবে কার্নেগী হলে। আমি থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাইলে দিই ইয়র্ক জন রীড ক্লাবের সদস্যদের কম্যুনিস্ট পার্টির সব শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের বিস্তৃত দেখালো। আমি অপেক্ষা করে থাকি। একজন শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্ট আরেকজন শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করেন, আমার, একজন কৃষ্ণাঙ্গ শিকাগো কম্যুনিস্টের, বাসস্থানের কি ব্যবস্থা করা যায়? এখানে আসার পথে আমি নিজেকে নিগ্রো বলে ভাবি নি। আমি মনে মনে আমার পরিচিত তরুণ বামপন্থী লেখকদের সমস্যার কথা চিন্তা করছিলাম। এখন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, একজন শ্বেতাঙ্গ কমরেডকে আরেকজন কমরেডের সঙ্গে আমার ত্বকের বর্ণ নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে দেখে আমার মধ্যে তীব্র বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে।

শ্বেতাঙ্গ কমরেড আমার কাছে ফিরে এসে বললো, এক মিনিট, কমরেড। আমি আপনার থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, থাকার ব্যবস্থা কি ইতিমধ্যে করা হয় নি? এসব ব্যাপার তো পূর্বাহ্নেই ঠিকঠাক করে রাখার কথা।

ও অন্তরঙ্গ গলায় স্বীকার করলো, হ্যাঁ। আমাদের কাছে এখানে কয়েকটা ঠিকানা আছে, কিন্তু আমরা তাদের চিনি না। আপনি বুঝতে পারছেন?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।

ও আমার বাহুতে হাত রাখে, আমাকে আশ্বস্ত করে বলে, আপনি একটু অপেক্ষা করেন, আমি আপনার জন্য একটা জায়গা অবশ্যই পেয়ে যাবো।

আমার কণ্ঠস্বর ক্রোধের প্রকাশ চাপা দেয়ার চেষ্টা করতে করতে আমি বললাম, শুনুন, এ নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

ও দৃঢ়চিত্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, ওহ, না। এটা একটা সমস্যা আর আমি এর সুরাহা করবো।

আমি না বলে পারলাম না, এ সমস্যা তো হওয়ার কথা নয়।

ও তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বললো, না, না, আমি ওটা বোঝাতে চাই না।

আমি অস্ফুট চাপা গলায় শাপশাপান্ত করি, গড ড্যাম। কাছে দাঁড়ানো কয়েকজন লোক একজন শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টের জন্য একটা শোবার জায়গা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত দেখছিল। লজ্জায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কয়েক মিনিট পর শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টটি ফিরে আসে। সে ঘামছে, তার চোখ উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু পেলেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে ও বললো, না, এখনো পাই নি। এক মিনিট। আমার পরিচিত একজনকে আমি ফোন করছি। এই যে, ফোন করার জন্য একটা নিকেল ঢুকিয়ে দিতে হবে কি?

আমি বললাম, ভুলে যান ওর কথা। আমার মনে হলো আমার বুদ্ধি যেন জলের মতো তরল হয়ে গেছে। আমি বললাম, আমি একটা জায়গা নিজেই খুঁজে নেবো। তবে আজকের রাতে সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার এই সুটকেসটা কোথাও রেখে দিতে চাই।

ও বললো, আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে আপনি একটা জায়গা খুঁজে নিতে পারবেন? সে তার কণ্ঠস্বর থেকে একটা মরীয়া আশার সুর গোপন করার চেষ্টা করে।

আমি জানালাম, অবশ্যই পারবো।

তবু তাকে অনিশ্চিত দেখায়। সে আমাকে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু কিভাবে করবে তা সে জানে না। সে আমার ব্যাগ একটা ছোট কুঠুরিতে রেখে তালা বন্ধ করে দেয়। আমি ফুটপাথে নেমে ভাবতে থাকি, হারলেম জায়গাটা কোথায়। কোথায় আজ রাতে আমি ঘুমাবো সে-ভাবনা আমার মন অধিকার করে রাখে। শিকাগো ত্যাগ করার আগে জন রীড ক্লাবগুলি টিকিয়ে রাখার জন্য সম্মেলনে আমি যে হাজারটা যুক্তি উত্থাপন করবো বলে মনে মনে যে চিন্তাগুলি করেছিলাম, এখন আর ক্লাবগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয় না। আমি এখন আমার গায়ের কৃষ্ণবর্ণ ত্বক নিয়ে নিউইয়র্কের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি, পকেটে অর্থ বলতে প্রায় কিছুই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে আমি আর এখন মগ্ন নই, আমার সমস্যা হলো কেমন করে আমি এখন স্নান করতে পারবো। আমি কার্নেগী হলে আমার পরিচয় পত্রাদি জমা দিই। ভবনটি জনাকীর্ণ। জঙ্গী বক্তৃতাগুলি শুনতে শুনতে আমি ভাবি, কেন, কেন আমি এখানে এলাম?

আমি ফুটপাথে নেমে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজনের মুখাবয়ব লক্ষ্য করি। যে শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্টটি আমার শোবার জন্য ঘর খুঁজছিল সে আমাকে দেখতে পেয়ে আমার কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কি, ঘরের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন?

আমি বললাম, না, এখনো পারি নি।

সে একটা কাগজ বের করে সগর্বে বললো, এই যে, এখানে একটা নাম-ঠিকানা আছে ওখানে চলে যান, ওরা আপনাকে আজ রাতটা থাকতে দেবে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। যাক, আজ রাতটা কোথাও গিয়ে গা এলিয়ে দিতে পারবো।

সভা শেষ হলে আমি ক্লাব থেকে আমার ব্যাগ উদ্ধার করে গ্রিনউইচ ভিলেজের এক অন্ধকার গলিতে ঠিকানাটা খোঁজ করে ফিরি। দরজায় টোকা দিতেই এক শ্বেতাঙ্গ দরজা খুলে আমার মুখের দিকে তাকায়, তারপর সঙ্গে সঙ্গে দরজা প্রায় ঠেলে বন্ধ করে দেয়, যেন সে মরীয়া হয়ে তার নিজেকে এবং তার সংসারকে কিছু একটা থেকে রক্ষা করছে।

অতি দ্রুত বেগে তার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসে, কি চাই আপনার?
কাগজে যার নাম লেখা ছিল আমি তার খোঁজ জানতে চাই।
লোকটি বললো, ওরা এখানে নেই।
কখন ফিরবে?
দ্রুত অসংলগ্ন অস্পষ্ট গলায় আমি জানি না বলতে বলতে সে একটু একটু করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

আমি ওখান থেকে চলে আসি। যে বাড়িতে আমার চেহারা দেখামাত্র লোকের মনে ভয় ঢুকে যায় সেখানে কেমন করে আমি রাত্রি যাপন করবো? আমি ক্লাবে ফিরে যাই। সেখানে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কাপ্তেনকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তাদেরকে এড়াবার জন্য আমি রাস্তার অপর পাশে চলে যাই। আমি একটা খবরের কাগজের স্ট্যান্ডের বিক্রেতার দিকে এগিয়ে যাই। তখন প্রায় তিনটা বাজে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হারলেম কোথায়?
লোকটি চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখে। আমি আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি ফেটে পড়ি : ঈশ্বরের দোহাই! আমি এই শহরে নতুন এসেছি। হারলেম কোথায় আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি!
লোকটি চোখ মিটমিট করলো, তারপর অস্পষ্টভাবে একদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, ওই দিকে।
তার পথনির্দেশ কোনো কাজ দেয় না। আমি হাঁটতে থাকি। শিকাগো ক্লাবের এক সদস্যের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এখনো কোনো জায়গা পাও নি?
আমি বললাম, না। আমি কোনো হোটেলে চেষ্টা করতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে একজন হোটেল কেরানির সঙ্গে আমার গায়ের রঙ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবার মেজাজ নেই আমার।
ও বললো, গড ড্যাম। আচ্ছা, এক মিনিট অপেক্ষা করো।
আমি অপেক্ষা করি। ও ছুটে চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরেই ও একজন মোটা ভারি দেহের শ্বেতাঙ্গ রমণীকে নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। ও আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার পর মহিলা বললেন, আপনি আজ রাতে আমাদের ওখানে ঘুমাতে পারেন।
আমি তার সঙ্গে তার অ্যাপার্টমেন্টে যাই। তিনি আমাকে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি তাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই, তারপর রান্নাঘর গিয়ে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়ি। সকাল ছটায় উঠে আমি জামাকাপড় পরি, তাদের দরজায় টোকা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাই, তারপর ফুটপাথে নেমে আসি। আমি একটা বেঞ্চে বসি, কাগজ-পেন্সিল বের করি, তারপর জন রীড ক্লাবগুলি টিকিয়ে রাখার পক্ষে যে সব যুক্তি প্রদান করবো তা নোট করি, আবারো ক্লাবগুলির সমস্যা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। যা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা হলো : এই অভিশপ্ত দেশে

একজন নিগ্রোর পক্ষে কি অর্থ-মানবের জীবন যাপন করা কখনো সম্ভব?
আমি সেদিন কংগ্রেসের সবগুলো অধিবেশনে যোগ দিই, কিন্তু আমি যা শুনি তা আমাকে স্পর্শ করে না। সেদিন রাতে আমি নিজেই পথ খুঁজে হারলেমে যাই, কালো প্রাণে আকীর্ণ ফুটপাথ ধরে হাঁটি। আমি পথচারিদের জিজ্ঞাসা করে করে অবাক হয়ে অবিশ্বাস করি যে, হারলেমে বলতে গেলে, নিগ্রোদের জন্য কোনো হোটেল নেই। আমি হাঁটতে থাকি। অবশেষে আমি একটি সুইচ পরিচ্ছন্ন হোটেল দেখতে পাই, কৃষ্ণাঙ্গ লোকজন তার দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করছে, আর কোথাও কোনো শ্বেতাঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। আশ্বার সঙ্গে আমি ভেতরে প্রবেশ করি, কিন্তু টেবিলের পেছনে একজন শ্বেতাঙ্গ কেরানি দেখে আমি একটু অবাক হই। আমি ইতস্ততঃ করি। তারপর আমি বললাম, আমি একটা ঘর নিতে চাই।
কেরানি বললো, এখানে না।
কিন্তু এটা তো হারলেম, তাই না?
হ্যাঁ, কিন্তু এই হোটেল শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য।
কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য হোটেল কোথায় আছে?
ও বললো, আপনি ওয়াই-তে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।
ওটা কোন দিকে?
সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ওই দিকে হাঁটতে থাকুন।
আধ ঘণ্টা পরে আমি নিগ্রো ইয়ং মেনস ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের জিম ক্রো-বাদের ওই দুর্গে গিয়ে পৌছাই। আমি একটা ঘর নিই, স্নান করি।
তারপর টানা বারো ঘণ্টা ঘুম দিই।
জেগে ওঠার পর আমার আর সম্মেলনে যেতে ইচ্ছা করে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবি : আমাকে তো চলতে হবে... কেমন করে তা আমাকে আবার শিখতে হবে...
আমি জামাকাপড় পরে নিই, তারপর যে সভায় ক্লাবগুলি বিলুপ্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তাতে যোগ দিই। চটপট সভা শুরু হয়। একজন ইতিহাস তুলে ধরেন এবং তারপর তাদের বিলুপ্তির প্রস্তাব করেন। বিতর্ক শুরু হয়। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ লেখকদের জন্য ক্লাব কী অর্থ বহন করে তা ব্যাখ্যা করি এবং ক্লাবগুলি চালু রাখার আবেদন জানাই। নীরবতার মধ্যে আমি বসে পড়ি। বিতর্ক সমাপ্ত হয়। বিষয়টি ভোটে দেয়া হলে বিলুপ্তির পক্ষে ঘরভর্তি উত্তোলিত হাত দেখা যায়। এরপর ভিন্ন মতাবলম্বীদের হাত তুলতে বলা হয়। একমাত্র আমার হাত উপরে ওঠে। আমি বুঝতে পারি যে, আমার এই অবস্থান কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধিতা বলে গণ্য হবে, কিন্তু আমি মনে মনে বলি, গোল্লায় যাক এই সব!
নিউইয়র্ক সম্পর্কে আমার আর কোনো উৎসাহ থাকে না। পরদিন সকালে আমি বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

ক্লাবগুলি বিপ্লবের পর পার্টির সঙ্গে সকল সম্পর্ক থেকে আমি মুক্ত হই। পার্টি আমাকে শাসন করা হয় সেই ভয়ে আমি ইউনিট মিটিংগুলি এড়িয়ে চলি। কখনো কখনো, সন্ধেভ্রমণে উপাদান থেকে দূরে থাকার পার্টি নীতি উপেক্ষা করে কোনো কোনো নিয়া কম্যুনিষ্ট আমার বাড়ি আসে এবং সম্প্রতি কম্যুনিস্টরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনছে আমাকে তা জানায়। আমি অবাক হয়ে শুনি যে বাড়ি নিলসন আমাকে প্রতিক্রিয়ার ঘোরাঘোরবার বলে চিহ্নিত করেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তিনি আমাকে এ নামে চিহ্নিত করলেন?

উত্তর পেলাম, তিনি বলেছেন, তুমি একটা ক্ষুদ্র অধঃপতিত বুর্জোয়া।

কথাটার মানে কি?

তুমি তোমার ধ্যান-ধারণা দিয়ে পার্টিকে কলুষিত করছো।

কিভাবে?

এর কোনো উত্তর পাই না আমি। আমি স্থির করলাম যে, পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমাকে পার্টি ত্যাগ করতে হবে। আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ দিন দিন বাড়তে থাকে, আর আমি কোনো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করায় নিলসন উত্তেজিত হয়ে আরো নানা উদ্ভট শব্দগুচ্ছ তৈরি করে চলে। আমাকে বলা হলো একজন জারজ বুদ্ধিজীবী, একজন প্রাথমিক স্তরের ট্রটস্কিবাদী; দাবি করা হলো যে, আমার মধ্যে নেতৃত্ববিরোধী প্রবণতা আছে, আমি দেবদূতসুলভ প্রবণতা দেখাচ্ছি, শেষ শব্দগুচ্ছটির অর্থ হলো, আমি জীবন সংগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, আমি নিজেকে বিবেচনা করছি একজন অভ্রান্ত দেবদূত রূপে।

আমি এইসব অভিযোগ হালকাভাবে বাতিল করে দিতে পারি না, কারণ তখন পার্টির সদস্যদের মধ্যে ট্রটস্কিপন্থীদের চিহ্নিত করার জন্য একটা স্নায়ুবৈকল্যতাড়িত উন্মত্ত খোঁজ চলছিল। সেভিয়েত ইউনিয়নে ট্রটস্কিপন্থীদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল। সেভিয়েত ইউনিয়নে বাস করলে আমার কী অবস্থা হতো রাত জেগে শুয়ে শুয়ে আমি সে কথা ভাবি।

আমি সারাদিন কাজ করি, অর্ধেক রাত ধরে লিখি, ফলে বুকে প্রচণ্ড অসুস্থতায় আক্রান্ত হই। সারাক্ষণ বুক ব্যথা করে, নিঃশ্বাস নিতে পারি না প্রায়। পার্টিতে আমি কি রকম জীবন যাপন করেছি শুয়ে শুয়ে তার পর্যালোচনা করি আর আমার কাছে তা খুব অরুচিকর মনে হয়। আমি উপলব্ধি করি যে, ক্লাবগুলি বাঁচাবার অলীক উচ্চ আদর্শিক যুদ্ধে আমি নৈর্ব্যক্তিক ছিলাম না। আমি ক্লাবগুলির জন্য যতটা যুদ্ধ করেছি আমার নিজের জন্যও ততোটা করেছি। কিন্তু সেটা কি অন্যায়? আমি আবারো সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি পার্টি ত্যাগ করবো, এর সদস্যপদের জন্য যে আবেগগত মূল্য দিতে হচ্ছে তা বড় বেশি উঁচু।

আমার অসুস্থতার সময় একদিন সকালে আমি আমার দরজায় একটা টোকার শব্দ

শুনি। দু এর মিনিট পরে [illegible] কথাবার্তা শুনতে পেলাম। ও যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন হলওয়ে ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। ও যার সঙ্গে কথা বলছিল তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাই। আমি জানতাম সে তিনি আমাকে বিছানায় শুয়ে থেকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাই। আমি জানতাম সে তিনি আমাকে পার্টির একজন চতুর ও দৃঢ়প্রত্যয় শত্রু মনে করেন। আমার চোখের কিনারা ঘামে ভরে ওঠে।

আমি নীরস গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই আপনার? সেখানে যে আমি অসুস্থ। ট্রন বললো, আমি পার্টির কাজ থেকে আপনার জন্য একটা খাতা নিয়ে এসেছি। আমি তাকে ও সঙ্কথন জানাই নি, সেও জানায় নি। সে হাসে নি, আমিও হাসি নি। সে কৌতূহলী চোখে আমার বিবর্ণ মলিন ঘরের দিকে তাকায়।

আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম, এই হলো একজন জারজ বুদ্ধিজীবীর বাড়ি।

সে পলকহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি তার ওই রকম পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য করতে পারি না। সাধারণ সৌজন্য আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, বসুন।

ওর কাঁধ শক্ত হয়ে ওঠে।

একজন সেনা-অফিসারের ভঙ্গিতে সে বললো, আমার তাড়া আছে।

তো, আপনি আমাকে কি বলতে চান?

ট্রন জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি বাড়ি নিলসনকে চেনেন?

আমি বললাম, না, তবে আমি ওর কথা শুনেছি।

আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। এটা কি কোনো রাজনৈতিক ফাঁদ? ওরা আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ খুঁড়ে নিয়েছে, আমি মনে করি আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার কোনো ভিত্তিভূমি নেই। রাজনৈতিক দিক থেকে আমার পরিচয় থাকা উচিত নয় এমন কাউকে আমি চিনি, ও কি সেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে? কিন্তু বাড়ি নিলসন তো কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্য। কিন্তু বাড়ি নিলসন যদি হঠাৎ কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে থাকে, আর এড গ্রিন এখন জানার চেষ্টা করছে আমি তাকে চিনি কিনা?

কি ধরনের বাস্তবতার সঙ্গে আমাকে লড়তে হচ্ছে তা না জানা পর্যন্ত আমি কোনো পক্ষে নিজেকে সমর্পণ করি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ি নিলসন সম্পর্কে কি বলতে চান আপনি?

এড গ্রিন বললো, উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আমি একটু সহজ হই। বর্তমানে একটু ভয়ের অনুভূতি ছাড়া আমি কোনো কম্যুনিষ্টের সঙ্গে দেখা করতে পারি না।

তখনো অবশ্য আমার সন্দেহ দূর হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

তিনি আপনার পার্টির কাজ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ক্লাবগুলি বিলুপ্তির পর পার্টির সঙ্গে সকল সম্পর্ক থেকে আমি মুক্ত হই। পাছে আমাকে শাসন করা হয় সেই ভয়ে আমি ইউনিট মিটিংগুলি এড়িয়ে চলি। কখনো কখনো, সন্দেহভাজন উপাদান থেকে দূরে থাকার পার্টি নীতি উপেক্ষা করে কোনো কোনো নিম্ন কম্যুনিস্ট আমার বাড়ি আসে এবং সম্প্রতি কম্যুনিস্টরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনছে আমাকে তা জানায়। আমি অবাক হয়ে শুনি যে বাডি নিলসন আমাকে প্রতিক্রিয়ার চোরাকারবারি বলে চিহ্নিত করেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তিনি আমাকে এ নামে চিহ্নিত করলেন?

উত্তর পেলাম, তিনি বলেছেন, তুমি একটা ক্ষুদ্র অধঃপতিত বুর্জোয়া।

কথাটার মানে কি?

তুমি তোমার ধ্যান-ধারণা দিয়ে পার্টিকে কলুষিত করছো।

কিভাবে?

এর কোনো উত্তর পাই না আমি। আমি স্থির করলাম যে, পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমাকে পার্টি ত্যাগ করতে হবে। আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ দিন দিন বাড়তে থাকে, আর আমি কোনো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করায় নিলসন উত্তেজিত হয়ে আরো নানা উদ্ভট শব্দগুচ্ছ তৈরি করে চলে। আমাকে বলা হলো একজন জারজ বুদ্ধিজীবী, একজন প্রাথমিক স্তরের ট্রটস্কিবাদী; দাবি করা হলো যে, আমার মধ্যে নেতৃত্ববিরোধী প্রবণতা আছে, আমি দেবদূততুল্য প্রবণতা দেখাচ্ছি, শেষ শব্দগুচ্ছটির অর্থ হলো, আমি জীবন সংগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, আমি নিজেকে বিবেচনা করছি একজন অভ্রান্ত দেবদূত রূপে।

আমি এইসব অভিযোগ হালকাভাবে বাতিল করে দিতে পারি না, কারণ তখন পার্টির সদস্যদের মধ্যে ট্রটস্কিপন্থীদের চিহ্নত করার জন্য একটা স্নায়ুবৈকল্যতাড়িত উন্মত্ত খোঁজ চলছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রটস্কিপন্থীদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস করলে আমার কী অবস্থা হতো রাত জেগে শুয়ে শুয়ে আমি সে কথা ভাবি।

আমি সারাদিন কাজ করি, অর্ধেক রাত ধরে লিখি, ফলে বুকে প্রচণ্ড অসুস্থতায় আক্রান্ত হই। সারাক্ষণ বুক ব্যথা করে, নিঃশ্বাস নিতে পারি না প্রায়। পার্টিতে আমি কি রকম জীবন যাপন করেছি শুয়ে শুয়ে তার পর্যালোচনা করি আর আমার কাছে তা খুব অরুচিকর মনে হয়। আমি উপলব্ধি করি যে, ক্লাবগুলি বাঁচাবার অলীক উচ্চ আদর্শিক যুদ্ধে আমি নৈর্ব্যক্তিক ছিলাম না। আমি ক্লাবগুলির জন্য যতটা যুদ্ধ করেছি আমার নিজের জন্যও ততোটা করেছি। কিন্তু সেটা কি অন্যায়? আমি আবারো সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি পার্টি ত্যাগ করবো, এর সদস্যপদের জন্য যে আবেগগত মূল্য দিতে হচ্ছে তা বড় বেশি উঁচু।

আমার অসুস্থতার সময় একদিন সকালে আমি আমার দরজায় একটা টোকার শব্দ

পাই। মা এড গ্রিনকে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি যখন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন ইনিই জানতে চেয়েছিলেন ও সব নিয়ে আমি কি করবো। আমি বিছানায় শুয়ে থেকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাই। আমি জানতাম যে তিনি আমাকে পার্টির একজন চতুর ও কৃতশপথ শত্রু মনে করেন। আমার চেহারা দেখে তিনি ঘাবড়ে ওঠে।

আমি নীরস গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই আপনার? দেখছেন তো আমি অসুস্থ।

গ্রিন বললো, আমি পার্টির কাছ থেকে আপনার জন্য একটা কথা নিয়ে এসেছি। আমি তাকে শুভ সন্ধ্যায়ণ জানাই নি, সেও জানায় নি। সে হাসে নি, আমিও হাসি নি। সে কৌতূহলী চোখে আমার বিবর্ণ মলিন ঘরের দিকে তাকায়।

আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম, এই হলো একজন জারজ বুদ্ধিজীবীর বাড়ি।

সে পলকহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি তার ওই রকম পথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য করতে পারি না। সাধারণ সৌজন্য আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, বসুন।

ওর কাঁধ শক্ত হয়ে ওঠে।

একজন সেনা-অফিসারের ভঙ্গিতে সে বললো, আমার তাড়া আছে।

তো, আপনি আমাকে কি বলতে চান?

গ্রিন জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি বাডি নিলসনকে চেনেন?

আমি বললাম, না, তবে আমি ওর কথা শুনেছি।

আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। এটা কি কোনো রাজনৈতিক ফাঁদ? ওরা আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ছুঁড়ে দিয়েছে, আমি মনে করি আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার কোনো ভিত্তিভূমি নেই। রাজনৈতিক দিক থেকে আমার পরিচয় থাকা উচিত নয় এমন কাউকে আমি চিনি, ও কি সেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে? কিন্তু বাডি নিলসন তো কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্য। কিন্তু বাডি নিলসন যদি হঠাৎ কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে থাকে, আর এড গ্রিন এখন জানার চেষ্টা করছে আমি তাকে চিনি কিনা?

কি ধরনের বাস্তবতার সঙ্গে আমাকে লড়তে হচ্ছে তা না জানা পর্যন্ত আমি কোনো পক্ষে নিজেকে সমর্পণ করি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাডি নিলসন সম্পর্কে কি বলতে চান আপনি?

এড গ্রিন বললো, উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আমি একটু সহজ হই। বর্তমানে একটু ভয়ের অনুভূতি ছাড়া আমি কোনো কম্যুনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে পারি না।

তখনো অবশ্য আমার সন্দেহ দূর হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

তিনি আপনার পার্টির কাজ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আমি বললাম, আমি অসুস্থ। সেরে ওঠার আগে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারছি না।

এড গ্রিন এক সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশ সময় দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর তার গোডালির ওপর ঘুরে ঋজু পদক্ষেপে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

বাডি নিলসনের সঙ্গে কি আমার দেখা করা উচিত? মার্কিন নিগ্রোদের সম্পর্কে কম্যুনিস্ট অবস্থানের নীতি তিনিই প্রণয়ন করেন; তিনি ক্রেমলিনে বক্তৃতা দিয়েছেন; স্বয়ং স্তালিনের সামনে তিনি কথা বলেছেন। তাহলে কম্যুনিজমের যে নানা দিক আমাকে বিভ্রান্ত করেছে তা হয়তো তিনি আমার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। যাই হোক, আমি তাঁর মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নিই। আমি তাঁকে কয়েকটা সরাসরি সরল প্রশ্ন করবো এবং তাঁর কী বলার আছে তা শুনবো।

আমার বুকের ব্যথা প্রশমিত হলে আমি বাডি নিলসনের সঙ্গে সাক্ষাতের দিনক্ষণ ঠিক করি। তিনি ছিলেন একজন বেঁটেখাটো, সদা হাসাময় কালো মানুষ; পুরু ঠোঁট, আচার-আচরণে একটা গোপন ভাব, একটা তেলতেলে ঘর্মাক্ত চোখের দৃষ্টি, ভাবভঙ্গিতে অস্থিরতা ও আত্মসচেতনতা। তিনি যেন সব সময় ভেতরে একটা প্রপাঢ় বিরক্তি লুকিয়ে রাখছেন। তিনি কথা বলেন ছোট ছোট কাটাকাটা বাক্যে; একটু মুক্ত, পরস্পর সম্পৃক্ত ভাবে তিনি যেন এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় দ্রুত লাফিয়ে যান। তিনি হাঁপানির রোগী এবং অপ্রত্যাশিত বিরতির সময় নাক দিয়ে শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। তিনি তাঁর কথার প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে একটা হুইস্কির বোতল থেকে এক চুমুক পান করেন। অর্ধেক পৃথিবী তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর কথাবার্তায় ইউরোপীয় নগরগুলির প্রসঙ্গ আবছাভাবে ঘুরেফিরে আসে। আমি তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, মন দিয়ে তাঁর কথা শুনি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে দেখি, কারণ আমি জানতাম যে আমি বিশ্ব কম্যুনিজমের একজন নেতার সামনে বসে আছি।

তিনি নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে বললেন, হ্যালো, রাইট, আমি তোমার কথা শুনেছি।

আমরা করমর্দন করি আর তিনি হা হা করে হেসে ওঠেন, আপাত দৃষ্টিতে অকারণে, আর আমি বুঝতে পারি না তাঁর আনন্দ কি আমার কারণে, নাকি তাঁর অস্বস্তি গোপন রাখার জন্য।

আমি বললাম, আশা করি আমার সম্পর্কে আপনি ভাল কথাই শুনেছেন।

তিনি আবার হেসে উঠে আমাকে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, বসো। ওরা আমাকে বলেছে যে তুমি লেখালেখি করো...

আমি বললাম, চেষ্টা করি।

তিনি নাক দিয়ে একটা শব্দ করে বললেন, তুমি লিখতে পারো। জো লুই সম্পর্কে নিউ মাসেস এ তোমার লেখাটা আমি পড়েছি। ভাল লেখা, ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের প্রথম

রাজনৈতিক আলোচনা... হা হা...

আমি বললাম, আমি নিজের অভিজ্ঞতার অর্থটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

তিনি একটু স্তাবকতার সুরে বললেন, তোমার মতো লোকের আমাদের দরকার।

আমি অপেক্ষা করে থাকি। আমি ভেবেছিলাম আমি একজন কম্যুনিস্ট অধিকারী লোকের দেখা পাবো, কিন্তু তিনি তা নন। তা হলে হয়তো তিনি কাজের মানুষ? কিন্তু তারও কোরো ইঙ্গিত আমি পাই না। আমরা কথা বলতে থাকি আর আমি এই সময়ে তাঁর কথাসূত্রের কাঠামোটা ধরার চেষ্টা করি যেন তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে তা আমি বুঝতে পারি।

তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা আমাকে বলেছে তুমি নাকি রস-এর বন্ধু।

উত্তর দেবার আগে আমি একটু থামি। তিনি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন যে, নিরপেক্ষভাবে শুধু একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন, একটু খোঁচানোর ভঙ্গিতে। আমি মনে মনে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিই যে আমি কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্যের সঙ্গে কথা বলছি। আমি শুনেছি যে নেতৃত্ব বিরোধিতা-র কারণে রসকে বহিষ্কার করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে, আর এখন কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্য আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন আগু বহিষ্কৃত হতে যাওয়া একজন লোকের আমি বন্ধু কিনা, তার অর্থ তিনি আমাকে পরোক্ষ জিজ্ঞাসা করছেন আমি পার্টির অনুগত, না অনুগত নই। আমি অকপটভাবে জবাব দিই, রস আমার বিশেষ কোনো বন্ধু নয়, তবে তাকে আমি ভালভাবেই চিনি, বস্তুতপক্ষে খুব ভালভাবেই চিনি।

তাঁর প্রশ্নের মধ্যে যে কঠোর হুমকি ছিল তাকে কোমল করার জন্য তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, ও যদি তোমার বন্ধু না হয়ে থাকে তাহলে তুমি ওকে ভালভাবে চিনলে কি করে?

আমি বললাম, আমি ওর জীবনের একটা ইতিবৃত্ত লিখছিলাম। তাই আমি হয়তো ওকে অন্যদের চাইতে বেশি ভালভাবে চিনি।

নিলসন বললেন, হ্যাঁ, আমি এটার কথা শুনেছি। রাইট-হা-হা-তো, আমি তোমাকে ডিক বলে সম্বোধন করতে পারি, কি বলো?

করুন।

তিনি বললেন, ডিক, রস জাতীয়তাবাদী।

তাঁর অভিযোগ আমার বুকে গেঁথে যাবার জন্য তিনি একটু থামলেন। তিনি বোঝাতে চান যে রসের জঙ্গীত্ব চরম প্রকৃতির। তিনি বললেন, আমরা কম্যুনিস্টরা নিম্নো জাতীয়তাবাদকে নাটকীয় করি না। তিনি তাঁর উক্তির মধ্যে হাসি, অভিযোগ এবং হালকা শৈথিল্য মিশিয়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বলতে চান?

এবার তিনি সরাসরি বললেন, আমরা রসকে জিজ্ঞাসিত করছি না।

আমি বললাম, আমরা দুটো ভিন্ন জিনিস সম্পর্কে কথা বলছি। আমি রসকে জনপ্রিয় করে তুলবো এ নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হয়, কারণ রস আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, কিন্তু তাঁর রাজনীতিতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

লোকটিকে আমার মনে হয়েছিল যে নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করতে আসা নিম্নোদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। আমি তার জীবনের একটা ঘটনা নিয়ে একটা গল্প লিখি। সে-গল্প ইতিমধ্যে আমি বিক্রিও করেছি।

নিলসন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ঘটনাটা কি ছিল? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বললাম, তেরো বছর বয়সের সময় ও একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল।

এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখ ফাঁকা দেখায়, তারপরই তিনি হেসে উঠে বললেন, ওহ্, আমি ভেবেছিলাম রাজনৈতিক কিছু। তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন।

আমি ব্যাখ্যা করে বললাম, আমি আপনাকে বলছি যে, আপনি ভুল করছেন। আমি আমার লেখার সাহায্যে আপনাদের সঙ্গে লড়ার চেষ্টা করছি না। আমার কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমি বিশেষ কোনো কমরেডকে আঘাত করতে চাই না, সাহায্যও করতে চাই না। আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে। আমি নিগ্রো জীবনকে আঁকার চেষ্টা করছি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, রস সম্পর্কে তোমার লেখাটা শেষ কবেছো?

আমি বললাম, না। ওই পরিকল্পনাটা আমি বাদ দিয়েছি। আমাদের পার্টি সদস্যরা আমাকে সন্দেহ করে, তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়।

তিনি হাসলেন। দন্ত বিকশিত করে তিনি বললেন, আমাদেরকে তোমার আরেকটু ভাল করে চিনতে হবে, ডিক। আমি পার্টিতে বেশ উঁচু পদে আছি। তোমার ওই ব্যাপারটা আমি ঠিক করে দেবো।

আমি বললাম, আমি কোনো পৃষ্ঠপোষক খুঁজছি না কিন্তু।

তিনি হাসতে হাসতে, নাক দিয়ে একটা শব্দ করে বললেন, আমি সে কথা বলতে চাই নি। নাও, ডিক, এক চুমুক সুরা পান করো।

না, ধন্যবাদ।

তুমি মদ খাও না?

কখনো কখনো খাই।

কিছু মানুষ আছে যাদের সঙ্গে আপনি সুরা পান করতে পারেন, আর কিছু মানুষ আছে যাদের সঙ্গে আপনি সুরা পান করতে পারেন না। নিলসন হচ্ছেন তাদের একজন যার সঙ্গে বসে আমি সুরা পান করতে পারতাম না। তিনি এক চুমুক খেলেন, তারপর বোতলটা সরিয়ে রাখলেন। তিনি আমার দিকে একটি তুরিৎ আত্মসচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমি টানটান হয়ে উঠলেও নিজেকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখি।

তিনি আরম্ভ করলেন, ডিক, আমাদের লোকবল কম। আমরা এখন একটা গভীর

সঙ্কটের মুখোমুখী।

আমি বললাম, পার্টি সর্বদাই সঙ্কটের মুখোমুখী।

তাঁর মুখের হাসি অন্তর্হিত হয়। তিনি স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি হতাশাবাদী নও, তাই না ডিক?

আমি বললাম, না, কিন্তু কথাটা সত্য। প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে একটা না একটা সঙ্কট আছেই।

তিনি হাসলেন, আবার নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করলেন, তারপর বললেন, তুমি একটা মজার লোক। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমরা আমাদের কাজে পরিবর্তন আনছি। বিপদ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ, সকল মানুষের জন্য এখন তা একটা বড় বিপদ।

আমি বললাম, আমি বুঝতে পারছি।

তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন, তুমি অল্প কিছুদিন আগে নিউইয়র্কে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ।

যেখানে কোনো পার্টি নেতাদের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?

না।

তোমার এখানকার কাজ সম্পর্কে তুমি কারো সঙ্গে কোনো কথা বলো নি?

আমি বড় বড় চোখে তাঁর দিকে তাকাই। আমি জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তার কোনো অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেছি কিনা তিনি কি সেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন? তাঁর জন্য ঝামেলা বাঁধাতে পারি আমার তেমন রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে কিনা তিনি কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেষ্টা করছেন?

আমি বললাম, আমি তো আপনাকে বলেছি যে, আমার কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওরা বলছে যে তুমি ক্লাবগুলির বিলুপ্তি চাও নি।

আমি সত্য কথা বললাম, হ্যাঁ, আমি তা চাই নি। আমার মনে হয়েছিল যে, পার্টির সেরা লেখকদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

হাঁপানির টানে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে তিনি তাঁর চিন্তাধারা পরিবর্তন করে বললেন, ফ্যাসিস্টদের আমাদের পরাভূত করতেই হবে। আমরা তোমার বিষয়ে আলোচনা করেছি। তোমার ক্ষমতা আছে। আমরা চাই যে, তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো। আমাদের কাজের সঙ্কীর্ণ ধারা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের কাজ করতে হবে গির্জার লোকজন, ছাত্র, ক্লাবের জনগণ, পেশাদার মানুষ, মধ্যবিত্ত সমাজ ... সবার সঙ্গে।

আমি বললাম, নিচু গলায়; আমাকে গালাগাল করা হয়েছে, সেটা কি সঙ্কীর্ণ ধারা

থেকে সরে আসা?

তিনি হাতের হাতের বললেন, ওসব কথা ভুলে যাও।

পালাগান করার কথা তিনি অস্বীকার করলেন না। তার মানে আমি যদি তাঁর কথা না শুনি তাহলে পালাগান আবার শুরু হবে।

আমি খোলাখুলিভাবে বললাম, আমি রাগ থাইয়ে নিতে পারবো কিনা আমি জানি না।

আমরা তোমার ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিতে চাই।

আমাকে কি করতে হবে?

আমরা চাই যে, জীবনযাত্রার উচ্চ মূল্যের বিরুদ্ধে তুমি একটা কমিটি সংগঠিত করো...

আমি সবিস্ময়ে টক করে বলি, জীবনযাত্রার উচ্চ মূল্য? ও সব বিষয়ে আমি কি জানি?

ওটা খুব সোজা কাজ। তুমি শিখে নিতে পারবে।

আমি একটা উপন্যাস রচনা করছিলাম আর তিনি আমাকে সে কাজ থেকে সরিয়ে এনে মুদি দোকানের হৈচৈসপত্রের তালিকা তৈরি করতে বলছেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি যা করার চেষ্টা করছি সেটা সম্পর্কে স্পষ্টতই তিনি বিশেষ কিছু ভাবেন না।

আমি বললাম, কমরেড নিলসন, যে লেখক উল্লেখযোগ্য কিছু লেখে নি সে অবশ্যই খুব অনিশ্চিত মানুষ। আমি এখন সেই পর্যায়ে আছি, তবু আমার মনে হয় আমি লিখতে পারি। আমি বিশেষ কোনো অনুগ্রহ চাইছি না, কিন্তু আমি এখন একটা বই রচনার মাঝপথে আছি। আমি আশা করছি মাস ছয়েকের মধ্যে আমি কাজটা শেষ করতে পারবো। আগে আমি নিজের কাছে প্রমাণ করি যে, লেখার জন্য লালায়িত হওয়াটা আমার একটা ভুল, তখন আমি আপনাদের সঙ্গে আগাগোড়া থাকবো।

তিনি বললেন, পার্টি অপেক্ষা করতে পারবে না। তুমি লেখার সময় পাবে।

আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি পার্টির কাছ থেকে টাকা পাচ্ছেন সে কথা স্মরণ করে আমি বললাম, আমি জীবিকার জন্য প্রতিদিন কাজ করি।

তিনি বললেন, শোনো আমরা তোমাকে জনগণের নেতা বানাতে চাই।

কিন্তু, ধরুন আমি সে ধরনের মালমশলা নই?

তিনি হেসে উঠালেন। আমার একটি কথাও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন নি। আমাদের কথাবার্তা ছিল একটা খেলা। ওই বুদ্ধির খেলায় তিনি আমাকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কাছে অন্যের আবেগ-অনুভূতি ছিল মূল্যহীন।

তিনি তাঁর চেয়ারে ঘুরে বসে তাঁর হাত নাড়লেন, যেন বিরক্তি ঘটানো একটা পোকাকে ঝেড়ে ফেলছেন, তোমাকে পৌঁছতে হবে...

আমি বললাম, আমার কিছু লেখা তো আপনি দেখেছেন, আপনার কি মনে হয় না এর ভিত্তিতে আমাকে অন্তত একটা সুযোগ দেয়া যায়?

তিনি বললেন, পার্টি তোমার অনুভূতি নিয়ে ভাবতে পারে না।

এবার আমি পুরোপুরিভাবে কথাটা বললাম, হয়তো আমি আর পার্টিতে অনুভূতি রাখি না।

তিনি নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহ, না! ও কথা বলো না। তুমি দেখছি রীতিমত চাঁছাছোলা।

আমি বললাম, আমি যে রকম অনুভব করি সে রকম করেই বলি। আপনার সঙ্গে আমি সোজাসুজি, ঠিকভাবে শুরু করতে চাই। পার্টিতে আমার মানানরকম বেরকম হয়েছে।

তিনি হেসে উঠে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর বললেন, তোমার মুশকিল হয়েছে কোথায় জানো? তুমি সাউথ সাইডের শ্বেতাঙ্গ শিল্পীদের সঙ্গে বড় বেশি সময় কাটিয়েছো... তুমি ওদের মতো করে কথা পর্যন্ত বলো। তোমাকে তোমার নিজের মানুষদের চিনতে হবে...

আমি বুঝতে পারি যে, ওঁর সঙ্গে আমি কখনই সত্যিকার কথাবার্তা বলতে পারবো না। আমি শুধু বললাম, আমার মনে হয় আমি আমার মানুষদের চিনি। আমি সাউথ সাইডের নিগ্রোদের তিন-চতুর্থাংশের বাড়িতে গিয়েছি...

তিনি বললেন, কিন্তু তোমাকে ওদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

আমি বললাম, আমি রসের সঙ্গে কাজ করছিলাম আর ওরা তখন আমাকে ওপ্তচর বলে সন্দেহ করে।

একটা নীরবতা নেমে এলো। এমন সময় দরজায় ঘন্টির শব্দ হয়। নিলসন দরজা খুলে দিলে তার স্ত্রী ঘরে ঢোকেন, একজন শ্বেতাঙ্গ আকর্ষণীয় শ্যামলা রঙের ইটালীয় মহিলা, হাতে একটা বই। মুখভরা হাসি নিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন।

নিলসন আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি পড়ছেন আপনি?

সাগ্রহে বইটা দেখিয়ে তিনি বললেন, একটা ট্রুকুলার রহস্য গল্প, তারপর বললেন, দেখো, ডিক, সাউথ সাইডে তোমার আর আমার নিগ্রো সংস্কৃতি নির্মাণ করা উচিত।

আমি বললাম, আমি এইমাত্র নিলসনকে সে সুযোগ দেয়ার কথাই বলছিলাম। আমি অবশ্য মনে মনে ভাবছিলাম, ট্রুকুলা রহস্য আর নিগ্রো সংস্কৃতির মাঝে যোগসূত্র কোথায়।

নিলসন তার স্ত্রীকে বললেন আমি চাইছিলাম ও উচ্চ মূল্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলুক। কিন্তু ও একটা বই লিখছে...

মহিলা আমার সমস্যার একটা সহজ বাস্তবিক সমাধান নিয়ে বললেন, সেটা ওর বই

লেখার কাজে কোনো বাধা হওয়া উচিত নয়।

আমি জানালাম, আমি দিনে কাজ করি।

তিনি লঘু কণ্ঠে বললেন, ওহ, তুমি ঠিক সময় করে নিতে পারবে।

তুমি ঘর ছেড়ে গেলেন। আবার নীরবতা নেমে আসে। এবার কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সদস্যের কাছ থেকে পরের কথাটি আসার সময় হয়।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, ডিক, পার্টির সিদ্ধান্ত তোমাকে এ কাজটা নিতে হবে।

আমি চুপ করে থাকি। তাঁর কথার অর্থ আমি জানি। একটা সিদ্ধান্ত হলো পার্টির সর্বোচ্চ আদেশ আর সে সিদ্ধান্ত অমান্য করার ফলে পার্টির কাজ করার ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। নীতি হিসেবে আমি আন্তরিকভাবে এর সঙ্গে এক মত, কারণ আমি জানি যে শ্রমিক শ্রেণী কর্মের ঐক্য অর্জন করতে না পারলে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ারসমূহ নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। শতাব্দির পর শতাব্দি তারা নির্যাতিত হয়েছে। তাদেরকে বিভক্ত হতাশগ্রস্ত ও দুর্নীতি আক্রান্ত ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। আমি এক সময় যেমন ছিলাম এখন তারা সেই রকম সন্দিগ্ধ ও আস্থাহীন। আর কম্যুনিস্ট পদ্ধতিই ঐতিহাসিকভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে উঠে এসেছে। এক কথায় এখন নিলসন আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করছেন, আমি কি একজন কম্যুনিষ্ট, না কম্যুনিষ্ট নই? আমি কম্যুনিষ্ট হতে চাই, তবে আমার জাতের কম্যুনিষ্ট। আমি চাই মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত দিতে, আমাদের হৃদয়কে জাগাতে। কিন্তু নিলসনকে সে কথা বলার আমার উপায় নেই। তাহলে তিনি শুধু নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস ধ্বনি করতেন।

আমি বললাম, আমি কমিটিটা সংগঠিত করে দেবো, তারপর আর কারো ওপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত করবো।

তিনি বললেন, তুমি এটা করতে চাও না, তাই না?

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, না।

তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, তুমি শ্বেতাঙ্গ লেখকদের সংগঠিত করার কাজ খুব অন্যায়ের সঙ্গে করেছিলে।

আমি বললাম, যাদের আমি বুঝতে পারতাম তাদের সংগঠিত করছিলাম আমি।

তাহলে সাউথ সাউডে তুমি এখন কি করতে চাও?

আমি নিগ্রো লেখকদের সংগঠিত করতে চাই।

কিন্তু ওটা তো পার্টির এখন দরকার নেই।

আমি উঠে দাঁড়াই। আমি বুঝতে পারি যে, কমিটি সংগঠিত করে দেবার পর আমাকে অব্যাহতি দেবার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। আমার ইচ্ছা করে তাঁকে বলি যে, আমি আর এ সবের কোনো কিছুর মধ্যে নেই, কিন্তু আমি এখনই পরিস্থিতিকে চরম পর্যায়ে পৌছে দিতে প্রস্তুত নই। আমি বেরিয়ে আসি। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি নিজের ওপর, তাঁর ওপর, পার্টির ওপর। যাই হোক, আমি ওদের সিদ্ধান্ত অমান্য করি নি, আবার

পুরোপুরি তা মেনেও নিই নি। আমি এড়িয়ে গেছি, চেষ্টা করেছি লেখার জন্য সময় বাঁচাতে, চিন্তা করার জন্য কিছু সময় দাবার।

আবার আমি নিজেকে পার্টি ছেড়ে দেবার জন্য মনে মনে তৈরি দিই, কিন্তু তখন কাজটা করতে পারি না। আমি জানি যে, নিলসন ঠিক নেতা নন। তাঁর মন বড় বেশি অনমনীয়, বড় বেশি সীমিত। আমি তাঁর মধ্যে জীবন অথবা রাজনীতিকে উপলব্ধি করার কোনো চিহ্ন দেখতে পাই নি। তিনি আমাকে সুরা পানে আমন্ত্রণ করেন, ওই উপায়ও ব্যর্থ হলে তিনি আমাকে ভয় দেখান। তিনি আমাকে তোষামোদও করেন, আর সেটাও অকার্যকর হলে তিনি আমাকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেই ভুল সম্পর্কে তিনি আমার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম হন নি। অবশেষে আমি এক মাস কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই, তারপর আমার প্রথম সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আবার তাঁর মুখোমুখি হবো।

আমার কাজ হলো অনেক রাত পর্যন্ত সভায় যোগ দেয়া, আলোচনায় অংশ নেয়া এবং সাধারণভাবে অন্যান্য কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিলে সাউথ সাইডের জনগণকে পরিচালিত করা। আমরা আবাসিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি, নিগ্রোদের অবস্থা নিয়ে উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করার জন্য নগর কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করার সর্বোত্তম পন্থা কী হতে পারে তা নিয়ে আলাপ করি। আমি দাঁতে দাঁত টিপে শুয়োরের মাংসের চপের দৈনন্দিন দামের সারণী তৈরি করি, কখন বাড়ি ফিরে লিখতে বসতে পারবো সেজন্য ব্যগ্র হয়ে থাকি। আমি অনুভব করি যে, শুয়োরের মাংসের চপ জীবনের একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান, কিন্তু তাদের দামের ওঠা-নামার রেখাচিত্র আমার বদলে অন্য কেউ তৈরি করলে আমি খুশি হতাম।

নিলসন ছিলেন আমার চাইতে বেশি চতুর। আমি তাঁর মুখোমুখি হবার সুযোগ লাভের আগেই তিনি আমার মুখোমুখি হলেন। একদিন রাতে নিলসন এবং তার এক বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমি ডাক পাই। আমি সাউথ সাইডের এক হোটেলে উপস্থিত হবার পর আমাকে একজন খর্বকায় মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তাঁর ভাবভঙ্গি ছিল নেপোলিয়নের মতো, চোখে চশমা, ঠোঁট সর্বদা কুঞ্চিত করে রাখতেন যেন গভীর কোনো চিন্তায় সদা মগ্ন, হাঁটতেন সদম্ভে, কথা বলতেন ধীরে ধীরে, নির্ভুলভাবে, তাঁর কথা যতটুকু অর্থ বহনে সক্ষম তার চাইতে বেশি অর্থ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করতেন তিনি। নাম ছিল স্মিথ, ওয়াশিংটনের লোক। তার পরিকল্পনা হলো নিগ্রোদের বর্তমান সব প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে ফেডারেল পদ্ধতিতে একটি জাতীয় নিগ্রো সংগঠন গড়ার আন্দোলন করা যেন কর্মকাণ্ডের একটা ব্যাপক ঐক্য অর্জিত হয়।

আমরা তিনজন একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে একটা টেবিলে বসি। এখন কারো মুখে হাসি নেই। আমি বুঝতে পারি যে, এবার আমাকে আরেকটি এবং শেষ প্রস্তাব দেয়া হবে, আর আমি যদি তা গ্রহণ না করি তাহলে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হবে।

স্মিথ নাটকীয় আকস্মিকতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, রাইট, সুইজারল্যান্ডে যেতে তোমার কেমন লাগবে?

আমি বললাম, ভাল লাগবে, তবে এই মুহূর্তে আমি একটা কাজের মধ্যে আছি।

নিলসন বললেন, সেটা তুমি বাদ দিতে পারো। এ ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমি জানতে চাইলাম, সুইজারল্যান্ডে আমি কি করবো?

স্মিথ বললেন, তুমি একজন যুব-প্রতিনিধি হয়ে যাবে। সেখান থেকে তুমি সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে পারো।

আমি অকপটে বললাম, প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। এখন আমি যা লিখছি সেটাতে ছেদ দিতে পারবো না আমি।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি, নীরবে ধূমপান করি।

আমি স্মিথকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যাপারে আমার মনোভাবের কথা কি নিলসন আপনাকে বলেছে?

স্মিথ কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ক্রুদ্ধ অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, রাইট, তুমি একটা বোকার হদ্দ।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। স্মিথ আমার দিক থেকে তার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অল্প সামান্য একটু রাগ দেখালেই আমি তার মুখে একটা ঘুসি বসিয়ে দিতাম। নিলসন বোকার মতো হাসলেন, নাক দিয়ে শব্দ করলেন।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম, ওটার কি দরকার ছিল?

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ছেলেবেলার কথা মনে করি। তখন আমাকে কেউ এ রকম কিছু বললে রক্ত না ঝরা পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে লড়তাম। কিন্তু এখন আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, আমার ক্রোধ আমি বশে রাখতে পারি, আমার তরঙ্গের মতো উদ্ভসিত আবেগকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমি আমার মাথায় টুপি বসিয়ে দরজার দিকে হেঁটে যাই। আমি মনে মনে বলি, শান্ত থাকো। ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দিও না...

আমি বললাম, এবার বিদায় সম্ভাষণ।

আমি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি যাই। আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম। আমি পরবর্তী ইউনিট মিটিং-এ যোগ দেবো এবং আমার দলত্যাগের কথা জানাবো। আমি কমরেডদের বলবো যে আমি এখনো পার্টির আদর্শগত কর্মসূচির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করি, কিন্তু আমি আর পার্টির সিদ্ধান্ত দ্বারা আবদ্ধ থাকতে চাই না।

আমি পরবর্তী ইউনিট মিটিং-এ যোগ দিই এবং এজেণ্ডাতে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুরোধ রক্ষিত হয়। নিলসন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইভান্স সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এড গ্রিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার বক্তব্য প্রদানের সময় হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি :

কমরেডগণ, গত দু বছর ধরে আমি প্রতিদিন আপনাদের বেশির ভাগ লোকের সঙ্গে কাজ করেছি। তা সত্ত্বেও আমি কিছু কাল ধরে পার্টির মধ্যে নিজেকে একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দেখেছি। ওই কঠিন অবস্থা কেন ঘটেছে সে এক দীর্ঘ কাহিনী, সেটা আর আমি এখন বর্ণনা করতে চাই না। তাতে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমার মনে হয়, আমি আমার সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছি। আমি এখানে আজ রাতে প্রস্তাব করছি যে, পার্টির তালিকায় সদস্যপদ থেকে আমার নাম খারিজ করে দেয়া হোক। কোনো আদর্শগত মতদ্বৈততার কারণে আমি এ কথা বলছি না, আমি শুধু পার্টির সিদ্ধান্ত দ্বারা আবদ্ধ থাকতে চাই না। যে সব সংগঠনে পার্টির প্রভাব আছে সে সব সংগঠনে আমি আমার সদস্যপদ বহাল রাখতে চাই এবং ওই সব সংগঠনে আমি পার্টির কর্মসূচি অনুসরণ করে চলবো। আমি আশা করি, যে মনোভাব নিয়ে আমি এ কথাগুলি বললাম অনুরূপ মনোভাব নিয়ে তা গৃহীত হবে। হয়তো ভবিষ্যতে, কোনো এক সময়ে, যে কাজগুলি আমি সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারি তা নিয়ে আমি পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথা বলবো।

আমি প্রগাঢ় নীরবতার মধ্যে আসন গ্রহণ করি। সভার নিয়ো সম্পাদককে ভীত সন্ত্রস্ত দেখায়, সে নিলসন, ইভান্স আর এড গ্রিনের দিকে তাকায়।

অবশেষে সে জানতে চাইলো, কমরেড রাইটের বক্তব্য সম্পর্কে কারো কোনো আলোচনা আছে?

নিলসন বললেন, আমি প্রস্তাব করছি যে রাইটের বক্তব্যের ওপর আলোচনা মুলতবি থাকুক।

দ্রুত ভোট গ্রহণের পর নিলসনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। আমি নিস্তব্ধ ঘরের চারপাশে তাকাই, আমার হ্যাট তুলে নিই, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলি, আমি এখন যেতে চাই।

কেউ কোনো কথা বললো না, আমি দরজা দিয়ে বাইরে রাতের মধ্যে বেরিয়ে যাই, আর আমার মনে হলো আমার কাঁধ থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেছে। আমি মুক্ত। আর আমি সব কিছু করেছি ভদ্র ও স্পষ্টভাবে। আমি কোনো তিক্ততা প্রদর্শন করি নি। আমি একটা পাল্টা অভিযোগ করি নি, কাউকে আক্রমণ করি নি। রাতের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে পড়ে আমি কিভাবে মিসিসিপি জ্যাকসন সিনেমা হল থেকে টাকা চুরি করেছিলাম; কিভাবে জানালা দিয়ে ঢুকে পিস্তল চুরি করেছিলাম; কিভাবে কলেজের গুদামঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে সংরক্ষিত ফলের টিনগুলি চুরি করেছিলাম; আমার মনে পড়ে মেম্ফিসে আমার চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য আমি কিভাবে আমার মালিককে মিথ্যা কথা বলে শিকাগো চলে এসেছিলাম, কিভাবে আমি মিস্টার হফম্যানকে মিছে কথা বলেছিলাম, কিভাবে বই পড়ার জন্য আমি মেম্ফিসের গ্রন্থাগারের জন্য চিঠি জাল করেছিলাম... কিন্তু আমি বদলে গেছি। এখন আর আমার মধ্যে ওই

রকম কোনো ভয় বা হঠকারী প্রণোদনা নেই। আমি শুধু আমার কমরেডদের মুখোমুখি হয়েছি, যা অনুভব করেছি তাই বলেছি এবং সেখানেই ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েছি।

কম্যুনিস্ট পার্টি আমাকে শত্রু বলতে পারবে না, আমি তাদের আক্রমণ করেছি এমন কথা বলতে পারবে না। একজন ট্রটস্কিপন্থী কিংবা পার্টিকে ধ্বংস করতে বা তার কার্যক্রম ব্যাহত করতে চায় এমন কেউ পার্টির ভেতরে থেকে যেত, যেন ভাল করে কোন্দল পাকাতে পারে, পার্টির কাজে বাধা দিতে পারে। কিন্তু আমি শুধু বন্ধনমুক্ত হতে চেয়েছি, আমি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনি নি, কারো নিন্দা করি নি। আমি আপন মনে বলি, কম্যুনিস্ট পার্টি যখন বেড়ে উঠবে, যখন আতঙ্ক, ভীতি প্রদর্শন, কটূক্তি, ত্রাস সৃষ্টি এবং সন্দেহ ছড়ানোর কৌশল ত্যাগ করে কাজ করতে পারবে তখন হয়তো আমি আবার সেখানে কাজ করতে ফিরে যাবো...

ওহ, ঈশ্বর... কতো সরল ও নির্বোধ ছিলাম আমি! বয়স কম ছিল, আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আমার শক্তি অসীম। আমাকে দীর্ঘকাল বিরক্ত করা একটা সমস্যা আমি সুন্দরভাবে সমাধান করে ফেলেছি, এখন আমি আমার সব উদ্যম লেখার কাজে নিয়োগ করতে পারবো এবং নিজের বিশ্বাসের ন্যায্যতা প্রতিপালন করতে সক্ষম হবো। আমি যে পার্টির সদস্য ছিলাম তাকে যে আমি কতো কম বুঝতে পেরেছিলাম তা আমি সে রাতে জানতে পারি নি। কিন্তু শিগগিরই আমি অনুধাবন করি, আমি শিগগিরই বুঝতে পারি, আমার উদ্দেশ্য ছিল কতো সরল, আমার মনোভাব ছিল কতো বেশি বিশ্বাসপরায়ণ, আমার চোখ ছিল কতো বিস্ফারিত এবং নিষ্পাপ, শিশির ভেজা মর্নিং গ্লোরি ফুলের মতো খোলা এবং গোলগোল...

পরদিন রাতে দু'জন নিগ্রো কম্যুনিস্ট আমার বাড়ি আসে। ইউনিট মিটিং-এ কী ঘটেছিল তারা তা না জানার ভাব করে। ধৈর্য সহকারে আমি তাদের ঘটনাটা ব্যাখ্যা করি।

ওরা বললো, নিলসন যা বলছেন তার সঙ্গে আপনার কাহিনী মিলছে না।

আমার কাছে ওদের আসার উদ্দেশ্য ওই উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নিলসন কি বলেছেন?

নিলসন বলেছেন যে, একটি ট্রটস্কিপন্থী গোষ্ঠির সঙ্গে আপনার যোগসাজস আছে। পার্টি ত্যাগ করে আপনাকে অনুসরণ করার জন্য আপনি অন্যান্য পার্টি সদস্যদের প্রতি আবেদন করেছেন।

আমি হা হয়ে গিয়ে বলি, কী? এ কথা সত্য নয়। আমি শুধু বলেছি যে, আমার সদস্যপদ বাতিল করা হোক। কোনো রাজনৈতিক বিষয় আমি উত্থাপন করি নি। এ সবের অর্থ কি? আমি বসে বসে ভাবি। আমি বললাম, আমার হয়তো পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করা উচিত ছিল। নিলসন যদি এ রকম আচরণ করেন তাহলে আমি পদত্যাগ করবো।

ওরা আমাকে জানালো, পদত্যাগ আপনি করতে পারবেন না।

তার মানে?

কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে কেউ পদত্যাগ করতে পারে না।

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলি, তারপর বলি, পাগলের মতো কথা বলছেন আপনারা।

ওরা বললো, নিলসন আপনাকে প্রকাশ্যভাবে বহিষ্কার করবে। আপনি পদত্যাগ করলে সে আপনার পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে ফেলবে। সাইথ সাউথে আপনার মতো কেউ পদত্যাগ করলে লোকে ভাববে যে, কোথাও কিছু গোলমাল আছে।

আমি রেগে উঠি। পার্টি কি এতো দুর্বল, নিজেদের সম্বন্ধে এতো অনিশ্চিত যে, ইউনিট মিটিং-এর আমি যা বলেছি তা গ্রহণ করতে পারছে না? এ সব কলাকৌশল কারা ভেবে ঠিক করেছে? তারপর, হঠাৎ আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রাচীন রাশিয়ার জারদের অধীনে কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক আন্দোলনের গোপন নিন্দিত কলাকৌশল ছিল এগুলি। কম্যুনিস্ট পার্টি যখন দেখলো যে, আমি তাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা আবদ্ধ থাকতে চাই না তখন তারা মনে করলো যে, আমাকে তাদের নৈতিকভাবে গুপ্তহত্যা করতেই হবে। আমি এখন বুঝতে পারি যে, আমার কমরেডরা তাদের একটা স্বল্পকল্পনা কার্যকর করছে, যার সঙ্গে তাদের পরিবেশের কোনো বাস্তব সম্পর্ক নেই।

আমি বললাম, নিলসনকে বলে দেবেন যে, তিনি যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামের তাহলে, ঈশ্বরের দোহাই, আমি তাঁর সঙ্গে লড়বো। ব্যাপারটা যেখানে আছে তিনি যদি সেখানেই ছেড়ে দেন তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু তিনি যদি মনে করেন যে, আমি প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে লড়বো না তাহলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

আমার এই বক্তব্য নিলসনের কানে পৌঁছেছিল কিনা আমি জানতে পারি নি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো হইচই হয় নি। তবে পার্টি সদস্যদের মধ্যে একটা ঝড় ওঠে, আর আমি চিহ্নিত হই একজন বিশ্বাসঘাতক ও অস্থিতিশীল ব্যক্তিত্ব রূপে, যে তার বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখতে পারে নি।

কী এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয় আমার! কম্যুনিস্ট পার্টিতে আমি কখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি নি। তার সম্ভাবনা আমি সব সময় অনুভব করেছি কিন্তু যাদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কখনো ঠিক সুনিশ্চিত হতে পারি নি, যেমন ওরাও কখনো আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঠিক সুনিশ্চিত হতে পারে নি। আমার কমরেডরা আমাকে, আমার পরিবারকে আমার বন্ধুদের চিনতো। ঈশ্বর জানেন, আমার তীব্র যন্ত্রণাদায়ক দারিদ্র্যের কথা তাদের জানা ছিল। কিন্তু আমি যে রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে জীবন যাপন করতাম সে সম্পর্কে তারা তাদের ভয় কখনো জয় করতে পারে নি। কিন্তু ওই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তো জীবন আমার রক্ত ও অস্থির মধ্যে অগ্নিশিখার মতো প্রবিষ্ট করে দিয়েছিল।

এখন আমি কমরেডদের যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলি, আর একদিকে পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে আসে তখন অন্যদিকে সাউথ সাইডের অনেক তরুণ নিগ্রো প্রথমাবরের মতো পার্টিতে যোগদান করে। জাতি ও সামাজিক মর্যাদার কারণে বহু তরুণ নিগ্রোকে অত্যন্ত সংকীর্ণ জীবন যাপন করতে হয়। পিপলস ফ্রন্ট পলিসির আওতায় পার্টির প্রসারিত কার্যক্রম তাদের জন্য অনেক সুযোগ এনে দেয়। একজন তরুণ প্রতিনিধি হিসেবে সুইজারল্যান্ডে যাবার যে-আমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করি এক তরুণ নিগ্রো তা গ্রহণ করে, যদিও ইউরোপে যাবার এই সুযোগ লাভের আগে সে কমুনিস্ট পার্টি ও তার আদর্শাবলীকে আক্রমণ করে এসেছিল।

ত্রাণ কর্তৃপক্ষ আমাকে সাউথ সাইড বয়েজ ক্লাব থেকে ফেডারেল নিগ্রো থিয়েটারে বদলি করে দেয়। আমি সেখানে প্রচার-প্রতিনিধি রূপে কাজ করবো। কোনো কোনো দিন কমরেডদের অন্তহীন বিচার-বিশ্লেষণের জন্য আমি বুভুক্ষ হয়ে থাকতাম কিন্তু যখনই আমি পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবনের খবর শুনতাম তখনই আমি শুনতাম অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ, আঘাত ও প্রত্যাঘাতের খবর, আর ওসব থেকে আমি সানন্দে দূরে থাকতাম। আমার মনে হয়, পার্টির সকল শক্তি উপদলীয় দ্বন্দ্ব এবং চুলচেরা রাজনৈতিক সংজ্ঞা নির্মাণের কাজে অপচয়িত হচ্ছে। আমি যে ফেডারেল নিগ্রো থিয়েটারের প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলাম তা অনেকগুলি খুব সাধারণ নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। সেগুলির সবই ছিল পুরানো নাটকের জোড়াতালি দেয়া নিগ্রো রূপান্তর। সেখানে ছিল অরণ্যের দৃশ্য, নিগ্রোদের আধ্যাত্মিক গান, ওই জাতীয় সব কিছু। থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন একজন অস্থিচর্মসার শ্বেতাঙ্গিনী, বয়স্ক, মিশনারি টাইপের। তিনি একটা নাটক বেছে নিতেন, যার চরিত্ররা সাদা চামড়ার, যার বিষয়বস্তু আবর্তিত হয় মধ্যযুগকে ঘিরে; তিনি তাকে ঢেলে সাজাতেন দক্ষিণের নিগ্রো জীবনকে ঘিরে আর তার মধ্যে সংযোজিত করতেন আফ্রিকীয় চড়া স্বর। নিগ্রো জীবনকে বাস্তবতার সঙ্গে পরিবেশিত সমকালীন নাটক বিতর্কমূলক বিবেচনায় অবজ্ঞাভরে বর্জিত নিগ্রো অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিল, তারা অলস সময় কাটায়, অসন্তুষ্ট, কিছু একটা করার জন্য উন্মুখ, নিজেদের নিয়ে তারা কী করবে জানে না।

আমি মনে মনে ভাবি সহজাত ক্ষমতার কী অপচয়। একটা ভাল নিগ্রো নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ এখানে বিদ্যমান, অথচ কেউ সে সম্পর্কে সচেতন নয়। আমি পরিস্থিতি ভাল করে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করি, তারপর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রশাসনে আমার যে সব শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ছিল তাদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরি। আমি তাদেরকে অদ্ভুত নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা সংবলিত শ্বেতাঙ্গ মহিলাটির জায়গায় নিগ্রো জীবন ও থিয়েটার সম্পর্কে জানে এমন একজনকে নিয়োগ দান করতে বলি। তারা কথা দেয় যে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এক মাসের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ মহিলা পরিচালককে অন্যত্র বদলি করা হলো। আমরা

সাউথ সাইড থেকে লুপ-এ চলে আসি এবং একটা লম্বা ব্লকীর থিয়েটারে অস্থানা গড়ি। আমি চার্লস ডিশেইম নামের একজন অভিজ্ঞতাবান ইহুদিকে পরিচালকের পদে নিয়োগ দানের প্রস্তাব করি। আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডিশেইম আর আমি দীর্ঘ আলোচনা করি, কী অর্জন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি তার একটি রূপরেখা আমি তুলে ধরি। জোর দিয়ে বলি যে আমাদের প্রথম পরিবেশনা হওয়া উচিত তিনটি একক নাটকের একটি সম্ভার, তার অন্তর্গত হবে পল গ্রিনের উদীয়মান সূর্যের উদ্দেশে বন্দনাগীতি নামের একটি নির্মম, কাব্যময়, শক্তিশালী একাঙ্কিকা, যা গড়ে উঠেছে দক্ষিণের কারাগারের বাইরে কর্মরত একত্রে শৃঙ্খলিত একটি কয়েদি দলের অবস্থা নিয়ে।

আমি এখন সুখী। অবশেষে আমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আমি পরামর্শ দিতে পারি, প্রস্তাব করতে পারি, আর সে সবকে ভিত্তি করে কাজ হয়। আমার দৃঢ় আস্থা জন্মে যে, আমরা একটি খাঁটি নিগ্রো থিয়েটার গড়ার বিরল সুযোগ পেয়েছি। আমি একটা সভা আহ্বান করি, নিগ্রো থিয়েটার কোম্পানির সঙ্গে ডিশেইমের পরিচয় করিয়ে দিই, তাদের বলি যে, এই লোক থিয়েটার সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি তাদেরকে তাৎপর্যময় নাট্যকর্মের দিকে পরিচালিত করতে পারবেন। ডিশেইম একটা ভাষণ দিলো। সে বললো যে সে পরিচালনা করার জন্য এ থিয়েটারে যোগ দেয় নি, তার উদ্দেশ্য নিগ্রোদেরকে তাদের নাটক পরিচালনা করতে সাহায্য করা। সে এতো সহজ অথচ উদাত্তভাবে তার কথা বললো যে, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করলো।

এরপর আমি সগর্বে পল গ্রিনের উদীয়মান সূর্যের উদ্দেশে বন্দনাগীতির কপি কোম্পানির সকল সদস্যের মধ্যে বিতরণ করলাম। ডিশেইম পড়ার জন্য ভূমিকা বণ্টন করে দিলো। আমি প্রাণ্ডবয়স্ক নিগ্রো নাট্যক্রিয়া উপভোগ করার জন্য আসন গ্রহণ করলাম, কিন্তু কোথাও একটা কিছু গোলমাল হয়ে যায়। নিগ্রোরা তোতলায়, তাদের সংলাপ বলার সময় হোঁচট খায়। অবশেষে তারা পুরোপুরি তাদের পড়া বন্ধ করে দিলো। ডিশেইমকে আতঙ্কিত দেখায়। একজন নিগ্রো অভিনেতা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মিস্টার ডিশেইম, আমরা মনে করি এ নাটক শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। মার্কিন জনগণের সামনে আমরা এ ধরনের নাটকে অভিনয় করতে চাই না। আমি মনে করি না যে, দক্ষিণে এ ধরনের কোনো অবস্থা বিরাজ করছে। আমি দক্ষিণে বাস করেছি এবং আমি কখনো কোথাও একত্রে শেকল বাঁধা কোনো কর্মরত কয়েদি দল দেখি নি। মিস্টার ডিশেইম, আমরা এমন একটা নাটক চাই যা দেখে লোকজন আমাদের ভালবাসবে।

আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, নিগ্রো অভিনেতারা মার্কিন থিয়েটারে প্রাণ্ডবয়স্ক অভিব্যক্তি দেখার জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে, তারা ছাঁচে ঢালা ভাঁড়, শ্বেতাঙ্গ রমণীদের নিগ্রো পরিচারিকা, খুর, জুয়াখেলার ঘুঁটি, তরমুজ আর তুলার ক্ষেত দেখতে দেখতে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। আর এখন তারা নাটকীয়

বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমি নাটকীয় সমর্থন করার চেষ্টা করি কিন্তু ওরা আমাকে নানা কূট মন্তব্যে জর্জরিত করে থামিয়ে দেয়।

ডিশেইম তাদের জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা কি ধরনের নাটক চাও।

ওরা জানে না। আমি দফতরে গিয়ে ওদের কাগজপত্র উল্টে দেখি যে, ওদের বেশির ভাগই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে শস্তা বিনোদনমূলক বিচিত্রানুষ্ঠানে অভিনয় করে। আমি ভেবেছিলাম যে, যুক্তিসঙ্গত থিয়েটারে তাদের ঢুকতে না দেয়ার কারণে তারা ওই রকম বিচিত্রানুষ্ঠানে অভিনয় করেছে, কিন্তু এখন দেখা গেল যে, যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত থিয়েটার তারা চায় না, জনগণ পছন্দ না করতে পারে সে রকম কোনো নাটকে অভিনয় করার সম্ভাবনা তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে যায়, যদিও ওই জনগণকে তারা বোঝে না, তাদের পছন্দ অপছন্দ নিরূপনের কোনো পথ তাদের জানা ছিল না।

আমার মনে হয়, অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্য যে, শ্বেতাঙ্গরাই বোধ হয় সঠিক, নিগ্রোরা শিশুর মতো, আর কখনই তারা বড় হবে না। ডিশেইম ওদের বললো যে, ওরা যে নাটক পছন্দ করবে সে তাই মঞ্চায়িত করবে, আর তার কথা শুনে ওরা ভয় পাওয়া ইঁদুরের মতো চুপ করে বসে থাকে, ওদের অস্পষ্ট ইচ্ছাগুলির কথা জানাবার মতো ভাষা ওদের নেই।

কয়েকদিন পর থিয়েটারে গিয়ে একটা বিষয় জেনে আমি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। ওরা ডিশেইমকে বরখাস্ত করার জন্য একটা দরখাস্ত লিখে ফেলেছে। আমাকে ওরা ওই দরখাস্তে সই দিতে বললে আমি অস্বীকৃতি জানাই।

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি, কে তোমাদের বন্ধু তাও তোমরা জানো না?

ওরা কটমটে চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি ডিশেইমকে ডেকে আনি এবং ব্যাকুল আলোচনায় ব্যাপৃত হই।

ডিশেইম জানতে চায়, কি করবো আমি?

আমি বললাম, ওদেরকে তুমি তোমার আস্থায় নাও। ওদের জানতে দাও যে, তাদের অভিযোগ নিরসনের জন্য দরখাস্ত করার অধিকার ওদের আছে।

ডিশেইম আমার পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে। সে অনুযায়ী সে কোম্পানির সবাইকে জড়ো করে তাদের জানিয়ে দেয় যে, তারা ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করতে পারে, তাদের সে অধিকার আছে, তবে, তার মনে হয়, যদি কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে তবে সুন্দরভাবে তার নিরসন হওয়া উচিত।

একজন কৃষ্ণাঙ্গ জানতে চাইলো, আমরা যে দরখাস্ত করতে যাচ্ছি কে আপনাকে এ কথা বলেছে?

ডিশেইম আমার দিকে তাকায়, শব্দহীনভাবে তোতলায়।

একটি কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে চিৎকার করে ওঠে, এই থিয়েটারে একটা আঙ্কল টম আছে।

মিটিং-এর পর নিগ্রো পুরুষদের একটি প্রতিনিধি দল আমার দফতরে ঢোকে। তারা

তাদের পকেট ছুরি বের করে আমার মুখের সামনে ঝকঝক করে নাড়ায়। তারা আমাকে লক্ষ্য করে বললো, তোমার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে নাড়িভুড়ি বের করে ফেলার আগে তুমি এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালাও, বুঝলে?

আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। সেদিন একটি বিশালদেহী, মোটা, কৃষ্ণাঙ্গ রমণী, বিনোদসঙ্গীতের এক গায়িকা বহুবার সম্ভব আমার পাশ দিয়ে যাবার সুযোগ গ্রহণ করে এবং প্রতিবারই চাপা গলায় অশ্রাব্যভাষায় ভঙ্গিতে হিসহিস করে বলে, ঈশ্বর, একজন শ্বেতাঙ্গের নিগারকে আমি কী যে ঘৃণা করি।

কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশাসনে আমার যে শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা ছিল আমি তাদের টেলিফোন করে বলি, আমাকে এক্ষুণি অন্য কোথাও বদলি করো, না হলে আমি খুন হয়ে যাবো।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ডিশেইম ও আমি আমাদের কাগজপত্র পেয়ে যাই। পরস্পরে করমর্দন করে আমরা আমাদের পৃথক পৃথক পথে যাত্রা করি।

আমি একটা শ্বেতাঙ্গ নিরীক্ষামূলক থিয়েটার কোম্পানিতে প্রচার-প্রতিনিধি হিসেবে বদলি হই। আমি আমার ধ্যান-ধারণাগুলি নিজের মধ্যে রাখার সিদ্ধান্ত নিই, কারণ আরো ভাল হবে, আমি সেগুলি লিখে রাখবো, কিন্তু বাস্তবে সে সব প্রয়োগ করার কোনো চেষ্টা করবো না। আমি নিগ্রো থিয়েটারের জগৎ এড়িয়ে চলি এবং নিজেকে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের কাছ থেকে কঠোরভাবে দূরে রাখি। যখনই আমার কোনো প্রাক্তন কমরেডের সঙ্গে দেখা হতো তখনই তারা পার্টির নীতি অনুযায়ী আমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতো। বিশ্বাসঘাতকদের শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে, পার্টির এই নীতি মেনে চলা ছিল সকল সদস্যের জন্য অপরিহার্য।

এক সন্ধ্যায় নিগ্রো কম্যুনিস্টদের একটি দল আমার বাসায় এলো। তারা খুব গোপনে আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়। আমি তাদেরকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা তালাবন্ধ করে দিই।

তারা হঠাৎ করেই শুরু করলো, ডিক, পার্টি চায় যে, তুমি রোববারের সভায় উপস্থিত থাকো।

আমি প্রশ্ন করলাম, কেন? আমি তো আর সদস্য নই।

সে ঠিক আছে। ওরা চান যে তুমি উপস্থিত থাকো।

কম্যুনিস্টরা পথে-ঘাটে দেখা হলে আমার সঙ্গে কথা বলে না, আর এখন কেন তোমরা একটা মিটিং-এ আমার উপস্থিতি চাইছো?

ওরা এড়িয়ে যায়, আমাকে বলতে চায় না।

আমি ওদের স্পষ্ট জানিয়ে দিই, তোমরা আমাকে যদি না বলতে পারো তাহলে আমিও যেতে পারি না।

ওরা নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলে এবং শেষে আমাকে তাদের আস্থায়

নেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওরা বললো, ঠিক, রসের বিচার হবে।

কি জন্য?

ওরা রসের রাজনৈতিক অপরাধের একটা দীর্ঘ তালিকা আবৃত্তি করে গেল। ওরা বললো যে সে ওই সব অপরাধে অপরাধী।

কিন্তু এসবের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

তুমি গেলেই বুঝতে পারবে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি অতো সরল আর নির্বোধ নই।

এখন আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। ওরা কি আমাকে ধোঁকা দিয়ে বিচারের সম্মুখীন করে বহিষ্কার করার চেষ্টা করছে? আমি বললাম, ওই বিচার হয়তো আমার বিচারে পরিণত হতে পারে...

ওরা শপথ করে বললো যে, আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার কোনো ইচ্ছা ওদের নেই। পার্টি চায় আমি যেন রসের বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করি, শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের কি পরিণতি হয় আমি যেন তা বুঝতে পারি।

আমি বললাম, কিন্তু আমি তো তোমাদের শত্রু নই।

আমরা তোমাকে রক্ষা করতে চাই।

আমি প্রশ্ন করি, কিসের থেকে? আমি তো নিঃস্ব হয়ে যাই নি।

আমরা শুধু তোমার মঙ্গলের কথাই ভাবছি।

তাহলে কেন তোমরা সবাই আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিলে, কেন আমাকে ট্রটস্কিপন্থী রূপে আখ্যায়িত করেছিলে?

নিলসন বেদিশা হয়ে গিয়েছিল। তুমি পার্টি ত্যাগ করার পর তোমাকে যে কোনোভাবে আক্রমণ করার জন্য সে হন্যে হয়ে গিয়েছিল।

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, ভিন্নমতাবলম্বীদের খুঁজে বের করে নির্যাতন করার এইসব পাগলামি কর্মকাণ্ডে তোমরা কেন এতো সময় নষ্ট করো? তোমরা দাবি করো যে, তোমরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছো, কিন্তু তোমাদের স্বীকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চাইতে তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই-এ বেশি সময় ব্যয় কর।

ওদের কাছে-এসব কথা বলার সময় আমার অনেক কাল আগের আরকানসাস-এর দিনগুলির কথা মনে পড়ে। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন আমার চাচাকে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে হবে, কেন তিনি ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে লড়ছেন না, আর তখন মা আমার গালে ঠাস করে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। ভয়ের কারণে তিনি ওই কাজটা করেছিলেন। এখন আমার মনে হয়, কম্যুনিস্টরা তাদের শত্রুদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে, আর অসচেতনভাবে, তাদের ওই ভয়ের খেসারত হিসেবে তারা নিজেদের মধ্যে এই রকম মরীয়া হয়ে অবিরাম দ্বন্দ্ব

সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু আমি ওদেরকে এ কথা বলি না, ওরা বুঝতে না।

আমি বললাম, শোনো, রস হলো রাজপথের একজন গৌণ আবেদনকারী, ওর কথা তোমরা ভুলে যাও। দেখবে দু' সপ্তাহের মধ্যে তার বিষয়টা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

ওরা বললো, রসের মাধ্যমে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। তার বিচারকার্য শ্রমিক শ্রেণীর জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হবে, তোমার জন্যও হবে যদি তুমি উপস্থিত থাকো।

ওদের কথা শুনতে শুনতে নতুন কিছু দেখার জন্য আমার পুরানো ভালবাসা আবার আমার মধ্যে জেগে ওঠে। আমি ওই বিচারকার্যটা দেখতে চাই; কিন্তু আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হতে পারে সে ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। আমি ওদের বললাম, শোনো, নিলসন যে সব অভিযোগ করেছে আমি সে সব অপরাধে অপরাধী নই। এখন আমি যদি বিচারকার্যে উপস্থিত হই তাহলে মনে হতে পারে যে, আমিও বুঝি ওইসব অপরাধ করেছি।

ওরা বললো, না, না, তা মনে হবে না। তুমি আসো।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি যাবো।... কিন্তু, শোনো, যদি আমার সঙ্গে কোনো চালাকি করা হয় আমি কিন্তু লড়বো। শুনতে পাচ্ছো? নিলসনকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি রাজনীতিবিদ নই, আর যে মানুষ তার জাগ্রত গোটা সময়টা ষড়যন্ত্র করে কাটায় সে যে কি অদ্ভুত কাজ করে বসবে পূর্বাহ্নে তা কল্পনা করার ক্ষমতা আমার নেই।

পরের রবিবার অপরাহ্নে রসের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। সহজে চোখে পড়ে না এমনভাবে কমরেডরা প্রহরারত দাঁড়িয়ে থাকলেন সভাকক্ষে, দ্বারপথে, রাস্তায়, সভার প্রবেশপথের দু'পাশে। আমি গিয়ে পৌঁছতেই আমাকে দ্রুত ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। আমি টানটান হয়ে থাকি। এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, একবার ভেতরে ঢুকলে সভা সমাপ্ত হবার আগে কেউ আর বাইরে যেতে পারে না। আশঙ্কা করা হতো কেউ হয়তো পুলিশের কাছে গিয়ে সবাইকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে।

উচ্চতম প্রণোদনা থেকে এরা কাজ করে, নির্যাতিতের জন্য ভালবাসায় এদের অন্তর পূর্ণ, বিদ্রোহীদের প্রতি সহমর্মিতার বোধ দ্বারা এরা পরিচালিত, আত্মত্যাগে এরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তবু কেন কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিরাজ করে এতো ঘৃণা, সন্দেহ, তিক্ততা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব? যেসব লোকদের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি তাদের আমি ভালবাসি, তবু কেন আমি তাদের ভয়ে ভীত? আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে তারা সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে, তবু আমার ডান হাতটা তোলার ওপরই যদি ওদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নির্ভর করতো, আমি আমার হাত তুলতে ভয় পেতাম। আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। আমি ফিস ফিস করে আপন মনে বলি, ঈশ্বর, আমি এই লোকগুলিকে ভালবাসি, কিন্তু আমি খুশি যে ওরা ক্ষমতায় নেই, থাকলে হয়তো আমাকে গুলি করে

হত্যা করতো।

কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। কয়েকজন পার্টি-নেতা আমার দিকে তীব্র বৈরী দৃষ্টি হেনে তাদের মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এই বিচারকার্য দেখতে কেন আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে? চঞ্চল প্রাণ্ড নিয়ে আমি বসে থাকি, তাড়াতাড়ি বিচারকার্য শুরু হওয়ার জন্য আমি অধৈর্য হয়ে উঠি। ভয় ভীতি সত্ত্বেও আমার মধ্যে কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি স্থির করেছি এই বিচারকার্যে আমি কোনো অংশগ্রহণ করবো না, কারণ তা করলেই আমি নিশ্চিতভাবে এমন একটা অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়বো যেখানে আমার বিন্দুমাত্র অংশ ছিল না।

অভিযুক্ত রস একটা টেবিলে হলঘরের সামনের দিকে বসেছিল। তাকে দেখাচ্ছিল বিহ্বল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত। তার জন্য আমি দুঃখ বোধ করি, তবু আমার মনে হয় সে যেন ব্যাপারটা উপভোগও করছে। তার বিবর্ণ নিরানন্দ জীবনে এটা হয়তো ছিল আবেগ-অনুভূতির শীর্ষ বিন্দু।

আমি ছিলাম ওই লোকগুলির পক্ষে। আমি নিগ্রো, ও রকম না হয়ে আমার উপায় ছিল না। ওরা নিগ্রোদের ঘৃণা করে না। ওদের মধ্যে জাতিবর্ণগত কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না। হলে উপস্থিত বহু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নিগ্রো মেয়েকে বিয়ে করেছে, বহু নিগ্রো পুরুষ বিয়ে করেছে শ্বেতাঙ্গ রমণীকে। ইহুদি, জার্মান, রুশী, স্পেনীয়, সকল নরগোষ্ঠী ও জাতীয়তার লোকজন এখানে ছিল, কোনো প্রকার পৃথকীকরণ ছাড়াই।

জাতিবর্ণগত ঘৃণা ছিল আমার জীবনের সকল দুর্দশার হেতু, আর এখানে আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাই যে, তা উচ্ছেদ করা সম্ভব। অথচ কুৎসিত বর্ণজাতিতে ঘৃণার জায়গায় নতুন একটা ঘৃণার উদ্ভব হয়েছে এখন। কম্যুনিস্টরা যাদের বুদ্ধিজীবী আখ্যায়িত করে তাদেরকে কিংবা অন্য যে কেউ স্বতন্ত্রভাবে নিজের মতো চিন্তা করতে চায় তাদেরকে ঘৃণা করবে এটা আমার কাছে যুক্তিহীন মনে হতো। যে সব লোক আমার ত্বকের রঙ পছন্দ করে না তাদের কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি, আর এখন আমি আছি সেই সব লোকের মধ্যে যারা আমার চিন্তাধারা পছন্দ করে না।

কম্যুনিস্টরা কেন বুদ্ধিজীবীদের পছন্দ করে না তা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার মন রুশ বিপ্লবের যে সব বর্ণনা আমি পড়েছি আবার তার কাছে ফিরে যায়। প্রাচীন রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মূর্খ মানুষ অল্পসংখ্যক শিক্ষিত উদ্ধত অভিজাত লোকদের দ্বারা শোষিত হয়েছে, তাই রুশ কম্যুনিস্টদের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে সম্পৃক্তরা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এমন একটি উপাদান বিরাজ করে যা কম্যুনিস্ট পার্টিকে বিভ্রান্ত ও ভীত করে তোলে। তা হলো খোপার্জিত সাক্ষরতার ব্যাপক প্রচলন। এমনকি, অজ্ঞানতা ও শোষণের জালে ধৃত একজন নিগ্রোও, আমার অবস্থা যেমন ছিল, ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে পড়তে এবং যে জগতে তার বাস তাকে বুঝতে শিখতে পারে। কম্যুনিস্টরা এই লোকগুলিকেই বুঝতে পারে না। মার্কিন

কম্যুনিস্টরা আইনগত বৈধতা লাভ করে গোপন নিষিদ্ধ কর্ম বলশেভিক আদল যে সব পদ্ধতি নির্মাণ করেছিল তাই এখানে প্রয়োগ করছে, তাদের অনুসারীবৃন্দ যেন প্রকৃত পরিস্থিতি দাবি না করলেও তাদের প্রদত্ত বাস্তবতার ব্যাখ্যা মেনে নেয় তা সুনিশ্চিত করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মুক্ত চিন্তার ঐতিহ্য, পড়তে সক্ষম কোনো মানুষের পক্ষেই যার প্রভাব এড়ানো অসম্ভব, প্রোটেস্টান্ট নৈতিক নীতিমালার যে প্রাণ একজন মানুষ, রূপকের আকারে বললে, মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে পান করে, ওই স্টউসারিত শক্তি, যার কারণে একজন মানুষ, সে উপলব্ধি করুক কিংবা না করুক, অনুভব করে যে তাকে কাজ করতেই হবে, তার কর্মপ্রবাহের মধ্যে দিয়েই তাকে ত্রাণ লাভ করতে হবে। এই সবই ছিল নিষিদ্ধ, অকরণীয়। অথচ এটাই ছিল সেই সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের সারবস্তু যা কম্যুনিস্ট পার্টি পুরোপুরি এবং অক্ষুণ্ণভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যে মূল্যবোধগুলি রক্ষা করার জন্য তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চোখের সামনে দেখার পরও তারা আর সে সব চিনতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা বা অনুভূতির সামান্যতম চিহ্ন কারো মধ্যে দেখলেই, তা পার্টির কাজকে সাহায্য করলেও, ওই লোককে তারা সন্দেহ করে তাকে চিহ্নিত করে একজন বিপদজনক বিশ্বাসঘাতক রূপে।

বিচারকার্য শুরু হয় শান্ত, ধরোয়া ভঙ্গিতে। কমরেডদের আচরণ দেখে মনে হয় তারা যেন কয়েকজন প্রতিবেশী, যার বিচার করছে সে তাদেরই একজন, তার অপরাধ সে একটা মুরগি চুরি করেছে। যে কেউ কথা বলতে পারবে, অনুমতি চাইলেই তাকে অনুমতি দেয়া হবে। বক্তব্যের স্বাধীনতা পুরোপুরি বিরাজ করে। তবু সভার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার নিজস্ব এক বিস্ময়কর আনুষ্ঠানিক কাঠামো, যা মানুষের একসঙ্গে বাস করার আকাঙ্ক্ষার মতোই গভীর।

কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্ব পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন। তিনি আবেগহীন কণ্ঠে কঠিন তথ্যগুলি জানালেন। তিনি জার্মানি, ইতালি ও জাপানের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের একটি ভয়ঙ্কর কিন্তু শক্তিশালী ছবি আঁকলেন। এইভাবে বিচারকার্য শুরু হবার কারণটা আমি মেনে নিই। রসের অপরাধগুলি কিসের অথবা কাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল তা স্বীকৃতসত্য রূপে তুলে ধরা ছিল অত্যাবশ্যক। তাই মানবজাতি যে নির্যাতনের মধ্যে আছে তার একটি প্রাণবন্ত চিত্র উপস্থিত সবার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আর ওই চিত্র ছিল যথার্থ। শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে জীবন ধারণ করে সে সম্পর্কে এতো বিশদ জ্ঞান কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো সংগঠনের নেই, কারণ তার তথ্যের উৎস ছিল সরাসরি শ্রমজীবী মানুষেরা।

পরবর্তী বক্তা বিশ্বের একমাত্র শ্রমিকদের রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আলোচনা করেন। কিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন শত্রু-পরিবেষ্টিত, কিভাবে

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের দেশকে শিল্পায়িত করার চেষ্টা করছে, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে যৌথ নিরাপত্তার ধারণার মাধ্যমে একটা শান্তির পথে পরিচালিত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কতো আন্তরিকভাবে কাজ করেছে তিনি তার কথা বললেন।

এ পর্যন্ত পরিবেশিত তথ্যগুলি এই অনিশ্চিত বিশ্বে যে কোনো তথ্য যতখানি সত্য হতে পারে ততখানি সত্য ছিল। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিটি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত একটি কথাও উচ্চারিত হয় নি। অন্য যে কোনো শ্রোতার মতোই সে-ও বসে বসে ওই সব কথা শুনছিল। পৃথিবীব্যাপী এই সংঘাতের চিত্রের মধ্যে তাকে এবং তার অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার সময় এখনো হয় নি। প্রথমে কমরেডদের মনে একটা নিঃশর্ত জিনিস প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেন তারা তাদের কাজের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা তার মানদণ্ডে পরিমাপ করতে পারে। এখানে কোনো আধ্যাত্মিকতা ছিল না, এখানে শুধু ছিল অন্যায়ের প্রতিবিধানকল্পে উপস্থিত সকলের একটা তীব্র আবেগদীপ্ত একাত্মতা। এটা ছিল একটি সরল, প্রাকৃতিক উপাদানের মতো নৈতিকতা। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এ রকম একটা নৈতিক বিধিমালা কম্যুনিজম খুঁজে পেয়েছে। আর এটা উৎসারিত হয়েছে মানুষের বাস্তব জীবন যাপন প্রণালী থেকে, অলৌকিকের কোনো আদেশ-নির্দেশাবলী থেকে নয়।

এরপর আরো একজন বক্তা উঠে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন এবং তাকে যুক্ত করলেন বিশ্বের দৃশ্যপটের সঙ্গে। তিনি এটা করলেন ধীরেসুস্থে, বেশ পরিশ্রম করে, তবু হলের লোকজন আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, মানবনিয়তির একটা বোধ সেখানে দেখা দেয়, মানুষের দুর্বলতার একটা উপস্থিতি সেখানে অনুভূত হয়।

অবশেষে একজন বক্তা সামনে এগিয়ে এসে শিকাগোর সাউথ সাইডের কথা বললেন, তার নিগ্রো অধিবাসী, তাদের দুঃখযন্ত্রণা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বললেন, আর এই সব কিছুকে যুক্ত করলেন বিশ্বসংগ্রামের সঙ্গে। এরপর আরো একজন বক্তা এলেন, তিনি সাউথ সাইডে কম্যুনিস্ট পার্টির করণীয় সম্পর্কে বললেন। এবং সবশেষে বৈশ্বিক, জাতীয় এবং স্থানীয় চিত্র একটা নৈতিক সংগ্রামের অভিভূত করা নাটকের মধ্যে এক হয়ে মিশে যায়, যে নাটকের অংশীদার হয়ে ওঠে হলকক্ষে উপস্থিত সবাই। এই উপস্থাপনার একটা নতুন বোধ প্রতিষ্ঠিত করেছে, এই ধরণীর বুকে মানুষ সম্পর্কে একটা নতুন বোধ। তার পুরাণ ও উপকথাসমূহ নিয়ে চার্চের বাইরে কম্যুনিস্ট পার্টি বাস করা মানুষদের অনুভব করতে এতো সক্ষম করে তুলতে পারে। আমি দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে, উপলব্ধি করি যে, আমি মানবজাতির ভবিষ্যৎ অবলোকন করছি, জীবন যাপনের এই পথই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবে। মানুষের আবেগের শক্তিকে, মানুষের অনুভূতির প্রকৃতিকে, এতো গভীরভাবে আলোড়িত করতে এমন আর কোনো পথের কথা আমার জানা নেই। এখন পর্যন্ত এমন আর কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় নি যা এই ধরণীতে

মানুষের নিয়তিকে এতো স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করেছে, যে নিয়তি তার রাজ-করা হবে বলে সে মনে করে সে পরিতৃপ্তি সে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে। কিন্তু আমি দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে, এটাও উপলব্ধি করি যে, খুব কম সংখ্যক মানুষই মানুষ জানে যে কম্যুনিজম তার বিভিন্ন পৃথক পৃথক পার্টিগুলির চাইতে এবং তার যাবতীয় কৌশল, তত্ত্ব, ভুলভ্রান্তি এবং ট্র্যাজেডির সমিলিত যোগফলের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি, ভালর জন্য হোক কিংবা মন্দের জন্য হোক, একবার এই পদ্ধতি পৃথিবীতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা আর ব্যর্থ হবে না, গোটা ইউরোপ তার সেনাবাহিনী নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে পারবে না, মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগের যে প্রণোদনা কম্যুনিজম জাগিয়ে তুলেছে তা সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেবে।

আর এই লোকগুলি আমাকে এখানে এসে একজনের বিচারকার্য দেখতে ও শুনতে বলেছে, যেন আমি কোনো রকম ভুল করলে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে তা বুঝতে পারি। আমি তো ওদের পক্ষে। আমি কি উঠে দাঁড়িয়ে ওদেরকে সে কথা বলতে পারি না? কিন্তু কথাটা চিন্তা করতে করতেই আমি বুঝতে পারি যে, আমি যে সত্য কথা বলছি তা তারা বুঝতে পারবে না। আমার সাহায্য করার ভঙ্গিটা তাদের ভীত করে তোলে। এখন আমি কিছু বললে নিজেকে আরো অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে ফেলবো।

এই লোকগুলির অনুভূতির কথা আমি অন্যদের বলতে চেয়েছিলাম। অনুরঞ্জভাব ও পীড়নের মধ্য থেকে তারা কম্যুনিজমের কাছে এসে পৌঁছেছে আমি তা বুঝতে পারি। আমি জানি যে, বাডি নিলসন কিংবা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবর্গ অথবা কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সদস্যবর্গ ব্রাজনীতি সম্পর্কে যতটা জানেন আমি ততোটা জানি না। রাজনীতি আমার অঙ্গন নয়, আমার অঙ্গন মানব-অন্তর। কিন্তু একমাত্র রাজনীতির জগতেই আমি মানব অন্তরে গভীর তলদেশ দেখতে পাই। কম্যুনিস্ট হৃদয়ে কি আছে, কম্যুনিস্টরা কি চায়, আমি অন্যদের তা দেখাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজে এখানে বিকল্প বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, ওরা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে রেখেছে।

সন্ধ্যার দিকে রসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগগুলি উত্থাপিত হয়। কাজটা পার্টির নেতারা করেন না, রসের বন্ধুরা, যারা তাকে সব চাইতে বেশি চিনতো, কাজটা তারা করে। সেটা ছিল মনোবলচূর্ণকারী। রস ভেঙে পড়ে। নৈতিকতার চাপের গুরুভার তার আবেগ সহ্য করতে পারে না। তার বিরুদ্ধে তথ্য প্রদানের জন্য কাউকে ভয়-ভীতি দেখানো হয় নি। তারা স্বেচ্ছায় সব তথ্য দেয়, তারা তারিখ, কথাবার্তা, ঘটনাস্থল সব কিছুর উল্লেখ করে। ধীরে ধীরে এবং অকাট্যভাবে রসের ভুল কাজকর্মের বিশাল কালো তালিকা গড়ে ওঠে। রস তা অস্বীকার করতে পারে না। কেউই পারতো না।

ওরা আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় নি কারণ আমার মধ্যে ওরা কী ভা
তার কোনো নাম ওরা দিতে পারে না। আমি রসের মতো ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করি
নি। ওদের একটি নীতিরও আমি প্রতিবাদ করি নি। কিন্তু ওরা ভয় পায় আমার চিন্তা ও
অনুভূতির ধরনকে। যে পরিবেশে আমাকে কাজ করতে হয় তা তাদের বিভ্রান্ত করে।
লেখার কাজটা একাকীত্বের মধ্যে করতে হয় আর কম্যুনিজম মানুষের একাকীত্বের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ওরা বলে, একা মানুষ দুর্বল মানুষ। অন্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ
হলে সে শক্তিশালী হয়। তাই, যে মানুষ একা অবস্থান নেয় স্বভাবগতভাবেই ওরা তাকে
ভয় পায়। কম্যুনিজম মানবিক জীবনের ঐক্যের কথা বলে এবং কোনো কম্যুনিস্ট তার
নির্ধারিত বিচ্ছিন্নতা থেকে সদা উঠে আসার পর যখন আরেকজনকে ওই একাকীত্ব
অন্বেষণ করতে দেখে তখন সে তাকে ভয় পায়। আমি যে কম্যুনিজমকে দেখি তা
সম্প্রসারিত পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অসহিষ্ণু, রাতারাতি ফল না পাওয়া গেলে তা অধৈর্য
হয়ে পড়ে, যে কাজ একদিনের মধ্যেই সম্পন্ন করা যায় না তা নিয়ে তারা ধৈর্য সংবরণ
করতে পারে না। এভাবেই আমেরিকা কম্যুনিজমকে আলিঙ্গন করেছে। এটাই হলো
বস্তুতান্ত্রিক বিদ্রোহের আমেরিকার প্রথম কাঁচা ফল।

রসের আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় আসে। আমাকে বলা হয়েছিল যে সে তার
কয়েকজন বন্ধুকে ঠিক করে রেখেছে, তারা তার পক্ষে সাক্ষী দেবে। কিন্তু সে কাউকে
ডাকলো না। সে উঠে দাঁড়ায়, তার শরীর কাঁপে। সে কিছু বলতে চেষ্টা করে কিন্তু তার
মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। সমস্ত হল-ঘর মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ। তার কালো
ত্বকের প্রতিটি বিন্দুতে তার অপরাধ ফুটে ওঠে। তার হাত কাঁপতে থাকে। দাঁড়িয়ে
থাকতে পারার জন্য সে হাত দিয়ে টেবিলের প্রান্ত আঁকড়ে ধরে থাকে। তার ব্যক্তিত্ব,
নিজের সম্পর্কে তার চেতনা, অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ যে স্বপ্ন তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে
দিয়েছে তা যদি সে মেনে না নিতো, তাতে অংশগ্রহণ না করতো সেই স্বপ্ন যা আমাদের
সকলকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে, সেটা না হলে সে এতোটা নতজানু হতো না।

নিচু, আবেগদীপ্ত গলায় সে বললো, কমরেডগণ, যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছে
আমি তার সব অপরাধের অপরাধী।

ডুকরে কেঁদে ওঠে সে। কেউ তাকে খোঁচায় নি। কেউ তার ওপর কোনো অত্যাচার
করে নি। কেউ তাকে ভয় দেখায় নি। সে ইচ্ছা করলে ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারতো,
সারা জীবনে আর কোনো কম্যুনিস্টের মুখোমুখি না হতে পারতো সে। কিন্তু সে তা চায়
না। তার অন্য কোনো উপায় নেই। একটা যৌথ পৃথিবীর স্বপ্ন তার আত্মার গভীরে
এমনভাবে খোদিত হয়ে গিয়েছিল যে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা সেখান থেকে অপসৃত
হবে না। সে বলে চলে, কেমনভাবে সে ভুল করেছে, কিভাবে সে নিজেকে সংশোধন
করে নেবে।

আমি ওখানে বসে থাকি। আমি জানি, অনেকে যারা মনে করে যে, তারা জীবনকে

জানে ও বোঝে, তারা মস্কোর বিচারগুলি সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। কিন্তু তারা যদি
আজকের এই বিস্ময়কর বিচারকার্য দেখতো তাহলে আর তারা সন্দিহান থাকতো না।
রসকে কোনো মাদক দ্রব্যের সাহায্যে হত-চেতন করা হয় নি। সে ছিল পুরোপুরি
জাগ্রত।

কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো ভয়ের কারণে সে স্বীকারোক্তি করে নি, কিন্তু সে যে
নিজেকে কি শাস্তি দেবে তার ভয়ে সে স্বীকারোক্তিগুলি করেছে। কম্যুনিস্টরা তার সঙ্গে
অনেকক্ষণ কথা বলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাকে নতুন চোখ দিয়েছে তার আর
সেই চোখ দিয়ে সে তার নিজের অপরাধগুলি দেখতে পেয়েছে। তারপর তারা সরে গেছে
নিজেদের আসনে বসেছে আর সে যে কিভাবে ভুল করেছে তার ইতিবৃত্ত শুনেছে। জাতি-
বর্ণ নির্বিশেষে সেখানে উপস্থিত সব সদস্যের সঙ্গে সে এক হয়ে গেছে। তার হৃদয় এখন
তাদের হৃদয়, তাদের হৃদয় তার।

আর একটা মানুষ যখন অন্যদের সঙ্গে এই রকম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়,
যখন এই রকম একাত্মতার মাত্রা অর্জন করে, কিংবা যখন একটা বিচারকার্য তার অনায়
কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আবার তাকে
আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে তখন তাকে, এই পৃথিবী গভীরতম নৈতিকতার বোধ
থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতেই হয় : আমি অপরাধী। আমাকে ক্ষমা করুন।

আমার কাছে এটা ছিল এক গৌরবে দৃশ্য, তবু, যেহেতু এটা আমাকে দোষী সাব্যস্ত
করেছিল, যেহেতু এটা ছিল অন্ধ এবং মূর্খ, সেহেতু আমি অনুভব করি যে, এটা এক
আতঙ্কের দৃশ্য। তাদের সীমিত জীবনের অন্ধত্ব, কম্যুনিজমের নাম শোনার বহু আগে
থেকেই তাদের যে জীবন দীর্ঘদিনের অত্যাচার-নির্যাতন ও কষ্টভোগের ফলে খণ্ডিত ও
নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, সেই জীবনের অন্ধত্বের কারণে তারা মনে করে আমি বুঝি তাদের
শত্রুদের সঙ্গে আছি। মার্কিন জীবন তাদের চেতনাকে এতোটাই দুর্নীতিগ্রস্ত করে
ফেলেছিল যে তাদের বন্ধুদের দেখলেও তারা তাদের চিনতো না। আমি জানি যে, এখন
তারা যদি রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হতো তাহলে তারা আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে
অভিযুক্ত করতো, তারপর আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। আর আমি এটাও জানি
যে, তাদের তমসাচ্ছন্ন অন্ধত্ব নিয়ে তারা মনে করতো যে তারাই সঠিক। আমি আর শেষ
পর্যন্ত থাকতে পারি না। আমি হল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে যে আসন্নিক টেনশন
আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে তার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমি
উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যাই। একজন কমরেড তার মাথা নাড়ে, আমাকে সতর্ক করে
দেয় যে বিচারপর্ব শেষ হবার আগে আমি যেতে পারি না।

সে বললো, তুমি এখন চলে যেতে পারো না।

আমি বললাম, আমি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার রাগের কারণে,
আমি না চাইলেও, আমার কণ্ঠস্বর বেশ উঁচু শোনায়।

আমরা পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকি। আরেকজন কমরেড ছুটে আসে। আমি এক পা সামনে এগিয়ে যাই। যে-কমরেড ছুটে এসেছিল সে ইঙ্গিতে জানায় যে আমাকে হল ত্যাগ করতে দেয়া যায়। ওরা কোনো সহিংসতা চায় নি, আমিও চাই নি। ওরা একপাশে সরে দাঁড়ায়।

আমি শিক্ষাগোর অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে আসি, একটা বিষাদের অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ঠাণ্ডার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি যাই। আমি আরেকবার নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলি, আমাকে একা দাঁড়াতে শিখতেই হবে। ওদের প্রত্যাখানে আমি এতোটা আহত হই নি যে, আমাকে তার জন্য হা-হুতাশ করতে হবে। হয়তো আমার ছেলেবেলার শিক্ষা আমাকে ওই নিরর্থক পথ থেকে রক্ষা করেছে। আমি সে রাতে বিছানায় শুয়ে আপন মনে বলি : ওরা আমার পক্ষে না থাকলেও আমি ওদের পক্ষে থাকবো।

পরদিন সকালে আমি শয্যা ত্যাগ করার আগেই একজন নিগ্রো কম্যুনিস্ট আমার বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। সে আসন গ্রহণ করে কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকায় না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই, হ্যারল্ড?

কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না।

যেভাবে খুশি বলো আমি এখন সব কিছু সহ্য করতে পারবো।

ওহ্, আমি আমার জীবনে কখনো এর চাইতে বেশি দুঃখিত হই নি। ওরা যে কি করতে যাচ্ছে আমি জানতাম না...

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঠিক বলছো?

ঈশ্বরের দোহাই, হ্যাঁ।

ধন্যবাদ। শোনো, আমি পার্টির শত্রু নই।

কী ভয়ঙ্কর!

ওর মধ্যে গৌরবের একটা ঝলকও ছিল।

কি?

কিছু না।

ও চলে যায়। ওই ছিল একমাত্র কম্যুনিস্ট যার মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলার মতো যথেষ্ট সাহস ছিল।

বিশতম অধ্যায়

ফেডারেল নিরীক্ষামূলক থিয়েটার থেকে আমাকে বরখাস্ত করা হলো ফেডারেল লেখক প্রকল্পে। আমি গাইড বই লিখে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস পাই। এই প্রকল্পের অনেক লেখকই ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। তারা শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কথা না বলার তাদের বৈপ্লবিক শপথ পালন করে চলে। আমি দফতরে তাদের পাশে বসি, রেস্তোরাঁয় তাদের পাশে বসে খাই, লিফটে তাদের সঙ্গে ওঠা-নামা করি, কিন্তু তারা সব সময় সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে, নীরবে।

প্রকল্পে কয়েক মাস কাজ করার পর আমাকে প্রবন্ধের সাময়িক তত্ত্বাবধায়ক করা হলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমি রাজনৈতিক অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাই। একদিন সকালে প্রকল্প প্রশাসক আমাকে তাঁর দফতরে ডেকে পাঠালেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, রাইট, এই প্রকল্পে তোমার বন্ধু কারা?

আমি বললাম, আমি জানি না। কেন?

তো, শিগগিরই জানবে।

মানে?

তুমি অদক্ষ, এই অভিযোগ তুলে কয়েকজন তোমার অপসারণ চাইছে।

তারা কারা?

তিনি আমার বেশ কয়েকজন ভূতপূর্ব কমরেডের নাম করলেন। তাহলে ব্যাপারটা এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ওরা এবার আমার রুটি-রুজির পথ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার লড়তে ইচ্ছা করে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওদের অভিযোগ সম্পর্কে আপনি কি করবেন ভাবছেন?

তিনি হেসে উঠে বললেন, কিছু না। আমার মনে হয় এখানে কি ঘটছে আমি তা বুঝতে পারছি। ওরা তোমাকে এই চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আমি সেটা দেখবো।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হেঁটে যাই। আমার মনে হলো তার কথার মধ্যে কিছু একটা যেন ঠিক শোনায় নি। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়ে পুনরাবৃত্তি করলাম, এই চাকরি? কি বলতে চাইছেন আপনি?

তুমি কি বলতে চাও যে তুমি তা জানো না?

কি জানি না? আপনি কিসের কথা বলছেন?

তুমি ফেডারেল নিগ্রো থিয়েটার ছেড়ে চলে এসেছিলেন কেন?

আমি সেখানে অসুবিধায় পড়ি। ওরা আমাকে ওই চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

নিগ্রোরা তাই করে। তিনি শ্লেষভরা কণ্ঠে বললেন, আর তোমার কি মনে হয় নি যে তাদের পেছনে উৎসাহদাতা ছিল?

আমি অবাক হলাম। এটা তো মারাত্মক। আমি অবাক হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করি।

তিনি বললেন, এখানে তোমরা এসব করার কিছুই নেই। তুমি ভাত করবে, লিখবে...

আমি প্রতিবাদ করে বলি, এ সব লিখবো কথা বলিনি।

তুলে যাও এ কথা।

আমি আমার টেবিলে ফিরে যাই। যে সব কমুনিস্ট আমার কাছে বসে আছে তাদের দিকে বড় বড় চোখে তাকাই। আমার রাগ হয় না, দুঃখ হয় না। একারে কাজ করলে এরা কত দূর যেতে পারবে? আমি জানি, আমাকে চাকরিচ্যুত করবে সক্ষম হলে এরা সেটাকে শ্রমজীবী মানুষের কৌশলের একটা বিজয় বলে গণ্য করবে। এরা আমার কথা ভুলে যেতে পারবে না কেন? আমি তো এদের কোনো নীতির বিরোধিতা করছি না। আমি এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছি না, কোনো কিছু লিখছি না। বিচ্ছু সব চাইতে খারাপ ব্যাপারটা তখনো ঘটে নি।

একদিন দুপুরে আমি আমার দেরাজ বন্ধ করে লিফটে নিয়ে নিচে নেমে আসি। তখনো নিচ তলায় পৌঁছে আমি রাস্তায় একটা আন্দোলনকারী দলকে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখি। প্ল্যাকার্ড হাতে নারী-পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমার পুরানো বন্ধু। তারা ওয়ার্কস প্রোগ্রেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শিল্পী ও লেখকদের উচ্ছেদের বেতন নদির করে আওয়াজ তুলছিল। এ ধরনের মিছিলের মধ্য দিয়ে কেউ পার হয় না। সেটাই প্রথা। আমি দরজার কাছ থেকে সরে আসার উপক্রম করতেই উচ্চকণ্ঠে আমার নাম উচ্চারিত হতে শুনলাম।

ওই যে, রাইট, গড ড্যাম, ট্রটস্কি পন্থী!

কুত্তার বাচ্চা রাইট ওদের দলে আছে!

তোকে আমরা চিনি, হারামজাদা!

রাইট লেপ্তজারী৩!

এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো আমি বোধ হয় বেঁচে নেই। আমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি যেখানে আদর্শিকার ভিত্তীয় ব্যবহৃত নাগরীর বাস্তবতম রাস্তায় আমাকে উচ্চকণ্ঠে শাপশাপান্ত করা হচ্ছে। আমি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাই, ইতিপূর্বে কখনো আমি এ রকম ধাক্কা খাই নি।

আমি সাফাই, ধোলাখেলা, বকুনিসুলভ আচরণ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি আর নিজেকে এ রকম নিরীক্ষুন-নির্যাতনের শিকার হতে দিতে পারি না। আমি সোজা স্থানীয় কমুনিস্ট পার্টি এখানের কাছে যাবো, তাঁর সঙ্গে কথা বলবো, তাঁর কাছে সব কিছু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করবো। আমি আমার এক বন্ধুকে অনুনয়-বিনয় করে বললাম সে যেন তার যতটুকু প্রভাব আছে তা খাটিয়ে পার্টি সেক্রেটারির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের একটা দিনক্ষণ ঠিক করে দেয়।

কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। অবশেষে খবর পেলাম যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে, ফোটকিন-এর সাথে। আমি নিঃশ্বাস ফেলি, মেনে নিই।

কমুনিস্ট পার্টির সদর দফতরে পৌঁছার পর আমাকে আলমা ফোটকিনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। মাঝারি, সোনালি চুল, নীল চোখ, মাথা ঘিরে রয়েছে বড় বড় কেশ। হাতে এক পাতা কাগজপত্র নিয়ে সেগুলি নাড়াচাড়া করছিল সে। আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো না।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে, হয়ে আমি পার্টি সেক্রেটারি বার্গারের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

তার চোখ হাতের কাগজের ওপর আটকে থাকে। মাথা না তুলেই সে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার?

পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পর্কে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

এ সব ব্যাপারে তিনি আপনার সাথে দেখা করতে পারবেন না।

তাহলে কার সঙ্গে আমি কথা বলবো?

আপনার কিছু বলার থাকলে আমি তা শুনতে পারি।

সে ছিল শীতল, সুদূর। আমি বুঝতে পারি যে, ও আগেই মন ঠিক করে ফেলেছে, আমার সম্পর্কে ইতিমধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।

আমি বললাম, বেশ কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, আমি সেগুলি পরিষ্কার করতে চাই।

আমি কথাগুলি জোর করে আমার ভেতর থেকে টেনে আনি, কারণ আমি বুঝেছিলাম যে আমার এই উদ্যোগ ব্যর্থ হবে।

আমার দিকে তখনো না তাকিয়ে ও জিজ্ঞাসা করলো, কি ভুল বোঝাবুঝি?

শান্তভাবে আমি তার বর্ণনা দিই, সালমাটা তথ্যগুলি জানাই, আর আমার মনে হয় আমি যেন একটা পাথরের দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছি। আমার বক্তব্যের শেষে ও বললো, ও সমস্যা নিয়ে আমরা আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না।

মানে? কি বলতে চান আপনি?

তার নীল শীতল কঠিন চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। সে উষ্ণ কণ্ঠে বললো, আপনি যদি সাইডে সাইডে আপনার কমরেডদের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে না পারেন তাহলে সে ব্যাপারে আমরা কি করবো বলে আপনি আশা করেন!

আমি বললাম, ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। ওরা আমাকে ট্রটস্কিপন্থী বলে।

কেন?

এতক্ষণে আমার ওপর পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে ও জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি ট্রটস্কিপন্থী?

আমি বললাম, না। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে আপনি ট্রটস্কিপন্থী ভাবলেন কেন?

ও নিঃশব্দে হেসে আবার তার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তো, কি বলার আছে আপনার?

আপনার জন্য আমাদের কিছুই করার নেই।

আমি এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার উত্তর আমি পেয়েছি, তবু সে উত্তর আমার কাছে মনে হলো অর্থহীন, অবোধ্য। আমি কোনো সমাধানই সমাধান করতে পারি নি। আমি ওর দিকে তাকাই, ও তখনো তার কাগজপত্রে মাথা নুয়ে আছে। আমি

ওডবাই বলে ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে যাই।

ও কোনো উত্তর দেয় না। আমি দরজার কাছে থেমে আবার ওর দিকে তাকাই। ও তখনো তার কাগজপত্র দেখছে। আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।

সেদিন রাতে আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করি, আমার ঘুম আসে না। আলমা ছেটকিনের মনের মধ্যে কি ছিল, তাকে কি বলা হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য কি ছিল আমি তা কল্পনা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু অসম্ভব কিছু উত্তর ছাড়া আমার মন কিছুই খুঁজে পায় না। তাকে কি সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে কোনো অবস্থাতেই আমাকে যেন বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেয়া না হয়? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে কেন? এমন কি রস, যে পার্টির মধ্যে থেকেও পার্টির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়েছে, সে এখনো পার্টির একজন সদস্য এবং বেশ ভাল তার অবস্থান। আর আমি? আমার বিরুদ্ধে তারা সরকারিভাবে কোনো অভিযোগ আনে নি অথচ আমি তাদের চোখে একজন প্রকাশ্য শত্রু।

আমি যে বাস্তবতা দেখি তাকে ব্যাখ্যা করার মতো কিছুই আমি ভেবে উঠতে পারি না। আমি যখনই পার্টির সঙ্গে আমার কী ঘটেছে সে কথা ভাবি তখনই আমার মন যেন একটু দুষ্টক্ষত হয়ে ওঠে। আমি লক্ষ কোটি বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কেন এমন হলো কিন্তু কোনো উত্তর পাই না।

দিন কেটে যায়। আমি আমার কাজ করে চলি। যে ইউনিয়নকে আমি সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিলাম সেই ইউনিয়নে আমার প্রভাব নস্যাত করার জন্য আমার প্রাক্তন কমরেডরা গোটা ইউনিয়নকেই অকার্যকর করে দিতে চায়।

১৯৩৬ সালের মে দিবস এগিয়ে আসে। ইউনিয়নের সদস্যরা ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আমরা জনসাধারণের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবো। মে দিবসের সকালে আমি মুদ্রিত নির্দেশাবলী পাই। তাতে লেখা ছিল কোথায় ক'টার সময় আমাদের ইউনিয়নের দলটি জড়ো হয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দেবে। আমি দুপুরে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখি যে, ইতিমধ্যে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। আমি আমাদের স্থানীয় ইউনিয়নের পতাকাগুলি খুঁজে বেড়াই কিন্তু কোথাও তাদের দেখতে পাই না। কোথায় তারা? আমি রাস্তা ধরে সামনে-পেছনে ছোটাছুটি করি, আমাদের ইউনিয়নের লোকজন কোথায় সে সম্পর্কে জানতে চাই।

জনৈক নিগ্রো জানালো, ওহ, ওরা তো পনেরো মিনিট আগে চলে গেছে। আপনি যদি মার্চ করতে চান তাহলে কোনো এক জায়গায় ঢুকে পড় ন।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ভিড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকি। হঠাৎ আমি শুনলাম কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকছে। আমি ঘুরে তাকাই। আমি দেখলাম আমার বাঁ দিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সাউথ সাইডের অংশটি মার্চ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন পুরানো পার্টি বন্ধু আমাকে ডেকে বললো, এই যে, এখানে চলে আসো।

আমি তার কাছে এগিয়ে যাই।

ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি আজকের মার্চে যোগ দিচ্ছো না?

আমি বললাম, আমি আমার স্থানীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারি নি। ওরা আগেই চলে গিয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? তুমি আমাদের সঙ্গে মার্চ করে।

পার্টির সদর দফতরে আমার শেষ সাক্ষাৎকারের কথা আমার মনে পড়ে। আমি তো শত্রু শ্রেণীভুক্ত। আমি বললাম, আমি ঠিক করতে পারছি না।

ও বললো, আরে, আজ মে দিবস। এসো, লাইনে দাঁড়িয়ে যাও। আমি বললাম, আমাকে নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল তুমি তো তার কথা জানো।

ও বললো, ওটা কিছু না।

আজ সবাই মার্চ করছে।

আমি আমার মাথা নেড়ে বললাম, আমার বোধ হয় এখানে যোগ না দেয়াই ভাল।

গড ড্যাম, তুমি কি ভয় পাচ্ছো নাকি? আজ মে দিবস!

ও আমার ডান বাহু ধরে টান দিয়ে আমাকে ওর পাশে সারির মধ্যে নিয়ে এলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি, ওর কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, উভয়ের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কথা জানতে চাই।

হঠাৎ আমার কানের কাছে একটা চিৎকার শুনলাম আমি, এই আমাদের দল থেকে বেরিয়ে যাও তুমি!

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম কম্যুনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির একজন নেতা, শ্বেতাঙ্গ, হালকা-পাতলা, খুব ছোট করে চুল ছাঁটা, সাই পেরী, আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, আমি...

আজ মে দিবস, আমি শোভাযাত্রায় যোগ দিতে চাই।

ও চেঁচিয়ে উঠলো, বেরিয়ে যাও!

যে নিগ্রো কম্যুনিস্ট আমাকে এখানে এসে দাঁড়াতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমি তার দিকে তাকাই। আমি চাই না যে, প্রকাশ্যে কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটুক। আমি আমার বন্ধুর দিকে ফিরি, কিন্তু সে তার দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। ও ভয় পেয়েছে। কি করবো আমি বুঝতে পারি না।

আমি ওকে উদ্দেশ্য করে বলি, তুমি আমাকে এখানে তোমাদের সঙ্গে মার্চ করতে বলেছিলে।

ও কোনো উত্তর দেয় না। আমি ওর জামার হাতায় টান দিয়ে বলি, বলো, ওকে বলো যে তুমি আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলে।

সাই পেরী চিৎকার করে উঠলো, আমি তোমাকে শেষ বারের মতো আমাদের সারি থেকে চলে যেতে বলছি!

আমি নড়ি না। আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এক সঙ্গে এতো প্রণোদনা এসে জড়ো হয়েছিল যে, আমি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারি নি। আরেকজন শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্ট পেরীর সাহায্যে এগিয়ে এলো। পেরী আমার জামার কলার ধরে আমাকে টান দেয়। আমি বাধা দিই। তারা আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখে। আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য যুঝি।

আমি বললাম, ছেড়ে দাও আমাকে!

ফুটপাথ থেকে আমাকে সশরীরে উপরে তুলে ফেলা হয়। আমি অনুভব করি যে আমাকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। দু' হাত দিয়ে রাস্তার কোণার একটা প্রস্তরখণ্ড আঁকড়ে ধরি আমি, যেন আমার মাথা গিয়ে সজোরে ফুটপাথে আঘাত না করে। ধীরে ধীরে আমি উঠে দাঁড়াই। পেরী তার সাহায্যকারী তীব্র চোখে আমাকে লক্ষ্য করছে। সারিবদ্ধ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টরা ঠাণ্ডা অপরিচিতের চোখ নিয়ে আমাকে দেখছে। আমার হাত জ্বালা করছিল, সেখান থেকে রক্ত ঝরছিল, তবু যা ঘটে গেল তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমি দুরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ কম্যুনিস্ট কর্তৃক প্রকাশ্যে শরীরিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছি আর কৃষ্ণাঙ্গ কম্যুনিস্টরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। আমি ওই জায়গা থেকে সরে আসতে পারি না। কি করবো সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো ধারণা জেগে ওঠে না। কিন্তু আমি আক্রমণাত্মক বোধ করি না। আমার শৈশব আমি পেছনে ফেলে এসেছি। আমি ওখানে অসাড় ও স্তম্ভিত হয়ে যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি জানি না, কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করি যে কম্যুনিস্ট পার্টির সুবিশাল লাইনগুলি চলতে শুরু করেছে। বিশ্ব বিপ্লবের কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীক আঁকা টকটকে লাল পতাকাগুলি তুলে ধরা হয়েছে, মে-র মৃদুমন্দ বাতাসে সেগুলি পতপত করে উড়ছে। ঢোল বাজছে। গান শোনা যাচ্ছে। বহু মানুষের পদভারে মাটি কেঁপে উঠছে। দৃঢ়মুখের নরনারীর একটি দীর্ঘ লাইন, সাদা আর কালো মানুষের, আমার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতে থাকে। আমি শোভাযাত্রার পেছন লুপ পর্যন্ত যাই, তারপর গ্র্যান্ট পার্ক প্লাজাতে ঢুকে একটা বেঞ্চের ওপর বসি। আমি কোনো কিছু চিন্তা করছিলাম না। চিন্তা করতে আমি পারছিলাম না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি একটা নৈর্ব্যক্তিকতা আমার মধ্যে জন্ম নিতে থাকে। নানা টুকিটাকি জিনিস বিশাল একটা তরঙ্গের মতো এসে একসঙ্গে মিশে একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা প্রেক্ষিত, নির্মাণ করে। আমি মনে মনে বলি, ওরা অন্ধ। বড় বেশি অত্যাচার নির্যাতন করে ওদের শত্রুরা ওদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। আমি একটা সিগারেট ধরাই। সূর্যালোকিত হওয়ার মধ্য দিয়ে একটা গান ভাসতে ভাসতে আমার কানে এসে বাজে।

জাগো, অনশন-বন্দি!

আমি যে গল্পগুলি লিখেছিলাম, যে গল্পগুলিতে আমি কম্যুনিস্ট পার্টিকে একটা সম্মান ও গৌরবের ভূমিকা দিয়েছিলাম, তার কথা আমার মনে পড়ে। সেগুলি যে সাদাকালোর অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে, লেখা শেষ হয়ে গেছে, সেজন্য আমি খুশি হই। কারণ আমি আর কোনোদিন ওই রকম করে লিখতে পারবো না, জীবনকে ওই রকম সরল তীব্রতার সঙ্গে আর কোনোদিন অনুভব করতে পারবো না, ওই রকম আবেগোচ্ছল আশা আর কোনোদিন আমি প্রকাশ করতে পারবো না, আস্থায় ওই রকম পরিপূর্ণ অঙ্গীকার আমি আর কোনোদিন করতে পারবো না।

জাগো, জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!

আমার অতীতের দিনগুলি, আমার যৌবনের দিনগুলি, আটের টানের মতো পেছনে সরে যাচ্ছে, আমাকে একা রেখে যাচ্ছে উষ্ণ রক্ত চুইয়ে, একটি অপরূপতর শান্ত ও গভীরতর চেতনার মধ্যে।

যত অত্যাচারে আজ বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী

আমার চিন্তাগুলি তাদের নিজস্ব একটা শক্তির জোরে আমার চেতনের কোনো এক জায়গা থেকে উঠে আসে। সঠিক পথ খুঁজে পাবার আগে বহু দীর্ঘ ও বন্ধুর সময় পার হতে হবে, বহুবার হোঁচট খেতে ও পড়ে যেতে হবে। আমি মনে মনে ভাবি সর্বলোকে অন্ধের মতো তাদের পথ হাতড়াতে হবে, প্রতিটি ভুলের গায়ে মাথা ঠুকতে হবে, প্রতিটি দুঃখকষ্ট ডেকে আনবে, তাদের জন্য রক্ত ঝরাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কিভাবে বাঁচতে হয় তা না শেখে।

কোনো একভাবে মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর এখন একটা নতুন ঐক্য, নতুন সামগ্রিকতা ও নতুন একাত্মতা অন্বেষণ করতে গিয়ে তাকে ভুল করে লক্ষ দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেতে হবে, শুধু এ টুকু আবিষ্কার করার জন্য যে আর জন্য কোনো সুনিশ্চিত গতিপথ নেই। তাকে কেউ কিছু বলে দিতে পারবে না। ইতিহাসের রক্তাক্ত পথ ধরে যেতে যেতে তা শিখতে হবে। পবিত্র মৃত্যু দিয়ে তাকে ক্রয় করতে হবে জীবনের প্রজ্ঞা। সামান্য একটুখানি শেখার জন্য তাকে চড়া মূল্য দিতে হবে।

কিন্তু মানুষের জন্য হয়তো সর্বদাই এটাই ছিল পথ...

নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত...

শোভাযাত্রা তখনো চলতে থাকে। তখনো পতাকা পতপত করে ওড়ে। গান তখন গীত হয়।

আমি বাড়ির পথ ধরি। একা। এখন সত্যি একা। আমি আমার নিজেকে বলি, আমাদের এই বিশাল বিস্তৃত শক্তিশালী মহাদেশে জীবন যাপনের সব চাইতে কম জানা উপাদান হচ্ছে মানুষের অন্তর, অস্তিত্বের সব চাইতে কম অন্বেষণ করা লক্ষ্য হচ্ছে একটি মানবিক জীবন যাপনের পথ খুঁজে পাওয়া। আমি ভাবি, আমার নির্যাতিত আবেগ-অনুভূতির মধ্যে থেকেও আমি হয়তো এই অন্ধকারের ভেতর একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়ে দিতে সক্ষম হবো। আমি যে চেষ্টাই করবো, করতে চাই বলে নয়, বরং এই জন্য যে আমি অনুভব করি, আমাকে বেঁচে থাকতে হলে তা করতেই হবে।

আমি আমার সঙ্কীর্ণ ঘরে একা বসে বসে মে-র ঠাণ্ডা আকাশে সূর্যকে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে দেখি। আমার অস্থির লাগে। আমি টুপি হাতে নেবার জন্য উঠে দাঁড়াই, আমার কয়েকজন বন্ধুর বাড়ি যেতে চাই আমি, আমার অনুভূতির কথা তাদের জানাতে চাই। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। তারপরই আবার বসে পড়ি। কেন এটা করতে

যাবো? আমার সমস্যা তো এখানেই, এখানে আমার মধ্যে, এইখানে এই ঘরের ভেতর, আর আমাকে তার সমাধান করতে হবে এইখানে, একাকী, নইলে তার সমাধান আর হবেই না। তবু, আমি এর মুখোমুখি হতে চাই না। আমার ভয় করে। রাস্তায় বেরিয়ে আসি। রকের অর্ধেক পার হয়ে ফিরে যাই, আবার বসে পড়ি, আমার জীবনকে সরাসরি দেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

তো, শহরে জীবন যাপন করে কি আমি পেয়েছি? দক্ষিণে জীবন যাপন করে কি পেয়েছি আমি? আমেরিকায় জীবন যাপন করে আমি কি পেয়েছি? আমি মেঝেতে পায়চারি করি। আমি জানি যে আমি কিছু শব্দের অধিকারী, আমার একটা অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা আছে যে কিভাবে একটা মানবিক জীবন যাপন করা যায় তার কোনো দৃষ্টান্ত আমার দেশ আমাকে দেখায় নি। আমার সমগ্র জীবন আমি বাঁচার একটা নতুন পথের জন্য বুভুক্ষু হয়ে থেকেছি...

গোধূলির প্রথম লগ্নে ইস্পাতের লাইনের ওপর দিয়ে কর্কশ শব্দ তুলে একটা ট্রলির চলে যাবার আওয়াজ শুনি আমি। আমি জানি অপর্যাপ্ত মজুরি পাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ নারীপুরুষ তাদের প্রভুদের অধীনে নিজ নিজ কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছে। আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনের ঘরে রেডিও বাজছে, আমার বাড়ির মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে একটি শ্বেতাঙ্গ মানুষের কণ্ঠস্বর, সে কণ্ঠস্বর একটা আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয়, যে যুদ্ধ লক্ষ কোটি জীবনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

আমি মনে মনে ভাবি, হ্যাঁ, সাদারাও তাদের কালো শিকারের মতোই হতভাগা। যদি এই দেশ একটা মানবিক পথের সন্ধান না পায়, যদি জীবনের একটা বোধ দ্বারা তার আচার-আচরণ পরিচালিত করতে না পারে, তাহলে আমরা সবাই, যেমন কালোরা তেমনি সাদারা, একইভাবে নিঃস্ব ও অপচয়িত হয়ে যাবে...

আমি একটি পেন্সিল তুলে নিই, একটা সাদা কাগজের ওপর তা ধরে রাখি, কিন্তু আমার অনুভূতির প্রাবল্য আমার শব্দের পথ রুদ্ধ করে রাখে। ঠিক আছে, আমি তাহলে অপেক্ষা করবো, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, যতক্ষণ পর্যন্ত না কি বলতে হবে তা আমি জানি। একটা বিশাল ঐক্য অর্জনের কোনো সুউচ্চ স্বপ্ন নিয়ে নয়, এখন আমি বিনীতভাবে চেষ্টা করবো একটা শব্দের সেতু নির্মাণ করতে আমার আর বাইরের পৃথিবীর মধ্যে, যে পৃথিবী এতো সুদূর ও পলায়নপর যে মনে হয় অবাস্তব।

আমি এই অন্ধকারের মধ্যে শব্দ ছুঁড়ে দেবো, অপেক্ষা করবো একটা প্রতিধ্বনির জন্য, আর যদি কোনো প্রতিধ্বনি জাগে, যত ক্ষীণই হোক, তাহলে আমি বলার জন্য, মার্চ করার জন্য, লড়ার জন্য, জীবনের জন্য যে ক্ষুধা আমাদের মধ্যে এক নাগাড়ে কামড়াতে থাকে সেই ক্ষুধার বোধ সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের সকলের অন্তরে অবর্ণনীয় একটা মানবিক বোধ নিরন্তর জাগরূক রাখার জন্য আমি আরো অনেক শব্দ পাঠাবো এই অন্ধকারের মধ্যে।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অনুবাদক, দেশে-বিদেশে খ্যাতিমান গ্রাবন্ধিক, শিক্ষব্রতী, সংস্কৃতিকর্মী এবং সুশীল সমাজের অন্যতম নেতা কবীর চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন (১৯৪৩-৪৪); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট বৃত্তিধারী হিসাবে মার্কিন সাহিত্য অধ্যয়ন করেন (১৯৫৭-৫৮) এবং সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৬৪-৬৫)।

কবীর চৌধুরী অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী কলেজে, অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে এবং অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। আনুষ্ঠানিক অবসর গ্রহণের পর তিনি এখন সেখানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পূর্বে তিনি বাংলা একাডেমীর প্রধান, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সচিব রূপে কাজ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন।

ইংরেজি, আমেরিকান, ফরাসি, জার্মানি, রুশ সহ বিভিন্ন ভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর মৌলিক ও অনূদিত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড়শো ছাড়িয়ে গেছে। তিরাশি বছরে পৌঁছে তিনি এখনও নিরলস সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত।

তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। এবং মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও ভারতের উইলিয়াম কেরী পুরস্কার। তাঁর স্ত্রী মেহের কবীরও একজন শিক্ষাবিদ ও সুঅনুবাদক।

আলোকচিত্র ▮ সুমন

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অনুবাদক, দেশে-বিদেশে খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক, শিক্ষব্রতী, সংস্কৃতিকর্মী এবং সুশীল সমাজের অন্যতম নেতা কবীর চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অনুবাদক, দেশে-বিদেশে খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক, শিক্ষাব্রতী, সংস্কৃতিকর্মী এবং সুশীল সমাজের অন্যতম নেতা কবীর চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন (১৯৪৩-৪৪); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট বৃত্তিধারী হিসাবে মার্কিন সাহিত্য অধ্যয়ন করেন (১৯৫৭-৫৮) এবং সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৬৪-৬৫)।

কবীর চৌধুরী অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী কলেজে, অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে এবং অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। আনুষ্ঠানিক অবসর গ্রহণের পর তিনি এখন সেখানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পূর্বে তিনি বাংলা একাডেমীর প্রধান, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সচিব রূপে কাজ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন।

ইংরেজি, আমেরিকান, ফরাসি, জার্মানি, রুশ সহ বিভিন্ন ভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর মৌলিক ও অনূদিত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড়শো ছাড়িয়ে গেছে। তিরাশি বছরে পৌঁছে তিনি এখনও নিরলস সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত।

তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। এবং মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও ভারতের উইলিয়াম কেরী পুরস্কার। তাঁর স্ত্রী মেহের কবীরও একজন শিক্ষাবিদ ও সুঅনুবাদক।